ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

মুক্তিযুদ্ধ পর্ব

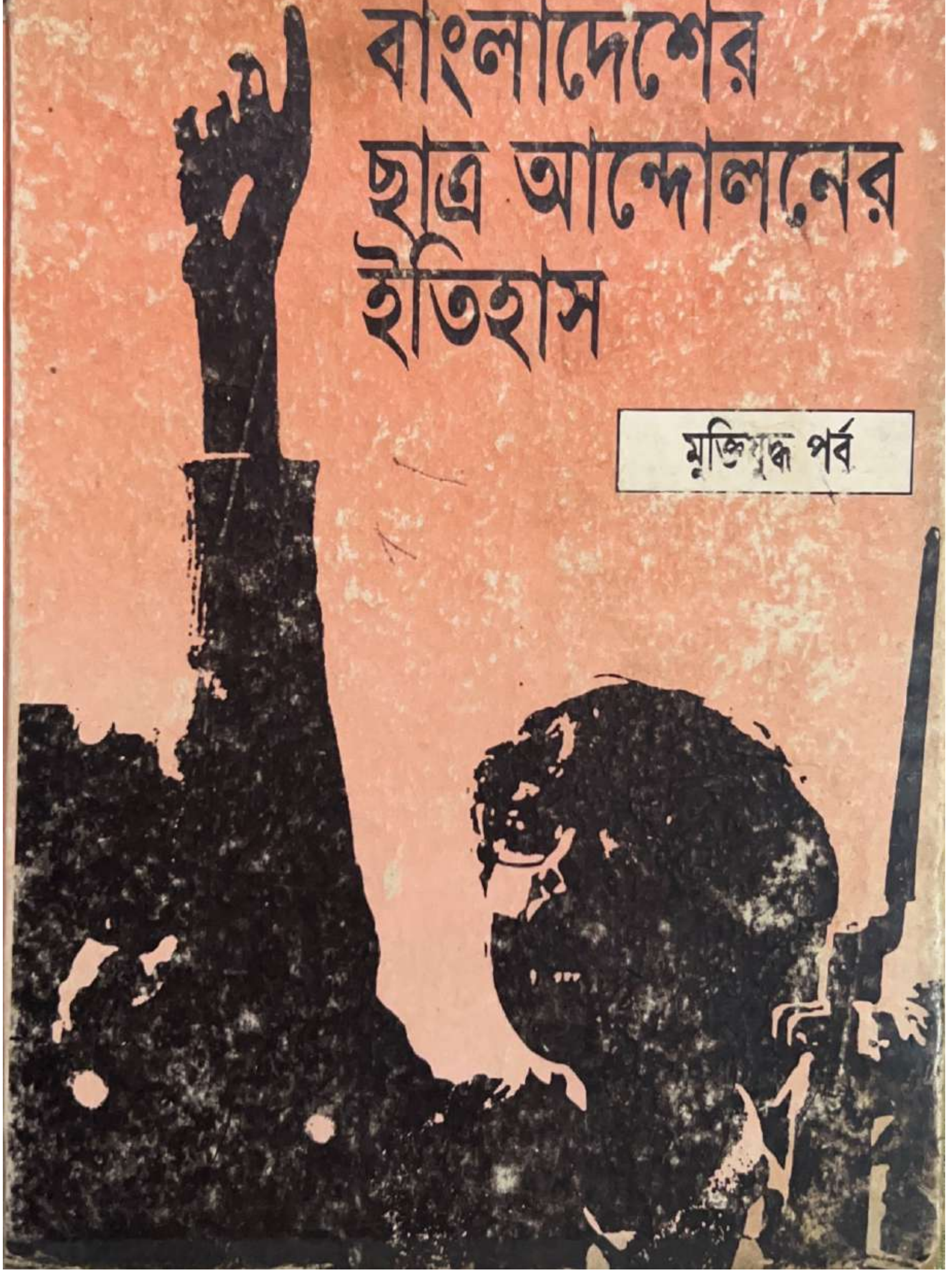

বাংলাদেশের
ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

(চতুর্থ খন্ড)

মুক্তিযুদ্ধ পর্ব

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

(চতুর্থ খন্ড)

মুক্তিযুদ্ধ পর্ব

ড. মোহাম্মদ হাননান

গ্রন্থলোক
ঢাকা

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৩৯৭
ফেব্রুয়ারী ১৯৯১

প্রকাশক
চৌধুরী গিয়াস উদ্দিন

গ্রন্থলোক
৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা

পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা

চেতনা
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস
সুবর্ণ মুদ্রায়ণ
৭৮/২–এ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা

মুদ্রণ
প্রকাশ
৩৪ বিজয়নগর, ঢাকা

প্রচ্ছদ
শেখর দত্ত

স্বত্ব
চিত্র রূপময় প্রান্ত

মূল্য :
শুলভ : ১৫০ টাকা
শোভন : ২১০ টাকা

History of the student Movement in Bangladesh, part IV, Liberation period, by Dr. Mohammed Hannan, Grantholoke, Dhaka.

মুক্তিযুদ্ধের মতোই প্রিয়
আমার তিন অনুজা

নাসিমা আখতার নাসিম
শাহীমা আখতার সোমা
সালমা আখতার আঁখি

এবং একমাত্র অনুজ
মোহাম্মদ আদনান বাতিন

এই চতুষ্টয়ের উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

১. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০–১৯৫২), প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, গ্রন্থলোক, ঢাকা, ১৯৮৬
২. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৯৫৩–১৯৬৯), দ্বিতীয় খন্ড, ওয়ার্শী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭
৩. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (প্রাক মুক্তিযুদ্ধ পর্ব), তৃতীয় খন্ড, গ্রন্থলোক, ঢাকা, ১৯৯১
৪. বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (মুক্তিযুদ্ধ পর্ব), চতুর্থ খন্ড, গ্রন্থলোক, ঢাকা, ১৯৯১
৫. বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব (মধ্যযুগ : মনসা মঙ্গল), ঢাকা, ১৯৯১
৬. বর্ণমালায় মুক্তিযুদ্ধ (যৌথভাবে), ঢাকা, ১৯৯১
৭. প্রিয়জনের ছবি (কবিতা গ্রন্থ), চেতনা, ঢাকা, ১৯৮৯

নান্দীপাঠ

বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ এই মহাদেশের মহাকাব্যিক পটভূমির নায়ক। দুনিয়ার দেশে দেশে বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে ছাত্র সমাজ এক অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিরাজিত। কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ এই ভূখন্ডটির শুধু নিয়ামক শক্তি নয়, জনকের আসনেও প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত: বাংলাদেশের ইতিহাস মানেই বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের ইতিহাস। দীর্ঘ সংগ্রাম ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ একটি দেশের জন্ম দেয়। দুনিয়ার কোনো দেশের ছাত্র সমাজের জন্যে এতো বড় ঘটনা নেই।

১৮৩০ সালে এদেশের ছাত্র আন্দোলনের যে অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হয়েছিল, ১৯৭১ সালে এসে তা পূর্ণ সফলতা লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, যার সাথে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের রক্তের সম্পর্ক, তার পূর্ণতার ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে আমার দীর্ঘদিনের একটি পরিকল্পনা মোট চার খন্ডে বাস্তবায়িত হল।

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড), যার আরেক নাম দেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পর্ব, তার শুরু ১৯৬৯ সালে জেনারেল ইয়াহিয়ার সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা থেকে। তবে তৃতীয় খন্ড ও চতুর্থ খন্ড মিলিয়েই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে, এই জন্যে এই দুই খন্ডের নামও দেওয়া হয়েছে প্রাক মুক্তিযুদ্ধ পর্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ পর্ব।

আলোচ্য চতুর্থ খন্ডটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর ছাপা হয়েও শুধুমাত্র বাধাইয়ের অপেক্ষায় প্রেসে পড়ে থাকে। মাত্র দু'টি জায়গায় এই সময়টায় দুটো সংযোজন করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের বিষয়টি। আমি এই সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য সংযোজনের চেষ্টা করেছি।

আলোচ্য মুক্তিযুদ্ধ পর্বে এমন অনেক দলিলপত্র ব্যবহার করা হয়েছে যা তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র'–এর ১৫ খন্ডেও স্থান পায়নি। এই কাজটি করতে গিয়ে দেখেছি, এখনো অনেক মুক্তিযুদ্ধের দলিল বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

এই বই লেখার সময় যার সাহায্য ও সহযোগিতা এবং প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি, তিনি তথ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন তথ্য কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা শামসুজ্জামান চৌধুরী। আমার দুর্ভাগ্য, তিনি এই বই গ্রন্থিত দেখে যেতে পারলেন না। ৩০ মার্চ (১৯৯০) রাতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিন মৃত্যুকে বরণ করেন।

এই অধিদপ্তরের আরেক জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের রণাঙ্গন প্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা হারুন–উর–রসিদ এর কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁর স্নেহ ধন্যে এই

বই লেখা সম্ভব হয়েছে। অনেক বই ও দলিল পত্রের খোঁজ এবং সংগ্রহ তাঁর উৎসাহে সম্ভব হয়েছে।

এই গ্রন্থে যেসব দৈনিক পত্রিকার কাজ রয়েছে, তার নিরঙ্কুশ অংশ সংগৃহীত হয়েছে বন্ধু প্রতীম এবং বাংলাদেশের যুব আন্দোলনের নবীন গবেষক ইলিয়াস মল্লিকের সৌজন্যে। এনায়েত হোসেন খান, মিজানুর রহমান, মাকসুদুর রহমান শ্যামল গ্রন্থটির নামসূচী তৈরী করে দিয়েছে।

সুবর্ণ মুদ্রণের মুজিব ভাই, আজাদ মোসলেম, শফিক, আক্কাস প্রমুখ এই গ্রন্থ প্রকাশে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের অতিরিক্ত শ্রম ও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া বহু সংখ্যক সুহৃদ, যাদের বিভিন্ন প্রকার শ্রম ও সহযোগিতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত ছাত্র আন্দোলনের এই খন্ড সফলভাবে বাস্তবায়িত, তাদের সকলের কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

মোহাম্মদ হাননান
২৪/ এম আজিমপুর এস্টেট,
ঢাকা–১২০৫

সূচীপত্র

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ :
নির্বাচন ঘোষণা ও প্রতিক্রিয়া ৩
প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে তিন ছাত্র সংগঠনের বিবৃতি ও প্রচারপত্র ৪
বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনায় বিবর্তন ১২
নির্বাচনে চ্যালেঞ্জঃ 'হাতে চুড়ি পড়বো' ১৫
বার নভেম্বর ঃ 'কাঁদো দেশবাসী কাঁদো' ১৯
একটি পোষ্টার ঃ সোনার বাংলা শ্মশান কেন? ২৩
পাকিস্থানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ২৪

নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলী ২৬

শাসনতন্ত্র রচনা প্রতিযোগিতা ২৮
সংসদ সদস্য হত্যা ২৯
নিরাপত্তা আইনে বন্দী মুক্তি ৩১
দুই আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব ৩২
জনতার সামনে প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের শপথ ৩৩
মুজিব হত্যা প্রচেষ্টা ৩৬
ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন ৩৭
'শেখ মুজিব ভাবী প্রধানমন্ত্রী' ঘোষণা ৩৭
প্রেসিডেন্টের পাখি শিকার ৩৮
মুজিব–ভুট্টো প্রথম বৈঠক: 'নতি স্বীকার করবো না' ৩৮
ভারতীয় বিমান ছিনতাই ৪২
নতুন রাজনৈতিক দল ৪৪

নির্বাচন পরবর্তী ভাঙ্গন, দলাদলি পদত্যাগ ৪৬

ভাসানীকে নিয়ে প্রশ্ন ৪৭
কমিউনিস্ট পার্টিতে হাতিয়ার গ্রুপের উদ্ভব ৬২

অবশেষে ঢাকায় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ৬৫

আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু ৬৫
বাংলা একাডেমীতে বঙ্গবন্ধু 'ফেব্রুয়ারী কঠিন সপ্তাহ' ৬৬
ছাত্র ইউনিয়ন : পাঁচটি প্রদেশেরই স্বাধীন সত্ত্বা দাবী ৬৮
'ঢাকায় যাবনা' ঃ সংকটের শুরু ৬৯

'জাতীয় পরিষদ হবে কসাইখানা' ৭২
'ডেনমার্কের যুবরাজের রচনা লেখা' ৭৪
ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের ভীড় ৭৫
সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব ও স্বাধীন গণবাংলার ডাক ৭৬
'নেতার অব্যক্ত কথা বুঝে নিতে হবে' ৭৮
প্রথম মুজিববাদের ঘোষণা ৭৯
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ধৈর্যের শেষ সীমায় ৭৯
সংকট নিরসনের চেষ্টা ৮১
পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়ে জুয়া খেলা ৮২
কমিউনিস্ট পার্টি ঃ পৃথক রাষ্ট্রের সম্ভবনার ইঙ্গিত ৮৩
ভাসানীর চিন্তাধারায় নতুন মোড় ৮৫
ফেব্রুয়ারীর (১৯৭১) শেষ দিনটি ৮৭
'কোন ছাগলে পাকিস্তান খাইয়াছে?' ৮৭
'ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভবনা আছে' ৮৮

অবশেষে গুজব সত্যি হল ঃ ঢাকার অধিবেশন স্থগিত ৮৯

ঢাকা স্টেডিয়াম : প্রথম রণভূমি ৯১
'কি করিতে হইবে' ৯১
ঢাকা পরিণত হল মিছিলের নগরীতে ৯৩
দোসরা মার্চের ঢাকা : কারফিউ ভঙ্গ, হরতাল ৯৭
'বাঙ্গালীরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে চায়' : বঙ্গবন্ধু ৯৯
স্বাধীনতার প্রস্তাব ও স্বাধীন পতাকা ৯৯
'নিষ্ঠুর তামাশা' ১০৬
'দানবের সাথে লড়াইয়ে রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিব' ঃ বঙ্গবন্ধু ১০৭
ছাত্রলীগের সভায় স্বাধীনতার প্রস্তাব ১০৮
ছাত্রলীগের প্রথম ইশতেহার ১০৯
চৌদ্দ মার্চের বাংলাদেশ ১১২
কন্ঠে কন্ঠে ক্ষুব্ধ গর্জন ১১৪
প্রাণে প্রাণে সংগ্রামী শপথ ১১৪
'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঃ ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু ১১৬
কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি ঃ 'বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়' ১১৯
ট্রেনিং শুরু : ছাত্র ইউনিয়ন ১২০
টিক্কা খানের আগমন ১২০
গণমুক্তি বাহিনী ও কালো পতাকা ১২১
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তৈরী ১২২
সরকারী প্রেসনোট : গণহত্যার স্বীকারোক্তি ১২৪

'লা–কুম দ্বীনুকুম আল্ইয়া দ্বীন' ১২৬
দুইজন জাতির পিতা ১২৮
টিক্কা খানের শপথ হল না ১২৯
কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা ১৩০
কমিউনিস্ট পার্টি (মা–লে) : 'অস্ত্র হাতে লড়াই করুন' ১৩১
দশ মার্চের ঘটনাবলী ১৩২
পূর্বাঞ্চল আগ্নেয়াগিরির জ্বালামুখে ১৩৪
দোষ করলো লাহোর : গুলী চললো ঢাকায় ১৩৬
ভুট্টোর স্বরূপে আত্মপ্রকাশ ১৩৮
'এখনো সময় আছে' : 'আর সময় নাই' ১৪১
'শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসুন' ১৪২
'আর শহীদ মিনার গড়বো না' ১৪৪
'৮৯ বছরের ইতিহাসের এমন ঐক্য দেখিনি' ১৪৬
পাকিস্তান ঃ বাংলা যুদ্ধ শুরু ১৪৮
ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের সামরিক মহড়া ১৫১
ভুট্টোর পুন:আগমন ১৫৩
বৈঠক আর বৈঠক ১৫৪
২৩ মার্চ ঃ দিবসের দিবস ১৫৫
'প্রেসিডেন্ট সারাদিন ক্যান্টনমেন্টে কাটালেন ১৫৭
সংকট হলো ঘনীভূত ১৫৮
পরাধীন বাংলার শেষ জনসভা ১৫৯
একটি চিরকুট ১৬১

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা ১৬৫

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঃ ১৬৭
আক্রমণের পরিকল্পনা ও নকশা
ইকবাল হলে প্রতিরোধ দূর্গ ১৭০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডী ১৭০
রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানা ই পি আর দপ্তর ছিন্নভিন্ন ১৭৩
লাশের শহর ঢাকা ১৭৫
পিপল, সংবাদ, ইত্তেফাকে আগুন ১৭৮
বিদেশীদের চোখে সেই কালরাত ১৭৮
সামরিক বাহিনী নিয়ে প্রশ্ন ১৮০
আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ১৮৫
ঐক্যবদ্ধ পকিস্তানে সর্বশেষ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গ ১৮৬
রেডিওতে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা ১৮৮
প্রস্তুতি ছাড়াই সর্বাত্মক যুদ্ধ ১৯০
সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম সম্পর্কে আওয়ামী লীগের অপরিপক্কতা ১৯১

সশস্ত্র সংগ্রামে বাঙালীদের ঐতিহ্য ১৯৩

প্রাচীন ও মধ্যযুগ ঃ কৈবর্ত্য বিদ্রোহ ১৯৩

সুলতানী ও মুগল যুগ : ১৯৪

বৃটিশ আমল ১৯৫

স্বাধীন বাংলার সরকার গঠন ২০০

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ
প্রাক প্রস্তুতির কয়েকটি স্মারক চিহ্ন ২০৪

বৈদিক, প্রাচীন ও মধ্যযুগ আমল ২০৪
১৯০৫, ১৯৪০, ১৯৪৬–৪৭–এর প্রচেষ্টা ২০৭
১৯৫৪ সালে ফজলুল হকের মন্তব্য ২১১
দেবেন সিকদারের প্রস্তাব ২১২
ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি (১৯৫৮) ২১৫
আওয়ামী লীগ–কমিউনিস্ট পার্টি বৈঠক : স্বাধীনতার প্রস্তাব (১৯৬১) ২১৮
কমিউনিস্ট পার্টির 'রাজনৈতিক চিঠি' (১৯৬২) ২১৯
ছয় দফা : (১৯৬৬) ২২১
শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস (১৯৬৮) ২২৫
কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি : জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা (১৯৬৯) ২২৬
ছাত্রলীগের 'নিউক্লিয়াস' ২২৮
বঙ্গবাহিনী গঠন : যুব প্রচেষ্টা ২৩০

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঃ
আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ বৈষম্য চিত্র ২৩২

একটি কৃত্রিম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঃ পাকিস্তান পরিকল্পনা, জন্ম এবং মৃত্যু ২৫০

একটি টাইপ রাইটার ও পাকিস্তান ২৫৬
টিক্কা খানের প্রথম বেতার ভাষণ ২৫৯
বঙ্গ শার্দূলরা এক হলেন : যুদ্ধ পরিকল্পনা ২৬০
শান্তি কমিটি গঠন : পাকিস্তান পন্থীদের উদ্যোগ ২৬১

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের আন্তর্জাতিক আবেদন ২৬২

ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ব আবেদন ২৬৫
ট্রেনিং শুরু ২৬৭
বাঙালী সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের অংশগ্রহণ ২৬৮
ছাত্র ও অন্যান্য মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা ২৬৯
ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ প্রচেষ্টা ২৭১
ছাত্রলীগ : মুজিব বাহিনী গঠন ও জটিলতা ২৭২
বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে আওয়ামী লীগে দ্বন্দ্ব ২৮৪
মোশতাক চক্রের ষড়যন্ত্র ২৮৭

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কমিউনিষ্ট গ্রুপগুলির মূল্যায়ন ২৯০

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মূল্যায়ন ২৯০
মাওবাদী গ্রুপ সমূহের মূল্যায়ন ২৯২
সর্বহারা পার্টির প্রচারপত্র ২৯৪
বাংলার কমিউনিষ্ট পাটি কর্তৃক যুদ্ধ ও রাষ্ট্রের রূপরেখা ২৯৬
মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন, দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সমস্যা ২৯৭

সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং দ্বন্দ্ব ৩০২

স্বাধীনতা বিরোধী বিভিন্ন বাহিনী গঠন ঃ রেজাকার, আল শামস, আলবদর বাহিনী শান্তি কমিটি ৩০৯

রেজাকার –আলবদর বাহিনী গঠনের পটভূমি ও পূর্ব প্রস্তুতি ৩১৩

সারাদেশে রেজাকার, আলবদর ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তান্ডব ৩১৭

রাজারবাগ পুলিশ লাইন সভ্যতার পরাজয় ৩১৭
ধর্ষিতা গ্রাম বাংলা ৩২০
রাজাকারের মাতাও ধর্ষণের শিকার হল ৩২৩
পাকিস্তানের রাজনীনিতে জামায়াতে ইসলামী, মওদূদী ও গোলাম আযম প্রসঙ্গ ৩২৭
অবরুদ্ধ নয় মাসে ইসলামী ছাত্র সংঘ, জামায়াতে ইসলামী ও দৈনিক সংগ্রাম ৩৩৪
গোলাম আযমের নির্দেশ ঃ ঘরে ঘরে দুশমনদের খুঁজে বের কর ৩৪৪
বদর দিবস পালিত ৩৪৪
রাজাকারের প্রসন্ন বদন ৩৪৫

অবরুদ্ধ নয় মাসের শিক্ষা জীবন ৩৪৬

দলে দলে সামরিক আদালতে ডাক ৩৫১
ক্ষমতায় নানা রকম রদবদল ৩৫২
শেখ মুজিবের বিচার ৩৫৩
ন্যাপ নিষিদ্ধ ঘোষিত ৩৫৪
গোলাম আযম প্রেসিডেন্ট ৩৫৫
অবশেষে ভুট্টোর খায়েশ মিটলো ৩৫৬

মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সারা : ৩৫৭

কলকাতায় ছাত্রদের মিছিল ৩৫৭
সিন্ধুর কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন ৩৫৭
'পাকিস্তান টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে' ৩৫৮
আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থন ৩৫৮
সোভিয়েতের বিভিন্ন গণসংগঠন ৩৫৮
বৃটিশ লেবার পার্টি ৩৫৯
সশস্ত্র বিশ্ব বাহিনী গঠন ৩৫৯
মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানে বাঙালী সমাজ ৩৫৯

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ভূমিকা ৩৬০

ভারত প্রথম এবং প্রধান স্তম্ভ ৩৬১
গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভূমিকা ৩৬৩
সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা ৩৬৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ৩৬৬

যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ৩৬৭

ঢাকায় গোপন তথ্য গ্রুপ ৩৬৭
ঢাকার ক্র্যাক প্লাটুন ৩৬৮
মুক্তিবাহিনীর হাতে মোনায়েম খান ৩৬৯
যুদ্ধ ক্ষেত্রের কয়েকটি ঘটনা ৩৭০

'বিজয় নিশান উড়ছে ওই' ৩৭৪

'প্রিয় আবদুল্লাহ, এসে পড়েছি' ৩৭৫
শত্রু মুক্ত বাংলাদেশ ৩৭৬
ফুলের মালা আর থুতুর ছটা ৩৭৭
চায়নীজ রাইফেলের নতুন 'মুক্তিযোদ্ধা' ৩৭৮
ইন্দিরার সংযম ৩৭৯
আনন্দে বেদনার সুর ৩৮০
'অভিশাপ দিচ্ছি' ৩৮৩

পরিশিষ্ট ৩৮৭

নামসূচী

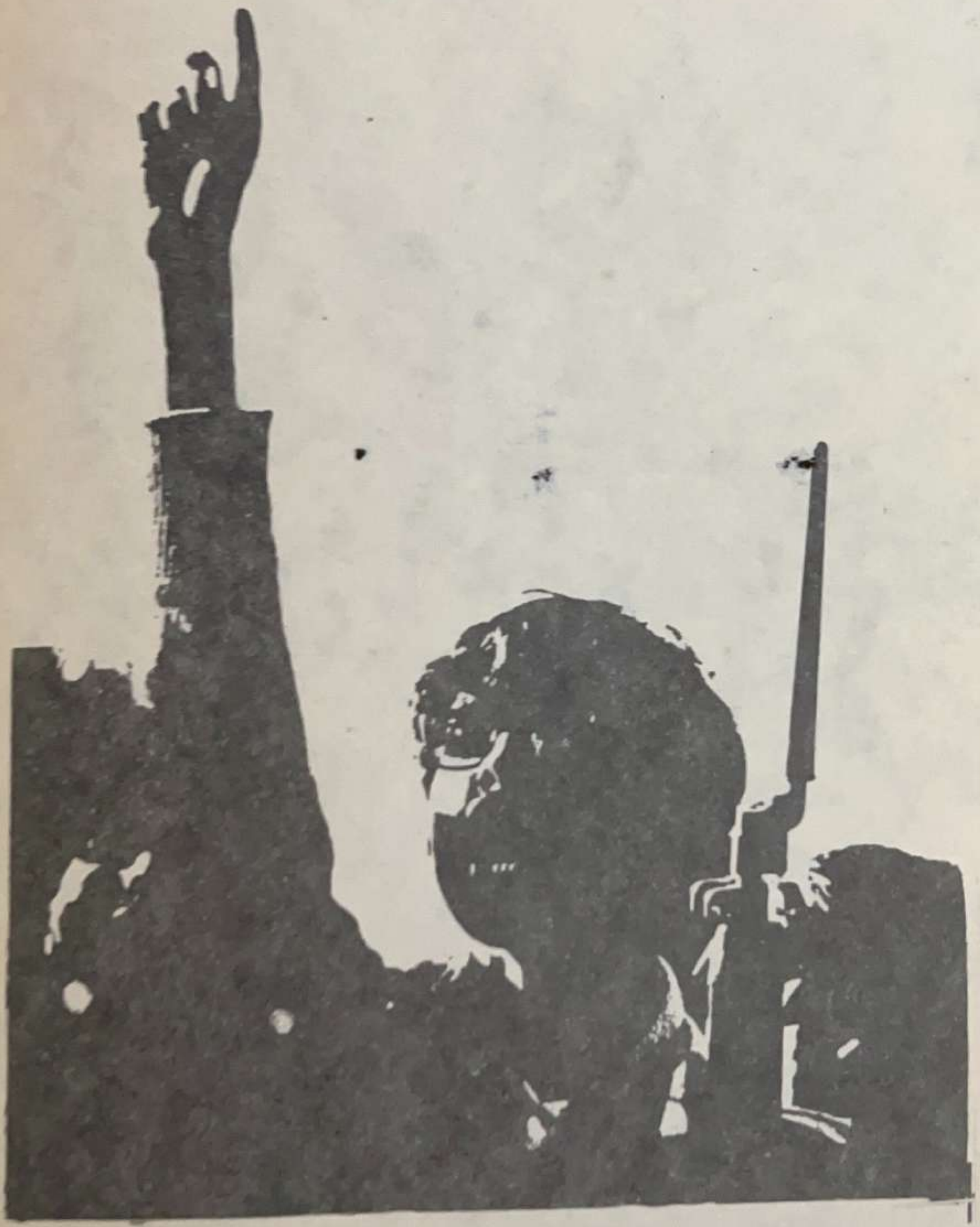

পাকিস্তানের
প্রথম
সাধারণ নির্বাচন
অসহযোগ আন্দোলন
এবং
স্বাধীনতার প্রস্তুতিতে
ছাত্র সমাজ

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ: নির্বাচন ঘোষণা ও প্রতিক্রিয়া

সারাদেশে রেডিও পাকিস্তান মারফত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে ২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) এক বেতার ভাষণ দেন। এতে প্রেসিডেন্ট সর্বপ্রথম পাকিস্তানে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করেন। ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে আরো কতকগুলি 'বৈপ্লবিক' ঘোষণা দেন। তিনি এদিন থেকে এক ইউনিট[১] বাতিল বলেও ঘোষণা করেন।

তিনি নির্বাচনে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' প্রথার কথা উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, ১৯৭০সালের ৩১ মার্চের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন আইনগত বুনিয়াদ প্রস্তুত হবে। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। জাতীয় পরিষদকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। অন্যথায় পরিষদ ভেঙে নতুন নির্বাচন দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, প্রদেশগুলোকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। দূর্নীতিবাজ প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত সামরিক আইন বহাল থাকবে।

এজন্য ১৯৭০ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে প্রকাশ্য পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেওয়া হবে।[২]

প্রেসিডেন্টের ভাষণের পরপরই ন্যাপ (ভাসানী)র সভাপতি মাওলানা ভাসানী এপিপির (এসোসিয়েট প্রেস অব পাকিস্তান বর্তমান বা. স. স.-এর পূর্বসূরী-লেখক) প্রতিনিধির

---

১ পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ (সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে) নিয়ে আইয়ুব খান 'এক ইউনিট' গঠন করেছিলেন। এর ফলে ৪টি প্রদেশের নতুন নাম হয়েছিল 'পশ্চিম পাকিস্তান'

২ দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ নভেম্বর ১৯৬৯

সাথে এক সাক্ষাৎকারে এক ইউনিট বাতিল ঘোষণাকে মোবারকবাদ জানান। তবে তিনি নির্বাচনের আইনগত ভিত্তি স্থাপনে গণভোট গ্রহণের দাবী জানান।

রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপের সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন, প্রেসিডেন্ট দেশের সমস্যাবলীকে ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন।

ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টির সভাপতি আতাউর রহমান খান বলেন, ৫ অক্টোবর নির্বাচনের তারিখ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অনুপযুক্ত। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে এ সময়টা বর্ষা মৌসুম।[৩]

৩০ নভেম্বর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় সমস্যাবলী অনুধাবন করার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও মূল সমস্যা সম্পর্কে জাতির সাথে ঐক্যমত প্রকাশের জন্য প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান। তবে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কোনো মতামত প্রকাশ না করায় তিনি দু:খ প্রকাশ করেন।[৪]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি সামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম, ছাত্রলীগ (তোফায়েল)-এর সভাপতি তোফায়েল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক আ. স. ম. রব, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (দুলন)-এর সভাপতি ইব্রাহিম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণে গণসংগ্রামের এক বিজয় সূচিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। পয়লা জানুয়ারী থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ দানের প্রসঙ্গে তারা বলেন, এদিন থেকেই সামরিক আইন তুলে নেওয়া উচিৎ।[৫]

প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে
তিন সংগঠনের যৌথ প্রচারপত্র

তিন সংগঠনের এই যৌথ বিবৃতির উপর ভিত্তি করে একই সময় একটি প্রচারপত্রও প্রকাশিত হয়। প্রচারপত্রে বলা হয়:

'দেশে পুনরায় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শাসন প্রবর্তনের জন্য 'এক লোক এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন ও নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করিতে হইয়াছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে। ইহাতে গণসংগ্রামের এক বিরাট বিজয় সূচিত হইয়াছে। ...পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ঘোষণাও সারাদেশের গণতন্ত্রকামী ও স্বায়ত্তশাসনকামী জনগণের আর একটি বিরাট বিজয়।

৩ দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ নভেম্বর ১৯৬৯
৪ ঐ, পয়লা ডিসেম্বর ১৯৬৯
৫ ঐ, দোসরা ডিসেম্বর ১৯৬৯

...দেশে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করিতে দেওয়ার জন্য যে দাবী উঠিয়াছিল, উহার পরিপ্রেক্ষিতে জানুয়ারী হইতে জনসভা, মিছিল, ধর্মঘটের অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার কথাও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।...

কিন্তু জনগণের দাবী হইল এই যে, দেশ হইতে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হউক এবং পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হউক। একই সঙ্গে বিনাবিচারে আটক দেশপ্রেমিক বৃদ্ধ জননেতা মণি সিংহ সহ সকল রাজবন্দী ও রাজনৈতিক কারণে সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত আটক সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক...

...আমরা মনে করি যে, ১লা জানুয়ারী হইতে সামরিক আইন তুলিয়া নেওয়া উচিত। ইহার ফলে শাসনব্যবস্থায় শূন্যতা সৃষ্টির অবকাশ নাই।....

...প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মাধ্যমে গণদাবীর কতকগুলি বিজয় সূচিত হইলেও আত্ম সন্তুষ্টির কোন অবকাশ নাই। ...দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী গত ২২ বৎসরব্যাপী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে এবং দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতে দেয় নাই। এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র চালাইয়া যাইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।...

...এ ক্ষেত্রে আমরা সুস্পষ্টভাবে এ কথা ঘোষণা করিতে চাই যে, শুধু নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র অর্জন করিলেই জনগণের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, একথা আমরা মনে করি না। ...সকল জাতির পূর্ণ জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্র শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়াই দেশ মুক্তির পথে যাইতে পারে।... কাজেই আমরা জনগণ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট আহবান জানাইতেছি যে দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও উগ্র-দক্ষিণ এবং উগ্র বামের বিপদের বিরুদ্ধে ১১ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হউন এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বর্তমানে অগ্রসর করিবার মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণ শাসন উচ্ছেদ করুন'।[৬]

চার মাস পর ২৮ মার্চ (১৯৭০) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে আরেকটি বেতার ভাষণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তাঁর পূর্বের প্রত্যয় ব্যক্ত

৬ প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে তিন সংগঠনের প্রচারপত্র, বনশ্রী মুদ্রায়ণ, ৩৪, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত [পূর্ণাঙ্গ প্রচারপত্রটি পরিশিষ্টে দেখুন]

করেন। কিন্তু তিনি এ দিনের ভাষণে কতকগুলি আইনগত কাঠামোর কথা ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন,

"The legal framework order, 1970 will be published on the 3oth of this month. This order will form the main base for the operation of the National Assembly in the task of constitution-making'[7]

৩০ মার্চ সরকারীভাবে আইনগত কাঠামো আদেশ জারী করা হয়।

পয়লা এপ্রিল আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির দু'দিনব্যাপী এক জরুরী বৈঠকে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঘোষিত আইনগত আদেশ-কাঠামো আদেশ সংশোধনের দাবী জানানো হয়।[৮]

মাওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে আইনগত কাঠামোর সমালোচনা করে বলেন, শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত কাঠামোর ব্যাপারে নির্বাচিত সদস্যদের কোনো কথা বলারই অধিকার থাকবে না।[৯]

প্রাদেশিক ন্যাপ (ওয়ালী) প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ আইনগত কাঠামোর ২৫ এবং ২৭ নম্বর ধারার সমালোচনা করে তা বাতিলের দাবী জানান।[১০]

আইনগত আদেশ কাঠামো জারীর মধ্য দিয়ে 'গণতন্ত্র দিয়ে আবার গণতন্ত্র নিয়ে যাওয়ার' আইনগত প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ 'এ্যাকশন পরিকল্পনা' গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৭ এপ্রিল এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) ১৩ এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেয়।

শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো (এল. এফ. ও) ঘোষণার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি, প্রতিবাদ ইত্যাদির পাশাপাশি ছাত্রলীগ ও ছাত্রইউনিয়ন পৃথক পৃথক প্রচারপত্রও বের করে। ছাত্রলীগের প্রচারপত্রে বলা হয়:

'দীর্ঘ বার বছরের আইয়ুবের অগণতান্ত্রিক সরকারের মূল উচ্ছেদ করিয়া সারাদেশে যে মুহূর্তে শর্তবিহীন নিরঙ্কুশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সামান্যতম সম্ভাবনা

---

৭ মর্নিং নিউজ, ২৯ মার্চ ১৯৭০
৮ দৈনিক পাকিস্তান, দোসরা এপ্রিল ১৯৭০
৯ ঐ পয়লা এপ্রিল ১৯৭০
১০ ঐ ৩ এপ্রিল ১৯৭০

দেখা দিয়েছিল গত ২৮ মার্চের ইয়াহিয়ার ভাষণ ও ৩০ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়ার ঘোষিত 'শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সে আশা দূরীভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয় জনজীবনে এক বিরাট জিজ্ঞাসা দেখা দিয়াছে যে - তাহা হইলে বাংলার ও বাঙ্গালীদের কি দশা হইবে।

...আমরা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে ইয়াহিয়া প্রণীত এই নীতিমালা কোনভাবেই এদেশের সংগ্রামী মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।'[১১]

ছাত্র ইউনিয়নের প্রচারপত্রে বলা হয়:

'ঘোষিত নির্বাচনী আইনগত কাঠামো আদেশ দ্বারা নির্বাচনী জাতীয় পরিষদকে কার্যতঃ পুরাপুরিভাবে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' করণের তথাকথিত পরিষদে পরিণত করা হইয়াছে।....

অন্যদিকে ছাত্রসমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত শিক্ষানীতিকে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, আই. ই. আর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ,সমাজকল্যাণ কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, পলেটেকনিক কলেজ, কৃষি কলেজ, এন. ডি. টি. আই. গ্রাফিক আর্ট ইন্সটিটিউট,টেকনিক্যাকল ইন্সটিটিউট, প্যারা মেডিক্যাল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী আজও মানিয়া লওয়া হইতেছে না।...ছাত্রনেতা হায়দার আলী, মাহাবুবউল্লাহ, বিধান, নির্মল, হিমাংসু বণিক, শুকদেব ঘোষ ও জননেতা মণি সিংহ, অজয় রায়,হাবিবুর রহমান, দেবেন সিকদার, শহীদুল্লাহ চৌধুরীসহ অসংখ্য দেশপ্রেমিক ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ, মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচণ্ড দমননীতির শিকারে পরিণত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়বারের জন্য সামরিক সরকারের শাসন কায়েম হইবার পর হইতেই আমরা দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি গুলির ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানাইয়াছিলাম। ...আমাদের এই আবেদনে কেহ কেহ সাড়া না দিয়া বরং গণতান্ত্রিক শক্তি ও দলগুলির মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করেন। খুবই দু:খজনক যে ১১ দফা উত্থাপনকারী ছাত্র সমাজের মধ্যেও বিভেদ তীব্র হইয়া উঠে।.... শাসকগোষ্ঠী আজ কৌশলে বীর শহীদদের রক্ত ও জীবনের মূল্য অর্থহীন করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

---

১১ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক ৪২ বলাকা ভবন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত ৫ এপ্রিল ১৯৭০

কিন্তু পূর্ব বাংলা তথা সারা পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র-সমাজ ও জনগণ শাসক-গোষ্ঠীর এই অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিয়াছে।'[১২]

৪ এপ্রিল বাংলা ছাত্রলীগের জরুরী সভায়ও শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো আদেশের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা হয়।[১৩]

১০ এপ্রিল সপ্তাহব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা থেকে রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রার প্রাককালে বলেন, আইনগত কাঠামো শতকরা ৯৯ ভাগ জনগণ কর্তৃক গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়েছে, শুধু মাত্র নয়া শাসনতন্ত্র প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কিভাবে অনুমোদিত হবে সে সম্পর্কেই কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথেও আলাপ করেন। আইনগত কাঠামো সংশোধন না হলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না-এমন কথা তাঁকে কোনো দল বলে নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।[১৪]

১৩ এপ্রিল পিপলস্ পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচীতে আইনগত কাঠামোর পক্ষে বলেন, শুধু এর ব্যাখ্যা নিয়েই সমস্যা হয়েছে। তিনি বলেন, তের শত বছরে ইসলামের ব্যাখ্যা নিয়ে মুসলমানরা কখনো এক হতে পারে নি। আজও এই ব্যাখ্যা নিয়ে এক হতে পারবে না।

কনভেনশনপন্থী মুসলিম লীগও আইনগত কাঠামোর সমালোচনা করে ১৩ এপ্রিল লাহোরে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সমালোচনা করে।[১৫]

৮ জুন খুলনায় হাদিস পার্কে এক জনসভায় জাতীয় প্রগতি লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান বলেন, আইনগত কাঠামো মেনে নিয়ে নির্বাচনে গেলে কোনোই ফল হবে না। তথাপিও তাঁর দল নির্বাচনে অংশ নেবে।

তিনি এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের সমালোচনা করে বলেন, শেখ মুজিব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল নেতার বিরুদ্ধেই কুৎসা গেয়ে বেড়াচ্ছেন। দেশে এ পর্যন্ত যে দুটো সামরিক শাসন জারী হয়েছে এজন্য শেখ মুজিবই দায়ী।[১৬]

---

১২ স্বাক্ষর: সামসুদ্দোহা ও নুরুল ইসলাম, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন, তারিখ: ১২ এপ্রিল ১৯৭০ [প্রচারপত্রটির পুরো অংশ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]
১৩ দৈনিক পাকিস্তান, ৬ এপ্রিল ১৯৭০
১৪ ঐ ১১ এপ্রিল ১৯৭০
১৫ ঐ ১৪ এপ্রিল ১৯৭০
১৬ ঐ ৯ জুন ১৯৭০

কিন্তু ১৬ জুন ঢাকার শান্তিনগরে আতাউর রহমান খান তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে ঘোষণা করেন, আইনগত কাঠামো আদেশ বাতিল না করলে তাঁর দল নির্বাচনে অংশ নেবে না।[১৭]

২৪ জুন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, শেখ মুজিবর রহমানের কাছে জবাব চেয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেছিলেন শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সংরক্ষিত না হলে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। কিন্তু এরই মধ্যে আইনগত কাঠামোতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এ সম্পর্কে তিনি (মুজিব) এখন কি বলবেন?[১৮]

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের সভাপতি খান সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে এ দলের কার্যনির্বাহী কমিটির দু'দিন ব্যাপী এক সভা শেষে আইনগত কাঠামো প্রত্যাহার না করলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণে তাঁরা অপারগ বলে ঘোষণা করেন।[১৯]

দোসরা জুলাই, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সর্বপ্রথম প্রার্থী মনোনয়নের কথা ঘোষণা করে। পূর্ব পাকিস্তানে তারা পয়লা জুলাই পর্যন্ত মাওলানা মওদুদীর সভাপতিত্বে মনোনয়ন বোর্ডের সভায় একশত প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করে।

৬ জুলাই আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ৯ দিন ব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে ঢাকা ফিরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

তিনি জানান, আওয়ামী লীগ একক ভাবেই নির্বাচন করবে, কারণ দলের জাতীয় ও প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটি কোনো প্রকার নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠন করার বিরোধিতা করেছে।[২০]

১৪ জুলাই অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, আতাউর রহমান খান সহ প্রদেশের ৪৬ জন রাজনৈতিক, ছাত্র, মহিলা, কৃষক ও শ্রমিক

---

১৭ দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ জুন ১৯৭০
১৮ ঐ ২৪ জুন ১৯৭০
১৯ ঐ ২৭ জুন ১৯৭০
২০ ঐ ৭ জুলাই ১৯৭০

নেতা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কর্তৃক নির্বাচন বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯ জুলাই প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেয়।[২১]

২৮ জুলাই (১৯৭০) প্রেসিডেন্ট শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবান জানিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে আরেকটি বেতার ভাষণ দেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, নির্ধারিত সময়ে অক্টোবরেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এ নির্বাচন হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ।

প্রেসিডেন্ট তার রাজনৈতিক উদারতার কথা প্রসঙ্গে উত্থাপন করে বলেন, 'প্রথম পর্যায়ে সামরিক আইন জারীর দিন থেকে.... এই পরিকল্পনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ না করা। আমার মনে আছে রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলে এতে যুগপৎ বিস্ময় এবং স্বস্তির সঞ্চার হয়েছিল। তাদের বিস্ময়ের কারণ ছিল এই যে সাধারণত: যে কোন সামরিক সরকারেরই প্রথম কাজ হয় রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। কেননা সামরিক সরকারের অস্তিত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার'।[২২]

প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার ফলে নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত রাজনৈতিক মহলের এতোদিনকার সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে।

দোসরা আগস্ট ভাসানী ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশন মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত নির্বাচনে অংশ নেওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার জন্য নির্বাচন তাঁরা ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারীতে পিছিয়ে দেওয়ার দাবী জানান।[২৩]

এর আগে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি নূর মোহাম্মদ খান ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক নান্নু এক বিবৃতিতে ভাসানী ন্যাপের এই প্রাদেশিক সম্মেলনে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবী জানিয়েছিলেন।[২৪]

---

২১ দৈনিক পাকিস্তান, ১৪ জুলাই ১৯৭০

২২ জাতির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ (পুস্তিকা), ২৮ জুলাই ১৯৭০ (পাকিস্তান সরকারের আঞ্চলিক প্রকাশনা দফতর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত, ১৯৭০)

২৩ দৈনিক পাকিস্তান, ৩ আগস্ট ১৯৭০

২৪ ঐ ২৬ জুলাই ১৯৭০

৭ আগস্ট কাইউমপন্থী মুসলিম লীগের প্রধান খান আবদুল কাইউম খান পূর্ব পাকিস্তানের বন্যার জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবী জানান। তিনি বলেন ৫ অক্টোবর নির্বাচন হতে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনেকেই বন্যার জন্য ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে না।[২৫]

ন্যাপ (রিকুইজিশনপন্থী) প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন, বন্যার কারণে নির্বাচন পিছিয়ে গেলে তাঁর দল আপত্তি করবে না। তবে তাঁর দল ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্বের বিরোধী। তিনি আরো বলেন, নির্বাচনে গণতান্ত্রিক দলগুলোর ঐক্যজোট হলে তিনি অভিনন্দন জানাবেন।

৯ আগস্ট আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে বক্তৃতাকালে বিভিন্ন মহল কর্তৃক নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবীর বিরোধিতা করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বছরই বন্যা হয়। ২৩ বছরে এ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। সুতরাং বন্যার অজুহাতে নির্বাচন পেছানো চলবে না। তিনি বলেন, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।[২৬]

যারা নির্বাচন পেছানো চায় তারা ষড়যন্ত্রকারী। আওয়ামী লীগ প্রধানের এমন ঢালাও উক্তির প্রতিবাদ করে ১১ আগস্ট পৃথক পৃথক বিবৃতি দেন ন্যাপ (ওয়ালী) পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, পিডিপি নেতা মাহমুদ আলী ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম।

সৈয়দ আলতাফ বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা দ্রুত নির্বাচনের জন্য এতোটা বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন যে, তিনি সকল প্রকার যুক্তিবোধ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেন, এবারকার বন্যা পূর্বেকার সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে।

মাহমুদ আলী বলেন, বিপুল জনপ্রিয়তার দাবীদার শেখ মুজিব নিশ্চয়ই চাইবেন নির্বাচনে বিপুল জনগণ অংশ নিক।[২৭]

অবশেষে নির্বাচন পিছালো

১৬ আগস্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচন পিছিয়ে দেন। জাতীয় পরিষদের যে নির্বাচন ৫ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল তা তিনি ৭ ডিসেম্বরে (১৯৭০) অনুষ্ঠিত

২৫ দৈনিক পাকিস্তান, ৭ আগস্ট ১৯৭০
২৬ ঐ ১০ আগস্ট ১৯৭০
২৭ ঐ ১১ আগস্ট ১৯৭০

হবে বলে ঘোষণা করেন। অবশ্য প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হয় নি। অবশ্য বলা হয়, তা অবশ্যই ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে।[২৮] পরে এর তারিখ ১৭ ডিসেম্বর হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনায় বিবর্তন

ছাত্রনেতা থাকাকালীন সময় থেকেই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনায় অসাম্প্রদায়িক চিন্তার রেশ লক্ষণীয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্রসংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় (১৯৪৮-৪৯) তিনি একে 'অপরিপক্ক সময়' ভাবলেও পরে এই সংগ্রামী ছাত্র সংগঠনটি তাঁর অনুপ্রেরণাতেই অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত হয়—এটা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এরপর থেকে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গতিধারা বিচিত্র পথের। তবে বিচিত্র মতের নয়। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণার পর তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বিষয়টি তাঁর মানসপটে লালন করেন। পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'ও আইয়ুব খান সরকার দায়ের করে ছিল।

কিন্তু এই সময়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনে একটি অভাবিত পরিবর্তনও ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার সাথে সমাজতন্ত্রের কথাও তাঁর চেতনায় যুক্ত করেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় এই পরিবর্তনকে 'অভাবিত' ভেবে তাঁকে ব্যঙ্গ করতে থাকেন। বিশেষ করে তৎকালীন পাকিস্তানে যাঁরা নিজেদের সমাজতন্ত্রের একমাত্র 'সোল এজেন্ট' ভাবতেন, বঙ্গবন্ধু প্রধানত তাঁদেরই আক্রমণের শিকার হন। এনায়েতুল্লাহ খান সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'হলিডে' বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে ব্যঙ্গ করে কার্টুনও প্রকাশ করে (ইতিহাসে পরবর্তীকালে এনায়েতুল্লাহ খানের সমাজতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকারের মন্ত্রী হয়ে সমাজতন্ত্র বিরোধী বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল কাজের সাথে হাত মিলিয়ে তিনি একজন 'সানডে কমিউনিস্ট' ছিলেন, তার প্রমাণ তিনি করেছেন)।

---

২৮ দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ আগস্ট ১৯৭০

১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দ যুক্ত করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। এ সময়ের বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তাও তাঁর রাজনৈতিক গতিধারায় গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নবাহী।

১৮ জুলাই (১৯৬৯) বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন, পূর্ণ আঞ্চলিক শায়ত্তশাসনই হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমস্যার ভদ্রোচিত সমাধান। তিনি বলেন, ভদ্রলোকের চুক্তিতে কখনো বিচ্ছিন্নতার সুর ধ্বনিত হতে পারে না।

শেখ মুজিব বলেন, দরিদ্র জনগণের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যই আমার সংগ্রাম। আমি একজন সমাজতন্ত্রী।

'বিচ্ছিন্নতা' সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর উপরিউক্ত কঠোর উক্তির কারণ ছিল এই যে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে সব সময়েই যে কোনঠাসা করে রাখার চেষ্টা করা হতো এটা ছিল তারই উত্তর।

এরপর ২৪ আগস্ট (১৯৬৯) ঢাকা জেলা বার সমিতিতে এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন, পাকিস্তানে ইসলাম টিকে থাকবেই। কিন্তু ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসন মানে আলাদা হওয়া নয়। শক্তিশালী কেন্দ্রের তুলনায় শক্তিশালী পাকিস্তান আরো বেশী প্রয়োজন।

পাকিস্তান এবং ইসলামকে যেসব রাজনীতিবিদ এক করে ফেলতেন এবং ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন বঙ্গবন্ধু তাঁদের উদ্দেশ্যেই এই বক্তব্য রাখেন। তিনি পাকিস্তানের শাসক ও শোষক গোষ্ঠীকে এটা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তারা যেভাবে পাকিস্তান রাখতে চান সেভাবে পাকিস্তান থাকবে না।

৮ সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্মদিনে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, একজন নাগরিক না খেয়ে মারা যাবে, আর অপর একজন নাগরিক ২৫ কোটি টাকার মালিক হবে আমাদের নেতা কখনো তা চান নি।

১০ সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) চট্টগ্রাম মুসলিম ইনসটিটিউট হলে বঙ্গবন্ধু বলেন, তাঁর দল ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশে সমাজতন্ত্র কয়েমের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, ইসলাম সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী নয়। কারণ ইসলাম চায় সামাজিক ন্যায় বিচার।

তিনি আরো বলেন, দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য কারো ইসলামের নাম ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

২২ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এক কর্মীসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, পুঁজিপতিদের দালালরা ইসলামী আদর্শের ভুল ব্যাখ্যা করছে। তিনি বলেন, ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

বস্তুত বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের পক্ষে যে যুক্তি এভাবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তাতে প্রতিক্রিয়াশীলরা সমাজতন্ত্রীদের জব্দ করার জন্য প্রধানভাবে ধর্মকেই ব্যবহার করেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা তাদের এর বিরুদ্ধে পাল্টা জবাব কখনোই হানতে পারে নি। অনেক বছর পর বঙ্গবন্ধু এসে এর বিরুদ্ধে তাঁর ভাষার-অস্ত্র ব্যবহার শুরু করেন।

পয়লা জানুয়ারী (১৯৭০) বঙ্গবন্ধু তেজগাঁও ইসলামিক মিশনের এতিমখানায় যান এবং সেখানে এক ঘরোয়া সমাবেশে তিনি বলেন, কতকগুলি রাজনৈতিক দল ইসলামের নামে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগাচ্ছে। এসব দল তাদের সাথে যারা একমত নয়, তাদের 'কাফের' ফতোয়া দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এরাই ইসলামকে ব্যবসার পণ্য হিসাবে পরিণত করে ইসলামবিরোধী কাজ করছে। বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, যিনি মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেন তিনিই প্রকৃত মুসলমান।

বঙ্গবন্ধুর এ মন্তব্য ছিল স্পষ্টতই প্রধানভাবে জামায়াতে ইসলামকে উদ্দেশ্য করে। কারণ পাকিস্তানের এই সময়কার রাজনীতিতে জামাতের প্রবলভাবে উত্থান ঘটে এবং যত্র-তত্র তারা ভিন্নমতাদর্শীদের 'কাফের' ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এমনকি জামায়াতে ইসলামীর বাইরে সকল দলকেই মাওলানা মওদুদী কাফের ফতোয়া দেন।

আর তাকে উদ্দেশ্য করেই বঙ্গবন্ধু ২৯ জানুয়ারী (১৯৭০) পাবনায় বলেন, রাজনীতি ও ধর্ম এক জিনিস নয়।

৭ জুন রোববার ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামের ঠিকাদার হতে চায়। তিনি বলেন, এ দলটি ৩ বছরে ১১টি পত্রিকার মালিক হয়েছে এবং প্রচুর বই-পত্র ছাপিয়েছে, এরা এতো টাকা কোথায় পায়?

এদিন বঙ্গবন্ধু অবশ্য ন্যাপ (ওয়ালী-মোজাফফর)-এর বিরুদ্ধেও কঠোর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, একটি দল 'ঐক্য ঐক্য' করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু তাদের আওয়ামী লীগে যোগদানের আহবান জানান।

এখানে উল্লেখ্য, নির্বাচনের পূর্বে ওয়ালী-মোজাফফর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ, আওয়ামী লীগের প্রতি ঐক্যের আহবান জানিয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা প্রত্যাখ্যান করে। বস্তুত এ দিনের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর সুরে কিছুটা দম্ভই প্রকাশ পায়। ওয়ালী ন্যাপ ছিল তৎকালীন পাকিস্তানে একমাত্র প্রগতিশীল দল যার দুই অংশেই শক্তিশালী অবস্থান ছিল। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে শক্তিশালী ছিল বটে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তার ভিত্তি ছিল না বললেই চলে। যদি আওয়ামী লীগ, ওয়ালী ন্যাপের সাথে নির্বাচনী জোট করতো তাহলে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন হতে শেখ মুজিবের প্রতি চ্যালেঞ্জ করার কেউ থাকতো না। কারণ ওয়ালী ন্যাপ পশ্চিম পাকিস্তানের দু'টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল।[২৮ক]

নির্বাচনে চ্যালেঞ্জের ছড়াছড়ি: 'হাতে চুড়ি পড়বো'

ডিসেম্বরে নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার পরই পাকিস্তানে নির্বাচনী তৎপরতা পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। এই সময় কাইউমপন্থী মুসলিম লীগের সহসভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান, শেখ মুজিবের প্রতি নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, তিনি ওয়াহিদুজ্জামানের ভরাডুবি ঘটাবেন।

২৮ আগস্ট এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ নেতা কাজী কাদের ও ওয়াহিদুজ্জামান এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের সাংবাদিকদের সাক্ষী রেখে বলেন, যদি আওয়ামী লীগের নেতারা নির্বাচনে জিততে পারেন তাহলে তাঁরা হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত চুড়ি পড়ে বেড়াবেন।

ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রে যদি তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। কাজী কাদের বলেন, রাজশাহী কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান জিতলে তিনিও রাজনীতি ছেড়ে দেবেন।[২৯]

২৮ক দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ জুলাই, ২৫ আগস্ট, ৯,১১,২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, ২,৩০ জানুয়ারী, ৮ জুন ১৯৭০

২৯ ঐ, ২৯ আগস্ট ১৯৭০

৩০ আগস্ট ওয়াহিদুজ্জামান আবার বলেন, শেখ মুজিব কোনো এলাকা থেকেই নির্বাচিত হতে পারবেন না।[৩০] (উল্লেখ্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ ও ঢাকা শহর থেকে একাধিক আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন)।

(ওয়াহিদুজ্জামান, কাজী কাদের এবং মুসলিম লীগ, পিডিপি, জামায়াতে ইসলামী সহ দক্ষিণপন্থী দলগুলো ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত এমন পরাজিত হয়েছিলেন যে, তাদের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। উৎসাহী এসব চ্যালেঞ্জ প্রদানকারীদের জন্য পরে চুড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁরা রাজনীতি থেকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অবসর নেন নি)।

২৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ঢাকায় তাঁর দলের মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। এদিন তিনি নির্বাচনের পূর্বেই সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

তিনি বলেন, একমাত্র সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট ব্যতীত আওয়ামী লীগ আর কারো সাথে নির্বাচনী জোট করবে না।[৩১]

আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল আসনেই প্রার্থী দেয়।

ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা, না করার দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। দলে অবস্থিত চরম বামপন্থীদের একটি উপদল নির্বাচন বর্জনের জন্য চাপ দিলে ঢাকায় দলের জরুরী কাউন্সিল ডাকা হয়।

৩ ও ৪ অক্টোবর দু'দিন ব্যাপী বৈঠকে দলে ভীষণভাবে তর্ক-বিতর্ক চলে এবং শেষ পর্যন্ত জুন মাসে লাহোরে দলের বৈঠকে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্তই বহাল থাকে।

দলের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান যাদু মিয়া তৃতীয় আরেকটি প্রস্তাব এনে বলেছিলেন, ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে শুধুমাত্র টোকেন অংশগ্রহন করবে। কিন্তু ভোটে এ প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।[৩২]

---

৩০ দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ আগস্ট ১৯৭০
৩১ ঐ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
৩২ ঐ ৫ অক্টোবর ১৯৭০

১৫ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬২ টি আসনের জন্য মোট ৮ শত ৭০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে।

এর মধ্যে ৩ জন মহিলা প্রার্থী রয়েছে। তাঁরা হলেন, জাতীয় লীগের আমেনা বেগম, ন্যাপ (ওয়ালী)-র সেলিনাবানু ও প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য খালেদা হাবীব।[৩৩]

২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান একযোগে বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর নির্বাচনী ভাষণ দেন। বস্তুত: শেখ মুজিবের ভাষণ দিয়েই পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশন নির্বাচনে রাজনৈতিক নেতাদের সিরিজ বক্তৃতা শুরু করে।

৩০ মিনিট ব্যাপী বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর প্রতিশ্রুতির পুনরোক্তি করে বলেন, "We are commited to the immediate withdrawl from SEATO, CENTO and all other military pacts'.[৩৪]

দোসরা নভেম্বর ঢাকার শহর এলাকা থেকে কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রার্থী ও শেখ মুজিবের প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা খয়েরউদ্দিন বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচন হবে পাকিস্তান টিকে থাকবে কি, থাকবে না-এই ইস্যুর উপর গণভোট।[৩৫]

৩ নভেম্বর, বেতার-টেলিভিশনে বক্তৃতা করে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রধান মাওলানা আবু আলা মওদুদী। তিনি বলেন, জামায়াত পাকিস্তানে এমন একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায় যা খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ করবে।[৩৬]

৫ নভেম্বর, ন্যাপ প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বেতার-টেলিভিশনে তাঁর নির্বাচনী ভাষণে বলেন,

---

৩৩ দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ অক্টোবর ১৯৭০

৩৪ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক: হাসান হাফিজুর রহমান (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৪), পৃষ্ঠা ৫৫৩ (পরে শুধু 'স্বাধীনতার দলিল' উল্লিখিত)

৩৫ দৈনিক পাকিস্তান, দোসরা নভেম্বর ১৯৭০

৩৬ ঐ ৪ নভেম্বর ১৯৭০

"Even if there are thousands of differences among us ; all should love Pakistan'.[৩৭]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান ৬ নভেম্বর বেতার-টেলিভিশনে তাঁর নির্বাচনী ভাষণ দেন। তিনি ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও নিম্নবিত্তের দাবী পূরণ করার আহবান জানান।[৩৮]

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) প্রধান নূরুল আমিন ১০ নভেম্বর বেতার-টেলিভিশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, মুখরোচক চৌখ ধাঁধানো শ্লোগান বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান করতে হবে।[৩৯]

এরমধ্যে ভাসানী ন্যাপের যারা নির্বাচন বিরোধী ছিলেন, তারা দেশের সর্বত্র নির্বাচন বয়কটের আহবান জানিয়ে মিছিল-সভা করে বেড়াতে থাকেন। ৯ নভেম্বর ঈশ্বরদীতে ভাসানী ন্যাপের মতিন-আলাউদ্দীন গ্রুপ ও পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা একটি নির্বাচন বিরোধী মিছিল বের করে।[৪০]

এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে ১২ নভেম্বর ঘটে যায় এক মহাপ্রলয়। প্রায় দশলক্ষ মানুষ অসহায় ভাবে মৃত্যু বরণ করে এতে। এ প্রলয়ঙ্করী মহাদুর্যোগে নির্বাচন হবে কি, হবে না - এ বিতর্ক আবার শুরু হয়ে যায়।

ওয়ালী ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এক বিবৃতিতে, পূর্ব পাকিস্তানের এই মহাবিপর্যয়ে নির্বাচন কিছুদিন পিছিয়ে দেওয়ার আহবান জানান।[৪১]

কয়েকদিন পর জলোচ্ছ্বাস কবলিত কয়েকটি এলাকায় নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর থেকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনী হাওয়ার পরিবর্তে এক শোকবিহ্বল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সারা প্রদেশ থেকে দলে দলে ছাত্র, যুবক ও রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মীরা আর্তমানবতার সেবায় দুর্গত এলাকায় যাত্রা করে।

---

৩৭ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৭ এবং দৈনিক পাকিস্তান, ৬ নভেম্বর ১৯৭০
৩৮ দৈনিক পাকিস্তান, ৭ নভেম্বর ১৯৭০
৩৯ ঐ ১১ নভেম্বর ১৯৭০
৪০ ঐ
৪১ ঐ ১৭ নভেম্বর ১৯৭০

২৪ নভেম্বর, ভাসানী ন্যাপের জরুরী বর্ধিত সভা ডাকা হয়। মাওলানা ভাসানী এতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভাসানী ন্যাপের যে ১৪ জন প্রার্থী জাতীয় পরিষদে এবং ৩৫ জন প্রার্থী প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করছিলেন তাঁদের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।[৪২] বস্তুত: ভাসানী ন্যাপের একটি গোষ্ঠী পূর্ব থেকেই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিরোধিতা করে আসছিল, ১২ নভেম্বর ঘূর্নিঝড়কে ইস্যু করে, চরম চাপ সৃষ্টি করে এবং শেষ মুহূর্তে এসে আংশিক সফলতা অর্জন করে।

কৃষক শ্রমিক পার্টির এ.এস.এম. সোলায়মানও সাইক্লোনের অজুহাত দেখিয়ে ৪ ডিসেম্বর মাত্র ৩ দিন আগে নির্বাচন থেকে সরে পড়েন।[৪৩]

বার নভেম্বর:
'কাঁদো দেশবাসী কাঁদো'

সমগ্র পাকিস্তান যখন প্রথম সাধারণ নির্বাচন নিয়ে উন্মত্ত ও উত্তেজণাপূর্ণ অবস্থায় কাটাচ্ছে, ঠিক তখন ১১ নভেম্বর দিবাগত রাতের শেষ প্রহরে বার নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য বিষাদপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। এদিন হিংস্রতম সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে নিপতিত হয় কয়েক লক্ষ মানুষ।

পশ্চিমে পটুয়াখালী থেকে পূর্বে সন্দ্বীপের উপকূল ও দ্বীপাঞ্চল, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুণা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা এদিন, মানুষ ও পশু তথা জীবন্ত প্রাণী শূন্য এক বিরান ভূমিতে পরিণত হয়।

সরকারী অবহেলা, অদুরদর্শিতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এদিনের ধ্বংসলীলা ও মৃত্যুর সংখ্যার মাত্রাকে এতো বেশী বাড়িয়ে তুলেছিল যে বাংলাদেশের ইতিহাসে জানামতে সাইক্লোনে এতো বেশী সংখ্যক লোক কখনো এমন অসহায়ভাবে মরে নি। বেসরকারী হিসেবে এ সংখ্যা দশলক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

সাইক্লোন, ঘুর্ণিঝড় বাংলাদেশে নিত্য নৈমিত্তিক। কিন্তু ১২ নভেম্বরের সাইক্লোনে এতো অধিক সংখ্যক প্রাণহানির কারণ অনুসন্ধানের পর তদন্ত কমিটি পেয়েছিলেন

৪২ দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ নভেম্বর ১৯৭০
৪৩ ঐ ৫ ডিসেম্বর ১৯৭০

এক আশ্চর্য তথ্য (এ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি) যা সেদিনের সারা বাংলার শোক বিহ্বল মানুষ শুনতে পায়নি। শুনলে ভিন্নরকম প্রলয় আরো ঘটতে পারতো।

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়া বিভাগে নতুন আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন একজন পশ্চিম পাকিস্তানী। তিনি এসে নতুন নির্দেশ জারী করেন যে, এখন থেকে আবহাওয়ার সংকেত রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারের জন্য পাঠানোর দরকার নেই। তিনি মনে করতেন, এগুলি শুধুমাত্র সমুদ্র ও নদীবন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজন, জনসাধারণের কোনো দরকার নেই।

তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী ছিলেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি মরুভূমির দেশেরই লোক। অবৈজ্ঞানিক ধারণা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা প্রশাসন ব্যবস্থায় চড়ে বসলে যা হয়, তাই ঘটেছিল সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের উপর। এদেশের মানুষ, রেডিও-টেলিভিশন আবিষ্কারের পর থেকে সাইক্লোনের পূর্বাভাসের সাথে সমুদ্র ও নদী বন্দরের সংকেত সমূহের বিবরণও শুনে আসছিল এরই মাধ্যমে। জনগণ আজো সংকেত সমূহের মানসংখ্যার উপর ভিত্তি করেই সাইক্লোনের প্রচণ্ডতার ধারণা নিতে অভ্যস্ত।

কিন্তু সেদিন পশ্চিমা আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে হটাৎ করে রেডিও-টেলিভিশনে সংকেত নম্বর প্রচারিত না হওয়ায় উপকূলবাসী ঘনিভূত এ সাইক্লোনকে গুরুত্ব না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সাইক্লোন অতিক্রম করার কথা ছিল মধ্যরাতে। ফলে ঘুমন্ত মানুষ-সকল কেউই আত্মরক্ষার সুযোগটুকুও পায়নি। ঘুমন্ত অবস্থায় লাখ মানুষ ভেসে যায় পানির প্লাবনের স্রোতের সাথে।[৪৪]

বাংলাদেশের মানুষ এখবরও জানতে পারে অনেক দেরীতে। ১১ নভেম্বর দিবাগত রাতের ঘটনা বিশ্ববাসী জানতে পারে ১৪ নভেম্বর। অধিকাংশ মৃতদেহ সমুদ্রে ভেসে যাওয়ার পরও যারা জীবিত ছিল, মৃত্যুর সাথে লড়াই করছিল, তারাও অসহায়ভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ৩দিন পরে ১৫ নভেম্বর খবরের কাগজগুলো অনুমান করে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ এতে নিহত হয়েছে।[৪৫] কিন্তু মৃতের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ১০ লক্ষ, এমনকি কোন কোন সূত্র ১৫ লক্ষ নিহত হওয়ার সংখ্যাও প্রকাশ করে।

---

৪৪ দৈনিক পূর্বকোণ (চট্টগ্রাম), ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯
৪৫ দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ নভেম্বর ১৯৭০

সরকারী উদ্ধারকার্য ও ত্রাণ তৎপরতা শুরু হয় অনেক দেরীতে। যে রাজনৈতিক কর্মীরা এসময়ও হাজার হাজার মানুষকে বাঁচাতে পারতো তারাও ছিল তখন নির্বাচন উত্তেজনায় বিভোর। প্রকৃতপক্ষে, সকল দিক থেকেই খুব বেশী রকম দেরী হয়ে যায় মানুষ বাঁচাতে। সামান্য পানিও ছিল না দুর্গত এলাকায়, কারণ জলোচ্ছ্বাসে সকল মিঠা পানিই সামুদ্রিক লবণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মাওলানা ভাসানী ২১ নভেম্বর শুক্রবার সারাদেশে শোক দিবস পালন ও গায়েবানা জানাজার আহ্বান জানান।[৪৬]

পাকিস্তান সরকার ২০ নভেম্বরকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাকে 'দুর্গত এলাকা' ঘোষণা করে বিদেশী সাহায্যের আহবান জানায়।[৪৭]

১৭ নভেম্ববর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বেতার ও টেলিভিশন ভবনের সামনে ক্ষয়—ক্ষতির প্রকৃত তথ্য প্রকাশের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৪৮]

১৮ নভেম্বর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আরমানীটোলা ময়দানে হাফেজ মোবারক হোসেনের ইমামতীতে এবং জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে সৈয়দ মোস্তফা মাহমুদ আল মাদানীর ইমামতীতে গায়েবানা নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ নভেম্বর থেকে সামরিক বিমান করে দুর্গত এলাকায় খাদ্য দ্রব্য নিক্ষেপ শুরু হয়।

এদিন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাঁর নির্বাচন সফর বাতিল করে দুর্গত এলাকা সফরে রওয়ানা হয়ে যান।

কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা এদিন যৌথভাবে ঢাকা শহরে একটি শোক মিছিল বের করে। মিছিলে 'কাঁদো দেশবাসী কাঁদো' শীর্ষক একটি ব্যানার বহন করা হয়। এ মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করার সময় মানুষ শোক বিহবল হয়ে পড়ে।[৪৯]

---

৪৬ দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ নভেম্বর ১৯৭০
৪৭ ঐ ২০ নভেম্বর- ১৯৭০
৪৮ ঐ ১৭ নভেম্বর ১৯৭০
৪৯ ঐ ১৯ নভেম্বর ১৯৭০

২০ নভেম্বর বেতার-টেলিভিশনে প্রলয়ংকারী ঝড়ের সঠিক তথ্য জানানোর দাবীতে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ইউনিয়ন বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কয়েকজন গ্রেফতার হয়।[৫০]

২৩ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের ১১ জন নেতা প্রেসিডেন্টের কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। তারবার্তায় বলা হয়ঃ

'গত সপ্তাহে সংঘটিত মানব সভ্যতার বৃহত্তম ধ্বংসলীলার প্রতি সরকারের ক্ষমাহীন অবহেলা, উদাসীনতা এবং খবর চাপা দেয়ার প্রচেষ্টাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তীব্র নিন্দা করছে। যে কাজের জন্য সরকার অথবা কোন মানুষ দায়ী নয় সেই মর্মান্তিক ঘটনা সরকার কেন ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছেন তা বোধগম্য নয়। ...কোন মন্ত্রী এখানে নেই। আপনি নিজে ভাসা ভাসাভাবে সফর করে প্রদেশ ত্যাগ করেছেন। ...এখনও পর্যন্ত মানুষ ও পশুর লাশ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে'।

তারবার্তায় স্বাক্ষর করেন মাওলানা ভাসানী, নূরুল আমিন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, আতাউর রহমান খান, খাজা খায়েরউদ্দীন, গোলাম আজম খান, এ সবুর, এ. এস. এম. সোলায়মান, মাওলানা সিদ্দিক আহমেদ, পীর মোহসেনউদ্দীন দুদু মিঞা এবং গরীব নেওয়াজ।[৫১]

এসময় পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক নেতা পূর্ব পাকিস্তানের এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়াননি। ব্যতিক্রম ছিলেন একমাত্র ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টি প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর নির্বাচনী প্রচার অভিযান বন্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত এলাকার মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং নিজ হাতে ত্রাণকার্য তদারক করেন।

মাওলানা মওদুদী এক বিবৃতিতে দুর্গত এলাকায় না যেতে পারার জন্য তাঁর অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেন।[৫২]

'দৈনিক পূর্বদেশ' এসময় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের ছবি দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে শিরোনাম করে-- 'ওরা কেউ আসে নি'।

---

৫০ দৈনিক পাকিস্তান, ২১ নভেম্বর ১৯৭০
৫১ দৈনিক পূর্বদেশ, ২৪ নভেম্বর ১৯৭০
৫২ দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ নভেম্বর ১৯৭০

'পূর্বদেশের' এ বিষয়ের সংবাদ বিবরণী পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত কঠোর আলোড়ন তোলে। কয়েকদিন পরেই ছিল সাধারণ নির্বাচন। জনগণ ব্যালটের অস্ত্র তুলে তার চরম প্রতিশোধ নেয়।

১২ নভেম্বরের পর পূর্ব পাকিস্তানবাসী কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের অবহেলা বিস্ময়ের সাথে প্রত্যক্ষ করলো। চরমভাবে অসহায় মনে করে পূর্বাঞ্চলের জনগণ। তাদের এরকম অবহেলা তারা প্রত্যক্ষ করেছিল ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আরেকবার। সে সময় উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সুযোগ জনগণ পায়নি। ফলে এবারের নির্বাচনে ব্যালট বেছে নিল জনগণ। জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব সারা পড়ে যায়, নৌকা মার্কায় সীল দেওয়ার জন্য। যে রায় এতোটা চরম হওয়ার কথা ছিল না, সে রায়ই পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ হয়ে দাঁড়াল।

একটি পোস্টার

পাকিস্তানের, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে একটি পোস্টার খুব আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?, পোস্টারে বর্ণিত বিষয় জনগণকে জঙ্গী করে তোলে এবং আওয়ামী লীগের প্রতি জনসমর্থন আরো নিশ্চিত হয়। আওয়ামী লীগের অসাধারণ যে বিজয় সূচীত হয় তার পশ্চাতে অনেক কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের এ পোস্টারটি প্রভূত ভূমিকা রাখে ঃ

সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খরচ	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	২০%	৮০%
আমদানী	২৫%	৭৫%
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	১৫%	৮৫%
সামরিক বাহিনী	১০%	৯০%
চাউল (প্রতি মণ)	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা (প্রতিসের)	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তেল (প্রতিসের)	৫ টাকা	২.৫০ টাকা
সোনা (প্রতি তোলা)	১৭৫ টাকা	১৩৫ টাকা

আবদুল মমিন, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।[৫২ক]

৫২ক Ranglal Sen, Political Elites in Bangladesh (UPL, Dhaka 1986)-গ্রন্থে উদ্ধৃত

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচন করেছিল বটে, কিন্তু সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর পর ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান ও ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনে সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছিল ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে, কিন্তু তাদের ভোটাধিকার ছিল না, সে সময় ভোট দিয়েছিল ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বি ডি মেম্বাররা। সুতরাং পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচনই ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন) এক অভূতপূর্ব ও জটিল ফলাফল নিয়ে আসে।

পূর্ব পাকিস্তানে মোট ১৬২ আসনের মধ্যে:	
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ:	১৬০টি
পি ডি পি :	১টি
স্বতন্ত্র :	১টি

পরে স্বতন্ত্র আসনটিও আওয়ামী লীগে যুক্ত হয়। স্বতন্ত্র সদস্য রাজা ত্রিদিব রায় পরে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের ঘরে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একটি আসনও না থাকায় দলটি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আঞ্চলিক মর্যাদার বাইরে ফিরে আসতে সক্ষম হয় নি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ নিয়ে যে বিশাল ভূখণ্ড পরে রইল তাতে আওয়ামী লীগের হয়ে কথা বলার কেউ থাকলো না।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের ফলাফলও বিরাট জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো।

পাঞ্জাবের ৮২ টি আসনের মধ্যে:	
পাকিস্তান পিপলস পার্টি :	৬৪টি
কাইউমপন্থী মুসলিম লীগ :	১টি
কাউন্সিল মুসলিম লীগ :	৭টি
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (থানভী গ্রুপ) :	৪টি
জামায়াতে ইসলামী :	১টি
কনভেনশনপন্থী মুসলিম লীগ :	২টি
স্বতন্ত্র সদস্যরা :	৩টি আসন লাভ করে।

সিন্ধুর জন্য বরাদ্দকৃত মোট ২৭টি আসনের জন্য :	
পিপলস পার্টি :	১৮টি
কাইউম পন্থী মুসলিম লীগ :	১টি
জামিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (থানভী গ্রুপ) :	৩টি
জামায়াতে ইসলামী :	২টি
স্বতন্ত্র সদস্যরা	৩টি
আসনে জয় লাভ করে।	

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আসন সংখ্যা ছিল মোট	১৮টি:
পিপলস পার্টি :	১টি
কাইউম মুসলিম লীগ :	৭টি
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ)	৬টি
ন্যাপ (ওয়ালী) :	৩টি
জামায়াতে ইসলাম :	১টি
এ প্রদেশে বস্তুত কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি।	

বেলুচিস্তান প্রদেশের জন্য মোট আসন সংখ্যা ছিল	৪টি :	
ন্যাপ (ওয়ালী)	৩টি	
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (হাজারভী)		১টি আসন লাভ করে।[৫৩]

সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী একমাত্র কেন্দ্রীয় দল ওয়ালী ন্যাপ একমাত্র এই বেলুচিস্তান প্রদেশেই সরকার গঠন করার মতো আসন পায় এবং যদিও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তারা কোয়ালিশন সরকার গঠনের মতো অবস্থায় পৌছেছিল হাজারভী গ্রুপের সাথে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে তারা ১ টি মাত্র আসন লাভ করতে সমর্থ হলেও পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে তারা কোন আসন লাভেই সমর্থ হয় নি।

অন্যদিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তানের বাকী ৩টি প্রদেশে তাদের জন্য অমর্যাদাকর অবস্থাই থেকে গেল। কিন্তু পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পাঞ্জাব ও সিন্ধুর আসন যোগ করে বলতে লাগলেন, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তান নামে সে সময় কোন প্রদেশই ছিল না। এক ইউনিট প্রথা ভেঙে যাওয়ায় সেখানে ৪টি প্রদেশের অস্তিত্ব ছিল।

---

৫৩ নির্বাচনী ফলাফলটি সাজানো হয়েছে, স্বাধীনতার দলিল, (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৬)-এর ভিত্তিতে

কিন্তু জনাব ভুট্টো বিষয়টা এমনভাবে উপস্থাপন করতে থাকলেন যে, মনে হতে লাগলো, পূর্ব পাকিস্তানে আছে আওয়ামী লীগ, এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আছে পিপলস পার্টি--সমান সমান। ফলে যুক্ত পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুতর এবং সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল।

নির্বাচন পরবর্তী ঘটনা

বস্তুত: পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের এই ফলাফল ছিল অভাবিত। পূর্ব পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগের নির্বাচন সম্পর্কিত পূর্ববর্তী যে রিপোর্ট ছিল, তার সাথে নির্বাচনের ফল শুধু অমিলই হল তা নয়, ফলাফল বিপরীতও হয়ে গিয়েছিল। ধারণা করা হয়, গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এমন একটি নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন দিতে সাহস করেছিল। তাদের ধারণা ছিল পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী দলগুলো, পি.ডি.পি, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, আসগর খানের গ্রুপ প্রমুখ নির্বাচনে আশাতীত ফল লাভ করবে। এমন কি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানও সত্যিকার অর্থে ফলাফল এতোটা বেশী তাঁর অনুকূলে যাবে ধারণা করতে পারেন নি। তিনি পূর্বপাকিস্তানে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা শুধু নিরঙ্কুশ নয়, একেবারে মাত্র দু'একটি আসন বাদে পুরো গরিষ্ঠতা, এতোটা হয়তো তিনি কল্পনায়ও আনেন নি। শেখ মুজিব ৯০% আসন লাভের সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন ৯৯% ভাগ আসন।

নির্বাচনে এ অভাবিত এবং অসাধারণ ফলাফল পাকিস্তানের রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে সূচিত করেছিল। কিন্তু এ পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর পাকিস্তানে গণতন্ত্র চর্চা ও এর বিকাশের প্রশ্নে কে কতটুকু আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান তা নিয়েই নির্বাচন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহিত হতে থাকে।

১০ ডিসেম্বর (১৯৭০) ডাকসু ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের এই বিরাট সাফল্যকে অভিনন্দিত করে। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, বাংলার মানুষ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রশ্নে ৬ দফা ও ১১ দফার সামান্যতম রদবদল সহ্য করবে না।[৫৪]

আগের দিন মাওলানা ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানীদের রায় যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে একটি গণভোট

---

৫৪ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০

অনুষ্ঠানের দাবী করেন। তিনি বলেন, দু'দিন আগে একটি নির্বাচনে জনগণ যে রায় দিল, তা কোনো ব্যক্তি, বা পার্টি কিংবা দফার জয় নয়। তিনি এ নির্বাচনের রায় ৬ দফা, ১১ দফা ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য জনগণের রায় বলে শেখ মুজিবের ঘোষণাকে নাকচ করেন।[৫৫]

বস্তুতঃ নির্বাচনের ফলাফলের ঠিক একদিন পরই মাওলানা ভাসানীর আরেকটি নির্বাচন দাবী ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের বিষয়টি পর্যবেক্ষক মহলকে বিস্মিত করে। কারণ একদিন আগে ঘটে যাওয়া নির্বাচনে মাওলানার দলের অংশ নেওয়ার কথা ছিল। তিনি প্রার্থীদের মনোনীতও করে-ছিলেন। প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর আকস্মিকভাবে রহস্যজনক কারণে মাওলানা নির্বাচন বয়কটের ডাক দেন। আবার নির্বাচনের ঠিক একদিন পরই মাওলানা ভাসানীর আবার আরেকটি নির্বাচন দাবী আনন্দে-উদ্বেলিত পূর্ব পাকিস্তানীদের বিস্মিত করে। অনেক রাজনীতিক একে অসুস্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাষ বলে মনে করতে থাকে।

কারণ লাহোরে এদিনই কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা মিয়া মমতাজ দৌলতানা এবং তেহরিকে ইশতেকলাল পার্টির নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান নির্বাচনে তাঁদের পরাজয়কে মেনে নিলেও পি.ডি.পি নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন, নির্বাচনে জনগণ ভুল রায় দিয়েছে। নসরুল্লাহ অভিযোগে করেন, আবেগ ও উত্তেজনার পরিবেশে দেশে এ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একই দিন ঢাকায় গোলাম আজমের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর দুইদিন ব্যাপী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করা হয়। সভায় বলা হয়, নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় নি।[৫৬]

কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের ১২ ডিসেম্বরের কার্যকরী পরিষদের জরুরী সভায় দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৫৭]

পূর্ব বাংলা ছাত্রশক্তি ১১ ডিসেম্বর প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মাওলানা ভাসানীর গণভোট অনুষ্ঠানের দাবীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। সংগঠনের সভাপতি

৫৫ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০
৫৬ ঐ ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০
৫৭ ঐ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭০

জিয়াউদ্দীন খান ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফ হোসেন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কায়েমের আহ্বান জানান।[৫৮]

শাসনতন্ত্র রচনা প্রতিযোগিতা

১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে একই দিন দু'টি পরস্পর বিরোধী ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা দিতে পারবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

অন্যদিকে, এ দিনই পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের মধ্যে মাত্র ২টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকর আলী ভুট্টো পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি করে সকলকে বিস্মিত করে দেন।[৫৯]

পরদিন এ ঘটনাকে মৃদু অভিনন্দিত করে এক সাক্ষাৎকার দেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে একমাত্র নির্বাচিত দক্ষিণপন্থী পি.ডি.পি'র নেতা নূরুল আমিন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি যদি সমঝোতার মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনায় এগিয়ে আসে তাহলে কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা দেবে না।[৬০]

এ প্রেক্ষাপটেই ভুট্টো ২১ ডিসেম্বর লাহোরে কেন্দ্রীয় সরকারে পিপলস পার্টি ও আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমান অংশীদারিত্ব দাবী করে বসেন।[৬১]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন পরদিন নির্বাচনের সাফল্যকে যাতে গণবিরোধী গোষ্ঠী নস্যাৎ করে দিতে না পারে তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে পরাজিত করার জন্যও জনগণকে অভিনন্দিত করে।[৬২]

---

৫৮ দৈনিক পাকিস্তান ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭০
৫৮ ঐ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭০
৫৯ ঐ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭০
৬০ ঐ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭০
৬১ ঐ ২২ ডিসেম্বর ১৯৭০
৬২ ঐ ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭০

সংসদ সদস্য হত্যা

এসময় পূর্ব পাকিস্তানে একটি নৃশংস ঘটনা ঘটে। পাবনার সাথিয়া-বেড়া এলাকা থেকে নব নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য আহমদ রফিককে নকশালপন্থীরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। তাঁর দেহে ১৩টি স্থানে ছুরিকাঘাত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ এক বিবৃতিতে এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেন, এ হত্যাকাণ্ডের বিচারে বিন্দুমাত্র সরকারী শৈথিল্য বাংলার ছাত্র সমাজ সহ্য করবে না।[৬৩]

পাবনা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছাত্রলীগের ডাকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

পাবনার সংসদ সদস্য আহমদ রফিক হত্যা নিন্দা করে ১২ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু বলেন, রাতের অন্ধকারে চোর-ডাকাতের মতো মানুষ খুন করে দেশের কল্যাণ আনা যায় না। তিনি বলেন, আমি এসব তথাকথিত বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চিনি। শীঘ্রই এরা এদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।[৬৪]

'ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা নেই'

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ঠিক পরপরই ১৮ ডিসেম্বর হাতিয়ার গ্রুপ বলে পরিচিত কমিউনিস্টরা সর্বপ্রথম তাঁদের পত্রিকায় এই আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, জনগণের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

নির্বাচনের পরই 'হাতিয়ার' পত্রিকা যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, পাকিস্তানের রাজনীতিতে অল্প কয়েকদিন পরই তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল। পত্রিকাটি বলেছিল,

'....মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ধনিকের কেনা গোলাম, জেনারেল ইয়াহিয়ার স্বৈরাচারী মিলিটারী সরকার চায় বর্তমান ঘুণেধরা রাষ্ট্রযন্ত্রটি অক্ষুন্ন থাকুক।

---

৬৩ দৈনিক পাকিস্তান ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭০
৬৪ ঐ ১২ জানুয়ার, ১৯৭০

মিলিটারী হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের ঐরূপ খায়েশ থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ নির্বাচনে অন্য প্রকার রায় দিয়া দিয়াছে এবং নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি এবং সেই সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়ার সরকার শাসনতন্ত্র তৈরীর প্রশ্নে মহাবিপাকে পড়িয়া গিয়াছে।...... ১৯৭০ সালের জনসাধারণের চেতনা একটি গণঅভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আকাঙ্ক্ষাও তাদের অত্যন্ত তীব্র.....

কেন্দ্রীয় তথ্য বিভাগ 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা', 'স্বাধীন বাংলা' বা 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' এমনকি 'সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান' কথাগুলি যাহাতে উচ্চারিত না হয় তজ্জন্য সংবাদপত্রগুলির প্রতি গোপন নির্দেশ জারী করিয়াছে।

.....পূর্ব বাংলার জনসাধারণ নিশ্চিতভাবেই আরেক নবতর মহাগণঅভ্যুত্থান ঘটাইয়া উহাকে উৎখাত করিয়া আকাঙ্ক্ষিত ১১ দফা ভিত্তিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করিবেই'।[৬৫]

'বাঙালী হতে হবে'

পয়লা জানুয়ারী, ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত, গবেষক ড. এনামুল হক তাঁর সম্মানে এক সংবর্ধনার জবাবে বলেন, 'এখন আমাদের বাঙালী হতে হবে'।

দোসরা জানুয়ারী দৈনিক পাকিস্তান একটি খবর পরিবেশন করে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একজন পশ্চিম পাকিস্তানীকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ করে দেশের নিরাপত্তার প্রতি তাঁর ভালবাসার বাস্তব প্রমাণ দেবেন। আইয়ুব আমলের মধ্যবর্তী সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল আজম খান এ পদে ভূষিত হতে পারেন বলে উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য, জেনারেল আজম খান আইয়ুবের নিয়োগকৃত প্রশাসক হয়েও তাঁর স্বভাব সুলভ উদারতা, অমায়িক ব্যবহার ও গণসংযোগের জন্য তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মন জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরে এ জনপ্রিয়তাই তাঁর চাকুরীর কাল হয়ে দাঁড়ায় এবং আইয়ুব খান তাঁকে অপসারণ করেন।[৬৬]

---

৬৫ সাক্ষাৎকার : নাসিম আলী এবং স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৭-৮৮
৬৬ দৈনিক পাকিস্তান, দোসরা জানুয়ারী ১৯৭১

১৯ জানুয়ারী ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ মণি সিংহ-এর মুক্তির দাবীতে এবং শহরে গুণ্ডামী-রাহাজানী ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে রাজধানী ঢাকা শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি গভর্ণর হাউসে গিয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য ৩০ মিনিট অবস্থান ধর্মঘট করে।[৬৭]

উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহকে দীর্ঘদিন থেকে বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রাখা হয়। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর বেশ কিছু রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলেও মণি সিংহকে আবার আটকে রাখা হয়। এমন কি ৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের অভাবিত রায় দেওয়ার পর পরিস্থিতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলেও মণি সিংহকে মুক্তি দেওয়া হয় নি।

৭০-এর নির্বাচনে নিরাপত্তা আইনে বন্দী মণি সিংহ রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাঁর ভোট প্রদান করেন। নেত্রকোণা মহকুমা ন্যাপের যুগ্ম সম্পাদক শাহ আবদুল মোতালিবের কাছে এক পত্রে মণি সিংহ জানান, এখান থেকে ন্যাপ মনোনীত জাতীয় পরিষদ সদস্য ওয়াজেদ আলী ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আবদুল কুদ্দুসকে ভোট দানের জন্য তিনি রিটার্নিং অফিসারের কাছে আবেদন করেছেন। ১৫ নভেম্বর, স্থানীয় রিটার্নিং অফিসার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের ঠিকানায় মণি সিংহের নামে পোস্টাল ব্যালট পাঠিয়ে দেন।[৬৮]

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রথম যেদিন ঢাকায় আসেন সেদিন রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি উঠেছিল। ইয়াহিয়া খান বলেন, তাঁর কারাগারে কোনো রাজবন্দী নেই। সাংবাদিকরা মণি সিংহের নাম বললে, ইয়াহিয়া সদম্ভে বলেন, 'মণি সিংহ কে? আমি তাঁকে চিনি না'।[৬৯]

নিরাপত্তা আইনে অপর বন্দী ছাত্রনেতা মাহবুবউল্লাহর সাথেও দীর্ঘদিন থেকে বিরূপ আচরণ করা হয়। ২৯ জানুয়ারী শনিবার ভোর ৭-২০ মিনিটে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহবুবউল্লাহকে মুক্তি দানের কথা ছিল। ভোর না হতেই শত শত ছাত্রকর্মী ফুল নিয়ে মাহবুবউল্লাহর মুক্তির জন্য যখন অপেক্ষা করছিল তখন

৬৭ দৈনিক পাকিস্তান, ২০ জানুয়ারী ১৯৭১
৬৮ ঐ ৫ ডিসেম্বর ১৯৭০
৬৯ সাক্ষাৎকার : নুরুল ইসলাম (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৭০-৭১) এবং দৈনিক পাকিস্তান, ১২ জানুয়ারী ১৯৭১

জেল কর্তৃপক্ষ জানান, নিরাপত্তা আইনে তাঁর আটকাদেশ আরো ৩ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এ ঘোষণার সাথে সাথে ছাত্রকর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং যে ফুল নিয়ে তারা মাহবুবউল্লাহকে বরণ করতে গিয়েছিল তা শহীদ মিনারে অর্পণ করে। ছাত্ররা এরপর মধুর কেন্টিনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে।[৭০]

ওয়ালী ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন ৩১ জানুয়ারী প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সামরিক আইনে কারাদণ্ড ভোগ করার পর জেলগেট থেকে ছাত্রনেতা মাহবুবউল্লাহকে পুনরায় নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতারের নিন্দা করেন। তিনি অবিলম্বে মাহবুবউল্লাহসহ সকল ছাত্র, শ্রমিক ও রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।[৭১]

**দুই আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব:
দেশ রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত**

পাকিস্তান নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সর্বশেষ ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রথম বক্তব্য রাখেন ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান। তিনি পিণ্ডিতে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন, পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যে দু'টো রাজনৈতিক দল প্রধানভাবে বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হয়েছে, তা আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি। দুটোই মূলতঃ আঞ্চলিক দল। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের বুনিয়াদ নেই, পূর্ব পাকিস্তানে পিপলস পার্টির অস্তিত্বই নেই। এ ঘটনাটি দু'টো রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রতিবন্ধক।

ওয়ালী খান বলেন, এক অর্থে এর গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ দেশ রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।[৭২]

ওয়ালী খানের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সত্যতা মেলে মাওলানা ভাসানীর বক্তৃতায়। এদিন মাওলানা ভাসানী রংপুরে এক জনসভায় বলেন, বন্যায় এ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে.। অথচ মাত্র ৬ শত কোটি টাকা

---

৭০ সাক্ষাৎকার : মাহফুজউল্লাহ (পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও মাহবুবউল্লাহর অনুজ) এবং দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ জানুয়ারী ১৯৭১
৭১ দৈনিক পাকিস্তান, পয়লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
৭২ ঐ ১৮ জানুয়ারী ১৯৭১

ব্যয় করে ক্রগ মিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতো। এ প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধ নির্মাণের জন্য ১৪ শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি আরো বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধ নির্মাণের জন্য ও লবণাক্ততা দূরীকরণে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। অথচ পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোনো উদ্যোগই নেওয়া হচ্ছে না।[৭৩]

২৮ জানুয়ারী মাওলানা চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে এক জনসভায় জানান, পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে ১৪ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছে। তাদের চাকুরী হবে এমন কোনো আশা তিনি দেখতে পান না।[৭৪]

সর্বত্র হাওয়া বদল

৬৯-এর গণআন্দোলনের সময়ে পুলিশের রায়টকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ছাত্রদের উপর নির্যাতন চালাতো। এ ছবি অনেক সময় বিরোধী দলের সংবাদ-পত্রেও প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় নি। দু'বছর পর ৭১ সালের ১৭ জানুয়ারী সরকারী দৈনিক পাকিস্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে রায়টকারের আলোকচিত্র প্রকাশ করে। শুধু তাই নয়, গণঅভ্যুত্থানের উপর এদিন সরকারী দৈনিকটি সচিত্র ফিচারও প্রকাশ করে। অথচ ৬৯-এর আন্দোলনের সময়ে, এমনকি গণঅভ্যুত্থান দিবসের পরদিনও এ সরকারী দৈনিকটি পড়ে বোঝা যায়নি পূর্ব পাকিস্তানে একটা কিছু ঘটে গেছে।

হাওয়া বদলের পালা শুরু হয় রাজনৈতিক দলে যোগদানের মধ্য দিয়েও। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পুত্র বেলায়েত আলী খান ২৪ জানুয়ারী (১৯৭১) আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন।[৭৫]

জনতার সামনে প্রকাশ্য শপথ

তেসরা জানুয়ারী (১৯৭১) রোববার আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) প্রকাশ্যে জনতার সামনে শপথ গ্রহণ করে। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং।

---

৭৩ দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ জানুয়ারী ১৯৭১
৭৪ ঐ ২৯ জানুয়ারী ১৯৭১
৭৫ ঐ ২৪ জানুয়ারী ১৯৭১

জনগণের সামনে প্রকাশ্যে এভাবে জনপ্রতিনিধিদের শপথ অনুষ্ঠান দেখার জন্য এদিন রেসকোর্স ময়দানে জনতার ঢল নেমেছিল।

১২০ ফুট দীর্ঘ ও ১২ ফুট উচু বিরাট নৌকার আকৃতির একটি মঞ্চ তৈরী করা হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্য এতে আরোহণ করেন। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয় এবং 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' নামে একটি গানও সমবেত কন্ঠে পরিবেশিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের উদীয়মান শিল্পী জাহেদুর রহিম, আবদুল জাব্বার, অজিত রায়, আবদুর রউফ, আবদুল গণি বোখারী প্রমুখ এতে কন্ঠ দেন।

বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতিকী ১৭টি কবুতর আকাশে করতালির মধ্য দিয়ে উড়িয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু নিজের কন্ঠে মোট ৬টি শ্লোগান দেন। এগুলি ছিল নিম্নরূপ:

১. নারায়ে তাকবীর ঃ আল্লাহ্ আকবার, ২. পাকিস্তান ঃ জিন্দাবাদ, ৩. আমার দেশ, তোমার দেশ ঃ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, ৪. জাগো জাগো ঃ বাঙালী জাগো, ৫. জয় বাংলা ৬. জয় পাকিস্তান।

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার দায়িত্ব পালন করেন, অন্যদিকে, 'তোমার দেশ আমার দেশ ঃ বাংলাদেশ বাংলাদেশ' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্থপতি একটি স্বাধীন ও নতুন দেশের স্বপ্নকেও জাতির সামনে পূর্বাহ্নেই তুলে ধরেন।

বস্তুত: এদিনের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণও ছিল ঠিক এমনি প্রতিকী তাৎপর্যসম্পন্ন। সমাবেশে নীতিনির্ধারণী বক্তৃতায় তিনি এমন কতকগুলি মন্তব্য করেন, যা ভাবতে গেলে বিশ্লেষকদের সত্যি বিস্মিত করে যে, কি করে সেদিন তিনি এতো আগেই আন্দোলন ও নির্বাচনের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এদিন ভাষণে বলেন:

'শুধু নির্বাচনে জয়লাভ করলেই দাবী আদায় হয় না। দাবী আদায়ের জন্য আরো সংগ্রাম করতে হবে।' আগামী দিনে এই সংগ্রামে রক্তদানের জন্য তিনি সকলকে প্রস্তুত থাকতে বলেন। নির্বচিনে বিজয়ের একমাসের মধ্যে নতুন করে রক্তদানের

প্রস্তুতি নেওয়ার আহবান সেদিক থেকে সবাইকে ভাবিত করেছিল। আওয়ামী লীগের উঁচু পর্যায়ের অনেক নেতাও এর তাৎপর্য সেদিন সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি।

এদিনই বঙ্গবন্ধু প্রথম তাঁর কর্মীদের প্রতিটি ইউনিয়ন ও মহল্লায় দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। ৭ মার্চের বহুপূর্বেই তিনি এ দুর্গ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কর্মীদের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন,ষড়যন্ত্রের কারণে যদি আমার মৃত্যুও ঘটে, তবু আপনারা নিরস্ত্র হবেন না। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যদি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে, তাহলে তিনি তাদের জ্যান্ত কবর দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।

বঙ্গবন্ধু কর্মীদের এদিন থেকে বাঁশের ও সুন্দরী কাঠের লাঠি তৈরীর নির্দেশ দেন।

আল্লাহর ধর্ম ইসলামের নামে যারা ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করছে, বঙ্গবন্ধু বলেন, তাদের শাস্তি হচ্ছে, চাবুক মারা। তিনি বলেন, 'ইসলাম গেল-ইসলাম গেল' বলে যারা চিৎকার তুলেছিল, জনগণ এবার এ পরগাছাদের একেবারে সাফ করে দিয়েছে।

ইসলামপন্থীদের পর তিনি চরম বামপন্থীদেরও সমালোচনা করেন। কিন্তু ভূমিহীন ও বস্তিবাসীর প্রসঙ্গ তুলে তিনি নিজেই চরমপন্থা গ্রহণের আভাস দেন। তিনি বলেন, রাস্তার পাশে ও বস্তিতে যারা শোচনীয় জীবন-যাপন করছে তাদের জমি ভুড়িওয়ালারা কেড়ে নিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে এবং ভুড়িওয়ালাদের থেকে জমি কেড়ে নিয়ে বাস্তুহারা ও বস্তিবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধু বলেন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হবে এবং আগামী ১০ বছরের মধ্যে ভুমি রাজস্ব বলতে আর কিছু থাকবে না।

আমলাদের কথা বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় আমি কারাগার থেকে অনেক সরকারী আমলার খেলা দেখেছি।

তিনি বলেন, বুড়িগঙ্গা, যমুনা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষ্মা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করা হবে।

ছাত্রদের ১১ দফা বাস্তায়নেরও তিনি আশ্বাস দেন এবং ১৯৬১ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সরকারী দৈনিক পাকিস্তান একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে এবং এতে পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট ধনিক ব্যক্তি ও শিল্পপতি জহুরুল ইসলাম নিজের নামে শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে।[৭৬]

চৌঠা জানুয়ারী ছিল ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস লেখার জন্য লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এতোদিন যে ইতিহাস লেখার ক্ষমতা হয় নি এখন লিখুন। সে বই নিষিদ্ধ করার কারো ক্ষমতা নেই। তিনি বলেন, আমাদের ছেলেরা তাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জানে না। এ ইতিহাসকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা চাই, আমাদের ছেলেরা সেই ইতিহাসই পড়বে যাতে তাদের পূর্বপুরুষ ও পূর্বসূরীদের সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা জানতে পারে।[৭৭]

মুজিব হত্যা প্রচেষ্টা

৫ জানুয়ারী জামায়াতে ইসলামীর প্রধান মাওলানা মওদুদী একটি বিবৃতি দেন। এতে তিনি বলেন, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এখানে কোনো ধর্ম নিরপেক্ষ বা কমিউনিস্ট শাসনতন্ত্র কার্যকর হবে না।[৭৮]

৭ জানুয়ারী গভীর রাতে গোলাম মোস্তফা নামে এক যুবক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহ-মানকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর বাসভবনে চড়াও হলে হাতে-নাতে ধরা পড়ে।[৭৯]

৯ জানুয়ারী জারী করা এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়, শেখ মুজিবের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।

সারা পাকিস্তানে এ ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বয়ং এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবকে হত্যা প্রচেষ্টার নিন্দা করেন।

---

৭৬ দৈনিক পাকিস্তান, ৪ জানুয়ারী ১৯৭১
৭৭ ঐ ৫জানুয়ারী ১৯৭১
৭৮ ঐ
৭৯ ঐ ৯ জানুয়ারী ১৯৭১

পি ডি পি প্রধান নূরুল আমিন, জামায়াতে ইসলামের গোলাম আজম ও আবদুল খালেক, ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা শেখ ওবায়দুল্লাহ জালালাবাদী, ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রভৃতি সংগঠন নিন্দা করে অনুরূপ বিবৃতি দেয়।[৮০]

১১ জানুয়ারী মাওলানা ভাসানীও এক তারবার্তায় শেখ মুজিবকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[৮১]

ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১১ জানুয়ায়ী প্রথম ঢাকা আগমন করেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরে। তিনি বলেন, তাঁর যে দায়িত্ব ছিল তা শেষ হয়েছে। জাতি কিভাবে পরিচালিত হবে সেই পথে আমি গতি সঞ্চার করে দিয়েছি।

ভাসানীর সাম্প্রতিক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি একজন মুসলমান ও পাকিস্তানী।

রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি উঠলে তিনি বলেন, আমার কোন রাজনৈতিক মত নেই এবং তাই আমার ক্ষেত্রে কোন রাজবন্দী নেই। এ সময় একজন সাংবাদিক জেলে বিনাবিচারে দীর্ঘদিন থেকে আটক কমিউনিস্ট নেতা মণি সিং-এর নাম করলে তিনি বলেন, মনি সিং কে তা আমি জানি না তাঁর রাজনৈতিক অভিমত কি তাও আমার জানা নেই। এ সম্পর্কে হয়তো প্রাদেশিক সরকারই ভাল জানবেন।

এদিন ঢাকা এসেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের সাথে ১০০ মিনিট একান্ত আলোচনা করেন।[৮২]

'শেখ মুজিব ভাবী প্রধানমন্ত্রী'

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে দু'দফা আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে ইয়াহিয়া খান ১৪ জানুয়ারী ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমানবন্দরে তিনি বলেন, আমি বড় ক্লান্ত। আমি ভুট্টোর এলাকা সিন্ধুতে পাখি শিকারে যাচ্ছি।

---

৮০ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ জানুয়ারী ১৯৭১
৮১ ঐ ১১ জানুয়ারী ১৯৭১
৮২ ঐ ১২ জানুয়ারী ১৯৭১

সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে প্রেসিডেন্ট, শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভাবী প্রধান-মন্ত্রী হতে চলেছেন বলে মন্তব্য করেন।[৮৩]

প্রেসিডেন্টের পাখি শিকার

ক্লান্ত বলে ঘোষিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পাখি শিকারের নামে লারকানায় মূলত: ভুট্টোর সাথে দেখা করতে যান। তারা সেখানে একান্তে ঘন্টার পর ঘন্টা বৈঠক করেন। প্রেসিডেন্ট সরাসরি ভুট্টোর বাড়ীতে যান এবং সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করেন। লোক দেখানোর জন্য প্রেসিডেন্ট কয়েকটি বালি হাঁস বন্দুকের গুলিতে শিকার করেন। মূলত: এ সময় এ দু'জন একান্তে পাকিস্তানের রাজনীতি শিকারেই ব্যস্ত ছিলেন। তার আভাস পাওয়া যায় প্রেসিডেন্টের স্ববিরোধী উক্তিতেই।

প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবের নাম ইত:পূর্বে ঢাকায় বলার কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিবের নাম তিনি বলেন নি। বরং পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকেন। এখন শেখ সাহেব যদি প্রধানমন্ত্রী হতে না চান তার পক্ষে জোর করারও কিছুই নেই। এক প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট নতুন করে বলেন, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপ্রধান কে হবেন তা তিনি বলতে পারেন না।[৮৪]

বস্তুত: এ দিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্যগুলো ছিল খুবই অসংলগ্ন এবং স্ববিরোধী। পাকিস্তানের রাজনীতিকরা প্রেসিডেন্টের এই অকস্মাৎ মত পরিবর্তনে ভবিষ্যৎ ক্ষমতা হস্তান্তরে গভীর ষড়যন্ত্রের পূর্বভাস পান। অনেকে এজন্য শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

'নতিস্বীকার করবো না'
মুজিব-ভুট্টোর বৈঠক

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের মধ্যে মাত্র ২টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো একেক দিন, একেক কথা বলতে শুরু করে দেন। প্রথমে তিনি খুব ভাল ভাল কথা বলতে থাকেন।

প্রথমত: তিনি ১৩ জানুয়ারী পিণ্ডিতে এক জনাকীর্ন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তিনি এই জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহেই ঢাকায় গিয়ে শেখ মুজিবের সাথে দেখা

---

৮৩ দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ জানুয়ারী ১৯৭১
৮৪ ঐ ১৮ জানুয়ারী ১৯৭১

করবেন। তিনি শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে বলেন, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের (আওয়ামী লীগ-লেখক) ক্ষমতাকে খাটো করে দেখতে চান না। কেননা সেটা গণতন্ত্রের স্বীকৃত নীতি। তবে এ প্রশ্নে ফেডারেশনের যোগদানকারী ইউনিট সমূহের মতামতের প্রতিফলন থাকা দরকার।

ভুট্টো বলেন, তিনি সরাসরি আওয়ামী লীগের ৬ দফার প্রথম দফাটি গ্রহণ করেছেন। তাতে আছে দেশে একটি প্রকৃত ফেডারেশন গঠন করতে হবে। শেখ মুজিব সম্পর্কে ভুট্টো বলেন, তাঁর সাথে কোন ব্যক্তিগত মতভেদ নেই। সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসাবে তিনি তাঁর জনগণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, নির্যাতন স্বীকার করেছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করি।[৮৫]

এ সময় হঠাৎ করেই কোন কারণ ছাড়াই ভুট্টো অত্যন্ত ভারত বিরোধী ভূমিকা নিতে থাকেন। কারণে-অকারণে ভারত প্রসঙ্গ তুলে তিনি এ সময় এমন একটা পরিস্থিতির ভাব দেখাতে থাকেন যে, মনে হচ্ছিল দেশে বুঝি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলছে। দেশের স্থিতিশীল এ পরিস্থিতিতে ভারত প্রসঙ্গে ভুট্টোর অকারণ যুদ্ধংদেহী মনোভাব রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বিস্মিত করে।

ঘটনাকালের সময়ে বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতা পাকিস্তানে হওয়ার কথা ছিল। ভুট্টো হটাৎ ঘোষণা দিলেন, পাকিস্তানের মাটিতে ভারতীয় দলের খোলোয়াড়দের পা রাখতে দেবেন না। পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর ক্রীড়ামোদী ও রাজনৈতিক মহল ভুট্টোর এ হুমকি প্রদর্শনে বিস্মিত হয়ে পড়ে। বস্তুত: পাকিস্তানে বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভবনাতেই প্রশ্ন দেখা দেয়।

ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স ক্লাবের সাধারণ সভায় বিশ্বকাশ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের অংশ গ্রহণের প্রশ্নে ভুট্টোর হুমকি প্রদর্শনের নিন্দা করা হয়। এক নিন্দা প্রস্তাবে বলা হয়, ভুট্টোর ঘোষণা অখেলোয়াড়োচিত এবং এদেশের হকি খেলার বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি আঘাত স্বরূপ। প্রস্তাবে ধেলাধুলাকে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পরিগণিত না করার জন্য ভুট্টোর প্রতি আহবান জানানো হয়।[৮৬]

২৭ জানুয়ারী ভুট্টো, বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য ঢাকা আসেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকরা তাঁকে বলেন, বিশ্বকাশ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতকে অংশগ্রহণ করতে

৮৫ দৈনিক পাকিস্তান, ১৪ জানুয়ারী ১৯৭১
৮৬ ঐ ২৭ জানুয়ারী ১৯৭১

না দেওয়ার বিষয়ে তাঁর নীতি পরিবর্তন হয়েছে কিনা? ভুট্টো জবাবে বলেন, আমি অতো সহজে আমার নীতি থেকে বিচ্যুত হচ্ছি না।

এ দিন ভুট্টোর অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ, ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান ও পিপলস পার্টির পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থকরা সমবেত হয়।

ভুট্টো এখানে বলেন, আওয়ামী লীগের সাথে কি কি বিষয়ে মতৈক্য ও সমঝোতা করা যায়, তার অনুসন্ধানেই তিনি ঢাকা এসেছেন। তিনি বলেন, প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় দেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভুট্টো বলেন, আমি পাকিস্তান দেশের অধিকাংশ জনগণের প্রদেশ বাংলাদেশে এসেছি।

এদিন ভুট্টো, বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব বাসভবনে আসেন এবং বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু নিজে নীচে নেমে এসে ভুট্টোকে গাড়ীতে তুলে দেন।[৮৭]

২৮ জানুয়ারী আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর দুই নেতা বেরিয়ে আসলে তাঁদের উৎফুল্ল দেখালেও আলোচনা সম্পর্কে উভয়েই কঠোর গোপনীয়তা পালন করেন। তবে দু'নেতা বিভিন্ন কৌতুক টিপ্পনীতে অংশ নেন। ভুট্টো মুজিবকে বলেন, আপনাকে কম বয়েসী মনে হচ্ছে। মুজিব ভুট্টোকে প্রত্যুত্তরে বলেন, আপনাকে দেখাচ্ছে সুন্দর।

এ সময় ভুট্টো হঠাৎ করে সবাইকে অবাক করে মুজিবকে বলে বসেন, 'তাহলে আপনাকে আমার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে'।

মুজিব খানিকক্ষণ হকচকিয়ে যান। পরে বলেন, 'আমি নতি স্বীকার করবো না'। এরপর আবার মুজিব অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কুৎসিত থেকে আপনি কিইবা আশা করেন। যা কিছু দেওয়ার সুন্দররাই দেয়'।

---

৮৭ দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ জানুয়ারী ১৯৭১

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা এ কৌতুক থেকেও অনেক রাজনৈতিক রস সিঞ্চন করেন। কারণ আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পরপরই জানিয়ে দিয়েছে ৬ দফা এখন আর এককভাবে আওয়ামী লীগের সম্পদ নয়, এটা রেফারেণ্ডাম হয়ে ৭ কোটি বাঙালীর দাবী হয়ে গেছে। রদবদল করার ক্ষমতা কারোর নেই। বল এখন ভুট্টোর কোর্টেই ঝুলছে।

এ দিন সাংবাদিকদের কাছে ভুট্টো বলেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সহযোগিতার মাধ্যমেই হওয়া উচিৎ। শেখ মুজিব বলেন, ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি জনগণের কাছে ওয়াদাবদ্ধ একথা ভুট্টোকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলেছেন।

তিনি বলেন, ২৩ বছর বাংলাদেশ কিভাবে শোষিত হয়েছে তাও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। মুজিব বলেন, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও অন্যান্য গ্রুপ নেতাদেরও তিনি এ সব বিষয় সম্পর্কে বোঝানোর জন্য ঢাকায় আমন্ত্রণ জানাবেন।[৮৮]

২৯ জানুয়ারী মুজিব-ভুট্টো নৌবিহার করেন এবং আরো একদফা বৈঠকে মিলিত হন। ভুট্টো বলেন, তিনি এবং মুজিব দুজনই বৃহৎ শিল্প ও ব্যাংক-বীমা জাতীয়করণের পক্ষে বলে দেশের শিল্পপতিরা ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। এই শোষকরা এখন ঘন ঘন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যাতায়াত করছে।

তিনি বলেন, আইয়ুব আমলে তিনি ৬দফার বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষার বিরুদ্ধে ভাষার অস্ত্র ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আইয়ুব খান তাঁর কথা শোনেন নি।

মুজিব-ভুট্টো আলোচনায় তাঁদের সহকারীরাও অংশ নেন। এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে তাজউদ্দীন আহমেদ অত্যন্ত দক্ষ কূটনীতির পরিচয় দেন যা ভুট্টোকেও বিস্মিত করে। ভুট্টো পরে বিভিন্ন রাজনীতিকদের কাছে তাজউদ্দীন আহমেদ সম্পর্কে উচ্চাশা প্রকাশ করেন।

কিন্তু মুজিব-ভুট্টো আলোচনা এ পর্যায়ে কতদূর এগিয়েছিল তার জন্য পাকিস্তানবাসীকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় ১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) পর্যন্ত।

---

৮৮ দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ জানুয়ারী ১৯৭১

সাধারণ নির্বাচনের পর সারা পাকিস্তানব্যাপী এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল, যাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, একটি শক্তিধর গোষ্ঠী যে কোনো প্রকারেই হোক দেশে একটি বড় ধরণের গোলযোগের চেষ্টা করছে। এর মূল উদ্দেশ্য যে পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত করা অথবা একেবারে বাতিল করা তাতে কোনো সন্দেহ থাকে নি।

বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের পাকিস্তানে আসতে ভুট্টোর হুমকি, সংসদ সদস্য আহমদ রফিক হত্যা, মাওলানা ভাসানীর হটাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবী ইত্যাদি মিলে পাকিস্তানে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস সৃষ্টি হতে থাকে।

ঠিক এমনি একটি পরিস্থিতিতে দোসরা ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তানের কোনো কোনো গোষ্ঠী মিলে একটি চরম হঠকারী কাজ করে বসে। ভারতের একটি বিমান কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে নয়াদিল্লী যাচ্ছিল। বিমানটি একটি গ্রুপ ছিনতাই করে লাহোর বিমান বন্দরে নামায় এবং গভীর রাতে ডিনেমাইট দিয়ে তা উড়িয়ে দেয়।[৮৯]

ঘটনাটির আকস্মিকতায়ই বোঝা যায়, তা ছিল ঠাণ্ডামাথায় একটি উস্কানীমূলক কাজ। কারণ কোনো দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে হলে ছিনতাইয়ের পর তাদের দাবী আদায়ের আর্জি প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু তা না করে চরম কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় বিমানটি রাতের অন্ধকারে লাহোর বিমান বন্দরে ধ্বংস করে ফেলা হয়। বোঝা যাচ্ছিল, পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একটি অংশ এতে প্রকাশ্যেই জড়িত রয়েছে। বিরোধী দলের একটি শক্তিও এতে জড়িত, পরে তা আঁচ করা যায়। ভারত যাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ ঘটনার প্রতিবাদে বড় ধরণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই আশাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটানো হয়।

কিন্তু ভারত তাদের বিমান ছিনতাই ও পরে ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দেয়। ভারত শুধু তার আকাশ সীমা পাকিস্তানী বিমানের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে পি. আই. এ-র বিমানকে এরপর থেকে কলম্বো ঘুরে করাচী-লাহোর থেকে ঢাকায় আসতে হয়।[৯০]

---

৮৯ দৈনিক পাকিস্তান, তেসরা ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
৯০ ঐ ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ ঘটনায় দ্রুতই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বিমানটি ছিনতাইয়ের কারণ ও বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার দাবী করেন। তিনি বলেন, বিমানটি উড়িয়ে দেওয়ার খবর শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। এটা নিন্দনীয়। কায়েমী স্বার্থবাদীরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্যই এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো ভিন্নধর্মী বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, ভারতীয় বিমানটি ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তান দায়ী নয়। কাশ্মিরী মুক্তিযোদ্ধারা মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। দু'জন কাশ্মিরী বিমানটি উড়িয়ে দিয়েছে বলে তিনি দাবী করেন।[৯১]

একই সুরে বিবৃতি দেন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা এয়ার মার্শাল (অব:) নূর খান। তিনি বিমান ছিনতাই ঘটনাকে অভিনন্দিত করেন। তিনি বলেন, ছিনতাইকারীরা ৮০ লক্ষ কাশ্মিরী জনগণের সমস্যাটি পুনরুজ্জীবিত করতে এক চমৎকার কার্য সমাধা করেছে। শেখ মুজিব বিমান ছিনতাইয়ের নিন্দা করায় নূরখান তারও সমালোচনা করেন।

ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা মতিউর রহমান নিজামী এ ব্যাপারে এক বিবৃতিতে বলেন, বিমান ছিনতাই মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা হচ্ছে, না কোনো বিশেষ শক্তির ষড়যন্ত্র, এটা এখনো সংশয় মুক্ত নয়।

ডাকসু ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এক যুক্ত বিবৃতিতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরকে ব্যাহত করার চক্রান্ত হিসেবে দু'জন কাশ্মিরী একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে এনে লাহোর বিমানবন্দরে ধ্বংস করেছে বলে দাবী করে।[৯৩]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়াপন্থী-লেখক) এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলী এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাক-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন সংকট সৃষ্টি করা হচ্ছে। লাহোরে ভারতীয় বেসামরিক বিমান ছিনতাই করে তা পুড়িয়ে ফেলাকে সুনিশ্চিত উস্কানীমূলক কাজ বলে তারা মন্তব্য করে।[৯৪]

---

৯১ দৈনিক পাকিস্তান, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
৯২ ঐ ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
৯৩ ঐ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
৯৪ ঐ ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

এর আগেও নির্বাচনের ঠিক অল্প কয়েকদিন পূর্বে এরকম একটি হঠকারী কাজ করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করা হয়েছিল। দোসরা নভেম্বর (১৯৭০) করাচী বিমানবন্দরে ফিরোজ আবদুল্লাহ নামে জামায়াতে ইসলামীর একজন ধর্মান্ধ-মাতাল কর্মী গাড়ী চালিয়ে পাকিস্তানে সফরে আসা পোল্যাণ্ডের সহকারী পররাস্ট্র মন্ত্রী জেড ওলনিয়াককে হত্যা করে।

পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় কতকগুলি বোমাও উদ্ধার করে। পুলিশকে সে বলে, পাকিস্তানে কোনো সমাজতন্ত্রীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

পাকিস্তানে নির্বাচনের ঠিক অল্প কয়েকদিন মাত্র আগে এ ঘটনায় গভীর ষড়যন্ত্রের আঁচ পাওয়া যায়। একজন জামায়াত ইসলামীর কর্মীর এই উদ্ভট কথা-বার্তায় সমগ্র পাকিস্তানবাসী হতবাক হয়ে যায়। ধর্মীয় উন্মাদনা কখনো কখনো মানুষকে কেমন নেশাগ্রস্থ করে ফেলতে পারে পোলিশ পররাস্ট্র মন্ত্রীর হত্যাকাণ্ড তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দেন। তিনি পাকিস্তানের একটি আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার এই অব্যবস্থা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলেন।

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতা মাওলানা শামসুদ্দিন কাসেমী ও মাওলানা মোতাসেম বিল্লাহ এ ঘটনার নিন্দা করে জামায়াতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের রহস্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদের দালালরা ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে ও পাকিস্তানের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে এবং ষড়যন্ত্র করছে।[৯৪ক]

নতুন রাজনৈতিক দল

আইয়ুবের বিদায়ের পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন 'পোলারাইজেসন' ঘটতে থাকে। এর মধ্যে বড় ধরণের পুনর্গঠন ও জোটবদ্ধতা ঘটে ডানপন্থী মহলে।

১৯৬৯ সালের ২৪ জুন নূরুল আমিন, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, এয়ার মার্শাল (অব:) আসগর খান প্রমুখ তাদের অনুসারীদের নিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। নূরুল আমিন এর আহবায়ক

৯৪ক দৈনিক পাকিস্তান, ৩, ৪, ৫ নভেম্বর ১৯৭০

নিযুক্ত হন। এই রাজনীতিবিদদের পূর্বতন দলগুলির নাম ছিল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ), আওয়ামী লীগ (পি.ডি.এম.পন্থী), এবং জাস্টিস পার্টি। তাঁরা তাঁদের পূর্বতন দলগুলির বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।[৯৫]

৯ জুলাই এ দলের সাথে আরো যুক্ত হন মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (আওয়ামীলীগ-পি.ডি.এম), ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), মাহমুদ আলী, মৌলবী ফরিদ আহমদ, মাওলানা মোসলেহউদ্দিন। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও এদিন গঠিত হয়।[৯৬]

২০ জুলাই আতাউর রহমান খানকে প্রধান করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ন্যাশনাল প্রগেসিভ লীগ নামে একটি নতুন দল গঠন করা হয়। বলা হয়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হবে দলের মূল আদর্শ। দলটি প্রাপ্ত বয়স্কদের ভিত্তিতে ভোটের দাবী করে বলে প্রত্যেক ভোটারকে হতে হবে মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত পাশ।[৯৭]

২৫ জুলাই কৃষক শ্রমিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক এ.এস.এম সোলায়মান বলেন, তিনি তাঁর দল পুনরুজ্জীবন করবেন না। পুরনো জোট এন.ডি.এফ নামেই কাজ চালাবেন।

১২ মার্চ (১৯৭০) মাওলানা আজিজুর রহমানকে আহবায়ক করে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে একটি নতুন ইসলামী দল গঠন করা হয়।[৯৯]

১২ এপ্রিল পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস একটি বিবৃতি দেয়। কংগ্রেস নতুন দল না হলেও সীমিত কর্মকাণ্ডে তার ভূমিকা পাকিস্তানে ছিল একেবারেই নগণ্য। এদিন বিবৃতিতে কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী করে। কংগ্রেস এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হয় এবং আবার তার কর্মকাণ্ড শুরু করে।[১০০]

উত্তর বঙ্গ প্রদেশ গণসংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক আনসার আলী বন্যাদুর্গত উত্তর বঙ্গ সফর করার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে আহবান জানান।[১০১]

---

৯৫ দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ জুন ১৯৬৯
৯৬ ঐ ১০ জুলাই ১৯৬৯
৯৭ ঐ ২১ জুলাই ১৯৬৯
৯৮ ঐ ২৫ জুলাই ১৯৬৯
৯৯ ঐ ১৩ মার্চ ১৯৭০
১০০ ঐ ১৪ এপ্রিল ১৯৭০
১০১ ঐ ৪ আগস্ট ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তান লেবার ফেডারেশনের রাজনৈতিক কমিটির ৩দিনব্যাপী অধিবেশন ঢাকায় ৩ আগস্ট শুরু হয়। সম্মেলনে শ্রমিক কৃষক পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১০২]

নির্বাচন পরবর্তী ভাঙন, দলাদলি, পদত্যাগ

পাকিস্তানের নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলীর অন্যতম বিষয় হচ্ছে ভাঙন, পদত্যাগ ইত্যাদির হিড়িক। ২৩ডিসেম্বর, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী দলীয় প্রধান ওয়ালী খানের কাছে সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার প্রেক্ষিতে পদত্যাগ করেন। তবে তিনি তাঁর দলের প্রতি সাধারণ সদস্য হিসেবে পূর্ণসমর্থন অব্যাহত রাখার কথা ব্যক্ত করেন।[১০৩]

বাংলা জাতীর লীগের আতাউর রহমান খানের বিরোধিরা ২৭ডিসেম্বর তাঁর কার্যকলাপের এক বিরাট ফিরিস্তি প্রকাশ করে তাঁকে তাঁর প্রাথমিক সদস্য পদ থেকেও সাময়িকভাবে বহিস্কার করে।[১০৪]

অন্যদিকে আতাউর রহমান খান তাঁর দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নূরুর রহমান, আবদুল হামিদ চৌধুরী ও অলি আহাদকে বহিস্কার করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আতাখান অভিযোগ তোলেন, এরা লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের দাবীর বিরোধিতা করেছে।

৮ জানুয়ারী (১৯৭১) বাংলা জাতীয় লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম উপরিউক্ত খবরে বিস্ময় প্রকাশ করে এক বিবৃতি দেন। তিনি দাবী করেন, দলের 'ম্যানিফ্যাস্টো' তিনিই রচনা করেছিলেন এবং আতা খান কর্তৃক বহিস্কৃত ৩ জন এর সাথে জড়িত ছিলেন। জনাব ইসলাম বলেন, দলের ম্যানিফ্যাস্টোতে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌম দাবী আবিস্কার হাস্যকর।[১০৫]

জাতীয় লীগের ভাঙাভাঙির শেষ ঘটে দুই উপদলের আলাদা আলাদা সম্মেলন ডাকার মধ্য দিয়ে। আতাউর রহমান গ্রুপ ১০ জানুয়ারী রোববার ঢাকার বিজয়নগরে এবং অলিআহাদ-মফিজুল ইসলাম গ্রুপ কুমিল্লায় একই দিন সম্মেলন আহবান করে।

---

১০২ দৈনিক পাকিস্তান, ৬ আগস্ট ১৯৭০
১০৩ ঐ ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭০
১০৪ ঐ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭০
১০৫ ঐ ৮ জানুয়ারী ১৯৭১

সম্মেলনের পূর্বেই খয়রাত হোসেন, বি.এম ইলিয়াস (বগুড়া), ইকবাল আনসারী খান, জিল্লুর রহিম (নোয়াখালী) প্রমুখ বিবৃতি দিয়ে অলি আহাদের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করে আতাউর রহমান খানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।[১০৬]

কুমিল্লায় অলি আহাদ গ্রুপের সম্মেলনে আতাউর রহমান খান ও আমেনা বেগমকে আনুষ্ঠানিকভাবে বহিস্কার করা হয়। মফিজুল ইসলাম, আতাখানের শূন্য আসনে নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্মেলনে আতাউর রহমান খানের একনায়কত্ব সুলভ আচরণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, গত সাধারণ নির্বাচন বর্জনের ব্যাপারে আতাউর রহমান খানের একক ঘোষণার পেছনে রয়েছে দুর্বলচিত্ততা ও জনগণের প্রতি অশ্রদ্ধা। অলি আহাদ তাঁর বর্ক্তৃতায় বলেন, নির্বাচনে হারজিত বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে নির্বাচন নামক গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা।[১০৭]

ভাসানীকে নিয়ে প্রশ্ন

৫ জানুয়ারী (১৯৭১) ভাসানী ন্যাপের ৮২৯ জন নেতা একযোগে মাওলানা ভাসানীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে পদত্যাগ করেন।

এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বয়োবৃদ্ধ জননেতা হাজী দানেশও ভাসানী ন্যাপ থেকে তাঁর পদত্যাগের কথা জানান। তিনি বলেন, মাওলানা ভাসানীর অরাজনৈতিক কার্যকলাপের দরুণই তিনি ন্যাপ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। ন্যাপ মাওলানার পকেট সংগঠনে পরিণত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।[১০৮]

৭ জানুয়ারী ভাসানীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে বিবৃতি দেন পার্টির প্রভাবশালী ৮ নেতা। এদের মধ্যে আনোয়ার জাহিদ, মোহাম্মদ সুলতান, নূরুল হুদা কাদের বক্স প্রমুখ অন্যতম। তাঁরা অভিযোগ তোলেন, মাওলানা ভাসানী কমিটির সভা না ডেকে একাই সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করছেন। তাঁরা এটা মানতে পারেন না।[১০৯]

৮ জানুয়ারী ভাসানী ন্যাপের সিনিয়র সহসভাপতি হাজী দানেশ ন্যাপের মধ্যে কোন্দল বৃদ্ধি এবং দেশের উভয় অংশে জনগণের শত্রুদের হাত শক্তিশালী করে

১০৬ দৈনিক পাকিস্তান, ৮ জানুয়ারী ১৯৭১
১০৭ ঐ ১১ জানুয়ারী ১৯৭১
১০৮ ঐ ৬ জানুয়ারী ১৯৭১
১০৯ ঐ ৭ জানুয়ারী ১৯৭১

শোষণের পথ প্রশস্ত করার জন্য মাওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ তোলেন। এদিন মাওলানার উদ্দেশ্যে লেখা হাজী সাহেবের এক খোলা চিঠিতে আরো অভিযোগ করা হয়, ভাসানী শাসক গোষ্ঠীর সাথে যোগসূত্র রেখে জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

খোলা চিঠিতে জননেতা হাজী দানেশ দু:খ ভারাক্রান্ত মনে লিখেন, 'আমি এই আশা নিয়ে ন্যাপে যোগদান করেছিলাম যে, আপনার নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্র ও শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে। গত ১০ বছরে আমি তার বিপরীত দেখতে পাচ্ছি। আমার মতে, আমাদের ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে, দলের অভ্যন্তরে আপনার একনায়কত্ববাদী নীতি। চিঠিতে আরো বলা হয়, ইসলামী সমাজতন্ত্রকে ন্যাপের লক্ষ্য ঘোষণার পূর্বে দলের কাউন্সিল ডাকা হয় নি। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ মর্যাদা দাবী করার পূর্বে কারো সাথে আলাপ করা হয় নি। এতে আরো বলা হয়, জাতীয় কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও ভাসানী একক সিদ্ধান্তে নির্বাচন বর্জনের শ্লোগান শুরু করেন।

খোলা চিঠিতে ভাসানীকে উদ্দেশ্য করে আরো বলা হয়, আপনি বিশ্বাস করতেন যে ইস্কান্দার মির্জা ও আইয়ুব খান দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করবে। আইয়ুবের বিরুদ্ধে বামপন্থী শক্তিগুলোকে সংগঠিত করার ব্যাপারে আপনার অনীহা এটাই প্রমাণ করে যে, শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে আপনার যোগ ছিল। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারিনা যে, আপনার ও ন্যাপের এ ধরণের নীতির মাধ্যমে লাখ লাখ শোষিত মানুষের মুক্তি আসবে'।[১১০]

বস্তুত মাওলানা ভাসানীর 'খেয়ালখুশী রাজনীতি ও রহস্যময় আচরণ' নিয়ে সব সময়ই এ রকম কথা উঠেছে। তাঁর এসব অরাজনৈতিক গতিবিধি তাঁর পার্টিকে এবং কর্মী ও ঘনিষ্ঠজনকে নিয়তই বিব্রত করতো। ফলে হাজী দানেশের মতো প্রশ্ন অনেকেই সেদিন তুলেছিলেন।

মাওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে বহুল কথিত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সাথে যোগ-সাজশ উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় ও তার পরবর্তী কালেও অব্যাহত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়। এ সম্পর্কে মাওলানা ভাসানীর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহচর, সাবেক ছাত্রনেতা মাহবুবউল্লাহ (তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক) তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন,

---

১১০ ভাসানীর কাছে হাজী দানেশের খোলা চিঠি, দৈনিক পাকিস্তান, ৮ জানুয়ারী ১৯৭১ [চিঠির বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্টে]

'সম্বর্ধনা শেষে মাওলানা ভাসানী, সাইদুল হাসানের বাসায় উঠলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাহবুব, 'মার্শাল ল' হলে তোমরা কি করবা?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরকম কিছু হবে নাকি? মাওলানা মৌন থাকলেন, কথা ছিল পরদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেবেন। কিন্তু তা না করে রাতের বেলা সন্তোষ চলে গেলেন।

মওলানা এমনিভাবেই তাঁর রাজনৈতিক পদক্ষেপকে রহস্যাবৃত্ত করে রাখতেন। এখন প্রশ্ন মাওলানা কি সামরিক আইন জারী হবার খবর জানতেন?

খুব সম্ভবত: পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালেই তিনি তা জানতে পেরেছিলেন। হয়তো এ ব্যাপার নিয়ে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর আলাপও হয়ে থাকতে পারে। সে ইতিহাস রহস্যাবৃত'।[১১১]

উপমহাদেশের প্রখ্যাত চীনপন্থী ছাত্রনেতা তারিক আলী পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সাথে মাওলানা ভাসানীর সখ্যতার কারণ অনুসন্ধান করে তার পটভূমি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান, মাওলানা ভাসানীকে পাকিস্তানের সরকারী প্রতিনিধি করে চীন পাঠাতে চাইলে মাওলানা রাজী হন। সেখানে চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং এর সাথে তাঁর যে গোপন সলা-পরামর্শ হয় তার একটা বিবরণ তিনি মাওলানার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন টেপ রেকর্ডারে। উল্লেখ্য, এ বিবরণ প্রকাশিত হয় মাওলানা ভাসানীর জীবদ্দশাতেই। তারিক আলী মাওলানাকে প্রশ্ন করেন,

"When you went to china what did mao discuss with you when you met him?"

মাওলানা ভাসানী এর উত্তরে বলেন যে মাও সে তুং আমাকে বলেন, 'আপনি আমাদের বন্ধু এবং এই মুহূর্তে যদি আপনি আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে আপনার সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন তাতে রাশিয়া, আমেরিকা এবং ভারতের হাতই শক্তিশালী হবে। আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ তথাপি আমরা আপনাকে সাবধানে এবং ধীর গতিতে আন্দোলনে অগ্রসর হতে অনুরোধ করবো। আপনার সরকারের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় করার সুযোগ দিন।'[১১২]

---

১১১ মাহবুবউল্লাহ, ষাটের দশকের ছাত্র রাজনীতি, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা, ১৯৭৭

১১২ TARIQ ALI, PAKISTAN, *Military Rule or Peoples's Power* (bikas publication, Delhi, 1970) P.140 (মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

এখানে উল্লেখ্য যে, মাওলানা ভাসানী যখন চীন সফর করে আসেন তখন ইতোমধ্যে ছাত্ররা আইয়ুবের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সূচনা (১৯৬২ সালেই) করে ফেলেছে।

তারিক আলী এরপর লিখেছেন, পিকিং থেকে ফেরার পর অবিভক্ত ন্যাপের ও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একটি অংশ আইয়ুব খানের শাসনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রকে তারা বলতে থাকেন,

"basic democracies could become training schools for soviets'.[১১৩]

এরা পরে ভাসানীর নেতৃত্বে আইয়ুবের সমর্থক বনে যান। এর ফলেই ভাসানীর সচিব এবং ন্যাপ (ভাসানীর) সাপ্তাহিক জনতা'র সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাশখন্দ চুক্তির পর আনোয়ার জাহিদ 'জনতা' সাপ্তাহিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাটি লিখতে সক্ষম হন। জনাব জাহিদ লিখেন,

"There were only two anti - imperialist voices in Pakistan - Ayub and Bashani' [১১৪]

বাংলাদেশের একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মফিদুল হক, মাওলানা ভাসানীর এ ভূমিকার সুদূর প্রসারী ফলাফলের ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছেন,

'১৯৬৩ সালে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর জেনারেল আইয়ুব আয়োজিত চীন সফরের পর থেকেই মাওলানা ভাসানীর পদস্খলন ফুটে উঠতে থাকে। চীনা রাষ্ট্র নেতাদের আত্মস্বার্থ - প্রণোদিত নীতির কাছে মাওলানা ভাসানীর আত্মসমর্পণ এদেশের বাম রাজনীতির জন্য বিরাট দুর্ভাগ্যের সূচনা করে।... রাজনৈতিক বিভ্রান্তি থেকে তিনি যে পথে পা দিয়েছিলেন তা শুধু আইয়ুবী শাসনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে নি, মাওলানা ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে সামরিক শাসকচক্রের যে সংযোগ গড়ে উঠে তা পরবর্তী সময়েও বহু দুর্ঘটনার কারণ হয়েছিল।...

ভাসানী অনুগত এককালের বহু ডাকসাইটে নেতার চরম নীতি-বিবর্জিত ভাবে সামরিক শক্তির অঙ্কশায়িনী হওয়ার শেকড় এখানেই নিহিত। চীনের রাজনীতির

১১৩ Dialogue with a communist, out look, (karachi, April 25th, 1964), তারিক আলীর পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত
১১৪ তারিক আলী পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৪৩

অন্ধ আনুগত্য মাওলানা ভাসানীকে করে তুলেছিল আইয়ুব অনুগত এবং জন-বিচ্ছিন্ন এই রাজনীতির পাশাপাশি তাঁর দলের সঙ্গে পাকিস্তানের শাসক সশস্ত্রবাহিনীর সংযোগ দলের বহু সদস্যের নীতি ও আদর্শের বিনষ্টি ঘটিয়েছিল'।[১১৫]

উপরিউক্ত রাজনৈতিক ভাষ্যকার ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রাককালে মাওলানা ভাসানীর সচেতন অংশ গ্রহণের পটভূমিও এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করেন।তিনি বলেন,

'অক্টোবর মাস থেকে রাজনৈতিক শিবিরেও ঐক্য গড়ার বিভিন্ন ধরণের তৎপরতা লক্ষিত হতে থাকে। ৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ (ছয় দফা), ন্যাপ মোজাফফর এবং এন.ডি.এফ এর মধ্যে আনুষ্ঠানিক ঐক্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঐক্য প্রক্রিয়ায় মাওলানা ভাসানীকে যুক্ত করারও ব্যর্থ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ১১ অক্টোবর মাওলানা ভাসানী স্বয়ং সন্তোষে বিরোধী দল সমূহের নেতাদের এক বৈঠক ডাকেন। সেখানে আওয়ামী লীগ (উভয় গ্রুপ),জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) প্রভৃতি দলকে ডাকা হলেও ন্যাপ (মোজাফফর) কে ডাকা হয় না।...

মাওলানা ভাসানী ঐক্য প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখা সত্ত্বেও ১৬ ডিসেম্বরের কর্মসূচীকে ঘিরে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, পিডিপি, পিপলস পার্টি মিলে সংযুক্ত বিরোধী দলের ঐক্য গঠিত হয় এবং ১৩ ডিসেম্বর থেকে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরুর জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।...

এই পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন মাওলানা ভাসানী এবং ডিসেম্বরে এই দিনগুলোতে তাঁর আচরণ বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। বিরোধী দল সমূহের ঐক্যবদ্ধভাবে ১৩ ডিসেম্বরের কর্মসূচী আহবান থেকে দেশে যে চরম আন্দোলনের সূচনা ঘটতে যাচ্ছে এটা মাওলানা ভাসানী ভালভাবেই বুঝেছিলেন। এই উপলব্ধি থেকে মাওলানা ভাসানী আর সন্তোষে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি মাঠে নামলেন এবং নামলেন অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে—সংযুক্ত বিরোধী দলের আন্দোলন শুরুর আগেই সংগ্রামের খাতায় নিজের নামটি লিখে রাখা এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়াসকে নিষ্পাপ করে তোলার চেষ্টা নিয়ে।

১৩ ডিসেম্বর ঐক্যবদ্ধ জুলুম প্রতিরোধ দিবসের আগে আগে মাওলানা ভাসানী ৬ ডির্সেম্বর, প্রায় প্রস্তুতিবিহীনভাবে নিজস্ব জুলুম প্রতিরোধ দিবস এবং ১২ ডিসেম্বর হরতাল আহবান করলেন। ১৩ ডিসেম্বরের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর পূর্বদিন আহূত

---

[১১৫] মফিদুল হক, '১৯৬৮, *নিরালোকে দিব্যরথ*', সচিত্র সন্ধানী, ঈদ সংখ্যা, মে, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ১৪৫

হরতালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।... ৮ ডিসেম্বরে তিনি আবার হুট করে ১১ ডিসেম্বর দেশব্যাপী হরতাল আহবান করে বসেন। পুনরায় এই আকস্মিক হরতাল আহবান থেকে বোঝা যায় মাওলানা ভাসানী কিছুতেই ১৩ ডিসেম্বর সংযুক্ত বিরোধী দল আহূত হরতালের ডাককে সহজে ছেড়ে দিতে চাইছেন না। ফলে একের পর এক বাড়তি কর্মসূচীর দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।... মাওলানা ভাসানীর কিন্তু ইচ্ছা সত্তেও দেশবাসী তখন প্রস্তুত হচ্ছিল ১৩ ডিসেম্বর আইয়ুবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা ব্যাপী গণরায় ঘোষণার জন্য। এবং ১৩ ডিসেম্বর পালিত হলো গোটা দেশব্যাপী অভূতপূর্ব হরতাল।... প্রকৃতঅর্থে, আটষট্টির যে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বিস্ফোরিত হলো তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল এই ১৩ ডিসেম্বর দেশব্যাপী অভূতপূর্ব হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে।'[১১৬]

বস্তুত মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক গতিধারা যেভাবে এই পর্যায়ে শরু হয়েছিল তার অনিবার্য পরিণতি লক্ষ্য করা যায় ১৯৭০ সালে তাঁর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে প্রবেশের মধ্য দিয়ে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে হাজী দানেশ ও অন্যান্য ন্যাপ নেতৃবৃন্দ তাঁর সম্পর্কে যেসব অপ্রীতিকর প্রশ্ন তোলেন তার পটভূমি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভাবতে অবাক লাগে যে, সংগ্রামী জননেতা মাওলানা ভাসানী যিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বিরোধিতার নামে ভারত বিরোধী জিগিরতুলে একটি মীথ-এ পরিণত হন, ১৯৭০ সাল ছিল মূলত সেই বিষবৃক্ষের সূচনা কাল। এই সময়ে মাওলানা ভাসানীর রাজনীতি একই সঙ্গে স্ববিরোধী, সাম্প্রদায়িক এবং কমিউনিষ্ট বিরোধী।

বস্তুত এই সময়কালে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হাতিয়ারে পরিণত হতে চলেছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দা সংস্থার সি.আই.এ-এর সাথে সংযোগের অভিযোগ থেকেও তিনি সন্দেহাতীতভাবে নিজেকে মুক্ত রাখতে অসমর্থ হন। এ প্রসঙ্গে সেই সময়েই বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক বদরুদ্দীন উমর মাওলানা ভাসানী সম্বন্ধে যে প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করেন তা ছিল সমকালীন রাজনৈতিক গতিধারায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭০ সালের ২১ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানে এক রাজনৈতিক সফরে যাত্রাকালে ঢাকা বিমানবন্দরে মাওলানা ভাসানী একটি বিস্ময়কর মন্তব্য করেন। তিনি বলেন,

---

১১৬ মফিদুল হক, পূর্বক্তো, পৃষ্ঠা ১৪৪

'পূর্ব বাংলায় হিন্দু বামপন্থী নেতারা তাদের ভক্ত নগণ্য মুসলমান কর্মীদের সাথে নিয়ে ন্যাপ ও কৃষক সমিতিকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ জনই মুসলমান, কাজেই তাদের এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়'।[১১৭]

পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে মাওলানা ভাসানীর এ প্রথম প্রবেশ না হলেও 'দীর্ঘদিনের কমরেড ভাসানীর' এ প্রথম প্রকাশ্য উচ্চারণে ভাসানী মোহ কাতর একটি অংশে চরম হতাশা দেখা দেয়।

পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বদরুদ্দীন উমর এ সপ্তাহেই মাওলানা ভাসানীর এ মন্তব্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বদরুদ্দীন উমর লিখেন,

'এতদিন যাঁরা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে মৌলানা ভাসানীর সাথে একত্রে কাজ করেছেন তাঁরাতো বটেই এমনকি পূর্ব বাঙলার সংগ্রামী জনগণও যে মৌলানার উক্তিতে লজ্জিত ও বিক্ষুব্ধ হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বামপন্থী নেতাদেরকে 'হিন্দু' হিসেবে আখ্যায়িত করে মৌলানা ভাসানী যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে চাইছেন, তা মূলত: মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামীর উদ্দেশ্য থেকে পৃথক নয়, বরং তার পরিপূরক।...

ঢাকা বিমান বন্দরে ২১শে মার্চ মৌলানা ভাসানী সাংবাদিকদের কাছে যে বিবৃতি দেন তা আকস্মিক অথবা উদ্দেশ্যহীন নয়। বস্তুত, বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলেও বিগত এক বছর থেকে তিনি বেশ ভালভাবেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছেন'।[১১৮]

বদরুদ্দীন উমর মাওলানা ভাসানীর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন করে আরো এক সংখ্যায় লিখেন,

'১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের গোড়া থেকেই মাওলানা ভাসানী ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রচারক। প্রায় পনেরো যোল বছর পর রাজনীতি ক্ষেত্রে সেই প্রথম তাঁর ইসলাম আমদানী।...

---

১১৭ দৈনিক পাকিস্তান ও পাকিস্তান অবজারভার ২২ মার্চ, ১৯৭০
১১৮ সাপ্তাহিক গণশক্তি, (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: বদরুদ্দীন উমর), ২৯ মার্চ ১৯৭০

সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে মাওলানার ইসলামী সমাজতন্ত্রের ধ্বনি আকস্মিক হলেও তার আসল উদ্দেশ্য জনগণের গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে রোধ করা।...

মাওলানা নিজের দক্ষিণপন্থী পথ অনুসরণ করতে গিয়ে শুধু ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলে বিগত ৩রা অক্টোবর আহমেদাবাদ দাঙ্গা বিরোধী 'দিবস' পালনেরও আহবান জানিয়েছিলেন। সেই আহবানের ফলে চারিদিকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের মুখে পড়ে তাঁর সেই আহবান অবশ্য তাঁকে বাধ্য হয়ে প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছিল।'[১১৯]

বদরুদ্দীন উমর সমকালীন রাজনীতিতে অতি আলোচিত এই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে পরবর্তী সপ্তাহেও আবার লিখেন,

'রাজনীতিতে ধর্ম টেনে আনার এর থেকে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে? এই কাজই তো এতদিন পর্যন্ত এদেশে মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী একটানাভাবে করে এসেছে। মাওলানা ভাসানীও একাজে শরীক হয়েছেন।...

এই হলো এদেশের মজলুম জনতার স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর অব্যর্থ কৌশল।

কিন্তু তিনি শুধু একাজ করে বেড়ালে কাহিনী এতো দীর্ঘ হতো না। এই কাহিনী আজ দীর্ঘ হয়ে দাঁড়িয়েছে বামপন্থী নামে কথিত কতকগুলি মহল তাঁকে এই সব ব্যাপারে খোলাখুলি ও নিলর্জ্জ সমর্থন জানানোর ফলে।...

নিজেদের সুবিধাবাদী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এইসব মতলববাজরা যে কীর্তিকলাপ শুরু করেছে তার ফলে একদিকে এদেশের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী রাজনীতির সুবিধেই হচ্ছে। কারণ মওলানাকে কেন্দ্র করে 'বামপন্থী' নামে পরিচিত সুবিধাবাদীর দল আজ নিজেদের মুখোশকে নিজেরাই ছিঁড়ে ফেলছে'।[১২০]

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পূর্ববর্তী মাওলানা ভাসানীর সুবিধাবাদী আচরণের আবার পুন:প্রকাশ ঘটে ১৯৭০ - এর নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে। এলোপাতাড়ি, উল্টা-

১১৯ সাপ্তাহিক গণশক্তি, ১২ এপ্রিল ১৯৭০
১২০ ঐ ১৯ এপ্রিল ১৯৭০

পাল্টা কর্মসূচী ঘোষণা করে মাওলানা ভাসানী আবারও আন্দোলনকে সুকৌশলে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস পান। ১৯ এপ্রিল (১৯৭০) মাওলানা হটাৎ করেই ঘোষণা করেন, তিনি আর কৃষক সমাবেশ করবেন না। পয়লা জুন থেকে তিনি আরেকটি নতুন সংগ্রাম শুরু করার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, গ্রামে গ্রামে তিনি এখন থেকে চোর-ডাকাত ধরবেন। বস্তুত তৎকালীন রাজনৈতিক মহল মাওলানার এই অদ্ভুত কর্মসূচীতে যুগপৎ হতবাক ও হতাশ হন। কারণ মাওলানার এ ধরনের কর্মসূচীর অর্থই ছিল সমকালীন মূল রাজনীতি থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া।

সাপ্তাহিক 'গণশক্তিতে' এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর বলেন,

'মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আজ একদল লোক সামন্ত বুর্জোয়া শোষকদের হাতকে জোরদার করার জন্যে প্রদেশব্যাপী চোর ঘুষখোর ধরে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার একটা কর্মসূচীর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মীদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা শুরু করেছে। তারা আজ জনগণকে বোঝাতে চাইছে যে চোর ঘুষখোর ধরার এই পথেই তারা কৃষক শ্রমিকদের মুক্তি আনবে। তাদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে।...

এদেশের সামন্ত বুর্জোয়া শোষকদের সাথে পরোক্ষভাবে হাত মিলিয়ে মাওলানা ভাসানী চোর ঘুষখোর ধরার যে পরিকল্পনা পেশ করেছেন তার স্বরূপ সম্পর্কে আজ গণতান্ত্রিক কর্মীদেরকে সচেতন হতে হবে'।[১২১]

মাওলানা ভাসানীর এই অরাজনৈতিক অপ্রয়োজনীয় সংগ্রামের কর্মসূচীতে সবচেয়ে যে বিষয়টি চমকপ্রদভাবে উঠে এসেছে তাহলো আবার সেই পাকিস্তানের সামরিক শক্তির সাথে তাঁর কথিত যোগসাজসের পরিচয়। মাওলানা ভাসানী এদিন কর্মসূচী ঘোষণার দিন প্রকাশ্যে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর চোর ধরার কর্মসূচীর বাস্তব রূপ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর জুন সংগ্রামে শরীক না হলেও পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রধান সাহেবজাদা ইয়াকুব খান একজন পরহেজগার মুসলমান হিসেবে তাঁকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন।[১২২]

মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর এ সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতি পাকিস্তানের ডানপন্থী মহল বিপুল আশাবাদ জানায়। তারা মাওলানা ভাসানীকে এজন্য সাধুবাদ জানায়। এ সময়ে দৈনিক পূর্বদেশ মন্তব্য করে:

১২১ গণশক্তি, ১০ মে ১৯৭০
১২২ ঐ ২৬ এপ্রিল ১৯৭০

'যে কোন কারণেই হোক, মাওলানা সাহেবের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের যে লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা স্থায়ী হলে আমরা তাকে অবশ্যই দেশের জন্য আশাব্যঞ্জক মনে করি'।[১২৩]

জামায়াতে ইসলামের দৈনিক সংগ্রাম এক সম্পাদকীয়তে মাওলানা ভাসানীকে তাঁর রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনে অভিনন্দিত করে।[১২৪]

তবে তৎকালীন পাকিস্তানী রাজনীতিতে মাওলানা ভাসানী আলোড়ন সৃষ্টি করেন, সি.আই.এ-এর একটি দলিল সম্পর্কিত বিতর্ককে কেন্দ্র করে। ১৯ জানুয়ারী (১৯৭০) মাওলানা ভাসানী সন্তোষে এক কৃষক সমাবেশে বলেন যে, পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে তিনি একটি গোপন সি.আই.এ-র রিপোর্ট পেয়েছেন। এবং এটি জনগণের কাছে প্রকাশ করার জন্য তিনি দলের (ভাসানী ন্যাপের - লেখক) সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তোয়াহা জনগণের অবগতির জন্য তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করে নি।[১২৫]

মাওলানা ভাসানী যে সত্যি মোহাম্মদ তোয়াহাকে এরকম একটি সি. আই. এ-র দলিল দিয়েছিলেন তার স্বীকারোক্তি অবশ্য তোয়াহা কিছুদিন পরে করেছিলেন। করাচীতে জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তাঁর হাতে একটি সি.আই.এ-র দলিল রয়েছে। এর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। দলিলটিতে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি চক্রান্তের পরিকল্পনা রয়েছে।

সাংবাদিকদের মোহাম্মদ তোয়াহা জানান, তাঁর নেতা মাওলানা ভাসানী নির্দেশ দিলে তিনি তা সাধারণ্যে প্রকাশ করবেন।[১২৬]

৬ এপ্রিল (১৯৭০) মাওলানা ভাসানী খুলনার মহিপুর থেকে একটি জরুরী বিবৃতি প্রেরণ করে আরো জানান, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছেন, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এ টাকা-পয়সা দিয়ে এ দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য একটি ভুয়া কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছে।[১২৭]

---

১২৩ দৈনিক পূর্বদেশ, ২৩ মে ১৯৭০
১২৪ দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ মে ১৯৭০
১২৫ বাংলাদেশ অবজারভার, ২০ জানুয়ারী ১৯৭০
১২৬ দৈনিক পাকিস্তান, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
১২৭ ঐ ৬ এপ্রিল ১৯৭০

মাওলানা ভাসানীর সি. আই. এ সম্পর্কিত এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে দু'টি বিষয় পাকিস্তানের রাজনীতির সামনে আসে। এর একটি হলো পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার প্রশ্ন (মাওলানা ভাসানী যাকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা বলতে চেয়েছেন), অন্যটি হলো, একটি ভুয়া কমিউনিস্ট পার্টি গঠন।

১৯ জানুয়ারী সন্তোষে মাওলানা ভাসানী এই চাঞ্চল্যকর সি. আই. এর দলিল সম্পর্কে তথ্য ফাঁস করার সময় আরো বলেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ উক্ত দলিলের একটি কপি তিনি স্বয়ং (ভাসানী-লেখক) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অবহিত করার জন্য পাঠিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে যদি তিনি জানাতে পারেন, তাহলে জনগণকে জানতে তাঁর সমস্যাটি ছিল কোথায়? কেন তিনি এই দায়িত্ব জনাব তোয়াহার কাছে দিলেন? তিনি জানিয়েছিলেন তোয়াহা দায়িত্ব পালন করেনি, কিন্তু প্রশ্ন উঠে, তোয়াহা দায়িত্ব পালন না করার পরও কেন আজো মাওলানা ভাসানী সে দায়িত্ব পালন করলেন না? তিনি তো পারতেন তা জনগণের কাছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিতে।

বস্তুত পাকিস্তানের রাজনীতিতে মাওলানা ভাসানীর 'এ ধরণের রাজনৈতিক চাল' তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অনেকংশে হাল্কা করে দেয়। ১৯৬৬ সালেও শেখ মুজিব ৬ দফা ঘোষণা করলে, তিনি (মাওলানা ভাসানী) ও তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীরা ৬ দফাকে সি. আই. এর দলিল বলে এর নিন্দা এবং বিরোধিতা করতে থাকেন। ১৯৭০ সালেও মাওলানা ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটি কল্পিত সি. আই. এর দলিল আবিষ্কার করেন (যা জীবনের শেষ দিনেও তিনি কখনো প্রকাশ করতে সমর্থ হননি) তখন, যখন পূর্ব বাংলায় জনমানসে স্বাদেশিক চেতনা, স্বজাত্যবোধ ও কতক ক্ষেত্রে তখনি সরাসরি স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে উঠছে। অথচ কি আশ্চর্য! এই মাওলানা ভাসানীই আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম ও প্রধান কৃতিত্বের ভাগীদার বলে দাবী করেন।

ইতিহাসকে জনগণ কিভাবে বিচার করবে! ১৯৭০ সালে শেখ মুজিব যখন নির্বাচনের জন্য 'হৈ চৈ' করে বেড়াচ্ছেন, তখনি মাওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষাণা করে ফেলেছেন, এমনকি অনেক ভাসানী-জীবনীকার বলেন, ১৯৫৬ সালেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আচ্ছালুআলাইকুম' জানিয়ে এই কৃতিত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য এই ঘটনা যে, ১৯৭০ সালে ডিসেম্বর মাসেও দেখি, পাকিস্তানের টেলিভিশন থেকে নির্বাচনী ভাষণে মাওলানা ভাসানী বলছেন,

'Even if there are thousands of difference among us; all should love Pakistan. . . The name of this country is Pakistan, there is no such country any where in the world.' [১২৮]

এমনকি ১৯৭১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী (২৫ মার্চ রাতের মাত্র ১০দিন আগে) মাওলানা ভাসানী ঢাকায় আবুজর গিফারীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুজিব-ভুট্টোকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব খর্ব হলে তোমাদেরও রেহাই দেওয়া হবেনা।'[১২৯]

বস্তুত মাওলানা ভাসানীর এমন স্ববিরোধী ও অস্থির বেসামাল রাজনীতি তৎকালে পাকিস্তানে, এমনকি বাংলাদেশের জন্মলাভের পরও এদেশের রাজনীতিকে এক জটিল পঙ্কে নিপতিত করে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সি. আই. এর কথিত দলিল আবিস্কারের কথা প্রচার করার পরও মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে এরকম প্রশ্ন উঠেছিল। এমনকি খোদ চীনপন্থী রাজনীতির ধারক-বাহক বলে কথিত কেন্দ্রগুলো থেকেও এ প্রশ্ন উঠে। সাপ্তাহিক 'গণশক্তি' এ সম্মর্কে গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেছিল:

'মাওলানা ভাসানী যে সমস্ত সি. আই. এ সংক্রান্ত গোপন তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছেন তার সূত্র কি? কিভাবে তিনি এইসব খবর জানতে পারছেন?...

সি. আই. এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি কিছুদিন থেকে 'বিশ্বস্তসূত্রে' পাওয়া নানা তথ্য সরবরাহ করে আসছেন।... মাওলানা সাহেবের উচিৎ সত্বর এ বিষয়ে সমস্ত বিবরণসহ সংবাদপত্রে একটা পূর্ণ বিবৃতি দিয়ে বিভ্রান্তির অবসান ঘটান। তিনি যদি একাজ না করেন তাহলে জনগণ তাঁর উদ্দ্যেশ্যের সততা ইত্যাদি সম্পর্কে স্বভাবতই নানা প্রশ্ন তুলতে পারে'।[১৩০]

মাওলানা ভাসানীর এসব কার্যকলাপে পূর্ব থেকেই তাঁর দলে এনিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারীতে হাজী দানেশ এবং তারপরে ৮২৯ নেতার বিবৃতি, একই সাথে দলের ৮ নেতার বিবৃতি ইত্যাদির অনেক পূর্বেই ভাসানী

১২৮ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৭
১২৯ দৈনিক পাকিস্তান ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৩০ গণশক্তি, ১২ এপ্রিল ১৯৭০

ন্যাপের মূল সংগঠক আবদুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা দল ছেড়ে চলে যান।

হাজী দানেশের মতো, মোহাম্মদ তোয়াহাও ভাসানীকে পদত্যাগের কথা জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিতে মোহাম্মদ তোয়াহা লিখেন,

'সমাজতন্ত্র অর্জন ছিলো ন্যাপের লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রের অর্থ হইল এক সম্পূর্ণ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।... কিন্তু ন্যাপের প্রেসিডেন্ট মাওলানা ভাসানী সংগঠনের সহিত কোনো আলাপ আলোচনা না করিয়াই ইসলামী সমাজতন্ত্রের বাণী প্রচার শুরু করিলেন।...

অথচ মাওলানা সাহেব সে জন্য আন্দোলন করিতেছেন না। কার্যত তিনি আন্দেলন করিতেছেন এই শোষণ ও শাসন ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য।... ন্যাপের মূলনীতি ছিলো অসাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু মাওলানা সাহেবের বিভিন্ন বক্তৃতা ও বিবৃতিতে আজকাল সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পাইতেছে।...

মাওলানা ভাসানী ও ন্যাপ নেতৃত্বের একটি অংশ সি. আই. এ দলিল নামে কথিত একটি দলিল লইয়া আমার বিরুদ্ধে তীব্র মিথ্যা কুৎসা প্রচার করিতেছেন। যাহারা প্রচার করিতেছেন, তাহারা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, ঐ দলিল আমার নিকট কোন দিনই ছিল না, এখনও নাই।... কিন্তু যখন সন্তোষে মাওলানা সাহেব আমার উপরে দোষ আরোপ করিতে ছিলেন ঠিক তখন সন্তোষেই ঐ দলিলের কয়েকশত সাইক্লো কপি ছিলো, মাওলানাকে তাহা জানানোও হয়, মাওলানা তাহা সেখানে বিলি করেন নাই।...

ন্যাপ একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কাজ করিতেছে না।মাওলানা সাহেব বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সংগঠনের মতামত না লইয়া নিজে যা ভালো বোঝেন তাহাই করিয়া যাইতেছেন।[১৩১]

বস্তুত মাওলানা ভাসানী এমনি করে তাঁর স্বেচ্ছাচারী মনোভাব ও একনায়কসূলভ আচরণ দ্বারা (তাঁর দীর্ঘদিনের সহচররা যে অভিযোগ করে সময়ে সময়ে তাঁকে ত্যাগ করে গিয়েছেন) দলের ভাঙনকে অনিবার্য করে তোলেন।

১৩১, গণশক্তি ৩১ মে ১৯৭০

১৯ জানুয়ারী ১৯৭১ মাওলানা ভাসানী সন্তোষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি সম্মেলন ডাকেন। দলের সাম্প্রতিক ভাঙাভাঙি ও দলাদলি থেকে কর্মীদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়াই ছিল এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কৃষক শ্রমিক পার্টির এস.এম সোলায়মান, লাহোরে প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ইসলামী গণতন্ত্রী দলের মেজর আফসারউদ্দীন, জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক পীর মোহসেন উদ্দীন দুদু মিঞা ও শাহ আজিজ প্রমুখ ছাড়া পাকিস্তানের বিশিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল এতে যোগদান করেননি।

সম্মেলনে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে ৫ দফা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এতে জাতীয় লীগ ছাড়া অন্য কোনো দল স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। ৫ দফা ছিল নিম্নরূপ:

১ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ মর্যাদা
২ সামাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, উপনিবেশিকতা ও নয়া উপনিবেশিকতাবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির প্রভাব মুক্ত কৃষক, শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠা
৩ দেশের উৎপাদন বন্টন ব্যবস্থার সামাজিক করণ
৪ পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্যের যাবতীয় বিদেশী বিকল্প পণ্য বর্জন
৫ এসব দাবীর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠায় গণভোট অনুষ্ঠান।

এস. এম সোলায়মান সম্পদের সামাজিকীকরণ প্রশ্নে দ্বিমত প্রকাশ করেন। মাওলানা সম্মেলনে দীর্ঘ ৬ ঘন্টা একটানা বক্তৃতা দেন। প্রায় ৩ হাজার ডেলিগেট এতে যোগদান করেন। মাওলানা ভাসানী তাঁর দেওয়া শ্লোগান ছাড়া সম্মেলনে অন্য কোনো শ্লোগান দিতে নিষেধ করেন। কারণ সম্মেলনে লালটুপী মাথায় দিয়েও কিছুসংখ্যক প্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

মাওলানা ভাসানী এদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বলেন, তাঁর আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও সিআইএর এজেন্টদের স্থান নেই, আবার অতি বিপ্লবীদের স্থানও নেই। তিনি তাঁদের আরো বলেন, বিপ্লব শুধু বন্দুক দিয়ে হয় না। তিনি বলেন, আমি সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করি না।

মাওলানা বলেন, যারা সশস্ত্র বিপ্লব করতে চায়, তারা আমার কথা মানতেও পারে, নাও মানতে পারে। তবে তারা যদি সশস্ত্র বিপ্লব করতে চায়, তবে ভারতের নকশালবাড়ীতে আদর্শ ও প্রেরণার উৎস গ্রহণ করছে কেন? মুখে

বিপ্লবী শ্লোগান দিলেই সশস্ত্র বিপ্লব হয় না। যদি তাদের ক্ষমতা থাকে তবে এখানে নিজস্ব ভিত্তি স্থান গড়ে তুলে তাকে প্রেরণা স্থল করে বিপ্লব করতে পারে। তাদের জন্য গারো পাহাড় আছে, চট্টগ্রামের বনাঞ্চল আছে। কিন্তু সন্তোষের প্রাঙ্গনে তাদের ঠাঁই হবে না। মাওলানা ভাসানী বলেন, তিনি অতীতে সন্ত্রাসবাদীদের আন্দোলন দেখেছেন। তারা কখনো যাকে তাকে হত্যা করতে যেত না।[১৩২]

সন্তোষ থেকে ফিরে মাওলানা ঢাকায় ১০ জানুয়ারী পল্টনে এক জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি এখানে বলেন, লবণ দিয়ে ভাত খাব, তবু আমেরিকা আর আদমজী, ইস্পাহানী, দাউদের গোলাম হয়ে থাকব না। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছু হবে না, যদি ছাত্রসমাজ ও জনগণের নৈতিক চরিত্র ঠিক না থাকে। তিনি বলেন, ভণ্ডামী করলে বা ব্লাফ দিলে দেশ গঠন করা যাবে না। সমাজতনত্র প্রতিষ্ঠা হলে গরু-ছাগলে তো দেশ চালাবেনা। চালাবে মানুষ। কিন্তু মাওলানা হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, 'সেই মানুষ কই' ?[১৩৩]

পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, মাওলানা সম্প্রতি তাঁর দলের ভাঙন ও দলাদলিকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনাকে উদ্দেশ্য করেই এসব মন্তব্য করেন।

কিন্তু মাওলানার সর্বশেষ এই কার্যকলাপে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে যে বিষয়টি সবচেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তাহলো, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার প্রশ্নে তার পিছুটান। কারণ সাধারণ নির্বাচনের পরপরই যে মাওলানা ভাসানী স্বাধীনতার ডাক দিয়ে গণভোটের আয়োজন করতে বলেছিলেন তিনিই এবার সন্তোষ সম্মেলনে আতাউর রহমান খানের সাথে জোট বেধে শুধু 'লাহোর প্রস্তাব' বাস্তবায়নের দাবীতে চলে আসেন।

নির্বাচনের পরে দল ভাঙাভাঙি ও পদত্যাগের সর্বশেষ খবর দেন একজন মুসলিম লীগ নেতা। ২৭ জানুয়ারী (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের কনভেশন মুসলিম লীগের সভাপতি. গমিরুদ্দিন প্রধান (শফিউল আলম প্রধানের বাবা) দল থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি পদত্যাগপত্রে বলেন, বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের পর এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, কনভেনশন লীগের অস্তিত্ব এদেশে টিকিয়ে রাখতে

১৩২ দৈনিক পাকিস্তান, ২০ জানুয়ারী ১৯৭১
১৩৩ ঐ ১১ জানুয়ারী ১৯৭১

হলে গতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানকে গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।[১৩৪]

জনাব প্রধান অবশ্য মুসলিম লীগের সাধারণ সদস্য হিসেবে নিজেকে শেষ পর্যন্ত সামিল রেখেছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টিতে হাতিয়ার গ্রুপের উদ্ভব

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রথম ভাঙন আসে ১৯৬৫ সালে। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এ সময় মতাদর্শগত বিরোধ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তৎকালীন পাকিস্তানের কমিউনিস্টদের মধ্যেও এর প্রভাব এসে পড়ে। যদিও কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এ বিষয়ে বড় ধরনের কোনো ফাটল ধরেনি (কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ তোয়াহা চীনপন্থা অনুসরণ করেন, বাকী সবাই রুশ পন্থা সঠিক মনে করেন) তথাপি কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা নেতৃত্বের বড় বড় অনেক নেতা চীনপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টিতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে বড় ধরনের ফাটল না আসলেও সারাদেশেই পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে।

তবে এই ষাটের দশক শেষ হতে না হতেই কয়েক বছরের মধ্যেই চীনপন্থা অনুসরণকারী কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভিন্ন উপদল সৃষ্টি হতে থাকে এবং চীনপন্থী কমিউনিস্টরা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। এই বিভিন্ন উপদলের মধ্যে হক-তোয়াহা, মতিন-আলাউদ্দীন, রনো-মেনন-জাফর, অমল সেন-দেবেন সিকদার, সুখেন্দু দস্তিদার, টিপু বিশ্বাস-বিমল বিশ্বাস, বদরুদ্দীন উমর, আমজাদ হোসেন, অহিদুর রহমান, আলী আব্বাস প্রমুখ প্রায় প্রত্যেকেই কম-বেশী যার যার উপদল ও গোষ্ঠী চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে ও ভাসানী ন্যাপে রক্ষা করে চলতেন। ষাটের দশকের শেষদিকে সিরাজ সিকদার এ ধারায় আরেকটি উপদল নিয়ে হাজির হন। ভাসানী ন্যাপেও বহু নেতা কর্মী ছিলেন যারা চীন ভক্ত ও সমাজতন্ত্রী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে ভালবাসতেন।

অন্যদিকে রুশপন্থা অনুসরণকারী দলটিতে বিভিন্ন সময়ে নানা রকম বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলেও কখনোই আনুষ্ঠানিক ভাঙন আসেনি। কখনো এ ধরনের

১৩৪ দৈনিক পাকিস্তান, ১১ জানুয়ারী ১৯৭১

গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিলে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেরা একাই সরে পড়েছেন অথবা পার্টিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন। কিন্তু দলকে তারা কেউই ভাঙেন নি অথবা উপদল সৃষ্টি করেননি। ভাল হোক, মন্দ হোক বিভিন্ন সময়ে এ দলে ক্ষোভ থাকলেও নেতা থেকে কর্মী পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বীয় 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা'-র নীতি অনুসরণ করতে দেখা গেছে অথবা নিষ্ক্রিয় থেকেছেন ভিন্নমতাবলম্বীরা। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এ দলের এই বিকাশের প্রক্রিয়া সত্যি নজিরবিহীন। ১৯৭৫ সালে দলের অন্যতম নেতা খোকা রায়, সত্যেন সেন প্রমূখ বাকশাল গঠনের প্রশ্নে মতভেদ হওয়ায় দেশত্যাগ করে আর ফিরে আসেননি)।

তবে এদলের একটিমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে ১৯৬৯ সালে। ঢাকা জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম সম্পাদক নাসিম আলী তার সূত্রপাত করেন। ১৯৬৫ সালে চীন-সোভিয়েত বিরোধ কমিউনিষ্ট পার্টিতে দেখা দিলে যাঁরা মনে করতেন চীন-সোভিয়েত বিরোধের বিতর্ক এদেশের পার্টিতে দরকার নেই, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নাসিম আলী। ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় (মূলতঃ এটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ সম্মেলন। আগের তিনটি সম্মেলনই দেশে অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি, ফলে দেশের মাটি ঢাকার মিরপুরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সম্মেলনের নাম রাখা হয় প্রথম কংগ্রেস)।

এ কংগ্রেসে পাকিস্তানে সম্ভাব্য মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে অংশ নেওয়া, না নেওয়ার প্রশ্নে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। নাসিম আলী নির্বাচন বর্জনের পক্ষে একটি লিখিত বক্তব্য দেন। কংগ্রেসে বর্জনের পক্ষে ১৫ এবং এর বিপক্ষে ১৬ ভোট পড়ে। ছ'জন ভোট দানে বিরত থাকেন। ফলে প্রায় সমান সমান মতামত আসায় কংগ্রেস বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির মতামতের উপর ছেড়ে দেন। পরে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের পক্ষে মত দেন।

কিন্তু নাসিম আলী কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বরং মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন বর্জনের পক্ষে বিভিন্ন রকম তৎপরতা চালাতে থাকেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে নাসিম আলী 'সংগ্রামী জনতা'র নামে নির্বাচন বিরোধী ১০,০০০ প্রচারপত্র ছেপে বিলি করেন। এ সম্মেলনে বদরুদ্দীন উমরও নির্বাচন বিরোধী একটি প্রচারপত্র ছেপে বিলি করেছিলেন। নাসিম আলী জানিয়েছেন, তাদের প্রচারপত্র পড়ে আওয়ামী লীগ সম্মেলনের প্রতিনিধিরা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং নির্বাচন বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয়েছিল।

এসময় নাসিম আলী 'হাতিয়ার' নামেও সাইক্লোস্টাইলে একটি পত্রিকা বের করতেন। এই 'হাতিয়ার' পত্রিকা থেকেই এই উপদলটির নাম হয় 'হাতিয়ার গ্রুপ'। নাসিম আলীর এসব তৎপরতা নিয়ে পার্টিতে আলোচনা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁকে পার্টি থেকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কারের চিঠিতে লেখা ছিল:

'কমরেড মওলা সম্পর্কে বক্তব্য' (মওলা ছিল নাসিম আলীর ছদ্মনাম) এতে বলা হয়, 'মধ্যে মধ্যে কমরেড মওলা উন্মাদনাসুলভ ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত হন'। নাসিম আলী জানান, তিনি পার্টির এই সার্কুলারে খুব আহত হয়ে পড়েন। পার্টিকে এই সার্কুলার প্রত্যাহারের জন্য তিনি বারংবার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, '৬ মাস পর আমার বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার হলেও আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব ছিল না। কারণ কোনো ব্যাপারে মতামত দিতে গেলেই আমাকে 'উন্মাদ' খেতাবের পাল্লায় পড়তে হতো। কিন্তু পার্টি আমার অনুরোধ রক্ষা করেনি। ফলে আমি উপায়ান্তর না দেখে সিদ্ধান্ত নেই পার্টিতে থাকব না'।

এসময় কমিউনিস্ট পার্টির শুভ রহমানও নাসিম আলীর সাথে যোগ দেন। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম ইল সুং-এর মধ্যবর্তী অবস্থানের বক্তব্যে এরা আকর্ষিত হন। তাঁরা 'হাতিয়ার'কে কেন্দ্র করে প্রথমে একটি পাঠচক্র এবং পরে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (১৯৭০ সালে) গঠন করেন। নাসিম আলী, শুভ রহমান, মো: সোলায়মান হোসেন ও অন্য ৪জন গোপন সদস্য এর অন্তর্ভুক্ত হন।

এ প্রসঙ্গে নাসিম আলী বলেন, মঞ্জুরুল আহসান খানের সাথে তাঁর কয়েক দফা আলাপ হয়েছিল। কিন্তু মঞ্জুরুল আহসান তাঁর সাথে আসেননি। তবে মঞ্জু 'হাতিয়ার' পড়তেন।[১৩৫]

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর হাতিয়ার গ্রুপই প্রথম এক ইশতেহারে বলে 'সুস্পষ্ট রায় হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো সম্ভবনা নেই'।[১৩৬]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (হাতিয়ার) চীনপন্থী দলগুলোর সাথে সমন্বয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়।

---

১৩৫ সাক্ষাৎকার : নাসিম আলী (বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগের কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরোর সদস্য)
১৩৬ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৭

অবশেষে ঢাকায় পরিষদের অধিবেশন আহবান

১৩ ফেব্রুয়ারী এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়, প্রেসিডেন্ট আগামী ৩ মার্চ (১৯৭১) ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেছেন। এর ফলে এতোদিনকার সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান হল।

ঢাকাস্থ প্রাদেশিক পরিষদের ভবনে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হবে। সকাল ৯টায় এ অধিবেশন উদ্বোধন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ঢাকার রাজনৈতিক মহল প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণাকে অভিনন্দিত করেন। পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন বলেন, আরো আগেই এটা ঘোষণা করা উচিৎ ছিল। তবু দেরীতে হলেও প্রেসিডেন্ট অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।

জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, জামায়াতে ইসলামের গোলাম আজম, ওয়ালী ন্যাপের মোজাফফর আহমদ প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে অত্যন্ত ভাল বলে মন্তব্য করে বিবৃতি দেন।[১৩৭]

আওয়ামী লীগ বিবৃতি দিয়ে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকে।

পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোও এ সম্পর্কে কোন অনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি।

আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু

১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) সোমবার থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনসটিটিউটে আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের এক যৌথ বৈঠক শুরু হয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নীতি নির্ধারণী এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

তিনি দু:খ করে বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই সবাই মেনে নেয়, কিন্তু পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি গত ২৩ বছর দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তার জের এখনো চলছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, কামানের গুলির মুখেও ৬ দফার ভিত্তিতে ছাড়া অন্য কোন শাসনতন্ত্র তিনি গ্রহণ করবেন না।

---

১৩৭ দৈনিক পাকিস্তান ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, এখনো পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করে এসেছেন। তাঁর আমলে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং এক ইউনিট বাতিল করা হয়েছে। যতো শীঘ্র সম্ভব তিনি ক্ষমতাও হস্তান্তর করবেন বলে বঙ্গুবন্ধু আশা প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিব বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে ৬ দফা কর্মসূচী নিয়ে তিনি কি আলাচনা করবেন। তাঁরা কি এতোদিনেও ৬ দফা কর্মসূচী বুঝতে পারেনি? নাকি তাঁরা ৬দফা বুঝতে চান না? বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি কখনো কোনদিন পশ্চিম পাকিস্তানী অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলেন নি।

১৬ ফেব্রুয়ারী সংসদীয় দলের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেটরী পার্টির নেতা নির্বাচন করা হয়। এর ফলে পাকিস্তানের অঘোষিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যত: তাঁকে বরণ করা হয়। সহকারী নেতা নির্বাচিত হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের পার্লামেটরী দলের নেতা নির্বাচিত হন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। এতে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনসুর আলী অঘোষিত ভাবে নির্বাচিত হন। চীফ হুইপ নির্বাচিত হন অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং টাঙ্গাইলের এম. এ মান্নান। সাংবাদিকদের কাছে এসব নির্বাচনের ঘোষণা প্রকাশ করেন তাজউদ্দীন আহমেদ।

বাংলা একাডেমীতে বঙ্গবন্ধু: 'ফেব্রুয়ারী কঠিন সপ্তাহ'

পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে প্রথম আগমন করেন ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সালে। এদিন থেকে বাংলা একাডেমীর ভাষা আন্দোলন স্মরণ সভা শুরু হয়। পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বঙ্গবন্ধু এখানে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমী আজ যে সপ্তাহ পালন করছে, সে সপ্তাহ বাংলাদেশের জীবনে এক কঠিন সপ্তাহ। বঙ্গবন্ধু বলেন, ফ্রেরুয়ারীর এ সপ্তাহেই বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন ভাষা আন্দোলনের শহীদরা, এ সপ্তাহেই কুর্মিটোলার বন্দী শিবিরে হত্যা করা হয়েছে সার্জেন্ট জহরুল হককে, এ সপ্তাহেই শহীদ হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড:

শামসুজ্জোহা, আর এ সপ্তাহেই কারফিউ ভেঙ্গে আত্মহুতি দিয়েছে এ দেশের অসংখ্য মাতার অসংখ্য নাম না জানা সন্তান।

সৈয়দ মুতুর্জা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় শেখ মুজিব বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা করে বলেন, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা প্রস্তাব করলে কোন মুসলমান গণপরিষদ সদস্য তার প্রতিবাদ জানান নি। এর প্রতিবাদ করেছিলেন একজন হিন্দু, তিনি কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এর সাথে ছিল ছাত্রদের প্রতিবাদ।

শেখ মুজিব প্রশ্ন করেন, বুদ্ধিজীবীরা কি করেছেন ভেবে দেখবেন। যখন আমাদের সংস্কৃতির উপর ক্রমাগত আঘাত এসেছে, যখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়ে গিয়াছিলাম, তখন ক্ষমতার লোভে সবাই এতো বেশী মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন যে এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। তিনি বলেন, অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এদেশের অসংখ্য মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ক'জন আছেন? এ প্রসঙ্গে তিনি ডিকেডী আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের লোভে সেদিন শিক্ষকরা এই সব ঘটনাবলীর প্রতিবাদটুকুও করেন নি। কেউ পদত্যাগ করেছেন বলেও শোনা যায় না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, সূর্যসেনের নাম বলতে আপনারা ভয় পান। কারণ তিনি ছিলেন হিন্দু।

শেখ মুজিব বলেন, এমনও বুদ্ধিজীবীর কথা জানি যিনি বিশেষ এজেন্সীর মাধ্যমে টাকা নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য বই লিখেছেন এবং সে বই হাজার হাজার কপি গ্রামে গ্রামে ছড়ানো হয়েছে।

তিনি বলেন, একদিন বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলা যেত না। কিন্তু আজ এই জাতীয়তাবাদ সত্য। আয়নার মতো সত্য।

শেখ সাহেব বলেন, আমরা জনগণের দাবী আদায়ের জন্য রাজনীতি করি। তবে তার মানে এই নয় যে, আমরা ক্ষমতা চাই না। তিনি বলেন, আমরা রামকৃষ্ণ মিশন নই বা আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম নই। আমরা দাবী বাস্তবায়ন করার জন্য ক্ষমতায় যেতে চাই। তবে দাবী আদায় না হলে ক্ষমতা ছেড়ে চলে আসবো।

বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরে বাংলা চালু হওয়া সম্পর্কে বলেন, আওয়ামী লীগ যেদিন ক্ষমতায় যাবে সেদিন থেকেই অফিস আদালতে বাংলা চালু হয়ে যাবে। তিনি বলেন, মুখ দিয়ে যে ভাষা বের হয়, তাই দিয়েই অফিস আদালতের কাজ শুরু করা হবে। ভুল হয় হোক, পরে শুদ্ধ করে নেওয়া যাবে।

শেখ মুজিব সুস্পষ্ট ভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের কথা ঘোষণা করেন। এবং লেখকদের প্রতি মানুষের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির আহ্বান জানান।

বাংলা একাডেমীর জন্য এবছর মাত্র ৩ লাখ টাকা বরাদ্দ হওয়ায় দু:খ প্রকাশ করে বলেন, কাকে দোষ দেব? যারা এ সব করছে সেই আমলারা তো এদেশেরই ছেলে। তিনি প্রশ্ন করেন, রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিরোধিতা করেছিল কারা? নজরুল গীতির ভাষা পরিবর্তন করে কারা?
বঙ্গবন্ধু বলেন, এ সব কথা ইতিহাস হয়ে থাকবে।[১৩৮]

ছাত্র ইউনিয়ন:
৫টি প্রদেশেরই স্বাধীন সত্ত্বা দাবী

এসময় সারা পাকিস্তান ব্যাপী প্রধান আলোচিত বিষয় ছিল পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা। আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনায় অটল থাকে। এছাড়া আওয়ামী লীগের সামনে অন্য কোন পথ খোলাও ছিল না। কারণ ১৯৬৬ সাল থেকে আওয়ামী লীগ ৬ দফার জন্য সংগ্রাম করে আসছিল। ৭০ সালে নির্বাচনে তা জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে। জনগণ ম্যাণ্ডেট দেয়। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ অন্য কোন সামান্যতম সংশোধন করলেও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে পড়তো। পাকিস্তানে অনেক রাজনৈতিক দল এ জন্য ওৎ পেতে বসেও ছিল, বিশেষ করে মাওলানা ভাসানীও শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এ ইস্যু রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যাহার করতেন। ফলে আওয়ামী লীগের সামনে কোন পথ ছিল না।

তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সচেতন একটি অংশ এই প্রথম পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একজন বাঙালীর অধিষ্ঠিত হওয়ার শেষ সুযোগকেও গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন। এরা মনে করতেন, দীর্ঘদিন পশ্চিম পাকিস্তনীরা রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে তাদের অঞ্চল অনেক সমৃদ্ধ করে নিয়েছে। বাঙালীদের এবার কেন্দ্রীয় তহবিলের ভাগ সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার ও বাস্তবায়ন করার সুযোগ

১৩৮ দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

এসেছে।যে কোন কিছুর বিনিময়েও তাকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা যে কোন কিছুর বিনিময়েও এই সুযোগ দিতে রাজী ছিলো না।

ভুট্টো এ সময় ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচিত হলে আন্দোলনের হুমকি দেন। এ প্রেক্ষিতে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর নেতা আ. স. ম. আবদুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এক বিবৃতিতে ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনায় অপোষহীন সংগ্রামের প্রত্যয় ঘোষণা করেন।[১৩৯]

শাসনতান্ত্রিক সংকটকে সামনে রেখে ১৪ ফেব্রুয়ারী রোববার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সংগঠনের এক বিশেষ জরুরী কাউন্সিল ডাকে। এতে পাকিস্তানের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচিত হয়। কাউন্সিলে বক্তাদের বক্তব্যে এ কথা স্পষ্ট ভাবে আলোচিত হয় যে, পাকিস্তানে হয়তো শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের আর পাকিস্তানের অংশ হিসেবে হয়তো থাকা সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষণের এই মূল্যায়ণের প্রেক্ষিতে ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় জরুরী কাউন্সিল শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ১৪ দফা দাবী প্রণয়ন করে।এতে বলা হয়:

'৫ পাকিস্তানের যে মূল পাঁচটি ভাষাভাষী জাতির অবস্থান উহাদের সকলকে পাকিস্তান ফেডারেশন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের অধিকার দিতে হইবে'।[১৪০]

ছাত্র ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের মাধ্যমে পাকিস্তানের ৫টি প্রদেশেরই আলাদা স্বাধীন সত্তার প্রস্তাব করে বসে'।

'ঢাকায় যাব না'
সংকটের শুরু

মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে পাকিস্তানের রাজনীতির সর্বশেষ সংকট শুরু হয়। এ সংকটের সূত্রপাত করেন স্বয়ং জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৫ ফেব্রুয়ারী তিনি পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় যাব না।

---

১৩৯ দৈনিক পাকিস্তান, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

১৪০ সাক্ষাৎকার : নূরুল ইসলাম এবং স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪৯ ও দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ (১৪ দফার বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্টে)

ভুট্টো তাঁর বক্তব্য বিস্তারিতভাবে সাংবাদিকদের কাছে পেশ করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ৬ দফার ব্যাপারে আপোস বা পূনর্বিন্যাসের আশ্বাস পাওয়া না গেলে তাঁর দল জাতীয় পরিষদের আসন্ন ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করতে পারবে না। তিনি বলেন, এখন তো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ঢাকা যেতে হচ্ছে না, যেতে হচ্ছে প্রণীত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে। প্রকৃত অবস্থা হলো, শাসনতন্ত্র ইতোমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে এবং আওয়ামী লীগ আমাদের দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে চায়।

তিনি বলেন, আমাদের কথা শোনা হবে এবং গ্রহণযোগ্য হলে তা গৃহীত হবে এমন নিশ্চয়তা দিলেই তাঁর দল জাতীয় পরিষদে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ না হলে তাঁদের যাওয়ায় পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভুট্টো জানান, তাঁর দল একটি দফা বাদে ছাত্রদের ১১ দফা মেনে নিয়েছে। আওয়ামী লীগের ৬ দফার প্রকৃত ফেডারেশন এবং গণবাহিনী গঠন সম্পর্কিত দফা দুটিও তারা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কর আরোপের ক্ষমতা সংক্রান্ত দফাটি সম্পর্কে মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

ভুট্টো বলেন, তিনি ঢালের শেষ পর্যন্ত গিয়েছেন এবং এর বেশী এগুলে তাঁকে খাদে পড়তে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের একদল নেতার সমালোচনা করে বলেন, মজার ব্যাপার হল নির্বাচনের সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের যেসব নেতা ৬ দফার তীব্র সমালোচনা করেছেন, তারাই আজ ৬ দফার প্রশংসাকারী সেজেছে।

ভুট্টো এ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর ঢাকা না যাওয়ার পেছনে আবারও সেই স্বভাব সুলভ 'ভারত বিরোধী জুজুর' প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিবের পক্ষে যদি পাশ্চিম পাকিস্তানে আসা সম্ভব না হয়, তাহলে ভারতের সাথে পাকিস্তানের বর্তমান সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ঢাকা যাওয়া আরো বেশী কঠিন। এ অবস্থায় জনগণের পাশে থাকা তাঁর দায়িত্ব। ভুট্টো বলেন, আমার জীবন আমি বিপন্ন করতে পারি। কিন্তু আমি তো একা নই, দলের ৮৩ জন নেতার প্রশ্ন জড়িত। ভারতের শত্রুতা এবং ৬ দফা না মানা হলে ঢাকায় তাদের অবস্থা হবে ডবল জিম্মির শামিল। তিনি তাদের সেই অবস্থায় ফেলতে পারেন না।[১৪১]

---

১৪১ দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রায় সকল রাজনীতিক ভুট্টোর এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে বিচলিত হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক মহলে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব এবার বিপন্ন। ভুট্টো আগুন নিয়ে খেলছেন। এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। ভুট্টো নিন্দিত হন সকল মহল থেকেই। একমাত্র কাইউমপন্থী মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুল কাইউম খান তাঁকে সমর্থন করেন।

পিডিপি প্রধান নুরুল আমিন এক বিবৃতিতে বলেন, পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট দেখে জনগণ ভেবেছিল তাদের আলোচনায় অগ্রগতি আছে। কিন্তু ভুট্টোর ঘোষণা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে ভুট্টোর সদস্যরা 'ডবল জিম্মি' হবে এই মন্তব্য এ অঞ্চলের জনগণের প্রতি কটাক্ষস্বরূপ।

জামায়াতে ইসলামীর প্রধান মাওলানা আবু আলা মওদুদী সব দিক বিবেচনা করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে এই মুহূর্তে এক শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করা উচিৎ নয়। তিনি বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের খোলামন নিয়ে জাতীয় পরিষদে যোগদান করা উচিৎ। তবে পরিষদে সংখ্যালঘু দলগুলোর খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ না করাই উচিৎ হবে। খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করবে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তবে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই যদি কোন দল তার খসড়া শাসনতন্ত্র পরিষদে পাশ করিয়ে নেয় তাহলে তার ফলাফলের জন্যেও সেই দলই দায়ী থাকবে।

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতা মাওলানা মুফতী মাহমুদ কোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাজনৈতিক নেতাদের উচিৎ নয় বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ৬ দফা রদবদল করতে শেখ মুজিব সম্মত হবেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

ওয়ালী ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান পেশোয়ারে এক বিবৃতিতে বলেন, তাঁর দল আগামী ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে। তিনি বলেন, শাসনতন্ত্রের ভিত্তি ও ৬ দফা কর্মসূচীর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকবে। আওয়ামী লীগকে জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্র পেশ করতে দেওয়া হোক।

ভাসানী ন্যাপ প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জাতীয় পরিষদে যোগদানের পূর্বশর্ত দেওয়ার জন্য ভুট্টোর সমালোচনা করে বলেন, এটা পূর্ব

পাকিস্তানের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান কারো চাপ বা হুমকির কাছে নতি স্বীকার করবে না। তিনি ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তান কাউকে শাসন করবে না, কারো শাসন মানবেও না।।

ওয়ালী ন্যাপের পূর্বাঞ্চল শাখার প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, ভুট্টোর ঘোষণায় জনগণ বিপদের আশঙ্কা করছে।

পি ডি পি'র পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন, পরিষদের অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত না নিয়ে ভুট্টো যদি পরিষদের অভ্যন্তরে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে প্রতিবাদ জানাতেন তাহলে সেটাই গণতান্ত্রিক হতো।

কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অবঃ) নূর খান পশ্চিম পাকিস্তানের সব জাতীয় পরিষদ সদস্যকে ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করতে পরামর্শ দেন।

ডাকসুর নেতা আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন ভুট্টোর সিদ্ধান্তের নিন্দা করে বলেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় যদি ভুট্টো ও তার দলের সদস্যরা বাংলাদেশে না আসেন তবে পরবর্তীকালেও তাদের বাংলাদেশে আসার কোনো প্রয়োজনীয়তা বাঙালীরা অনুভব করবে না।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ভুট্টোর আচরণের তীব্র নিন্দা করে এবং ছাত্র জনতার প্রতি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেয়।[১৪৩]

''জাতীয় পরিষদ হবে কসাইখানা''

১৮ ফেব্রুয়ারী দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে ভুট্টোর এক চাঞ্চল্যকর মন্তব্য ছাপা হয়। এদিন ভুট্টোর সেই পুরনো 'ভারত জুজু'র ভয় দেখানোর সংবাদসহ ঢাকা অধিবেশনকে 'কসাইখানা' বলার খবর ছাপা হয়।

ভুট্টো এদিন বলেন, পাকিস্তানের প্রতি ভারতের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে এ রকম পরিস্থিতি

১৪২ দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৪৩ ঐ ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

থেকেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে পিপলস পার্টির ৮৫ জন সদস্যের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা যাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এখন এই দলের সদস্যদের প্রথম ও প্রদান কর্তব্য হচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে তাদের নিজেদের লোকের পাশে থাকা।

প্রকৃতপক্ষে, জুলফিকার আলী ভুট্টো, যিনি আইয়ুব খানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে অল্প কিছুদিন আগেও চাকুরী করেছেন, তিনি তৎকালীন ভারত-পাকিস্তান পরিস্থিতিকে এমনভাবে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে প্রচার করছিলেন, পত্রিকার পাতায় তার কথা পড়ে মনে হচ্ছিল সত্যিই বুঝি এখানে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বস্তুতঃ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক স্মরণকালে এই সময়ে সবচেয়ে ভাল অবস্থা বিরাজ করছিল। কারণ পার্শ্ববর্তী গণতান্ত্রিক দেশ ভারত তার বৈরী ভাবাপন্ন দেশটিতে এই প্রথম গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে নিশ্চিত হচ্ছিল। সুতরাং ভুট্টো 'মিছেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের' চেষ্টায় 'ভারত-ভারত' বলে চিৎকার করছিলেন।

ভুট্টো এদিন সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর যে বক্তব্য দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলেন, তাহলো, তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের আর আপোস আলোচনার পথ নেই। ঢাকায় গিয়ে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে পিপিপি'র সদস্যরা যদি শাসনতন্ত্র অনুমোদন না করে, তাহলে আওয়ামী লীগ প্রশ্ন করতে পারে, শাসনতন্ত্রে যদি সই না দেবে, তাহলে ঢাকা এসেছো কেন? সে ক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদ হবে একটি কসাইখানা।[১৪৪]

পরদিন ভুট্টো করাচীতে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে বলেন, দেশে আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সশস্ত্র বাহিনী—এ তিনটি শক্তিই আছে। আমরা কোনো চতুর্থ শক্তির কথা স্বীকার করি না।[১৪৫]

কার উদ্দেশ্যে, কেনইবা ভুট্টো হটাৎ করে এক চতুর্থ শক্তির কল্পনা করলেন তা আজো পর্যবেক্ষক মহলের কাছে রহস্যময় হয়ে আছে।

দেশের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জরুরী টেলিফোনে ভুট্টোকে করাচী থেকে ইসলামাবাদ ডেকে পাঠান।[১৪৬]

---

১৪৪ দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৪৫ ঐ ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৪৬ ঐ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে ৫ ঘন্টাব্যাপী বৈঠকের পরও ভুট্টো তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পাল্টাতে রাজী হননি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, ইয়াহিয়া-ভুট্টো মূলত এ সময় গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এ গোপন বৈঠকে পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক আমলা ও শোষক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন, মুদ্রা, কর ব্যবস্থা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিধিগুলো সম্পর্কে মুজিবকে কিছু বাস্তব সম্মত আপোষ করতে হবে।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়,নির্দিষ্ট দিনে শপথ না নিলে তাদের সদস্যপদ বাতিল হলে তিনি কি করবেন? ভুট্টো উপমা সহযোগে বলেন, আমি বগুড়ার মোহাম্মদ আলী নই।

তাঁর অংশগ্রহণ ছাড়াই শাসনতন্ত্র রচনার উদ্যোগ নেওয়া হলে তিনি কি করবেন জিজ্ঞেস করা হলে ভুট্টো বলেন, তা হবে ডেনমার্কের যুবরাজ ছাড়া হ্যামলেট অভিনয়ের সমতুল্য। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন একটা রচনা লেখার মতো। পূর্ব পাকিস্তান এ রচনা লিখুক আমরা তা গ্রহণ করবো। কিন্তু এর উপসংহারে আমাদের কয়েকটি অনুচ্ছেদ লিখতে দিতে হবে।

ভুট্টো সাংবাদিক সম্মেলনে এমন একটা ভাব দেখান যেন তাঁর একটা কি হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, যদি আমি না থাকি তাহলে সিরাজ মোহাম্মদ খান ও মোস্তফা খার আমার উত্তরাধিকার হবেন। এর মাধ্যমে ভুট্টো একটা 'চেইন অব কমাণ্ড'ও তৈরী করেন।

এ সময় ভুট্টো আবার 'ভারত-জুজু'র প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, আগামীকাল আমি আমার দলের লোকদের সীমান্ত এলাকায় যেতে বলবো। পিপিপি সদস্যদের এখন প্রধান কাজ হবে গ্রামে যাওয়া, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় যাদের বাড়ী ঘর তাদের পাশে যেয়ে দাঁড়ানো। সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে কল্পনা বিলাসী ও ধুম্রজাল সৃষ্টি প্রয়াসী ভুট্টো সন্দেহ করেন।

২২ ফেব্রুয়ারী ভুট্টো সংকট সমাধানে ৫ দফা ফর্মুলা পেশ করেন। এতে তিনি সকল প্রদেশের জন্য সমান প্রতিনিধিত্বের দাবী তোলেন এবং এজন্য কেন্দ্রে একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের কথাও বলেন।

এদিন পিপিপি'র সংসদ সদস্যদের এক বৈঠকে ভুট্টোকে সকল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ম্যাণ্ডেট দেওয়া হয় এবং সদস্যদের কোরআন ছুঁয়ে ভুট্টোর কথা মেনে চলার শপথ করানো হয়।

শপথের পর সদস্যরা, 'জিয়ে ভুট্টো হাজারো সাল', 'জিয়ে সিন্ধ', 'জিয়ে পাঞ্জাব,' 'জিয়ে সরহাদ', জিয়ে বেলুচিস্তান', 'জিয়ে বাংলা', এবং 'জিয়ে আওয়াম' শ্লোগান দেয়।

ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের ভীড়

নির্বাচনের পর থেকে ঘন ঘন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকরা পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসতে থাকেন। সফরের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় ঢাকার ধানমণ্ডীর ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত একটি বাসভবন। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান থাকেন।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি জুলফিকার আলী ভূট্টোর ঢাকা সফরের পর এই পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে মধ্য ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা সফর করেন বেলুচিস্তানের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা নবাব আকবর খান বুগতী। তাঁর সাথে একই বিমানে ঢাকায় আসেন পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ খান রাইসানী এবং ওয়ালী ন্যাপের সাইফুর রহমান। বিমান বন্দরে আওয়ামী লীগের এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান, তাজউদ্দীন আহমদ এবং তোফায়েল আহমদ প্রমুখ তাঁদের অভ্যর্থনা করেন।

নবাব আকবর খান বুগতি বলেন, বালুচ জনগণ আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষপাতী। কারণ ৬ দফা ও ১১ দফা শুধু বাংলার নয়, আমাদেরও দাবী। তিনি বলেন, তিনি শেখ মুজিবকে বেলুচিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন। কারণ বেলুচিস্তানের জনগণ দেশের সাংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।[১৪৯]

১৮ ফেব্রুয়ারী সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের ও 'জিয়ে সিন্ধে'র নেতা জি.এম সৈয়দ ঢাকায় আসেন। তিনি বিমান বন্দরে বলেন, কায়েমী স্বার্থবাদীরা বাংলাদেশের চেয়ে সিন্ধুকে

১৪৭ দৈনিক পাকিস্তান, ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৪৮ ঐ ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৪৯ ঐ ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

বেশী শোষণ করেছে। ফলে ৬ দফাতে সিন্ধুর জনগণই বেশী লাভবান হবে। তিনি বলেন, ৬ দফা তিনি অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করেন।

জনাব সৈয়দ একটি গোপন তথ্য সাংবাদিকদের জানিয়ে বলেন, ভুট্টো তার নিজের দলের সংকট এড়ানোর জন্যই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছেন। তিনি উল্লেখ করেন, ৬ দফা মানা, না মানা প্রশ্নে ভুট্টোর দলে ভাঙ্গন লেগেছে বলে তিনি সংকট সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, ভুট্টো গনতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এবং তিনি একনায়কত্ববাদী।১৫০

২২ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম হাজারভী গ্রুপের নেতা মাওলানা গোলাম গাউস হাজারভী ও মাওলানা মুফতী মামুদ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এক একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠক শেষে এই দুই নেতা সাংবাদিকদের বলেন, ইনশাআল্লাহ সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। তাঁরা বলেন, শেখের সাথে আলাপ করে তারা বুঝতে পেরেছেন, তিনি পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাখতে আগ্রহী। তাঁরা বলেন, আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য ইউনিটের উপর শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিতে চায় না।

নেতৃদ্বয় বলেন, আওয়ামী লীগ বিচ্ছিন্নতাবাদী একথা সত্য নয়। তাছাড়া, ভারতের সাথে কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কেও উদাসীন নয়। ৬ দফা সম্পর্কেও আওয়ামী লীগ অনমনীয় নয় বলেও তাঁরা মন্তব্য করেন। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে এবং সেজন্য এমনকি জাতীয় পরিষদের ক্ষুদ্রতম দলের সাথেও আলোচনায় প্রস্তুত আছেন বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।১৫১

সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব ও স্বাধীন গণ বাংলার ডাক

একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন তার এক প্রচার পত্রে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরার ও স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করার আহবান জানায়।

---

১৫০ দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৫১ ঐ ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

প্রচারপত্রে আরো বলা হয়, একাত্তরের একুশেতে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নবতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এ থেকে মুক্তি আসতে পারে ভোটের রাজনীতি, মন্ত্রীত্বের লড়াই বা তথাকথিত আইন সভার 'শাসনতন্ত্র' রচনা করে নয়, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে। এর পাশাপাশি শহরাঞ্চলে বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানও সৃষ্টি করতে হবে এবং মুক্ত গ্রামাঞ্চল দ্বারা শহর ঘেরাও ও অধিকার এবং সর্বোপরি সারা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সশস্ত্র জনযুদ্ধের মহান বিপ্লবী পথে এগুতে হবে।[১৫২]

একই দিবস উপলক্ষে আল মুজাহিদী নেতৃত্বাধীন বাংলা ছাত্রলীগও একটি প্রচারপত্রে স্বাধীন সার্বভৌম গণবাংলা কায়েম করার আহবান জানায়। প্রচারপত্রে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মূল্যায়ন করে বলা হয়, বাংলা ভাষার উপর কায়েমী স্বার্থের হামলা ছিল মূলত: বাংলার সংস্কৃতি ও বাঙালী জাতির স্বাধিকার বিলুপ্তির বৃহত্তর ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। ৬৯-এর গণআন্দোলন ও ৭০-এর নির্বাচনের আলোকে আজ সমগ্র জগতের কাছে বাঙালী জাতির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চিরন্তন আকুতি পরিস্কার হয়ে পড়েছে। এই পটভূমিতে ৮ই ফাল্গুন আজ বাঙালীর সামগ্রিক অধিকার তথা জাতীয়তাবাদী স্বাধীন সার্বভৌম গণবাঙলা গঠনের নবতর সংগ্রামের ডাক দিচ্ছে। বাঙলা ছাত্রলীগ সেই সংগ্রামেরই দৃপ্ত সারথি। বাংলার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী সেই সংগ্রামেরই নির্ভীক সৈনিক। তাই এবারকার ৮ই ফাল্গুনে আমাদের কন্ঠের তুর্যে ধ্বনিত হোক সেই অভয়মন্ত্র: 'জয় স্বাধীন বাংলা'।

একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে বাংলা ছাত্রলীগ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার প্রতি হুমকি দিয়ে বলে:

'অবিলম্বে সরকারী অফিস-আদালতে বাংলার মাধ্যমে কার্যনির্বাহের ব্যবস্থা কর, অন্যথায় বিদেশী ভাষার সংরক্ষণের যাদুঘর, সরকারী অফিস-আদালতগুলো আমরা নিশ্চিহ্ন করে দেবো।....

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অটুট রেখে বাংলার সহজাত সংস্কৃতি বিকাশে মন দিতে হবে, বিদেশী ও পশ্চিম পাকিস্তানী পর্ণগ্রাফিক পুস্তক ও সিনেমার আমদানী বন্ধ করতে হবে। বাংলার মানুষ এ ব্যাপারে আর কোন দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ দিতে রাজী নয়'।

---

১৫২ প্রচারপত্রটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেখুন পরিশিষ্টে

এবং বাংলা ছাত্রলীগ সর্বশেষে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশেষ সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে জাগ্রত ছাত্র সমাজকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করতে আহ্বন জানায়।[১৫৩]

বাংলা ছাত্র লীগের প্রচারপত্রটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তৎকালে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক প্রস্তাব দলিল রচনা কিংবা প্রচারপত্রে যেখানে 'সাধু ভাষা' ব্যবহার করতো (এমন কি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল দৈনিক পত্রিকাও সাধু ভাষায় বের করা হতো) সেখানে বাংলা ছাত্র লীগই একমাত্র এ ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছে।

'নেতার অব্যক্ত কথা বুঝে নিতে হবে'

২২ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সভায় আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবুরের প্রতি কোনো রকম চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে ৬ ও ১১ দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে অটল থাকার আহবান জানানো হয়। ছাত্রলীগ কর্মীরা এদিন যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার জন্য শপথ গ্রহণ করে।

ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সবেক ছাত্রনেতা ও নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য তোফায়েল আহমদ বলেন, ৬দফার মাধ্যমে আমরা ১২শত মাইলের ব্যবধানের দুটি পাকিস্তানকে এক রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই চেষ্টা আজ নস্যাৎ হতে চলেছে। তিনি বলেন, ভুট্টো সাহেবেরা যদি এখানে না আসতে পারেন তো আপত্তি নেই। তারা ওখানে বসেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করুন। আমরা এখানে বাংলার শাসনতন্ত্র কায়েম করবো।

ডাকসু নেতা আ স ম আব্দুর রব সমাবেশে বলেন, শাসনতন্ত্র ৬দফা ও ১১দফা ভিত্তিতেই হবে। এর বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যদি একটিও প্রতিবাদ উঠে, তবে সাথে সাথেই আমরা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। তিনি বলেন, যে সংহতির নামে আমাদের শুধু শোষিতই হতে হয়, সেই তথাকথিত সংহতিতে আমরা বিশ্বাসী নই এবং শেখ মুজিব সেই সংহতির নেতা হতে চান না।

---

১৫৩ আগ্রহী পাঠক প্রচারপত্রটি পূর্ণাঙ্গ দেখুন পরিশিষ্টে

জনাব রব বলেন, শেখ মুজিবরের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এবং এই জন্যেই পুঁজিপতি ও শিল্পপতি গোষ্ঠী তাঁকে দেওয়া ম্যান্ডেটেকে নস্যাৎ করতে চায়। তিনি বলেন, ৬দফা ও ১১দফাই নেতার লক্ষ্য, এরপরও যা রয়েছে, নেতার সেই অব্যক্ত কথা আমাদের বুঝে নিতে হবে।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ বলেন, সারা পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল আজ ভুট্টোকে তাদের মুখপাত্র করেছে। ৩মার্চ যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না হয়, তার ফল অন্যরূপ হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

প্রথম মুজিববাদের ঘোষণা

ছাত্রলীগের এ দিনের সভাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শকে মুজিববাদ বলে ঘোষণা দেওয়া হয় (বস্তুত: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের তরফ থেকে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার যে প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছিল তার শব্দগত ব্যবহার এই সভা থেকেই প্রথম উচ্চারিত হয়। ইত:পূর্বে কোথাও 'মুজিববাদ' শব্দটি আওয়ামী লীগ কিংবা ছাত্রলীগ কর্মীরা ব্যবহার করে নি- লেখক)। আর ঘোষণাটি দেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন। জনাব মাখন তাঁর বক্তৃতায় ভুট্টোর সমালোচনা করে বলেন, তিনি যদি এখানে না আসতে চান, তাহলে তাঁর আর আসার দরকার নেই। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশে কোনো বিদেশী 'ইজম' প্রতিষ্ঠা হতে দেবনা। এখানে আমরা মুজিববাদের প্রতিষ্ঠা করবো।

ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই সাজাপ্রাপ্ত ও বিনাবিচারে আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবীতে প্রস্তাব গ্রহণের আহ্বান জানান।[১৫৪]

'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ধৈর্যের শেষ সীমায়'

২২ ফেব্রুয়ারী মাওলানা ভাসানী সিলেটে এক জনসভায় বলেন, সংবিধান রচনায় ভুট্টো না এলেও অসুবিধা নেই। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভুট্টোরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার জন্যেই সাত কোটি বাঙালীর উপর আজ এমন দুর্দশা নেমে এসেছে।

---

১৫৪ দৈনিক পাকিস্তান, ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

তিনি দেশের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে সকল বাম দলগুলোর ঐক্য কামনা করে বলেন, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হবে এবং মারাত্মক নিপীড়ন ও নির্যাতন শুরু হবে।[১৫৫]

চট্টগ্রামে ১৯ ফেব্রুয়ারী এক জনসভায় মাওলানা বলেন, সরকার যদি অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি না দেন তাহলে তিনি জেল ভাঙার আন্দোলন শুরু করবেন।[১৫৬]

মাওলানা ২৩ ফেব্রুয়ারী ভৈরবের জনসভায় বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে।[১৫৭]

২৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় শহীদ দিবস উপলক্ষে ওয়ালী ন্যাপের আলোচনা সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ পাক-ভারত সম্পর্কে অবনতি ঘটানোতে ভুট্টোর উৎসাহের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ৬দফা ও ১১দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র হলেই সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান হবে না। তিনি শাসনতন্ত্রে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ পাকিস্তানের ৫টি ভাষাভাষী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করেন।

কাজী মোহাম্মদ ইদরিস এর সভাপতিত্বে এ আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন পটুয়া কামরুল হাসান, রনেশ দাসগুপ্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার, সৈয়দ আলতাফ হোসেন প্রমুখ।

কামরুল হাসান তার বক্তৃতায় বলেন, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাধীকার আদায়ের ব্যর্থতার জন্যে বুদ্ধিজীবীদের উপর কোনো কোনো রাজনৈতিক দল আজ যে দোষারোপ করছে (বাংলা একাডেমীতে শেখ মুজিবের বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনাকে ইঙ্গিত করে-লেখক) তা অত্যন্ত একতরফা ও অযৌক্তিক। তিনি এর প্রতিবাদ করে বলেন, একই ধরনের অভিযোগ রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধেও করা চলে। তিনি প্রশ্ন করেন, উদ্দেশ্যের প্রতি তারা কতোটুকু সৎ ও একনিষ্ঠ ছিলেন?[১৫৮]

অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের এক সমাবেশে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৩মার্চ ঢাকায়

১৫৫ দৈনিক পাকিস্তান, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৫৬ ঐ ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৫৭ ঐ ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৫৮ ঐ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অবশ্যই বসতে হবে এবং গণতান্ত্রিক নিয়ম মতো ফোরাম হলেই তাকে আইনসিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে হবে। অন্যথায় সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য গণতন্ত্র বিরোধী পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীই দায়ী থাকবে।

ছাত্রইউনিয়ন সভাপতি নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তারা বলেন, জনগণের ভোটের রায় বাস্তবায়নের পথে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রই এদেশের ছাত্র সমাজ বরদাস্ত করবে না।

এতে ছাত্রনেতা আব্দুল কাইউম মুকুল ও মাহাবুবজামানও বক্তৃতা করেন।[১৫৯]

সংকট নিরসনের চেষ্টা

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ভুট্টোর যোগদানে অস্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের রাজনৈতিক শক্তিগুলো যখন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পরে তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস. এম আহসান ২৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা থেকে জরুরী পরামর্শের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান যান। পূর্ব পাকিস্তানের সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক অস্থিরতার রিপোর্ট করার জন্যই গভর্নর প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে যান। বিমানবন্দরে গভর্নর বলেন, শেখ মুজিব দেশের একজন শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতা।[১৬০]

পরদিন ২৪ ফেব্রুয়ারী সংকট নিরসনের শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত লে: জেনারেল এস. জি. এম পীরজাদা শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার জনা ঢাকা আসেন।[১৬১]

পীরজাদা মুজিবের সাথে আলোচনা করে পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারী ফিরে যান। ২৬ ফেব্রুয়ারী গভর্নর আহসান রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং এসেই শেখ মুজিবের সাথে এক অনির্ধারিত একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।

২৬ ফেব্রুয়ারী করাচীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভুট্টো দু'ঘন্টা স্থায়ী একান্ত আলোচনায় মিলিত হন। তাঁরা দু'জন এক সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজেও অংশ নেন।[১৬৩]

---

১৫৯ দৈনিক পাকিস্তান ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৬০ ঐ ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৬১ ঐ ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৬২ ঐ ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৬৩ ঐ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

২৪ ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর বহুদিন পর মুখ খুলেন। তিনি ৬ দফা সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মুলাও বের করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, পাকিস্তানের কোন প্রদেশের প্রতি তিনি ৬ দফা চাপিয়ে দেবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন প্রদেশ স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ সুযোগ লাভে অনিচ্ছুক হলে আওয়ামী লীগ জোর করবে না। তবে বাংলাদেশের ব্যাপারে ৬ দফা পুরোপুরি কার্যকর হতে হবে।

সাংবাদিকদের কাছে বাংলার ৭ কোটি মানুষের নয়নমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অভিযোগ করেন, একটি গোষ্ঠী জাতীয় সংহতির ভান করে পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েও জুয়া খেলার পর্যায়ে পৌচেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় শিল্পপতি বাংলাদেশকে তাদের সংরক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু আমরা এ অবস্থা আর কোন মতেই চলতে দিতে রাজী নই।

জনাব ভুট্টো, শেখ মুজিবের কাছে আশ্বাস চেয়েছেন বলে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করলে বঙ্গবন্ধু বলেন, ব্যক্তিগত আশ্বাস দেওয়ার প্রশ্নই নেই। জনগণ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে। এখন জনপ্রতিনিধিদেরই নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে পরিষদে গিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। বঙ্গবন্ধু বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান পরিষদ অধিবেশন আহবান করেন নি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিষদ ডেকেছেন। তাই কারো গোপন বা ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা লাভের আবদার চলে না।

পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন কিনা জিজ্ঞেস করলে বঙ্গবন্ধু ক্ষেপে যান। তিনি বলেন, এ ধরণের কথা শুনতে শুনতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি ততো মারাত্মক নয়। যখনি বাঙালীদের স্বার্থ আদায় সম্পর্কে কথা উঠেছে, তখনি 'পাকিস্তান বিপন্ন' হওয়ার ধুঁয়া তোলা হয়েছে। গত ২৩ বছরই এটা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বস্তুত: বাঙালীরা অনেকের চেয়ে ভাল পাকিস্তানী। বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি এ ধরণের ধুঁয়া আর শুনতে রাজী নই।[১৬৪]

বস্তুত: বঙ্গবন্ধুর উপরিউক্ত কথাগুলো একটুও অতিরিক্ত ছিল না। কারণ পাকিস্তানের জন্য বাঙালী মুসলমানদের দাবিই ছিল সবচেয়ে জোরালো। পাকিস্তানের

১৬৪ দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

সমর্থনে বাংলার মুসলমানরা দিয়েছিল ৯৬% ভোট, পাঞ্জাবীরা দিয়েছিল মাত্র ৪৯% ভোট। আর এর পরে পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এই পাঁচটি অঞ্চল নিয়ে গড়া হলো যে পাকিস্তান, তাতে বাঙালীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, বাংলা ভাষাই অধিকাংশ পাকিস্তানীর ভাষা। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী পাকিস্তানের রাজধানী হওয়া উচিৎ ছিল ঢাকা শহর। এবং বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সর্বোচ্চ দাবিদার। কিংবা ৫টি ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হতে পারতো। কিন্তু বিনা বিতর্কে রাজধানী হয়ে গেল করাচী। জিন্নাহর মৃত্যুর পরও করাচী কিছুদিন রাজধানী থাকলেও আইয়ুব খান এসে তা নিয়ে গেলেন প্রথমে রাওয়ালপিণ্ডি, এবং আরো কয়েকদিন পর ইসলামাবাদে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে পাঞ্জাবীরা পশ্চিম পাকিস্তানেই তিন তিনবার রাজধানী তৈরী করলো। ঢাকা এ নিয়ে কিছুই বলেনি। পাকিস্তানের বড় কর্তরা সবাই ছিল প্রায় উর্দু ভাষী এবং কোনরকম যুক্তি ছাড়াই তারা ধরে নিলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাঙালীরা এর বিরুদ্ধে কিছুই বলে নি, শুধু বলেছিল বাংলাকেও সমান মর্যাদা দাও। কিন্তু এ কন্ঠকে স্তব্ধ করার জন্য বাঙালীর মুখে গুলী চালানো হয়। অথচ এরপরও বাঙালীরা পাকিস্তানের সাথেই থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ন্যূনতম অধিকারের দাবীতে আন্দোলন করলেও পাঞ্জাবীরা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, 'পাকিস্তান বিপন্ন, ইসলাম বিপন্ন'।

কমিউনিস্ট পার্টি: পৃথক রাষ্ট্রের সম্ভাবনার ইঙ্গিত

নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি (মণি সিংহ-এর নেতৃত্বাধীন) ২৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) পাকিস্তানের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যা-লোচনায় বসে। কেন্দ্রীয় পার্টির বৈঠকে গৃহীত এক রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়:

'বর্তমান নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করিতে না দেওয়া হইলে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন এই অঞ্চলে একটা পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে যাইতে পারে। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা জনগণের এই সংগ্রামকে অবাঙালী জনগণ বিরোধী প্রবাহিত করিতে প্রয়াসী হইতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় আমাদের কর্তব্য হইবে, বাঙালীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে জনগণের এই সংগ্রামে আমাদের শরীক থাকা এবং এই নীতির ভিত্তিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এই সংগ্রামকে সঠিক গণতান্ত্রিক মতে পরিচালিত করিতে প্রচেষ্টা করা। এই ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণকে বুঝাইতে হইবে যে এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন

ভাষাভাষী জাতির জনগণ ও অবাঙালী জনগণের বিরুদ্ধে নয়। ইহা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমশত্রু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুজিঁর বিরুদ্ধে এবং এই সংগ্রাম সারা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গ। এই সংগ্রামে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা ও সমর্থন চাই এবং তাহাদের জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম আমরা সমর্থন করি। এই সংগ্রামের সফলতার জন্য জনগণ উগ্র বাঙালী জাতীয়তা-বাদের অবাঙালী জনগণ বিরোধী জিগির এবং মাওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকি-স্তানের জনগণ বিরোধী জিগিরের মুখোশও আমাদের খুলিয়া দিতে হইবে'।[১৬৫]

২৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে অফিস-আদালতে পর্যন্ত সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়লে পূর্ব বঙ্গবাসীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়।

ছাত্রসংগঠনগুলির ও রাজনৈতিক দলের অফিসে, সংবাদপত্র কার্যালয়ে, রাজনীতি-বিদদের বাড়ীতে অনুসন্ধানী মানুষের ঢল নামে। সকলেই ক্রমাগত রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে খবরটির সত্যতা যাচাই করে দেখছিলেন।

২৮ ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত দৈনিক পাকিস্তানের 'সর্বশেষ খবর' কলামে এ সংবাদ ছাপা হয় যে, ৩ মার্চই অধিবেশন বসছে, স্থগিত হচ্ছে না। এদিন পত্রিকাটি আরো খবর দেয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সকল দলই অবিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, এমনকি ভুট্টোর পিপলস পার্টিও সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনা করছে বলে সূত্রটিতে উল্লেখ করা হয়।[১৬৬]

২৭ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিতে শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। খসড়া পত্রটি পাঠ করে শোনান ড. কামাল হোসেন।[১৬৭]

এদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ওয়ালীখান, ন্যাপ থেকে নির্বাচিত সকল জাতীয় পরিষদ সদস্যকে নিয়ে অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় পৌছেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন, আওয়ামী লীগ নিজস্ব খসড়া সংবিধান পেশ করলে দোষের কি?[১৬৮]

১৬৫ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৬৬ দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৬৭ ঐ
১৬৮ ঐ

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ) ঢাকায় সংসদ অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এ দলের শিয়ালভী গ্রুপ ঢাকা অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। কাইউম খানের মুসলিম লীগও ঢাকায় আসবেনা বলে জানায়। জামায়াতে ইসলাম ঢাকা অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়।[১৬৯]

ভাসানীর চিন্তাধারায় নতুন মোড়

দেশের এই সংকটজনক পরিস্থিতির সময়ে মাওলানা ভাসানী 'শিক্ষা ও কৃষ্টি' সম্মেলনের নামে সন্তোষে কাটাচ্ছিলেন। আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনিশ্চয়তায় সমগ্র পূর্ব বাংলা তখন বিস্ফোরণের জ্বালামুখে টগবগ করছে।

তিনি সম্মেলনে আরো একটি বিপ্লব 'শিক্ষা বিপ্লবের' ডাক দেন। তিনি সাধারণ তত্ত্বগত শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা ও কুটীর শিল্প এবং কারিগরী বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এতোদিনকার বাম চিন্তাধারার নায়ক বলে পরিচিত ভাসানী বলেন, সর্বজনীন ইসলামের বৈপ্লবিক আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সভ্যতার সংকট ও সাম্রাজ্যবাদী হামলাকে বিনাশ করার জন্য শিক্ষাকে সকল পরিকল্পনার উপরে ইসলামিক দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[১৭০]

সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অনলবর্ষী নেতা হটাৎ করে পাকিস্তানের এমন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিক্ষা ও কৃষ্টি সম্মেলন আহবান করে কেন ইসলামিক আদর্শের প্রচার শুরু করলেন তা আজো রহস্যাবৃত হয়ে আছে।

অবশ্য মাওলানা ভাসানী বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তাঁর দলে চীনপন্থা অনুসরণকারী কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কথা বলে আসছিলেন। অনেকে এরই মধ্যে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে চলেও গিয়েছিলেন। ভাসানী এরই মধ্যে কয়েকদিন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ও লাহোর প্রস্তাব ইত্যাদি নিয়ে গরম বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা এ পর্যায়ে ঠিক সেদিনই প্রথম বলেন, যেদিন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ফল বের হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ

১৬৯ দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৭০ ঐ ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে একজন বাঙালীর নিখিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যখন তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল, ঠিক তখন তিনি ইসলামী আদর্শের প্রচার করা শুরু করেন। শুধু ইসলামী আদর্শ নয়, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবী করা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যও এ সময় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ দার্শনিক আবুজর গিফারীর ১৩৬৮তম মৃত্যু বার্ষিকীতে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে মাওলানা ভাসানী বলেন, শোষনহীন সমাজ কায়েমে ইসলামের মহান শিক্ষার কথা মনে রাখতে হবে। কোরআন পাক বিশ্বের মানুষের মুক্তির কালাম।

মাওলানা বলেন, দেশে আজ যে সংকট তা শুধুমাত্র শাসনতন্ত্র রচনা করেই মোচন করা যাবে না। তিনি রাগত: স্বরে বলেন, আমরা ক্ষমতায় যেতে চাই না। মুজিব-ভুট্টোরা ক্ষমতায় যাক এবং যতোদিন দেশ শাসন করুক আমাদের আপত্তি নেই।

মাওলানা ভাসানী বলেন, কমিউনিস্টরা মজলুম জনতার মুক্তি এনে দিতে পারে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এবার দেখিয়ে দিতে হবে, ইসলামও মানুষের সত্যিকার মুক্তি সাধনে সক্ষম।

তিনি মুজিব-ভুট্টোকে ইঙ্গিত করে বলেন, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব খর্ব হলে তোমাদেরও রেহাই দেওয়া হবে না।[১৭১]

বস্তুত: মাওলানা ভাসানীর এ ধরণের বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সচেতন মহলে হাসির খোরাক জোগায়। কারণ এই কয়েকদিন পূর্বেই তিনি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী তুলেছিলেন। অথচ এখন আবার পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হলে তিনি কাউকে ক্ষমা করতে চাচ্ছেন না।[১৭২]

---

১৭১ দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
১৭২ মাওলানা ভাসানী সম্পর্কিত এ আলোচনার বিস্তারিত দেখুন 'ভাসানীকে নিয়ে প্রশ্ন' অধ্যায়ে

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিনটি

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিনটিতে ঢাকা নগরীসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটায়। একটা গুরুতর কিছু হচ্ছে-এই আশঙ্কায় সাধারণ রাজনৈতিক মহল চরম অস্থিরতায় থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এস এম আহসান বঙ্গবন্ধুর সাথে এদিন আরো একটি অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। পিণ্ডি থেকে ফেরার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে এটি তার তৃতীয় বৈঠক।

এদিন জামায়াতে ইসলাম প্রধান মাওলানা মওদুদী সংকট নিরসনে বঙ্গবন্ধুর কাছে একটি জরুরী বার্তা পাঠান। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গেই ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তাটির জবাব পাঠান। বঙ্গবন্ধু এতে বলেন, এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রত্যেক নেতাকে কথা-বার্তায় সতর্ক এবং জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিৎ।[১৭৩]

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোসেফ ফারল্যাণ্ড এদিন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এসে তাঁর সাথে দেখা করেন। তাঁরা একান্তে কিছুক্ষণ কাটান। পরে শোনা গিয়েছিল, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে সমর্থন করবে না, একথাটি জানাতেই ফারল্যাণ্ড ঢাকা এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এরকম একটি ঘটনা ঘটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আশা করেছিলেন এমন গুজব বাজারে ছিল।

'কোন ছাগলে পাকিস্তান খাইয়াছে'?

জুলফিকার আলী ভুট্টো এদিন লাহোরে বলেন, জাতীয় পরিষদের এবারের তারিখ পিছিয়ে দিলেই তিনি অধিবেশনে যোগদান করবেন। তিনি বলেন, তাঁর অংশ গ্রহণ ছাড়া অধিবেশন হলে তিনি খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত আন্দোলন শুরু করবেন।

এর পূর্বে ২৭ ফেব্রুয়ারী ভুট্টো লাহোরে বলেন, তিনিও জয় বাংলা শ্লোগান দিতে পারেন। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানেও জয় সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্তের ক্ষেত্রে একই শ্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে 'কোন ছাগলে পাকিস্তান খাইয়াছে'?

---

১৭৩ দৈনিক ইত্তেফাক, আজাদ, পয়লা মার্চ ১৯৭১

তিনি আরো বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে তা পিপলস পার্টি প্রথম থেকেই স্বীকার করে এসেছে।[১৭৪]

'ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা আছে'

বঙ্গবন্ধু ফেব্রুয়ারীর শেষ দিনে ঢাকা শিল্প ও বণিক সংঘের এক সংবর্ধনায় যোগদান করেন। তিনি এখানে দীপ্ত কন্ঠে বলেন, তাঁর দল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাস করে। কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ছাড়া মানুষকে বাঁচানো যাবে না।

তিনি পাকিস্তানের ২৩ বছরের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশ শতকরা ৭০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতো, কিন্তু বর্তমানে তা কমে ৪৫ ভাগে নেমে এসেছে। আর পশ্চিম পাকিস্তান ৩০ ভাগের স্থলে ৫৫ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বাংলার পাট, তামাক, চায়ের বিনিময়ে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানে কলকারখানা স্থাপন করে সেই কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যই বাংলার বাজারে বিক্রি করছে।

তিনি বলেন, বাস্তুহারার ভিড়ে রাস্তায় চলা যায় না। আমরা এ অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না।

তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তাঁদের বাংলাদেশে আসতে নিষেধ করা হবে না। তবে তাদের এখানে ব্যবসা করে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাচার করতে দেওয়া হবে না। এদেশে অর্জিত অর্থ এদেশেই ব্যয় করতে হবে।

তিনি শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের বলেন, এদেশের ছাত্র, শ্রমিক, রিক্সাওয়ালারা যখন নির্যাতন, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে, তখন শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা তাদের পাশে দাঁড়ান নি। তিনি তাঁদের অতীতের মনোবৃত্তি মুছে ফেলে স্বাধীকার আন্দোলনে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে বলেন, অন্যথায় এ দেশের মানুষ তাঁদের ক্ষমা করবে না।

জয় বাংলা, শ্লোগানের বিশ্লেষণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, এর মধ্যে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার নিহিত।

১৭৪ আজাদ, পয়লা মার্চ ১৯৭১

শিল্প ও বণিক সমিতি থেকে তাঁকে প্রদত্ত রুপার নৌকা উপহারের জবাবে কৌতুক করে বঙ্গবন্ধু বলেন, নৌকায় বাদাম আছে, ঘূর্ণিঝড়েরও সম্ভাবনা আছে, আমি শক্ত হাতে হাল ধরে রেখেছি।[১৭৫]

'তখন কি হবে?'

একই দিন বঙ্গবন্ধু ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীর এক সংবর্ধনায়ও যোগ দেন। এখানে তিনি বলেন, কারো মতামত যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিপন্ন হলে তা কারো মেনে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়- এমনকি তিনি যদি তাঁর দলের একমাত্র সদস্যও হন।

তিনি প্রশ্ন করেন, পরিষদে আসবেন না কেন? জনগণ আপনাকে ভোট দিয়েছে পরিষদে আসার জন্য। পরিষদে আসার পূর্বেই শর্ত আরোপ কেন? শেখ মুজিব এ প্রসঙ্গে বলেন, স্বাধীনতা উত্তর বিগত ২৩ বছরে ২ হাজার টাকার লাইসেন্সের জন্য বাংলাদেশের মানুষের পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে হয়েছে। ছোট-খাট চাকুরীর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে হয়েছে। কোনোদিন তো বাঙালীরা তাতে আপত্তি করে নি। শেখ মুজিব বলেন, আমিও আইন পরিদের সদস্য থাকাকালীন ৩মাস করাচীতে অবস্থান করেছি। কিন্তু কোনোদিন বলি নি, পশ্চিম পাকিস্তান কসাই-খানা।

ভুট্টোকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেন, ৮৩জন সদস্য নিয়ে আপনি যদি ঢাকা আসিতে না চান, ১৬০ জন সদস্য নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আমরাও যদি বলি, আমরাও পশ্চিম পাকিস্তানে যাব না, তখন কি হবে?[১৭৬]

লণ্ডনে বাঙালী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, লণ্ডন আওয়ামী লীগ ও মুক্তিফ্রন্ট, ২৮ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে দিবারাত্রি অবস্থান ধর্মঘট করে এবং পাকিস্তানের পতাকা ও ইয়াহিয়ার আলোকচিত্র পুড়িয়ে দেয়। তারা স্বাধীন বাংলার দাবীতে শ্লোগান দেয়।[১৭৭]

'ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি'
অবশেষে গুজব সত্যি হল

পয়লা মার্চ সোমবার দুপুর ১.০৫ মি:, রেডিও পাকিস্তানের সকল কেন্দ্র একযোগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি বিবৃতি প্রচার করে।

১৭৫ ইত্তেফাক, আজাদ, পয়লা মার্চ ১৯৭১
১৭৬ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, মার্চ ১৯৭১
১৭৭ ইত্তেফাক, ২মার্চ ১৯৭১

এতে প্রেসিডেন্ট বলেন, এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তিনি বলেন, আমি বারবার একথাই উল্লেখ করেছি, শাসনতন্ত্র কোনো সাধারণ আইন নয়, বরং এটা এক সঙ্গে বসবাস করার একটি চুক্তি মাত্র। কাজেই একটি সুস্থ ও স্থায়ী শাসনতন্ত্রের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশের পর্যাপ্ত অংশ গ্রহণের উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন।

৩মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় হওয়ার কথা ছিল। একই দিন এক সরকারী ঘোষণা বলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসানকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাঁর স্থলে খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে নিযুক্ত করা হয়। রেডিও পাকিস্তানের সর্বশেষ উর্দু সংবাদ বুলেটিনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। গভর্নর আহসান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে গুজব ছিল। তিনি প্রেসিডেন্টকে আপোষের কথা বলে ছিলেন।

নিযুক্ত হয়েই গভীর রাতে জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান সামরিক আইনের ১১০ নং ধারা বলে সংবাদপত্রে পাকিস্তানের সংহতি ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী কোনো সংবাদ, মতামত বা আলোকচিত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন। উক্ত আদেশের বরখেলাপের ক্ষেত্রে সামরিক বিধির ২৫ ধারা বলে সর্বাধিক ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করার কথা বলা হয়।

দেশের অন্যান্য প্রদেশেও এ পরিবর্তন ঘটলো। লে: জেনারেল আতিকুর রহমান পাঞ্জাবে, লে: জেনারেল রিয়াজ হোসেন বেলুচিস্তানে, লে: জেনারেল কে এম আজাহার হোসেন সীমান্ত প্রদেশে, লে: জেনারেল রাখমান গুল সিন্ধু বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান নিযুক্ত হন।[১৭৮]

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল দেশ আবার কঠোর সামরিক ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে এবং সামরিক আইন কঠোর করে ভেতরে ভেতরে কোনো গভীর প্রস্তুতি চলছে।

---

১৭৮ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, দোসরা মার্চ ১৯৭১

ঢাকা স্টেডিয়াম:
প্রথম রণভূমি

রেডিওতে যখন জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের স্থগিত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হচ্ছিল, তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তান ও বিশ্ব একাদশের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। পাকিস্তান ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড একাদশ তখন ৮ উইকেটে ৩০৬ রান সংগ্রহ করে। রেডিওতে খবর শোনার সাথে সাথে ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম সংগঠিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে স্টেডিয়ামের হাজার হাজার ক্রিকেট দর্শক। তারা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে – 'জয় বাংলা' বলে। একদল জাল টপকে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে ব্যাট, বল, স্ট্যাম্প, প্যাড ও ম্যাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। ধাওয়া করে পশ্চিম পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের। এবং শ্লোগান মুখরিত জঙ্গী মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে পড়ে।

স্টেডিয়ামের দর্শকদের এ জঙ্গী মিছিল শহরে প্রদক্ষিণ করাকালীনই ঢাকার কর্মব্যস্ত রাজপথের মানুষজন প্রথম শোনতে পায় অধিবেশন স্থগিত হওয়ার সংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে মিছিলে নেমে পড়ে। অফিস – আদালত আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানার কর্মজীবী, কর্মচারী, ছাত্র, শ্রমিক, আদালতের আইজীবীগণ যে যেখানে ছিলেন, সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। রাজধানীর টাউন সার্ভিসের বাসগুলোও হটাৎ করে থেমে যায়। লাঠি হাতে বজ্র কন্ঠে মানুষ গগনবিদারী শ্লোগান তুলে রাজপথ প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের খবর শুনে পি আই এর কর্মচারীরা জনসাধারণের সাথে রাস্তায় নেমে পড়ে। জগন্নাথ কলেজ ও পার্শ্ববর্তী কায়দে আযম কলেজের ছাত্ররা বাঁশ-লাঠি নিয়ে সশস্ত্র হয়ে রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। আদমজী মিলের শ্রমিকরা সকল চাকা বন্ধ করে শোভাযাত্রা সহকারে রাস্তায় বেরিয়ে আসে।[১৭৯]

'কি করিতে হইবে'

মিছিলকারীরা এসময় বঙ্গবন্ধু কোথায় আছে এখবর জানতে চায়। বঙ্গবন্ধু এ সময় হোটেল পূর্বানীতে ছিলেন। এখানে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। মিছিলের ঢল নামে হোটেল পূর্বানী অভিমুখে।

১৭৯ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, দোসরা মার্চ ১৯৭১

লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়ে মতিঝিলের হোটেল পূর্বাণীর চত্বর প্রকম্পিত হতে থাকে। সকলেই বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী নির্দেশ 'কি করিতে হইবে' শোনার জন্য উৎকন্ঠার সাথে অপেক্ষা করতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু জনাকীর্ণ শত শত সাংবাদিকদের সামনে বলেন, তিনি এক্ষুণি চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি মাওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, আতাউর রহমান খান, নূরুল আমীন ও অন্যান্য নেতার সাথে আলোচনা করবেন।

তবে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত তেজোদীপ্ত ভঙ্গিতে বলেন, অধিবেশন স্থগিত হওয়ার বিষয়টি তিনি বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দিতে পারেন না। শেখ মুজিব বলেন, আগামী ৭ মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচী ঘোষণা করবেন।

২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ বুধবার সারা দেশে হরতাল পালিত হবে। বঙ্গবন্ধু পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচ ও সীমান্ত প্রদেশের মানুষকেও সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানান।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, যাঁর পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা বিষয়টি দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রেরই ফসল। বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি চেয়েছিলেন ১৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হোক, সংখ্যালঘু ভুট্টো চেয়েছিলেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে। ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথাই রাখলেন। আবারও ভুট্টো অধিবেশন বর্জনের হুমকি দিল। প্রেসিডেন্ট তার কথা মতোই অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। তিনি বলেন, শাসক গোষ্ঠী সংখ্যাগুরু দলের উপর সংখ্যালঘু দলের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রের পরিপন্থী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

পাকিস্তানী রাজনীতিতে ভুট্টোর 'না করার ইতিহাস' বর্ণনা করে বাংলার নেতা বলেন, যখন গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়েছিল, জনাব ভুট্টো তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি নির্বাচন পিছানোর দাবী তোলেন এবং এখন পরিষদ অধিবেশন স্থগিত না করলে ঢাকা না আসার বায়না ধরেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, এ বে-ইনসাফীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে। তাঁর পরিণতি যা-ই হোক না কেন। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র যদি আরো চলে, তাহলে বাংলাদেশ নিজ প্রশ্নের মীমাংসা করে নেবে।

বঙ্গবন্ধুকে সাংবাদিকরা জানায়, জনগণ তো রাস্তায় নেমে পড়েছে, তিনি তাদের কি বলবেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি জনতাকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে বলবো। 'যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতির' কথা বঙ্গবন্ধু পরপর দু'বার এই উত্তেজনাপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চারণ করেন।[১৮০]

ঢাকা পরিণত হল মিছিলের নগরীতে

এরই মধ্যে শহরের বিভিন্ন অলিগলি পথ থেকে শত শত মিছিল পল্টন ময়দানে স্বত:স্ফূর্তভাবে এসে জমায়েত হয়। স্বত:স্ফূর্ত জনসমাবেশ, জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এখানে এ সময় ছাত্রলীগ পরিচালিত একসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন সাবেক ছাত্রনেতা ও নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য তোফায়েল আহমদ। তিনি বলেন, আর ৬ দফা, ১১ দফা নয়, এবার বাংলার মানুষের ১ দফার সংগ্রাম শুরু করবে। আর এ ১ দফা হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব।

সমাবেশে উপস্থিত প্রতিটি মানুষের হাতেই ছিল বাঁশের লাঠি ও লোহার রড়। জনতা এসব সর্বক্ষণ উর্দ্ধে উঁচিয়ে রাখে। এখানে আরো বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, ডাকসু নেতা আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন, শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান ও সিরাজুল আলম খান।

বায়তুল মোকাররমের কাছে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) সমাবেশ। সমাবেশের পর বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কর্মীরা শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

গুলিস্তান কামানের উপর দাঁড়িয়ে এক স্বত:স্ফূর্ত সমাবেশে বক্তৃতা করেন অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়া চৌধুরী। তিনি বলেন, বাঙালী গণতন্ত্র চেয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী তা দেয়নি। বাঙালীরা এবার তাদের দেশের সর্বভৌমত্ব ঘোষণা করবে।

পূর্ব বাংলা ছাত্র শক্তির ভারপ্রাপ্ত সম্মাদক কে এ মতিন এর প্রতিবাদে দলমত নির্বিশেষে সকলকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান।

১৮০ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, দোসরা মার্চ, ১৯৭১

ঢাকা বারের আইনজীবীরা মিছিল নিয়ে বায়তুল মোকাররমে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। শাহ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার পর আইনজীবীরা মিছিল নিয়ে শহরে বেরিয়ে পড়ে।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সম্পদকমণ্ডলী পাড়ায়-মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার জন্য নির্দেশ পাঠায়।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হায়দার আনোয়ার খান জুনো ও সাধারণ সম্পদক আতিকুর রহমান সালু এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার নিন্দা করেন।

বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি আল মুজাহিদী ও সাধারণ সম্পদক মোশাররফ হোসেন এক বিবৃতিতে এ ঘটনাকে গণতন্ত্র বিরোধী বলে উল্লেখ করেন।

পিডিপি প্রধান ও জাতীয় পরিষদ সদস্য নুরুল আমিন বলেন, প্রেসিডেন্টের ঘোষণা শুনে 'তিনি হতবাক হইয়া গিয়াছেন'। পাকিস্তান জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান বলেন, 'তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছেন'।

জামায়াতে ইসলামের প্রাদেশিক নেতা গোলাম আজম বলেন,'ইহা দুর্ভাগ্যজনক'। জাতীয় গণমুক্তি দলের সাধারণ সম্পাদক কালিদাস বৈদ্য বলেন, 'ইহা গণতন্ত্র হত্যার সামিল'।

ওয়ালী ন্যাপের একটি বিক্ষোভ মিছিল সৈয়দ আলতাফ, আবদুল হালিম, মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে নবাবপুর হয়ে শহীদ মিনারে শেষ হয়।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও হল থেকে একযোগে বেরিয়ে এসে জনসমুদ্রে মিলিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এবং জগন্নাথ কলেজের নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[১৮১]

পয়লা মার্চের ঢাকার রোমাঞ্চকর অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন দু'জন তৎকালীন ছাত্র নেতা। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নূরুল ইসলাম ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী।

১৮১ সাক্ষাৎকার: আব্দুল কুদ্দুস মাখন (ছাত্রলীগ নেতা ও সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু, ১৯৭০-৭২), নুরুল ইসলাম (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৭০-৭২) এবং ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, দোসরা মার্চ ১৯৭১

নূরুল ইসলাম বলেন, 'আমি, সামসুদ্দোহা এবং হাসনাত দুপুরের দিকে আসছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, পুরানা পল্টনের দিকে। পথেই আমরা শুনতে পাই অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেছে। ফলে একটা প্রতিবাদ সভার প্রস্তুতি নেই। আমরা ভাবছিলাম বিকেলের দিকেই এটা করবো। সাধারণভাবে এ সময়ই সভা-সমাবেশ হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ ছুটছে। রাজপথে মানুষের ঢল নেমেছে। প্রতিবাদী জনতা হাতে লাঠি ও অন্যান্য হাতিয়ার তুলে নিয়েছে। ফলে বিকেলে প্রতিবাদ সমাবেশের চিন্তা বাদ দিতে হল, তখনি নেমে পড়লাম মিছিল নিয়ে।

রাজপথে এই প্রথম প্রকাশ্য শ্লোগান হল 'স্বাধীনতার'।এর আগে অনেকে, অনেক-ভাবে স্বাধীনতার কথা বলেছেন, আমাদের থেকেও ঘোষণা করা হয়েছিল, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ শহীদ মিনার সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সামসুদ্দোহা বলে-ছিলেন, দোসরা মার্চ সংসদ না বসলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। কিন্তু এই প্রথম রাজ-পথে,প্রকাশ্যে, স্বত:স্ফূর্তভাবে জনগণ স্বাধীনতার শ্লোগান আপনা-আপনিই তুলে নিল, 'ইয়াহিয়ার ঘোষণা: বাঙালীরা মানেনা', 'পাকিস্তানের পতাকা' জ্বালিয়ে দাও-পুড়িয়ে দাও: 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর: বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'জিন্নাহ মিয়ার পাকি-স্তান-আজিমপুরের গোরস্থান' ইত্যাদি শ্লোগান তুলে জনতা এগিয়ে যায়।[১৮২]

নূরে আলম সিদ্দিকী এদিনের কথা স্মরণ করে বলেন, 'আমি কি কাজে যেন আওয়ামী লীগ অফিসের কাছাকাছি এসেছিলাম। বায়তুল মোকাররমের দিকে এগিয়ে আসতেই দেখি জনতা শ্লোগানে মুখর ... উত্তাল তরঙ্গের বুকে মিলে যাওয়া উর্মির মত আমিও মিছিলে মিশে গেলাম। ...এর মাঝে পথে জনতা পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে ফেলেছে, রাস্তা-ঘাটে স্বত:স্ফূর্ত হরতাল আর জনতার দৃপ্ত পদচারণা। পূর্বাণীর সম্মুখে কেবলই ভীড় বাড়তে লাগল। জনতা ভীষণ উত্তেজিত। জনাব তোফায়েল ও আমি একটি মাইক দিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে খণ্ড বক্তৃতা করছিলাম। মাখন শ্লোগান দিচ্ছিল। এর মাঝে নেতা (বঙ্গবন্ধু-লেখক) এসে গেলেন। ...

বঙ্গবন্ধু বসে আলাপ করতে বললেন। আমরা সাবেক চারজন – জনাব মনিভাই, রাজ্জাক ভাই ও তোফায়েল সাহেব বসে আলাপ আলোচনা করছি, এমন সময় ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আসলেন। তাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা হল কিন্তু ঐক্যমতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না। ...ছাত্রলীগের পক্ষ হতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ নিয়ে পল্টনে আসলাম।'[১৮৩]

১৮২ সাক্ষাৎকার : নূরুল ইসলাম

১৮৩ নূরে আলম সিদ্দিকী, 'পহেলা মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ', বাংলারবাণী, বাংলাদেশে গণহত্যা (বিশেষ সংখ্যা), ১৯৭২

প্রকৃতপক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিকালে মার্চের প্রথম থেকেই একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, জনগণের চেতনা, নেতাদের ভাবনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নূরে আলম সিদ্দিকীও ২৫ মার্চের রাতের একটি দৃশ্যের কথা স্মরণ করে এরকম একটি অভিব্যক্তি করে বলেন যে, ২৫ মার্চ রাতে দশটার দিকে জহুরুল হক হলের দিকে এগিয়ে যেতে দেখি জঙ্গী জনতা নিউমার্কেটের দিকে ব্যারিকেড দিতে শুরু করেছে।[১৮৪]

একজন প্রাক্তন কমিউনিস্ট নেতা অমল সেন বলেন, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের পার্টি ও নেতৃত্বের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক আগে থেকেই। কিন্তু তখনও (ষাটের দশকের প্রথমে) ভাবিনি এটা নিয়ে কাজ করার কথা। জনগণই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। তারাই স্বাধীনতার চেতনা গ্রহণ করে এবং স্বত:স্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে।[১৮৫]

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী হওয়ার সংবাদ নারায়ণগঞ্জ এসে পৌঁছলে সারা শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা তোলারাম কলেজ প্রাঙ্গণে এসে হাজির হয়। এখানে এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজ সংসদের সহসভাপতি মো: ফয়েজুর রহমান। সভায় ঢাকা জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন চুন্নু, ছাত্র ইউনিয়ন শহর শাখার সাবেক সভাপতি আজহারুল হক খোকা, ঢাকা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মো: সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্মাদক আবদুস সাত্তার, কলেজ সংসদের সাধারণ সম্মাদক মো: শাহজাহান বক্তৃতা করেন।

চট্টগ্রামে আওয়াম লীগ, ছাত্রলীগ, ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মৌলভীবাজারে ভবেন্দ্রনারায়ণের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেটে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়ন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দেয়।

বরিশালে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উদ্যোগেই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।[১৮৬]

পয়লা মার্চ পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিতে অনেক সদস্য ঢাকায় এসে পৌঁছান। এর মধ্যে ভুট্টোর পিপলস পার্টির ৩ জন প্রভাবশালী সদস্য এজাজ আলী তালপুর, মোমতাজ আলী ভুট্টো এবং মীর রসুল বকস তালপুরও এসে পৌঁছান।

---

১৮৪ নূরে আলম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত
১৮৫ সাক্ষাৎকার: অমল সেন (তিনি বর্তমানে ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাথে যুক্ত আছেন)
১৮৬ সংবাদ, দোসরা মার্চ ১৯৭১

কাউন্সিল মুসলীম লীগ, ন্যাপ ওয়ালী, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (হাজারভী), স্বতন্ত্র সদস্যদের অনেকে এবং মাওলানা শাহ্ আহমদ নূরানী ও মেজর জেনারেল দার ঢাকা এসে পৌছেন।

দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করতে আসেন আতাউর রহমান খান ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ।

মাওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করার জন্য বঙ্গবন্ধু এদিন তাঁর একজন দূতকে পাঠান।[১৮৭] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের এই সংকটকালে মাওলানা ভাসানী সন্তোষ ছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা অধিবেশনে যোগ দিতে আসা সকল জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

একমাত্র মুসলীম লীগ (কাইউম গ্রুপের) খান আবদুল কাইউম খান খুশী হয়ে ইয়াহিয়ার কাছে অভিনন্দন বার্তা পাঠান। কিন্তু তাঁর দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক খান এ সবুর দলের সভাপতির আচরণের নিন্দা করে দল থেকে পদত্যাগ করেন। এর আগের দিন ভুট্টোকে মুজিবরের সাথে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে সবুর খান বিবৃতি দিয়েছিলেন।

জুলফিকার আলী ভুট্টো কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলেন, সর্তকতার সাথে তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

দোসরা মার্চের ঢাকা:
কারফিউ ভঙ্গ এবং হরতাল

দোসরা মার্চ ঢাকা শহরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় শ্রমিক লীগ, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, কৃষক সমিতি সহ প্রভৃতি সংগঠনের যুগপৎ ডাকে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। প্রচার ছাড়াই এ হরতাল পূর্ণভাবে সফল হয়।

হরতাল চলাকালীন সময়ে একশ্রেণীর দুস্কৃতকারী শহরে লুটতরাজের রাজত্ব কায়েম করে। বিভিন্ন দোকান পাটে এরা আগুন ধরিয়ে দেয় এবং মালামাল লুটপাট করে। ঢাকা শহরে অবস্থিত অবাঙালীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি এর প্রধান শিকার হয়।

---

১৮৭ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, দোসরা মার্চ ১৯৭১

কিন্তু শহরের রাজনীতি সচেতন জনগণ এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। বিশেষ করে ছাত্রদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুষ্কৃতকারীরা নবাবপুর রোড, জিন্নাহ এভিনিউ প্রভৃতি জায়গা থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

এ দিন রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্র থেকে হটাৎ করে শহরে ১০ঘন্টা ব্যাপী কার-ফিউ জারীর ঘোষণা আসে।এই ঘোষনা প্রচারের সাথে সাথে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন স্তিমিত হয়ে আসলেও রাত ৮টার অব্যবহিত পরেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গগণবিদারী শ্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে। রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভকারীরা কারফিউ ভঙ্গকরে মিছিল বের করে এবং শ্লোগান দেয়।

মালিবাগ, শান্তিনগর প্রভৃতি এলাকায় কারফিউ ভঙ্গ করে বিরাট বিরাট মিছিল বের হয় এবং মিছিলে গুলি বর্ষণের আওয়াজ শোনা যায়। প্রকৌশল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের ছাত্ররা ও বস্তীবাসী মিলে মিছিল করতে করতে শ্লোগান দিয়ে নীলক্ষেত, বাবুপুরা, নিউমার্কেট প্রভৃতি এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এক পর্যায়ে এ মিছিলগুলির উপর টহলদার বাহিনী গুলী ছোড়ে।

নবাবপুর থেকে সদরঘাট পর্যন্ত এলাকার পুরনো ঢাকার মহল্লায় গভীর রাতে শ্লোগানের আওয়াজে শহর প্রকম্পিত হয়ে উঠে। ছাত্ররা সন্ধ্যা থেকেই রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। রাত প্রায় পৌনে ১২টায় প্রকৌশল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রাবাসগুলির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পুরো এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়।

এমন করে সারা রাতই শহরে গুলী চলে। গুলীবিদ্ধ অবস্থায় সন্ত্রস্ত মানুষ পত্রিকা অফিসগুলোতে আহতদের পৌঁছে দিতে থাকে। ইত্তেফাক অফিসে বুলেটবিদ্ধ ২ জনকে, দৈনিক পাকিস্তান কার্যালয়ে স্টেডিয়াম এলাকায় কারফিউ ভঙ্গকালে গুলিবিদ্ধ ৩জনকে, মর্নিং নিউজে ২জনকে, সংবাদ অফিসে ২জন, ভজহরি সাহা স্ট্রীটে ৬ জনকে আহত অবস্থায় মিছিলকারীরা রেখে যায়। আহত আরো ২৫ ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খুব কম সংখ্যক লোকই কারফিউ অবস্থায় হাসপাতালে যেতে সক্ষম হয়।[১৮৮]

---

১৮৮ আজাদ, সংবাদ, ৩ মার্চ ১৯৭১

'বাঙালীরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হতে চায়'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এদিন সংবাদপত্রে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে গুলী বর্ষণে কমপক্ষে ২জন নিহত হওয়ার দাবী করে এর নিন্দা করেন।

তিনি বলেন, যারা শক্তির দ্বারা জনগণের মোকাবেলা করতে চান, তাদের এ ধরণের বেপরোয়া পথ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তাদের মনে রাখা উচিৎ যে, নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলী বর্ষণ গণহত্যার সামিল। তাদের জানা উচিৎ, বাংলাদেশে আজ যদি আগুন জ্বলে তবে তারা কেউই এর শিখা এড়াতে পারবেন না।

বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, সমগ্র বাংলাদেশ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাঙালীরা আর নির্যাতীত হতে রাজী নয় এবং তারা একটি 'স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক' হতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

তিনি বলেন, দেশের এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে সরকারী কর্মচারীসহ সকল শ্রেণীর বাঙালীর পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে গণবিরোধী শক্তিকে কোনো প্রকার সহযোগিতা না করা। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন, বেতার, টিভি অথবা সংবাদপত্রগুলি ঘটনাবলী বর্ণনা প্রকাশ অথবা আমাদের বিবৃতি প্রকাশ করতে না পারলে এই সকল সংস্থায় কর্মরত প্রত্যেক বাঙালীর ৭কোটি বাঙালীর কন্ঠরোধের কার্যক্রমের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করা উচিৎ। বঙ্গবন্ধু বাতিলকৃত ৩ মার্চ অধিবেশনকে স্মরণ করে একে শোক দিবস হিসেবে পালন করার আহবান জানান।[১৮৯]

স্বাধীনতার প্রস্তাব ও স্বাধীন পতাকা

বঙ্গবন্ধু পয়লা মার্চ রাতে প্রদত্ত বিবৃতিতে (যা দোসরা মার্চের সংবাদপত্রে ছাপা হয়) একদিকে যেমন বাঙালীদের 'স্বাধীন দেশ'-এর আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেন, তেমনি ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে ডেকে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে বলেন।

---

১৮৯ আজাদ, সংবাদ, ৩মার্চ ১৯৭১

নেতার নির্দেশ পেয়ে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন এই চার নেতা মিলে এক বৈঠকে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। পয়লা মার্চ বিকেল ৩.০০ মিনিটেই এটি গঠিত হয়।

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সর্বদলীয় হতে পারতো কিন্তু ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটি অংশ অন্য সংগঠনগুলিকে নিতে আপত্তি করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন পয়লা মার্চই প্রদেশের সকল গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল সংগঠনগুলির সমন্বয়ে গঠিত পূর্বের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সক্রিয় করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ছাত্রলীগ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। তারা নিজেরাই শুধু ছাত্রলীগ ও ডাকসুকে নিয়ে (ডাকসুতে ছাত্রলীগই তখন ক্ষমতায় ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ছাত্রইউনিয়ন সভাপতির মতে, 'ছাত্র লীগ মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি মহান সংগ্রামের প্রাক্কালেও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়।'[১৯০]

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন একজন ছাত্রলীগ নেতা বলেন, প্রকৃতপক্ষে অবস্থাটা তখন এমনি ছিল যে এ নিয়ে আলাপ-আলাচনার সুযোগ ও সময় কারোরই ছিল না। শুধু ছাত্রলীগ নামে আন্দোলনের ডাক দিলে আবেদনে সর্বজনীন সাড়া পাওয়া যেত না। আবার ছাত্রলীগকে বাদ দিয়ে অন্যরা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নামে আন্দোলন চালাতে পারে, এসব ভেবেই শুধু ছাত্রলীগ ও ডাকসু মিলে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[১৯১]

কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন সম্পর্কে ছাত্রলীগ-ছাত্রইউনিয়ন যে পয়লা মার্চ একটি বৈঠক, উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও, হোটেল পূর্বাণীতে করেছিলেন তার স্বীকৃতি রয়েছে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর জবানীতে। তিনি ১৯৭২ সালে এ সম্পর্কে বলেছেন, হোটেল পূর্বাণীতে ছাত্রইউনিয়ন নেতারা এসেছিলেন এবং তাঁদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়, কিন্তু ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি।[১৯২]

---

১৯০ সাক্ষাৎকার : নূরুল ইসলাম
১৯১ সাক্ষাৎকার : আব্দুল কুদ্দুস মাখন
১৯২ নূরে আলম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত

পয়লা মার্চ রাতেই ইকবাল হলে (বর্তমান জহরুল হক হলে) ছাত্রলীগের প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃবৃন্দের একটি যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সভাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ এবং বর্তমান নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ.স.ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। এটি ছিল ৮ নেতার ঐতিহাসিক বৈঠক।

এই সভায় প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতের কাঠামো ও রূপের বিশদ আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় আগামীকাল দোসরা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রলীগের সভায় 'স্বাধীনতার প্রস্তাব' পাঠ করা হবে। এটি পড়ে শোনানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় দপ্তর সম্পাদক এম. এ রশীদকে।[১৯৩]

পরদিন দোসরা মার্চ বটতলায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে লাখো ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সাবেক ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ, আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজ, শেখ শহিদুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বেলা ১২-৪৫ মিনিটে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাঠ করেন পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রনেতা এম. এ. রশীদ।[১৯৪]

এ দিনের সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার কোনো পতাকা উত্তোলন করা হয় নি। ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রব এদিনের সভাতেই স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন বলে দাবী করে থাকেন। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকারী বলে থাকেন। রব নিজেও তাই দাবী করেন। কিন্তু আ.স.ম রব তাঁর প্রথম রাজনৈতিক জীবনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেন, ৬ দফাতেও বিশ্বাস করতেন না। তিনি প্রথমে ছিলেন ৬ দফা বিরোধী পি. ডি. এম পন্থী আওয়ামী লীগের সমর্থক ও পাকিস্তানের নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের শিষ্য। ১৯৩৯ সালে আ.স.ম রব নোয়াখালীতে নসরুল্লাহকে নিয়ে সভা করতে গিয়ে ৬ দফা পন্থীদের হাতে লাঞ্ছিত হন।[১৯৪ক]

ছাত্রনেতা মাখন এক সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে বলেন, প্রকৃতপক্ষে এদিনের সভায় যা ঘটেছিল, তা হচ্ছে, লাখো ছাত্র-জনতার এই বিশাল সমাবেশ চলাকালীন সময়ে একটি জঙ্গী মিছিল নিউমার্কেটের কাছে ছাত্রলীগ কার্যালয় বলাকা ভবন থেকে আসে। এদের হাতে ছিল একটি পতাকা। পতাকাটি একজন অবাঙালী দর্জিকে দিয়ে তৈরী করা হয়। নিউমার্কেটের 'এপোলো' নামে একটি দোকান থেকে কাপড় কেনা হয়েছিল এবং 'পাক ফ্যাসান' নামে দর্জির দোকানে তা সেলাই করা হয়।

১৯৩ সাক্ষাৎকার: আবদুল কুদ্দুস মাখন
১৯৪ ঐ
১৯৪ক সাপ্তাহিক চিত্রবাংলা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

পতাকার ডিজাইন করেন শিল্পী শিব নারায়ণ দাশ।[১৯৫] পতাকাবাহী মিছিলটি এক পর্যায়ে শ্লোগান দিতে দিতে মঞ্চের প্রায় কাছে চলে আসে। মঞ্চের নীচে এ সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা নজরুল ইসলাম (তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজ ও পরে ফজলুল হক হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছে প্রত্যক্ষ সম্মুখ সমরে লড়াই করে তিনি শহীদ হন—লেখক)। নজরুল ইসলাম একটি বড় বাঁশের মাথায় এমন একটি সুন্দর পতাকা দেখে উড়ানোর জন্য মঞ্চের কাছে নিয়ে এসে নেতৃবৃন্দকে সোৎসাহে ডাকতে থাকেন। আ.স.ম. আবদুর রব এগিয়ে গিয়ে নজরুল ইসলাম থেকে পতাকাটি[১৯৬] মঞ্চে তুলে আনেন মাত্র।

ঘটনাটি ছোট্ট কিন্তু লাখো-জনতা এ প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা দেখে পরম উৎসাহে হাততালি ও মুহুর্মুহূ ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। স্বাধীন বাংলাদেশের এই প্রথম পতাকা, সত্য, সুন্দর, বিজয় নিশান, উপস্থিত লাখো মানুষকে সংগ্রামের মন্ত্রে পাগল করে তোলে।

ছাত্রনেতা মাখনের বক্তব্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়, ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর একটি লেখায়। যুদ্ধ সমাপ্তির মাত্র অল্প কয়েক দিন পর ১৯৭২ সালে জনাব সিদ্দিকী এ সম্পর্কে লিখেন:

'ঐদিন (দোসরা মার্চ -লেখক) স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়। অবশ্য ঐ সভার সভাপতি হিসাবে একটা কথা অবশ্যই আমি স্বীকার করবো ঐ পতাকা তোলার কোন পূর্ব পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের '১৫ ফেব্রুয়ারী বাহিনী'র (সার্জেন্ট জহুরুল হক, ১৫ ফেব্রুয়ারী শাহাদৎ বরণ করেন, তাঁর স্মরণে ছাত্রলীগের এ বাহিনী গড়ে উঠেছিল—লেখক) রেজিমেন্টাল পতাকা ঘাড়ে করে একটি জঙ্গী মিছিল নামে। এদিকে একটার পর একটা পাকিস্তানের পতাকা পুড়ছিল সভার জন সমুদ্রে। হঠাৎ সভা হতে দাবী উঠল ঐটাই বাংলাদেশের পতাকা, ওটাকে উড়িয়ে দাও।

আমি মিছিলকারীর হাত হতে পতাকাটি নিলাম, জনতা প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি দিল এবং সভা পরিচালনার জন্যে যখন মাইকের কাছে যেতে হ'ল তখন পতাকাটি জনাব রবের হাতে দিয়েছিলাম, পরবর্তীকালে এটাই বাংলাদেশের পতাকা হয়েছে।[১৯৭] ঐ

---

১৯৫ সাক্ষাৎকার : রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (তিনি বর্তমানে তথ্য অধিদপ্তরের একজন উপপ্রধান তথ্য অফিসার

১৯৬ বর্তমান জাতীয় পতাকার লাল গোলাকার অংশের মাঝখানে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র আঁকা ছিল এই পতাকাটিতে

১৯৭ নূরে আলম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত

পতাকা আমরা চারজনে ২৩ মার্চ পল্টনে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করি এবং ছাত্রলীগ বাহিনী তাকে সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।'[১৯৮]

ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতা কাজী আরেফ আহমেদ (বর্তমানে জাসদ ইনু গ্রুপের সভাপতি) জানিয়েছেন, স্বাধীন বাংলার পতাকা তৈরীর ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সরাসরি জড়িত। তিনি বলেন, ১৯৭০ সালের জুন 'জয়বাংলা বাহিনী'র প্রধান আ. স. ম রবের হাতে তিনি এ পতাকা তুলে দেন। রব হাটু গেড়ে পল্টন ময়দানে তা বঙ্গবন্ধু থেকে গ্রহণ করেন। কাজী আরেফ বলেন, ২ মার্চ (১৯৭১)-এ প্রকৃতপক্ষে পতাকা উত্তোলন করা হয়নি, হয়েছে পতাকা প্রদর্শন।[১৯৮ক]

সুতরাং আনুষ্ঠানিকভাবে সেদিন এ পতাকা তোলা হয় নি, তোলার সিদ্ধান্তও ছিল না। কিন্তু বিপ্লব ও সংগ্রাম এমনি সৃজনশীল শিল্প যা তারিখ, সময় ধরে অনেক সময়ই চলে না। বাংলাদেশের মানুষের প্রাণপ্রিয় পতাকা তৈরী ও উত্তোলনের ইতিহাসও তারই স্মৃতিবাহী।

আবার ঠকিতে হইবে

দোসরা মার্চ পল্টন ময়দানে ন্যাপ ও ছাত্রইউনিয়নের উদ্যোগে একক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ঐক্য ও শৃঙ্খলার উপর জোর দিয়ে বলেন, এই মুহূর্তে সামান্য ভেদাভেদ ও পদস্খলন গণসংগ্রামকে বিভ্রান্ত করবে। তিনি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে পাড়া-মহল্লায় সংগ্রাম কমিটি গঠনের কথা বলেন। মোজাফফর একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষকগোষ্ঠী সম্পর্কেও সচেতন থাকার ও তাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম পরিচালনার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, অন্যথায় শোষণ বন্ধ হবে না। 'আবার ঠকিতে হইবে'।

মহিউদ্দিন আহমদ উপস্থিত লাখো জনতাকে একটি সংবাদ দিয়ে সতর্ক করে দেন, ইন্দোনেশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সহযোগী হোতা মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যাণ্ড এখন ঢাকায়। (ইন্দোনেশিয়ার হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নাগরিককে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া ছিল বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ফারল্যাণ্ড এরপর নজর দেন দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ পাকিস্তানে—লেখক)।

মতিয়া চৌধুরী জনগণকে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, এবারের সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, এরাই এখানকার শোষকদের নাটের গুরু। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সংগ্রাম করে মুরগী এনে তা যেন বাঘের মুখে না যায়।

১৯৮ নূরে আলম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত
১৯৮ক সাক্ষাৎকার : কাজী আরেফ আহমেদ, দৈনিক আজাদী (চট্টগ্রাম), ৮ মার্চ, ১৯৯০

ছাত্রইউনিয়ন নেতা নুরুল ইসলাম বলেন, আজ আর আপোষ নেই। তিনি সংগ্রামে সকলকে এক হওয়ার আহ্বান জানান।

জনসভায় আবদুল হালিম, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিকসহ অন্যান্যরাও বক্তৃতা করেন।[১৯৯]

সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে

এয়ার মার্শাল (অব:) নূর খান এক বিবৃতিতে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতকে নিন্দা করে বলেন, সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। এখনি সত্ত্বর যদি কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয় তবে সেখানকার মানুষ এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যা আর ফিরান যাবে না।

অথচ এতোকিছুর সংবাদ পেয়েও এদিন ভুট্টো বলেন, অধিবেশন স্থগিত করায় এমন ক্ষতি হয় নি।

বায়তুল মোকাররমে জাতীয় লীগের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করেন আতাউর রহমান খান, আমেনা বেগম, শাহ্ আজিজ, সাবেক ছাত্রনেতা ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী প্রমুখ। বক্তারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর জোর দিয়ে বলেন, পেছানোর আর উপায় নেই।

নবগঠিত ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকও এদিন বায়তুল মোকাররমে ছাত্রসভা করে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে জনগণকে আহ্বান করে।[২০০]

শেখ মুজিবের প্রতি সিরাজ শিকদারের খোলা চিঠি

দোসরা মার্চ পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নেতা সিরাজ সিকদার বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের উদ্দেশ্যে এক চাঞ্চল্যকর খোলা চিঠি প্রেরণ করেন। এতে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের রূপরেখা ও ধরণকে তুলে ধরে শেখ মুজিবের প্রতি নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান পরোক্ষভাবে তুলে ধরা হয়। খোলা চিঠিতে শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে বলা হয়:

'আপনার ও আপনার পার্টির ছয়-দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ছয়-দফার অর্থনৈতিক দাবীসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের

---

১৯৯ আজাদ, সংবাদ, তেসরা মার্চ ১৯৭১
২০০ ঐ

মাধ্যমে, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে। আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ব বাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করেছে পূর্ব বাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাঙালী শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষ-ণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।

পূর্ব বাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী পেশ করছে:....।

২ পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক, প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশ-প্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্মিলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন। প্রয়োজনবোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষদেশে স্থানান্তরিত করুন।

৩ পূর্ববাংলা ব্যাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সূচনার আহবান জানান। এ উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতমের ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহবান জানান।....

৬ পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে.....

খ পূর্ব বাংলার জাতীয় বিশ্বাঘাতকদের সকল নাগরিক অধিকার বাতিল করা। সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে শ্রমিক, কৃষক, দেশপ্রেমিকদের জাতীয় সরকার গঠন করা।

গ গ্রাম্য এলাকায় উপনিবেশিক সরকারের ভূমি শোষণের অবসান করা। সরকারী খাসভূমি এবং বিশ্বাসঘাতক জমিদার-জোতদার ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা। দেশপ্রেমিক জমিদার, জোতদারের পরিচালিত শোষণ হ্রাস করা।.....

৭ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদদের পূর্ববাংলাস্থ তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা।.....
পূর্ববাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে প্রমাণ করেছেন স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় তাদের নিকট আর কিছুই নেই।২০১

সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের এই খোলা চিঠির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তা শেখ মুজিবুরের প্রতি দেশপ্রেমিক প্রকাশ্য ও গোপন সকল দলগুলোর সমন্বয়ে অস্থায়ী সরকার ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করার প্রস্তাব। বিশ্বাসঘাতকদের নাগরিক অধিকার বাতিল এবং দেশপ্রেমিক ও বিশ্বাসঘাতক জোতদারের পার্থক্য নির্ণয় করার মধ্যেও এ দলটি তাদের মতাদর্শ তুলে একটি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির প্রস্তাব সেদিন দিতে সক্ষম হয়েছিল।

'নিষ্ঠুর তামাশা'

৩ মার্চ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় পাকিস্তানের নির্বাচিত রাজনৈতিক দলের নেতাদের একটি বৈঠক ডাকেন। এ জন্য সরকার আমন্ত্রিতদের যে তালিকা প্রকাশ করেন তাতে,

১ পাকিস্তান আওয়ামী লীগ-শেখ মুজিবুর রহমান
২ পাকিস্তান পিপলস পার্টি-জুলফিকার আলী ভুট্টো
৩ ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টি-খান আব্দুল ওয়ালী খান
৪ পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইউম)-খান আব্দুল কাইউম খান
৫ পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)-মিয়া মোমতাজ দৌলতানা
৬ পাকিস্তান মুসলিম লীগ(কনভেনশন) মোহাম্মদ জামান কোরিফা
৭ জমিয়াতুল উলেমা ই ইসলাম (হাজারভী)-মাওলানা মুফতী মাহমুদ
৮ জমিয়াতুল উলেমা ই পাকিস্তান-মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী
৯ জামায়েত ইসলামী,পাকিস্তান-আব্দুল গফুর আহমদ
১০ পাকিস্তান ডেমক্রেটিক পার্টি-নূরুল আমিন

প্রমুখের নাম প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই রাজনৈতিক সভাকে বন্দুকের নলের মাথায় 'নিষ্ঠুর তামাশা' বলে প্রত্যাখ্যান করেন।২০২

২০১ শেখ মুজিবের প্রতি সিরাজ সিকদারের খোলা চিঠির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেখুন পরিশিষ্টে
২০২ আজাদ, ইত্তেফাক, ৪ মার্চ ১৯৭১

দানবের সাথে লড়াইয়ে রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিব'

এদিন (৩ মার্চ) পল্টনে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের উদ্যোগে এক বিশাল জনসভা। বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এতে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। তিনি এদিন ভূট্টোর উদ্দেশ্যে বলেন, গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি না চান, তাহলে আপনাদের শাসনতন্ত্র আপনারা রচনা করুন, বাংলা দেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করব।

তিনি সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে বলেন।বঙ্গবন্ধু বলেন, বুকে গুলী করার জন্য জনগণের করের পয়সায় আপনারদের অস্ত্র কিনে দেওয়া হয় নি। শেখ মুজিব দাবী করেন, 'আমি নিজের কানে গতরাতে মেশিনগানের গুলীর আওয়াজ শুনেছি। গত দুইদিন বহুলোককে হত্যা করা হয়েছে'। তিনি বলেন, এ অস্ত্র ধারণ করা উচিৎ ছিল ভুট্টোর উপর। 'আমরা মরিবার জন্য প্রস্তুত। ভয় দেখাইয়া লাভ নাই'।

বঙ্গবন্ধু ব্যথাতুর কন্ঠে বলেন, আমি মরে গেলেও ৭কোটি মানুষ দেখবে দেশ সত্যিকারের স্বাধীন হয়েছে।

তিনি বলেন, হয়তো এটাই আমার শেষ ভাষণ। আমি যদি নাও থাকি আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। বাঙালীর স্বাধীনতার আন্দোলন যাতে না থামে।

তিনি অফিস-আদালতে যাওয়া এবং কর খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখতে বলেন। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে বিধি – নিষেধ আরোপ করলে তিনি তা লংঘন করার নিদের্শ দেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, দানবের সাথে লড়াইয়ে যে কোন পরিণতিকে মাথা পেতে বরণের জন্য আমরা প্রস্তুত। তেইশ বছর রক্ত দিয়ে এসেছি। 'প্রয়োজন বোধে বুকের রক্তে গঙ্গা বহাইয়া দিব'। তবু সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বাংলার বীর শহীদদের রক্তের সাথে বেঈমানী করব না।২০৩

নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বঙ্গবন্ধুকে বাংলার স্বাধীকার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। এতে বক্তৃতা করেন তোফায়েল

২০৩ আজাদ, ইত্তেফাক, ৪ মার্চ ১৯৭১

আহমদ, শ্রমিকনেতা আব্দুল মান্নান, ডাকসু নেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখন। আ. স. ম আব্দুর রব এদিন বক্তৃতা দিতে পারেন নি। তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু সভায় পৌঁছে যান।[২০৪]

ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী জানিয়েছেন, 'রব অজ্ঞাত কারণে বক্তৃতা করেন নি।'[২০৫]

বিপুল সংখ্যক নারীও এদিন লাঠি হাতে সমাবেশে যোগদান করে। ঢাকার আন্দোলনে এই প্রথম মেয়েরাও লাঠি ধরলো।

দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট করে সমাবেশের ঘোষণা ও প্রস্তাব পাঠ করেন ছাত্রলীগের দপতর সম্পাদক এম এ রশিদ। শাজাহান সিরাজ পরবর্তী ৪দিনের কর্মসূচী পড়ে শোনান। আজাদ রিপোর্ট করে কর্মসূচী, ঘোষণা ও প্রস্তাব পাঠ করেন শাজাহান সিরাজ।

ছাত্রলীগের সভায় স্বাধীনতার প্রস্তাব

ছাত্রলীগ আয়োজিত সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়:

১ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী শক্তির সেনাবাহিনীর এই জঘন্য হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা

২ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী আহত বাঙালী ভাইদের বাঁচানোর জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালী ভাইদের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত প্রদান

৩ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিকরাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ

৪ স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা

৫ এবং সভা দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নর-নারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানায়।[২০৬]

---

২০৪ সাক্ষাৎকার: আব্দুল কুদ্দুস মাখন
২০৫ নূরে আলম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত
২০৬ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৬

পল্টন ময়দানে এদিন যে ইশতেহার পাঠ করা হয়, তাতে ছাত্রলীগের প্রথম ইশতেহার স্মারক দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তা 'স্বাধীনতার ইশতেহার' নামে চিহ্নিত হয়:

১ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে

৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'।

ক পৃথিবীর বুকে বাঙ্গালীর সাহিত্য-সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা
খ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক রাজ-শ্রমিকরাজ কায়েম করা
গ বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম

২ বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে:

ক প্রতিটি অঞ্চলে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন
খ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা
গ মুক্তিবাহিনী গঠন
ঘ সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার
ঙ লুটতরাজ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ।

৩ স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা হবে নিম্নরূপ:

ক বর্তমান সরকারকে বিদেশী সরকার গণ্য করে এর সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা
খ অবাঙ্গালী সেনাবাহিনীকে শত্রুসৈন্য হিসেবে গণ্য এবং এদের খতম করা
গ এদের সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেওয়া বন্ধ
ঘ আক্রমণরত শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ
ঙ বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টি নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা
চ স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' ব্যবহৃত হবে

ছ পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন ও সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলা

জ পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার

ঝ স্বাধীনতা সংগ্রামরত বীরদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান।

৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক।[২০৭]

পল্টনের জনসভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার আনন্দে উদ্বেলিত মানুষ রাজপথে প্রথম প্রকাশ্য শ্লোগান ধরে, 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর: বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়: মুক্তি বাহিনী গঠন কর' ইত্যাদি।

পল্টনের জনসভায় ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল পালনেরও আহবান জানানো হয়।

৫ মার্চ বায়তুল মোকাররম থেকে লাঠি-মিছিল বের করারও কর্মসূচী ঘোষিত হয়।

তেসরা মার্চে সারাদেশে পূর্ণ হরতাল শেষে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও সিলেটে গোলযোগ হয়। ২০০ শতের বেশী আহত লোককে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। এদের ৯৯ ভাগ লোকের দেহেই বুলেটের আঘাত ছিল। ঢাকায় নিহতের সংখ্যা ৪৭ বলে দাবী করা হয়। সর্বমোট আহতের সংখ্যা ৩০০ শতেরও বেশী বলে সংবাদপত্রগুলি রিপোর্ট করে।

সারাদেশেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জওয়ানরা নির্বিচারে মানুষের উপর গুলি চালায়। কারফিউ ভঙ্গ ও শান্তি - শৃঙ্খলা রক্ষার নামে এদের উপর গুলী চালানো হয়। দুস্কৃতকারীদের লুটপাট, হাঙ্গামা প্রতিরোধ করতে গিয়েও ছুরিকাঘাত ও প্রাইভেট বন্দুকের গুলীতে আহত হয় অনেকে। স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে অনেক দুস্কৃতকারীও নিহত কিংবা আহত হয়।

কর্তব্যরত অবস্থায় বুড়িগঙ্গার নৌকার মাঝি আবুল কাসেম নিহত হলে বুড়িগঙ্গার মাঝিরা তাকে কালিগঞ্জে দাফন করে চরঘাটে তাৎক্ষণিক একটি শহীদ মিনার তৈরী করে।

---

২০৭ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৬-৬৭

রমজান আলী (৩৬) নামে এক যুবক ই. পি. আর (বর্তমান বি. ডি. আর)-এর হাতে আহত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে রক্তের অভাবে মারা যায়।

এদিন ঢাকায় শহীদদের কমপক্ষে ৮টি লাশ নিয়ে রাজপথে মিছিল হয় এবং শহীদ মিনারে লাশ ছুঁয়ে মানুষ প্রতিশোধ নেওয়ার শ্লোগান দেয়। জায়গায় জায়গায় রাস্তায় মানুষ বড় বড় গাছ ও ইট দিয়ে ব্যারিকেড রচনা করে।

মালিবাগের রাস্তা দিয়ে এ সময় নিজগৃহে যাওয়ার সময় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ মান্নান ও সংসদ সদস্য আশরাফ আলী চৌধুরীকে সেনাবাহিনী তাঁদের নিজ হাতে ব্যারিকেড ভাঙ্গার নির্দেশ দিলে তাঁর তা করতে অস্বীকার করেন। ফলে সেনাবাহিনী প্রকাশ্য রাজপথে তাঁদের প্রহার করলে এখানেও জনতার সাথে খণ্ডযুদ্ধ হয়।

এদিন চট্টগ্রামে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বাঙালীরা বিহারীদের উপর আক্রমণ করবে।

এমন গুজব ছড়িয়ে পড়লে শহরের সর্বত্র গোলযোগের সূত্রপাত হয় এবং দাঙ্গা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে মৃতের সংখ্যা ৭৫ বলে জানানো হয়। শত শত আহতকে হাসপাতালে ও ক্লিনিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।[২০৮]

রাজশাহীতে এদিন টেলিফোন অফিসের সামনে সামরিক বাহিনীর গুলীতে আহতদের স্থানীয় মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের বারান্দায় ফেলে রাখা হয়। এ সময় আহতদের কয়েকজন ব্যাংকের দেওয়ালে তাঁদের থেকে নি:সারিত রক্ত দিয়ে লেখেন 'বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'[২০৯]

রংপুর ও সিলেটের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কারফিউ জারী করে।

মাওলানা ভাসানী ঢাকা এসে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখে যাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে একটি জরুরী বার্তা প্রেরণ করেন।

---

২০৮ সাক্ষাৎকার: নুরুল ইসলাম, আব্দুল কুদ্দুস মাখন এবং আজাদ ইত্তেফাক, ৪ মার্চ ১৯৭১
২০৯ আজাদ ১৮ মার্চ ১৯৭১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪৮ জন শিক্ষক ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষার আহবান জানিয়ে এক যুক্ত বিবৃতি দেন। তাঁরা বলেন, একটি চক্র পূর্ব বাংলার শোষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবীকে নস্যাৎ করে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনের ২০ জন শিল্পী গণতন্ত্র বিরোধী গোষ্ঠীর নির্যাতন চালানোর প্রতিবাদে এসব গণমাধ্যমের অনুষ্ঠান থেকে নিজেদের বিরত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিবৃতি দেন।[২১০]

চৌঠা মার্চের বাংলাদেশ

এদিনেও ঢাকাসহ প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় পূর্ব দিনগুলোর তুলনায় শান্ত অবস্থা গেলেও চট্টগ্রামে গত দু''দিনে মিলে পরিস্থিতি আরো সংকটের দিকে চলে যায়। দু'দিনে চট্টগ্রামে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২১ জনে। খুলনায়ও এদিন গোলযোগ বিস্তার লাভ করে। এখানে ৩৩জন হতাহত হয়।

ঢাকায় এদিন আকস্মিকভাবে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয় ।আনন্দে মানুষ নির্ভিক চিত্তে রাস্তায় মিছিল নিয়ে নেমে পড়ে।

'পাকিস্তান অবজারভারে' গণবিরোধী ভূমিকার নিন্দা করে বিবৃতি দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫ জন শিক্ষক। এতে বলা হয়, এ পত্রিকাটির ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ভুমিকা ক্ষমার অযোগ্য। এতে স্বাক্ষর করেন প্রফেসর আবু মোহাম্মদ হাবিববুল্লাহ, প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ, প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, ড. খান সারোয়ার মুর্শিদ প্রমুখ।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৯ জন শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদালয় শিক্ষক সমিতি পৃথক পৃথক বিবৃতিতে সশস্ত্র বাহিনীর নির্দয় হত্যাযজ্ঞের নিন্দা করে বিবৃতি দেয়। তারা সকলেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা পোষণ করেন।

বেতার টেলিভিশন শিল্পীরা তাদের অনুষ্ঠানমালা বর্জন করে বিবৃতি দেন। এতে স্বাক্ষর করেন, আতিকুল হক, ফেরদৌসী রহমান, মোস্তফা জামান আব্বাসী, গোলাম

২১০ আজাদ,, ইত্তেফাক, ৪ মার্চ ১৯৭১

মোস্তফা, জাহেদুর রহিম, লায়লা হাসান, হামিদা আতিক, অজিত রায়, ওয়াহিদুল হক প্রমুখ।

ছাত্রলীগ ও ডাকসু পাড়ায় - মহল্লায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সংগ্রাম কমিটি গঠন করে আন্দোলনকে বেগমান করার আহবান জানিয়ে বিবৃতি দেয়।

ছাত্রলীগের ৪ নেতা অপর এক বিবৃতিতে প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা বন্ধ রাখার অনুরোধ করে এবং সম্ভব হলে যে সকল পরীক্ষা ইতোমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ভিত্তিতেই ফলাফল ঘোষণার আহবান জানায়।

ইকবাল হলের কেন্টিনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং এখানে আহত, নিহত এবং অন্যান্য সংবাদ ও তথ্য প্রেরণের আহবান জানানো হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ৪ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবিত নেতৃসম্মেলন প্রত্যাখ্যান করা হয়। বলা হয়, এ ধরনের সম্মেলন হতে দেওয়া হবে না।

প্রাক্তন ছাত্রইউনিয়ন নেত্রী মতিয়া চৌধুরী এ সমাবেশে বলেন, বাংলার মানুষ আজ ১ দফার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তিনি সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনেরও আহবান জানান। সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম অভিযোগ করেন, পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টোর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগসাজশ রয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন পূর্ব বাংলার মুক্তিপাগল জনতার সাথে একাত্বতা প্রকাশ করে প্রেসক্লাবে এক জরুরী সভা করে। সভায় বলা হয়, যদি সরকার সংবাদ প্রকাশে বিধি-নিষেধ তুলে না নেয় তাহলে তা লংঘন করা হবে।[২১১]

এ দিন খুলনায় শহর ও শহরতলী এলাকায় বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ঘটনা ঘটে। উন্মত্ত জনতা একটি বন্দুকের দোকান লুট করে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। এর আগে আওয়ামী

---

২১১ সাক্ষাৎকার : নূরুল ইসলাম, আব্দুল কুদ্দুস মাখন এবং আজাদ, ইত্তেফাক, ৫ মার্চ ১৯৭১

লীগ ও ছাত্রলীগের একটি মিছিলে সশস্ত্র বাহিনী গুলী ছুড়লে ঘটনা স্থলেই ৩ জন নিহত হয়।

খালিশপুরে ২০ হাজার মানুষের একটি দল মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ী থেকে মোহাম্মদ হোসেন নামে এক লোক মিছিলে বোমা মারে। পালানোর চেষ্টা করলে উত্তেজিত জনতা তাকে ধরে ফেলে এবং স্থানীয় চিত্রালী সিনেমা হলের কাছে একটি গাছে তার লাশ ঝুলিয়ে রাখে।[২১২]

কন্ঠে কন্ঠে ক্ষুব্ধ গর্জন

৫ মার্চ শুক্রবার, টঙ্গিতে সশস্ত্র বাহিনীর গুলীতে ২জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়। পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হায়দার আকবর খান রণো গুলীবর্ষণ করে অসংখ্য শ্রমিককে হত্যার নিন্দা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বহু লাশ গুম করে ফেলা হয়েছে। তিনি বিবৃতিতে বলেন, টঙ্গির শ্রমিক ও এলাকাবাসীগণ স্বাধিকার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে গিয়েই নিহত হয়েছেন।

এদিন মার্চের উত্তাল আন্দোলনের পঞ্চম দিবস এবং লাগাতার হরতালের চতুর্থ দিবস অতিবাহিত হয়। বিকেলে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগ লাঠি মিছিল বের করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে সমাবেশ করে। পাকিস্তান লেখক সংঘ দেশব্যাপী গণহত্যার প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেয়। প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ যৌথভাবে প্রতিবাদ মিছিল ও শোক মিছিল বের করে।

সাবেক রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী ও লেখক আবুল মনসুর আহমদ এক বিববৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের যে সকল সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তি খেতাব ও তমঘা পেয়েছে তাদের তা অবিলম্বে বর্জনের নির্দেশ দানের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহবান জানান।[২১৩]

প্রাণে প্রাণে সংগ্রামী শপথ

৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দুপুরে এক বেতার ভাষণে ঢাকায় পুনরায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে স্বীকার

২১২ ইত্তেফাক, ৫ মার্চ ১৯৭১
২১৩ আজাদ, ৬ মার্চ ১৯৭১

করেন, শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে একটা সাধারণ ঐক্যমতে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয় নি, তবে প্রেসিডেন্ট তাঁর অধিবেশন পেছানোর সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, পরিবেশ শাসনতন্ত্র রচনার উপযোগী ছিলনা।

প্রেসিডেন্টের ভাষণের পরপরই অওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। এতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যই এতে যোগদান করেন।

ঢাকার রাজপথ এদিন স্বাধিকারকামী জনতার দৃপ্ত পদচারণায় প্রকম্পিত হয়ে উঠে। কন্ঠে কন্ঠে ক্ষুব্ধ গর্জন ও প্রাণে প্রাণে সংগ্রামী শপথ নিয়ে বীর বাঙালী শহরের রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করে। পঞ্চম দিবসের মতো হরতাল পালিত হয়। উত্তেজিত জনতা চিৎকার করে বলতে থাকে ''রক্ত চাও রক্ত নেবে, তবু স্বাধিকার দিতেই হবে''। হরতালে রাজধানী ঢাকা শহর এদিন ছিল বক্তৃতা মুখর। মিছিল আর সমাবেশে পূর্ণ ছিল শহরের অলিগলি রাজপথ।

ছাত্রইউনিয়নের নিয়মিত শহীদ মিনার সমাবেশ এদিনও সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে ন্যাপ প্রাদেশিক প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, বাংলার মানুষ অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে শুধু শোষণমুক্ত বাংলার স্বাধিকার অর্জনের জন্য। পরে কর্মীরা হাত উর্ধ্বে তুলে শপথ গ্রহণ করে। শপথ গ্রহণ করান সংগঠনের সভাপতি নুরুল ইসলাম।

পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ, ঢাকার শিল্পী সমাজ, বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, ঢাকা সেবিকা বিদ্যালয়, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, গণশিল্পী গোষ্ঠী, বাংলা ন্যাশনাল লীগ, ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক প্রভূতি সংগঠন সমাবেশ ও মিছিল করে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

বঙ্গবন্ধু ও সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সমিতি, কর্মচারী সমিতি ইত্যাদির ডাকে একটানা ৫দিন এই 'বাংলা বন্দের' সমাপ্তি দিবস ছিল উত্তেজনাকর ও জঙ্গীময়।

কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল(অব:) নূর খান এক বিবৃতিতে বলেন, আইনগত ভাবে শেখ মুজিবই দেশের শাসন পরিচালনার অধিকারী। প্রেসিডেন্টের

মন্তব্যে তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন, অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে আজ তাঁর সাথে দেখা করেন গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান এয়ার মার্শাল (অব:) আসগর খান।

ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী এক সাক্ষাৎকারে ছাত্রলীগের নামে বিভিন্ন স্থানে চাঁদা আদায়ের কথা অস্বীকার করেন। যারা সংগঠনের নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদা আদায় করছে তাদের তথ্য কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানোর আহবান জানান।

এদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটক ভেঙ্গে ও কারাগারের ১৪ ফুট উঁচু প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সকাল দশটায় প্রায় ৩শত ২৫ জন কয়েদী পলায়ন করে। জেল পুলিশ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য গুলী ছুড়লে ৭জন নিহত ও ৩০ জন বন্দী আহত হয়।

সাবেক ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ ৭ মার্চে রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যে ভাষণ দেবেন তা সরাসরি বেতারে রিলে করে প্রচার করার দাবী করে বিবৃতি দেন।

আলী আশরাফের সভাপতিত্বে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের এক প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করেন কে.জি. মোস্তফা, আতাউস সামাদ, আলী তারেক। কে. জি. মোস্তফা এখানে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, শাসকগোষ্ঠী এক হাতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের টোপ এবং অন্য হাতে উদ্যত বেয়নেট নিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে। তিনি দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের মানুষ বেয়নেটের চ্যালেঞ্জকেই মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত।[২১৪]

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম

৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে উজজ্বল মাইল-ফলক। বঙ্গবন্ধু এদিন তাঁর সর্বশেষ কর্মসূচী ঘোষণা করবেন একথা তিনি পয়লা মার্চ পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের পরই সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন। ফলে ৭ মার্চ রেসকোর্সের

---

২১৪ আজাদ, ইত্তেফাক, ৭মার্চ ১৯৭১

জনসভার জন্য সমগ্র বাংলাবাসী যেমন, তেমনি পাকিস্তানের সকল রাজনীতি সচেতন মানুষ উৎকন্ঠিত মনে অপেক্ষা করছিলেন।

যদিও ৩ মার্চই পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ-শ্রমিকলীগ আয়োজিত সভাতেই বঙ্গবন্ধু তাঁর চূড়ান্ত কথা— বাংলার স্বাধীনতার কথা বলে এসেছিলেন। মূলত বঙ্গবন্ধু সেদিন তাঁর শেষ ভাষণও দেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, ভাষণের পরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে। এজন্য তিনি শেষ নির্দেশাবলী, 'আমি যদি নাও থাকি' বলে এসেছিলেন।[২১৫]

সকাল থেকেই রেসকোর্স ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ শোনার জন্য আগমন করে। এদিন বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ় চিত্ত। তিনি মঞ্চে উঠেই সরাসরি মাইক্রোফোনের কাছে যান এবং বলেন, 'আজ দু:খ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।' এরপর বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাঙালী বঞ্চনা ও নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

২৫ তারিখ পরিষদ অধিবেশন বসা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শর্তারোপ করে বলেন:
১ 'সামরিক আইন মার্শাল-ল withdraw করতে হবে,'
২ 'সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে'
৩ 'যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে'
৪ 'আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে'

বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দৃঢ় কন্ঠে বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা। দেশের মানুষের অধিকার চাই। তিনি নির্দেশ দেন, 'এই বাংলাদেশে কোর্ট - কাচারী, আদালত- - ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, সেজন্য.... রিক্সা, গরুর গাড়ী, রেল চলবে, কিন্তু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম-কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না।

২৮ তারিখে গিয়ে তিনি কর্মচারীদের বেতন নিয়ে আসতে বলেন।

বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, রেডিও টেলিভিশন যদি আমাদের খবর না দেয়, তাহলে কোনো বাঙালী সেখানে যাবেন না। তিনি ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ দেন।

---

২১৫ এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে তেসরা মার্চের ঘটনাবলীর অধ্যায়ে

এরপর বঙ্গবন্ধু সর্বশেষ দু'টি বাক্য উচ্চারণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে বাঙালীর সংগ্রামের পাথেয় হিসেবে কাজ করে। বঙ্গবন্ধু বলেন, ''রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'[২১৬]

বঙ্গবন্ধু যে কোনো কারণেই হোক, এদিন ভাষণের পর জনগণকে সম্বোধন করে 'জয় বাংলা' বলে 'জয় পাকিস্তান'ও উচ্চারণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণ সরাসরি ঢাকা বেতার মারফত প্রচার করার দাবী উঠেছিল পূর্ব থেকেই। ঢাকা বেতারে কর্মরত বাঙালী কর্মীদের দাবীর প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন এ ভাষণ সরাসরি প্রচার করবেন সারা দেশের মানুষের একযোগে শোনার জন্য। রেডিওতে ঘোষণাও দেওয়া হয়। সেই জন্য বেলা ২.১০ মিনিট থেকে ৩.২০ মিনিট পর্যন্ত দেশাত্ববোধক সঙ্গীত পরিবেশন হতে থাকে। এই পর্যায়ে শেষ গানটি ছিল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। এরপর ঢাকা বেতার হটাৎ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। গভীর রাত পর্যন্তও এই কেন্দ্র খোলেনি। রাতে ঢাকা টেলিভিশনও বন্ধ থাকে।

শেষমুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করায় ঢাকা বেতারের কর্মীরা শ্লোগান দিতে দিতে কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসে এবং জনতার সাথে রেসকোর্সের সমাবেশে যোগ দেয়। তারা এ দাবী মানা না হলে আর কাজে ফিরে যেতে অস্বীকার করে। গভীর রাতে এ ব্যাপারে ঢাকা বেতারের কর্মীরা সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে একটি আপোষ ফর্মুলায় পৌছে যে, পরদিন ৮মার্চ এ ভাষণ কোন প্রকার কাট-ছাট ছাড়াই পুনঃ প্রচার করবে এবং কাজে ফিরে যাবে।[২১৭]

৮ মার্চ সকালেই সারা বঙ্গবাসী ঢাকা বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণ একযোগে শোনতে পায় এবং কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

রেসকোর্সে এদিন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন এমন একজন রাজনৈতিক কর্মী এই লেখককে বলেন, তিনি এদিন রেসকোর্সে দলবেঁধে আসা জনতাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও মারমুখী দেখতে পান। শ্লোগানেও ছিল অত্যন্ত জঙ্গীভাবের আবেগ। সকাল থেকেই একটা গুজব এদিন ছড়িয়ে পড়েছিল যে, বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের জনসভায়

২১৬ বজ্রকন্ঠ (পুস্তিকা), বাংলাদেশ সরকারের তথ্যদফতর কর্তৃক প্রচারিত, ১৯৭২
২১৭ ইত্তেফাক, সংবাদ, আজাদ, ৮ মার্চ ১৯৭১

ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করার নির্দেশ দেবেন। এবং রেসকোর্স থেকেই জনতাও ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাবে। তিনি বলেন, মানুষের মুখের ছবি এতো বেশী বিদ্রোহাত্মক ছিলো যে একে কে নিয়ন্ত্রণ করবে তাই একটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের বিষয়টি গুজবই থেকে যায়। অনেকে এতে হতাশ হন।[২১৮]

এর স্বীকৃতি দিয়েছেন তৎকালীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য রাশেদ খান মেনন।তিনি বলেন, 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড অবস্থায় থেকেও আমরা এদিন রেসকোর্সের জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম। সারা শহরে রটে গিয়েছিল যে, শেখ মুজিব আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। এবং বড় ধরনের একটা ঘটনা আজ ঘটবে। কিন্তু আমরা হতাশ হয়ে ফিরে আসি'।[২১৯]

কমিউনিষ্ট সমন্বয় কমিটি:
পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়

রেসকোর্সের জনসভার সশস্ত্রভাব ও অগ্নিমূর্তির সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় এদিনে প্রচারিত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটির একটি প্রচারপত্রে (মাও সে তুং-এর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কয়েকটি অংশের উদ্যোগে এ কমিটি গঠিত হয়েছিল)। প্রচারপত্রটিতে অগ্নিঝরা আহবান তুলে বলা হয়:

আঘাত হানো। সশস্ত্র বিপ্লব শুরু কর। জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম কর।

পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। পূর্ব বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। গত তেইশ বছর ধরিয়া পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনতার রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে।... সেনাবাহিনী হইল শাসকগোষ্ঠীর সকল ক্ষমতার উৎস। তাই আজ তাহারা সকল মুখোশ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাদের দেওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনও মুলতবী করিয়া দিয়াছে।...

কৃষক গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ শুরু কর। শাসক গোষ্ঠীর হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লও। গ্রাম বাংলায় স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দাও। মুক্ত এলাকা গঠন কর।... সেনাবাহিনীকে খতম কর'।[২২০]

২১৮ সাক্ষাৎকার : সনৎ বিশ্বাস (তিনি ছাত্র ইউনিয়ন-মেনন গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন বর্তমানে তথ্য অধিদপ্তরের একজন উর্দ্ধতন আধিকারিক)

২১৯ *সাক্ষাৎকার : রাশেদ খান মেনন (তৎকালীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির নেতা, বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক)*

২২০ *স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯৬*

ট্রেনিং শুরু

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ যেমন ছিল এদিনের প্রধানতম ঘটনা, তেমনি এদিন সকালেই পূর্ব বাংলার রাজধানীতে ঘটে যায় মুক্তি আন্দোলনের আরেকটি বিশেষ ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপের) কর্মীরা সকাল ৮টা থেকে শুরু করে কুচকাওয়াজ। সামরিক বাহিনীর সাথে পাল্লা দিয়ে এ প্রথম পূর্ব পকিস্তানে ছাত্র-যুবকরা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করে।[২২১] ছাত্ররা এজন্য ডামি রাইফেল ব্যবহার করে। ছাত্রদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছাত্রী কর্মীরাও মার্চপাস্টে অংশ নেয়।

পরদিন ৮ মার্চ এ সংবাদ খবরের কাগজে বের হলে সারা বাংলাদেশের মানুষের মনে বিদ্যুতের শিহরণ জাগে। প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টা ব্যাপী চলে প্রথমবারের মতো এই সামরিক প্যারেড। চলতে থাকে মহান মুক্তি আন্দোলনের মহাপ্রস্তুতি। ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রকাশ্যে এই সামরিক ট্রেনিং অব্যাহত ছিল।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ.ও.টি.সির ক্যাডেটরা এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। জনৈক আবু এর মূল দায়িত্বে ছিলেন।

ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি নুরুল ইসলাম জানান, তাঁরা এ সময় ডেমরার একটি গ্রামে গোপনে জনৈক ডা: আবুল কাশেমের পরিচালনায় সত্যিকারের বন্দুক চালনার প্রশিক্ষণেও অংশ নিয়েছিলেন।[২২২]

টিক্কা খানের আগমন

৭ মার্চ আরো একটি ঘটনা ঘটে পূর্ব পাকিস্তানে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নতুন গভর্ণর করে পাঠান লে: জেনারেল টিক্কা খানকে। টিক্কা খান ৭ মার্চ বিকেলে ঢাকা আসেন। খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং পদস্থ সামরিক অফিসারগণ বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।[২২৩]

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, ছাত্র ইউনিয়নের সামরিক ট্রেনিং গ্রহণের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার, টিক্কা খানের মতো উগ্র মেজাজী বলে পরিচিত

---

২২১ আজাদ, ৮ মার্চ ১৯৭১
২২২ সাক্ষাৎকার: নুরুল ইসলাম
২২৩ আজাদ, ইত্তেফাক, ৮মার্চ ১৯৭১

সামরিক অফিসারকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে প্রেরণের মধ্য দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

গণমুক্তি বাহিনী ও কাল পতাকা

ছাত্রলীগ ও ডাকসুর ৪ নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ, আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন এক বিবৃতিতে গুলীবর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে এবং শহীদ স্মরণে আইন-আদালত, দোকান-পাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাসগৃহে সর্বত্র অনির্দিষ্ট কালের জন্য কাল পতাকা তোলার আহবান জানান।[২২৪]

ওয়ালীপন্থী ন্যাপের পূর্বাঞ্চল শাখার প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ৭ মার্চ এক সভায় গ্রামে-গঞ্জে, বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে গণমুক্তি বাহিনী গঠন করে মুক্তির সংগ্রাম শুরু করার জন্য ৭ কোটি বাঙালীকে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানান।

৭ মার্চ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী) পূর্বাঞ্চল শাখাও পৃথক রাষ্ট্রের কথা রাজনৈতিক প্রস্তাবে গ্রহণ করে।[২২৫] বস্তুত নিখিল পাকিস্তানব্যাপী যেসব রাজনৈতিক দল রয়েছে তার মধ্যে ন্যাপ (ওয়ালী) হচ্ছে একমাত্র দল যারা এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল। পাকিস্তানে শক্তিশালী আওয়ামী লীগ ছিল আঞ্চলিক দল, পূর্ব পাকিস্তানে তার একাধিপত্য থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তার ভিত্তি ছিল না। পিপলস পার্টি পাঞ্জাব ও সিন্ধুতেই শক্তিশালী ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে তার চিহ্ন ছিল না। ভাসানী ন্যাপও ছিল পূর্ব পাকিস্তানেরই একটি আঞ্চলিক দল। পশ্চিমে তার তেমন কিছু ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি-রুশপন্থী কিংবা চীন পন্থী, উভয়ই ছিল পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীক। পশ্চিম পাকিস্তানে এদের মিত্ররা ভিন্ন কাঠামোতে কাজ করতো।

নিখিল পাকিস্তানব্যাপী দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল, জামায়াতে ইসলামী ও ন্যাপ (ওয়ালী)-ই ছিল অন্যতম। এর মধ্যে একমাত্র এই ন্যাপ (ওয়ালী)-ই পাকিস্তানের সকল প্রদেশে কম-বেশী আসন লাভ করে। বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তারা সরকার গঠন করার মতো আসনও লাভ করে। এমনকি ৭০ সালে আওয়ামী লীগের জোয়ারের মধ্যেও তারা পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ১টি আসন লাভে সক্ষম হয়।

---

২২৪ আজাদ, ইত্তেফাক, ৮মার্চ ১৯৭১
২২৫ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৭

সেদিক থেকে ন্যাপ (ওয়ালী) কর্তৃক শাসনতন্ত্রে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দাবী ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানেও তাই ন্যাপ (ওয়ালী খান পশ্চিম পাকিস্তানী হওয়ার পরও) নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার প্রথম বেতার কেন্দ্র তৈরী

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানীদের সাথে যেমন আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তেমনি সাথে সাথে তিনি কতকগুলি 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্ক'ও করে রাখছিলেন। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হতে রাজী ছিলেন, এজন্য তিনি এমন কতকগুলি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন যে তাতে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের ঘাম ছুটে যাচ্ছিলো। তাঁরা বুঝতে পারছিল ভুট্টোকে পাত্তা দিতে গিয়ে তাঁরা বড় ধরণের ভুল করে ফেলেছেন। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন, পাকিস্তানীদের সাথে আর আগানো বোধহয় সম্ভব হবে না। তিনি তাঁর প্রস্তুতি নিতে থাকলেন।

৭ মার্চের পর তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড: নূরুলউল্লাহকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতারা এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। বৈঠকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু, ড: নূরুলউল্লাহকে বলেন, 'নূরুলউল্লাহ আমাকে ট্রান্সমিটার তৈরী করে দিতে হবে। আমি যাবার বেলায় শুধু একবার আমার দেশবাসীর কাছে কিছু বলে যেতে চাই। তুমি আমায় কথা দাও, যে ভাবেই হোক একটা ট্রান্সমিটার আমার জন্য তৈরী রাখবে। আমি শেষ বারের ভাষণ দিয়ে যাব'।

ড: নূরুলউল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে এসে বার্তাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশল বিভাগের অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকদের বললেন। এবং শুরু হয়ে গেল স্বাধীন বাংলার প্রথম রেডিও ষ্টেশন তৈরীর কাজ। বিভাগীয় প্রধান ড: জহুরুল হক সহ প্রায় সকল শিক্ষক ৯ দিন কাজ করার পর একটি ট্রান্সমিটার তৈরী করে ফেলেন। এর ক্ষমতা বা শক্তি ছিল প্রায় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী। শর্ট ওয়েভে এর শব্দ ধরা যেত।[২২৬]

---

২২৬ স্বাধীনতার দলিল, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২২-২৩

অন্য একটি সূত্র দাবী করেছেন, ১৯৭০ সালেই বঙ্গবন্ধু আখাউড়া শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি লালমিয়া ও গঙ্গাসাগরের গোলাম রফিককে একটি রেডিও স্টেশন স্থাপন বিষয়ে যাবতীয় খুঁটি-নাটি প্রস্তুত করার জন্য ভারত পাঠিয়েছিলেন। তাদের মিশনের প্রাক কাজ-কর্ম স্বাধীন বাংলার প্রথম বেতার কেন্দ্র স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল।[২২৭]

মার্চের প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র সংগ্রামের সমূহ সম্ভাবনা দেখতে পান। ১৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও কর্নেল ওসমানী প্রথম আনুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা করে খুঁটি-নাটি দিক প্রস্তুত করেন।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক অফিসারও এসময় বঙ্গবন্ধুর সাথে গোপনে দেখা করেন।[২২৮]

কিন্তু সে মুহূর্তেই বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা সম্পর্কে কাউকেই সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেন নি। স্বত:স্ফূর্তভাবে যেখানে যেভাবে যা যা গড়ে উঠেছিল তিনি তা শুধু নিরীক্ষণ করছিলেন এবং কাউকে বাধা দেন নি বা দ্বিমতও করেন নি।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা ঢাকায় প্রকাশ্যে ট্রেনিং নেওয়া শুরু করে। এরপর ছাত্রলীগও পাড়ায় পাড়ায় একই ধাচের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা নেয়। ২১ মার্চ পল্টন ময়দানে প্রাক্তন সৈনিকরা প্যারেড করে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্রতচারী আন্দোলন তাদের অনুশীলন বাংলা একাডেমীতে শুরু করে। অন্যদিকে আবার খুব জোরে-শোরে আলাপ-আলোচনাও চলছিল।

বঙ্গবন্ধু তো ইয়াহিয়ার সাথে আলাপ চালাচ্ছিলেনই, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী সকল নেতারা এসে এক জোট হয়ে ভুট্টোর বিরুদ্ধে নেমে পড়েন এবং বঙ্গবন্ধুকে বোঝাতে থাকেন।

বাস্তব অবস্থাটি ছিল একেবারেই ঘোলাটে। ফলে বঙ্গবন্ধু কাউকে সুনির্দিষ্ট তারিখ-সময় দিয়ে কোনো নির্দেশ দেন নি। দেওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু সশস্ত্র প্রতিরোধের 'মাটির তলা'র কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

---

২২৭ সাক্ষাৎকার : আবদুল কুদ্দুস মাখন

২২৮ *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬) পৃষ্ঠা ৪১৯-২০

৯ মার্চ সংবাদপত্রে সামরিক কর্তৃপক্ষের একটি প্রেসনোট প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, 'হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে এবং বাজে 'প্রোপাগাণ্ডা' ছড়িয়ে পড়েছে বলে প্রকৃত অবস্থা জানাতে হচ্ছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা সম্পর্কিত প্রেসিডেন্টের পয়লা মার্চ তারিখের ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত এবং স্বত:স্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং জনসাধারণ রাস্তায় বের হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে দোসরা মার্চ সকাল থেকে পূর্ণ হরতাল পালন শুরু হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিক্ষোভরত জনতা লুট, অগ্নিসংযোগ, ছুরিকাঘাত ইত্যাদির ন্যায় অন্যায় কার্যক্রমে লিপ্ত হয়।...

সেই রাতেই সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। সান্ধ্য আইন রাত ৯টা থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত বলবৎ হয়। সৈন্যরা পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সহযোগিতায় সান্ধ্য আইন জারির জন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে রাত ৯টার পূর্বে বের হয়ে আসেনি।

সারা প্রদেশে গোলযোগের সময় ১৭২ জন প্রাণ হারায় এবং ৩৫৮ জন আহত হয়।...

চট্টগ্রামের ৬ নং সেক্টরের উপ সামরিক আইন প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদার ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত পরিচালনার পর স্বীকার করেন যে, সেনাবাহিনীর হাতে ৫ ব্যক্তি নিহত ও ১ ব্যক্তি আহত হয়। এবং উক্ত স্থানে গোলযোগে ইপিআর-এর হাতে ২ ব্যক্তি নিহত ও ১ ব্যক্তি আহত হয়।

গত ৩ ও ৪ মার্চ খুলনায় স্থানীয় ও অস্থানীয় (বাঙালী-বিহারী--লেখক)-এর মধ্যে সংঘর্ষে ও পুলিশের গুলিতে ৪১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ রংপুরে স্থানীয় গোলযোগ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালাবার সময় ৩ ব্যক্তি নিহত ও ১১ ব্যক্তি আহত হয়। খুলনায় ৪ মার্চ একটি ট্রেন লাইনচ্যুত করা হলে পুলিশের গুলীতে ৪ ব্যক্তি নিহত ও ১ ব্যক্তি আহত হয়।

৬ মার্চ ৩৪১ জন কয়েদী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশের গুলীতে ৭ব্যক্তি নিহত ও ৩০ ব্যক্তি আহত হয়।

২ ও ৩ মার্চের রাতে নবাবপুর, ঠাটারীবাজার-এর ঘটনায় ইপিআর বাহিনীর হাতে ৬ ব্যক্তি নিহত ও ৫৩ ব্যক্তি আহত হয়। ৫ মার্চ টঙ্গী এলাকায় জনতা ইপিআর বাহিনীকে আক্রমন করলে আত্মরক্ষার্থে গুলী ছুড়লে ৪ ব্যক্তি নিহত ও ৩ ব্যক্তি আহত হয়।

ঢাকার সদরঘাটে ২ ও ৩ মার্চ রাতে একদল জনতা একটি সেনাবাহিনীর ইউনিটের উপর আক্রমণ চালালে গুলীতে ৬ ব্যক্তি নিহত হয়। ৩ মার্চ সেনাবাহিনীর লোকেরা উত্তেজিত জনতার হাত থেকে ঢাকার টেলিভিশন কেন্দ্রকে রক্ষা করতে গেলে ১ ব্যক্তি নিহত হয়।

উত্তেজিত জনতা ৩ ও ৪ মার্চ যশোর, খুলনা ও রাজশাহীতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করে। এতে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৮ জন নিহত ও ১৯ ব্যক্তি আহত হয়।

৫ মার্চ যশোর থেকে খুলনা যাওয়ার পথে একদল জনতা সেনাবাহিনীর লোকদের আক্রমণ করলে গুলীতে ৩ ব্যক্তি নিহত ও কয়েক ব্যক্তি আহত হয়'।

প্রেসনোটে একই সঙ্গে বলা হয়, এসব ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে জনতার হাতে সশস্ত্র বাহিনীর একজন অফিসার নিহত ও ১জন আহত হয়।[২২৯]

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জননেতা তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে প্রেসনোটের বিবরণ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ভয়াবহ ঘটনাগুলিকে তাচ্ছিল্যের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আহত ও নিহতের সংখ্যা কমিয়ে বলা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সামরিক কর্তৃপক্ষের দেওয়া এই প্রেসনোটের ভাষায় যতো সীমাবদ্ধতাই থাকুক, এর মাধ্যমে মার্চের প্রথম সপ্তাহে সারা পূর্ব বাংলা কেমন উত্তাল ও জঙ্গীরূপ ধারণ করেছিল তারই চিত্র ভেসে উঠেছে।

অবাঙালী ও বিহারীরা প্রথম থেকেই ঢাকা ছাড়তে শুরু করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো বাঙালীকে এই সময় ঢাকা আসতে দেওয়া হয় না।

---

২২৯ ইত্তেফাক, ৯ মার্চ ১৯৭১

ডাচ ও বৃটিশ নাগরিকরা এসময় দূতাবাসের নির্দেশে ঢাকা ত্যাগ করতে শুরু করে।

মুসলিমলীগ থেকে সদ্য পদত্যাগকারী নেতা খান এ সবুর সব কিছুর জন্য পশ্চিম অঞ্চলের নেতাদের দায়ী করে বিবৃতি দেন।

আতাউর রহমান খান বলেন, মুক্তির লগ্ন উপস্থিত। তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।

বাংলা জাতীয় লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ, শেখ মুজিবের নির্দেশিত পথে কর্মসূচী পালনের জন্য শাখাগুলিকে নির্দেশ দেন।

পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন বলেন, সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা বর্তমান বংশধরদের এক পবিত্র দায়িত্ব। তিনি বলেন, বাংলা-দেশের মানুষকে এক গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে।

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী স্বৈরাচারী এজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের স্মৃতিতে মহররমের দিনে (৮ মার্চ) শোক মিছিল বের করে। জাতীয় পরিষদ সদস্য ড. কামাল হোসেন এর নেতৃত্ব দেন।[২৩০]

ফয়োয়ার্ড স্টুডেন্টস্ ব্লক ৮ মার্চ এক প্রচারপত্রে বলে, 'বাঙলার জনপদ আজ বাঙলার বীর মুক্তি ফৌজদের রক্তে রঞ্জিত। বিদেশী সেনাদের পদচারণায় বাঙলার মাটি আজ অপবিত্র ও কলঙ্কিত। এরই প্রেক্ষিতে সর্বস্তরে 'বাঙলা মুক্তিফ্রন্ট' গঠন করেন, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, মুক্তিফৌজ গড়ে তুলুন আর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলুন।[২৩১]

'লা-কুম দ্বীনুকুম অলইয়া দ্বীন'

৯ মার্চ মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা সমন্বয় কমিটি আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে অবিলম্বে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানান।

২৩০ আজাদ, ইত্তেফাক, ৯মার্চ ১৯৭১
২৩১ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০৫

তিনি ঘোষণা করেন, মুজিবের নির্দেশমতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোনো কিছু না হইলে আমি শেখ মুজিবরের সাথে মিলে ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করবো।

এদিনই মাওলানা সন্তোষ থেকে ফিরেন এবং শেখ মুজিবের সাথে টেলিফোনে আলাপ করে জনসভায় আসেন। মাওলানা ভাসানী বলেন, খামাখা কেউ মুজিবকে অবিশ্বাস করবেন না। মুজিবকে আমি ভাল করে চিনি। তাঁকে আমি রাজনীতিতে হাতে খড়ি দিয়েছি। আমি শেখ মুজিবকে আমার তিন পুত্রের চেয়েও ভালবাসি। আমার রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে আমি ৩১জন সেক্রেটারীর সাথে কাজ করেছি। তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমানই শ্রেষ্ঠ সেক্রেটারী।

তিনি তেজোদৃপ্ত কন্ঠে বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হইবে। পাকিস্তান অখণ্ড থাকিবে না, অখণ্ড রাখিব না। ইয়াহিয়ার বাপেরও ক্ষমতা নাই ইহা ঠেকায়। মাওলানা বলেন, স্বাধীন অহিংসায় আমি বিশ্বাস করি না। রসুল আমাকে এই শিক্ষা দেয়নি। যে জুলুম করে, সে যেমন পাপী, যে তা সহ্য করে, সেও তেমনি পাপী। জালেমের সাথে কোনো সহযোগিতা নাই।

পুরনো দিনের রাজনৈতিক বন্ধু ভুট্টোর উদ্দেশ্যে ভাসানী বলেন, খুরোর সাথে আলোচনা করে ভুট্টো সাহেব দুই-তিনদিন পর আসুন। তাড়াহুড়ার দরকার নেই। এসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন।

ভাসানী বলেন, গণতন্ত্রের অর্থই আপনি জানেন না। পার্লামেন্ট বর্জনের এ ধরনের নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ন্যায় সঙ্গত প্রস্তাব যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে সম্মত করাতে হয়।

ইয়াহিয়াকে অভিযুক্ত করে মাওলানা বলেন, ল এণ্ড অর্ডার আপনি ভঙ্গ করেছেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে তা আবার বাতিল করে যে কারণ দর্শিয়েছেন তা পানওয়ালারাও বিশ্বাস করে না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কর এবং আমরা আমাদের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করি। 'লাকুম দীনুকুম অল্ইয়া দ্বীন'।

নিরস্ত্র মানুষকে হত্যার তীব্র সমালোচনা করে মাওলানা ভাসানী ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনার ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা গাল-গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি

কর্মীদের চরিত্রবান হওয়ার আহবান করে বলেন, চরিত্রবান না হলে স্বাধীন বাংলা রক্ষা করা যাবে না। স্বাধীন বাংলায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান মুসলমান সকলের সমান অধিকার দিতে হবে।

জনসভায় আর একমাত্র আতাউর রহমান খান বক্তৃতা করেন। তিনি শেখ মুজিবরের উদ্দেশ্যে বলেন, এই মুহূর্তে আপনি জাতীয় সরকার গঠন করুন। বাংলায় সকলেই জাতীয় সরকারের হুকুম মেনে চলবে। আমাদের আর কোনো দাবী নেই।

তিনি বলেন, বাংলা-দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে তা স্বীকার করে নিতে বলেন। তিনি বলেন, যারা বাংলার মানুষকে হত্যা করেছে সেই কসাইদের কাছে হত্যার বিচার চাই না। মঞ্চে শাহ আজিজুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাব পাঠ করেন মশিউর রহমান যাদু মিয়া।[২৩২]

দুইজন জাতির পিতা

৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরী সভা নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে,

১. দোসরা মার্চ বটতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃত্বে গঠিত 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগাম পরিষদ-এর সভায় গৃহীত 'স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

২. অপর প্রস্তাবে বাঙালীর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশ জাতীয় সরকার গঠনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ৯ মার্চ পল্টনে স্বাধীন বাংলা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে মঞ্চ থেকে ও অন্যান্য জায়গায় 'স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা: মাওলানা ভাসানী' শ্লোগানও দেওয়া হয়।

ফলে এই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলাদেশে দুইজন জাতির পিতার ঘোষণা দেওয়ায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

---

২৩২ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, ১০ মার্চ ১৯৭১

৩ . ছাত্রলীগের অন্য প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন এই চারকে নিয়ে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

৪. ছাত্রলীগের জেলা ও শহর থেকে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখার সভাপতিকে আহবায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সম্পাদক করে এবং ৯ জন সদস্য নিয়ে সর্বমোট ১১ জনের সমন্বয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার নির্দেশ দান করা হয়। এছাড়া, আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়।

৫. সাংগঠনিক অপর এক প্রস্তাবে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' এর পরিবর্তে শুধু 'ছাত্রলীগ' নাম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৩৩]

টিক্কা খানের শপথ হলনা

পূর্ব পাকিস্তানে নবনিযুক্ত গভর্ণর টিক্কা খান শেষ পর্যন্ত শপথ নিতে পারেন নি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী শেখ মুজিবের নির্দেশ ব্যতীত টিক্কা খানকে শপথ করাতে অস্বীকার করেন। ফলে গভর্ণর হিসেবে টিক্কা খানের অভিষেক অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তিনি সরকারী ভাবে কাজ চালিয়ে নিতে পারলেন না।

ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী এক বিবৃতিতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। তারা শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার জন্যও কর্মীদের নির্দেশ দেয়।

রাজশাহীতে এদিন কারফিউ জারী করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান ও ওয়ালী ন্যাপ নেতা আতাউর রহমান রাজশাহী থেকে এর নিন্দা করে বিবৃতি দেন।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক রেজাউল হক মোস্তাফা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এদিন বলা হয়, স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের নামে একদল ট্রাক,

২৩৩ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০৮ এবং ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, ১০ মার্চ ১৯৭১
২৩৪ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, ১০ মার্চ ১৯৭১

জীপ, কার ও মোটর সাইকেল জোর করে রেখে তা দিয়ে জোর করে টাকা আদায়, ডিপো থেকে তেল নেওয়া ইত্যাদি সমাজবিরোধী কাজ করছে। কেউ কেউ এতে ছাত্রলীগ, ডাকসু, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম ভাঙাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব কাজের সাথে সংগ্রাম পরিষদের কোনো সম্পর্ক নেই।

কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা

৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিংহ নেতৃত্বাধীন) একটি প্রচারপত্র সারা শহরে বিলি করে। সেখানে বলা হয়:

'...বাংলাদেশের দুশমন হইল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষা-কারী সরকার ও উহাদের সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান, বেলুচ, সিন্ধি, পাঞ্জাবী জাতিসমূহের মেহনতী জনতা পূর্ব বাংলার জনগণের শত্রু নয়।...

ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণদুশমনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবীতে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের ডলারের শৃঙ্খলে বাধা না পড়ে... সেজন্যও সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে আগাইয়া লওয়ার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত জনতাকে তাহাদের সংগ্রাম আগাইয়া লওয়ার আহবান জানাইতেছে।'

প্রচারপত্রে কতকগুলি দলের সাথে কমিউনিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে চিহ্নিত করে বলা হয়,

'কতকগুলি তথাকথিত কমিউনিষ্ট পার্টি' জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মঘট অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির প্রয়োজন নাই', 'গ্রামে গ্রামে কৃষি বিপ্লব শুরু কর' 'জোতদারদের গলা কাট' প্রভৃতির আওয়াজ তুলিতেছে। কোন কোন নেতা 'স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে' বলিয়া ধ্বনি-তুলিয়া আজিকার গণসংগ্রামের উদ্দী-পনা, সংকল্প ও প্রস্তুতিতে ভাটা আনিয়া দিতে চাহিয়াছেন। মার্কিন এজেন্টরা এই সংগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া সংগ্রামকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টা করিতে পারে।...

জনগণকে আজ সংগ্রাম করিতে হইতেছে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাই শান্তিপূর্ণ পন্থায় শেষ পর্যন্ত জনগণের সংগ্রাম বিজয়ী হইবে এইরূপ মনে

করিবার কারণ নাই। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী সেনাবাহিনী জনগণের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করিতে পারে। তাই আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই। সংগ্রাম যে কোন সময়ে সুতীব্র রূপ ধারণ করিতে পারে। এই অবস্থায় স্বত:স্ফূর্ততার উপর নির্ভর না করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা, উহা প্রতিরোধ করার জন্য শহর-গ্রাম সর্বত্র জনগণকে সংগঠিতভাবে প্রস্তুত হইবার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহবান জানাইতেছি।

এই জন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে, কল-কারখানায় সর্বত্র দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শক্তি নিয়া গড়িয়া তুলুন স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী। সেনাবাহিনী আক্রমণ করিলে উহা প্রতিরোধের জন্য ব্যারিকেড গঠন করুন, যাহার যাহা আছে উহা দিয়াই শত্রুকে প্রতিহত করুন'।২৩৫

কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে):
'অস্ত্র হাতে লড়াই করুন'

৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গ্রুপও তাদের মতাদর্শগত সংগ্রামকে তুলে ধরে (এই পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন মাও সে তুং-এর চিন্তাধারার অনুসারী আবদুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ।)

এদিন পার্টি থেকে প্রচারিত একটি লিফলেটে জনগণকে অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই শুরু করার আহবান জানানো হয়। বলা হয়, শত শত মানুষের হত্যার বদলা নিন। গ্রামে কৃষকদের গেরিলা লড়াই-এ সংগঠিত করুন।

এতে শত্রু চিহ্নিত করে বলা হয়:

'পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী এবং পূর্ব বাংলার তথাকথিত দরদী বিশ্বাসঘাতক নেতাদের পরামর্শদাতা হল কুখ্যাত নরপশু মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যাড। এই নরঘাতক শুয়োরের বাচ্চাটি চক্রান্ত করে ইন্দোনেশিয়ার লক্ষ লক্ষ নিরীহ গরীব মানুষকে হত্যা করেছে। গত কিছুদিন যাবৎ ঘন ঘন পূর্ব বাংলায় এসে এখানেও ব্যাপক হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। বিশ্বের মেহনতি মানুষের বড় দুশমন এই হিংস্র জানোয়াদের সাথে যেসব তথাকথিত বাংলার দরদী নেতারা বৈঠক করে, ষড়যন্ত্র

২৩৫ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০৯

করে এবং লাঞ্ছিত-শোষিত মেহনতি মানুষকে শান্ত থাকতে উপদেশ দেয় তারা গরীব কৃষক-শ্রমিকের বন্ধু হতে পারেনা।... এই দালালদের চিনে নিন।... অস্ত্র হাতে নিয়ে ছোট দলে (৪/৫জন) বিভক্ত হয়ে অতর্কিতে দেশী-বিদেশী সকল শোষকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। শহরের বস্তিতে, পাড়ায়, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গেরিলা লড়াই (গোপন যুদ্ধ) চালিয়ে অত্যাচারী জোতদারী মহাজন ও দালালদের খতম করুন।...

শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা. লে)-এর ডাকে ও নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের ৪ অক্টোবর থেকে গ্রামে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অত্যাচারী জোতদারী মহাজন ও দালাল খতমের মাধ্যমে এই গেরিলা লড়াই ৭টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই লড়াইকে সারা পূর্ব বাঙলায় ছড়িয়ে দিন'।[২৩৬]

১০ মার্চের ঘটনা

১০ মার্চ ১১৪ নম্বর সামরিক আদেশ জারী করে বলা হয়, সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহের কোনো প্রকার বাধা প্রদান করা চলবে না। এতে বলা হয়, একদল লোক প্রতিদিন সেনাবাহিনীর স্বাভাবিক খাদ্য সরবরাহ ও অপরাপর নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করছে। যদি এটা অব্যাহত থাকে, তাহলে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

এদিন নারায়ণগঞ্জ কারাগারের ফটক ভেঙ্গে ৪০ জন কয়েদী পলায়ন করে। পলায়নকালে পুলিশের গুলীতে ১ জন বন্দী নিহত ও ২৫ জন আহত হয়।

লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এদিন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বায়তুল মোকাররম থেকে এ মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

শিল্পী মর্তুজা বশীর গণহত্যার প্রতিবাদে তাঁর সরকারী চিত্র প্রদর্শনী বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ নিউ মার্কেটের কাছে এক পথসভায় জনগণকে সেনাবাহিনীর সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রস্তুতির আহবান জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

২৩৬ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১৬ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্যে দেখুন পরিশিষ্ট অধ্যায়)

স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন এক বিবৃতিতে বলেন, কোনো বাঙালী বা বাঙালী প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তাকে চরম শাস্তি দেওয়া হবে।

এখনও যে সকল গৃহে বা অফিসে কাল পতাকা উত্তোলন করা হয় নি, আজকের মধ্যে সেখানে পতাকা উড়ানোর আহ্বান জানান। অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটলে তার জন্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ দায়ী থাকবেন না।

আরেকটি বিবৃতিতে পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, পাকিস্তান থেকে বিমানে বাঙালীদের আসতে দেওয়া হচ্ছে না। যদি এটা চলতে থাকে, তাহলে এয়ারপোর্ট রোডে গাড়ী তদন্ত করে কোনো অবাঙালীকেও পাকিস্তানে যেতে দেওয়া হবে না।

রেডিও পাকিস্তান থেকে মাওলানা ভাসানীর ৯ মার্চের পল্টনের বক্তৃতা প্রচার না করায় নিন্দা করে বিবৃতি দেন ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান।

ছাত্র ইউনিয়নের নিয়মিত কর্মসূচী সকাল ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে সামরিক প্রশিক্ষণ এবং ১১টায় শহীদ মিনারে জনগণের প্রতি প্রতিরোধ বাহিনীর করণীয় ও কৌশল শিক্ষার সমাবেশ, প্রতিদিনের মতো এদিনও অনুষ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্ক প্রবাসী বাঙালী ছাত্ররা ১০ মার্চ জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা নিরস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানীদের হত্যার প্রতিবাদে এবং এই বিষয়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের দাবীতে বিভিন্ন ধ্বনি দেয়। পরে বিক্ষোভকারীদের নেতা জনাব আহমদ জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের কাছে একটি স্মারকলিপি দেয়।

খুলনার ঘটনা প্রেসনোটে বিকৃত করার প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ আব্দুল আজীজ, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন ইউসুফ, জেলার সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান। পরে আওয়ামী লীগের এক বিক্ষোভ মিছিলেও তাঁরা নেতৃত্ব দেন। উপরিউক্ত জাতীয় পরিষদ সদস্য ত্রয় জানান, খুলনায় অফিস-আদালত বন্ধ রয়েছে।[২৩৭]

---

২৩৭ ইত্তেফাক, আজাদ, ১১ মার্চ ১৯৭১

১০ মার্চ থেকে নারায়ণগঞ্জের সিনেমাহলগুলি প্রমোদকর ছাড়া বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে নারায়ণগঞ্জের সিনেমা হলে মালিককগণ প্রমোদকর আদায় বন্ধ করে চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু করেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শেষে হলগুলোতে 'জয় বাংলা - বাংলার জয়' সঙ্গীতটি পরিবেশন করা হয়।[২৩৮]

পূর্বাঞ্চল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে

অসহযোগ আন্দোলনের চতুর্থ দিবসে ১১ মার্চ প্রদেশের সর্বত্র স্বাধীকারের দাবীতে বাঙালী সমাজ অবিচল থাকে। হাইকোর্টের বিচারপতি সহ সরকারী, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল শ্রেণীর নাগরিক অফিস বর্জন অব্যাহত রাখে। শহীদদের স্মরণে ঢাকার সকল সরকারী অফিসে কাল পতাকা উড়ে।

ঢাকা সফর শেষে এয়ার মার্শাল (অব:) আসগর খান করাচীতে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষার জন্য এই মুহূর্তেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, দেশের পূর্বাঞ্চল এখন একটি অগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বসে রয়েছে। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট ব্যতীত কোথাও তিনি পাকিস্তানী পতাকা দেখতে পান নি। কার্যতঃ শেখ মুজিবই পূর্ব পাকিস্তানে এখন সরকার চালাচ্ছেন।

তিনি পাকিস্তান সরকারকে শেখ মুজিবের শর্তসমূহ মেনে তাঁর হাতে ক্ষমতা দিয়ে আসতে বলেন। কারণ গত ২৩ বছর যাবৎ অপমানিত ও নিষ্পেসিত হওয়ার যে ধারণা বাঙালীর মনে বাসা বেঁধেছে, তার ফলে তার বিন্দুমাত্র রদবদলে তাদের সন্তুষ্ট করা যাবে না। অন্যথায় শেখ মুজিবের পক্ষেও দেশের দুই অংশকে একত্রিত রাখা সম্ভবপর হবে না।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙখলা রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে,

১. সামরিক বাহিনীর চলাচলের ব্যাপারে কোনো প্রকার সহযোগিতা না করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানায়। বাস, স্টীমার, ট্রেনে সেনাবাহিনী যাতে চলাচল না করতে পারে তার প্রতি দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানায়

২৩৮ ইত্তেফাক, ১১ মার্চ ১৯৭১

২ ইয়াহিয়া খানকে মুজিবের সাথে বৈঠকের প্রস্তাব দেন

৩ বাংলাদেশের খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের খেতাব বর্জনের নির্দেশ দেন।

টিক্কা খানকে গভর্ণর হিসেবে শপথ না করানোর বিপ্লবী সিদ্ধান্ত নিতে পারার জন্য ঢাকা হাইকোর্টের ১৬ জন আইনজীবী প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকীকে অভিনন্দন জানান।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এদিন বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে দেখা করেন এবং এক একান্ত আলোচনায় মিলিত হন।

জুলফিকার আলী ভুট্টো, বঙ্গবন্ধুর কাছে সংকট নিরসনের আহ্বান জানিয়ে এক তারবার্তা পাঠান। তিনি এজন্য ঢাকায় আসার ধারণাও প্রকাশ করেন।

ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী শোষণমুক্ত পূর্ব বাংলা কায়েমের জন্য সম্ভাব্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রস্তুতিতে নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে:

১. ঢাকা শহরে প্রতিদিন সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে জঙ্গী কর্মী বাহিনীর প্যারেড

২. ১২ মার্চ শুক্রবার বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে পথসভা ও মিছিলের মাধ্যমে জনগণকে সংগ্রামে উদ্দীপ্তকরণ

৩. ১৩ মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় বায়তুল মোকাররম থেকে মশাল মিছিল

৪. ১৪ মার্চ রোববার বায়তুল মোকাররমে জনসভা। এছাড়া, ছাত্র ইউনিয়নের সকল জেলা ও প্রাথমিক শাখাকে নিম্নলিখিত কর্মসূচী কার্যকরী করতে নির্দেশ দেয়:

১ সর্বাত্মক রাজনৈতিক প্রচার
২ জনগণের মধ্যে সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী গঠন
৩ গ্রামে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া
৪ বৃহত্তর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য 'যার যা আছে, তাই নিয়ে' প্রস্তুতি গ্রহণ
৫ জঙ্গী কর্মীবাহিনীর সমন্বয়ে নিয়মিত প্যারেড অনুষ্ঠান।

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে এদিন ২৪ জন কয়েদী পলায়ন করে। কুমিল্লায় পালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে পুলিশের গুলিতে ৫ জন নিহত হয়।

রাজশাহীতে শহরের শিল্পী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকরা একটি শোক মিছিল বের করে।[২৩৯]

দোষ করলো নাহোর গুলি চললো ঢাকায়

১২ মার্চ এয়ার মার্শাল (অব:) আসগর খান পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি দেশ এবং জন্মের পর মাত্র ২৫টি বছর না যেতেই ধ্বংস হয়ে গেলে ইসলামী বিশ্বাসের ইতিহাসে এর চাইতে বড় বিপর্যয় আর কিছু হতে পারে না।

তিনি বলেন, দেশের দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানে সশস্ত্র বাহিনীর অর্ধেক লোককে বাদ দিতে হবে। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশবাসী পাকিস্তানের চেয়ে আফগানিস্তানের সাথেই ঘনিষ্ঠতা বেশী অনুভব করে। অনুরূপভাবে স্বল্প সম্পদশালী বেলুচিস্তানও তার আপন পথ ধরবে। সিন্ধুও তাই করবে। ইতোমধ্যেই একশ্রেণীর লোক উপরিউক্ত ধরনের কথা বলতে শুরু করেছেন। সকল প্রদেশের মনেই পাঞ্জাব কর্তৃক শাসিত হওয়ার একটা ভীতি দানা বেধে উঠেছে। তিনি বলেন, এবারও এ ভীতি প্রমাণিত হয়েছে। কারণ দোষ করলো ভুট্টো, ইয়াহিয়া খান কিন্তু গুলি চললো ঢাকায়।

ভাসানী ন্যাপের পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা সি. আর আসলাম বলেন, বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের জাতীয় সংহতি বিপন্ন করে তুলেছে। তিনি বলেন, ভুট্টোর ক্ষমতালিপ্সাই রাজনৈতিক সংকটকে সঙ্গীন করে তুলেছে। তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, যে ভুট্টো ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, সেই ভুট্টোই এখন কিভাবে ২৫ মার্চের অধিবেশনে শর্তহীনভাবে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

রেডিও পাকিস্তান, করাচী কেন্দ্রের খ্যাতনামা বাংলা খবর পাঠক সরকার কবীরউদ্দিন রেডিও পাকিস্তান বর্জন করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের

---

২৩৯ ইত্তেফাক, আজাদ, ১২ মার্চ ১৯৭১

খবরের উপর রেডিওতে নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রতিবাদে তিনি এ গণমাধ্যম বর্জন করেন।

বাংলার কবি, সাহিত্যিকরা এদিন 'লেখক সংগ্রাম শিবির' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। হাসান হাফিজুর রহমান এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হন।

২৪ টি কর্মচারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় পরিষদের চেয়ারম্যান এম. এ. রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তৃতা করেন সেক্রেটারী জেনারেল এম. এ. বারী মোল্লা। সমাবেশে কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থার শপথ গ্রহণ করে কর্ম বিরতিতে একাত্মতা ঘোষণা করে।

নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বার্মা ইস্টার্ণ, এসো, পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েলস, দাউদ পেট্রোলিয়ামকে সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য কোনো প্রকার জ্বালানী ও তৈল সরবরাহ করতে নিষেধ করেন।

পটুয়াগোষ্ঠী গ্রাম বাংলার জনপদের অতি আদরের ফুল লাল শাপলাকে সংগ্রামী বাংলার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিন বগুড়া জেল ভেঙ্গে কয়েদীরা পালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে গুলি খেয়ে ১ জন নিহত ও ১৬জন আহত হয়।[২৪০]

১৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতুন করে সামরিক আইন আদেশ জারী করাকে উস্কানীমূলক বলে বিবৃতি দেন।

এদিনের দৈনিক আজাদ ধানমণ্ডীর ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর বাসভবনকে আমেরিকার হোয়াইট হাউস, কিংবা বৃটেনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে তুলনা করে মন্তব্য করে, বঙ্গবন্ধুর বাসভবন এখন একটি অঘোষিত সরকারী দপ্তর।

ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করায় বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে বিবৃতি দেয়।

---

২৪০ দৈনিক পাকিস্তান, ১৩ মার্চ, ১৯৭১

যেসব অবাঙালীরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাদের সম্পত্তি ক্রয় করা সম্পর্কে হুসিয়ার করে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিবৃতি দেয়।

পূর্ব পাকিস্তানের সি এস পি ও ই পি সি এস অফিসাররা এদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক চলার সিদ্ধান্ত নেয়।

শীতলক্ষ্যা নদীতে এদিন ব্যতিক্রমধর্মী নৌকা-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জের ছাত্র-যুবক ও নৌকার মাঝিরা বিক্ষোভের অংশ হিসেবে মাতলা স্টীমার ঘাট থেকে বের হয়ে মেঘনা পাড় হয়ে মুন্সীগঞ্জ থেকে এ দীর্ঘ মিছিল নিয়ে ফিরে আসে।

ছাত্র ইউনিয়ন বায়তুল মোকাররম থেকে এক মশাল মিছিল বের করে। এতে সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন।[২৪১]

ভুট্টোর স্বরূপে আত্মপ্রকাশ

১৪ মার্চ ভুট্টো এক অসম্ভব প্রস্তাব দিয়ে বসেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।[২৪২] অথচ এ সময় পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ বলে কিছু ছিল না। ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের আগেই এক ইউনিট ভেঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানকে তার পূর্বরূপ সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রূপান্তরিত করেছিলেন। নির্বাচনে ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি শুধু সিন্ধু ও পাঞ্জাবে সংখ্যাগর্ষ্ঠিতা পায়। বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় ন্যাপ (ওয়ালী) ও অন্যান্য দল। সেদিক থেকে ভুট্টোর এ নয়া ফর্মুলা ছিল উদ্ভট এবং এতে প্রমাণিত হয়ে যায় একমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই ভুট্টো পাকিস্তানে এ রাজনৈতিক সংকটগুলো তৈরী করছেন।

আর এ প্রস্তাবের মাধ্যমে ভুট্টো কার্যত: প্রথম পাকিস্তান ভাঙার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব আনলেন। কারণ ভুট্টোর প্রস্তাবে দুই পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বীকৃতি রয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এ বিষয়টি শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট করার জন্য মুজিব নন, ভুট্টোই একের পর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছেন।

---

২৪১ ইত্তেফাক, আজাদ, ১৪ মার্চ, ১৯৭১
২৪২ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, ১৫ মার্চ ১৯৭১

ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান এদিন বঙ্গবন্ধুর সাথে ৮৫ মিনিট ব্যাপী এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে ওয়ালী খান বলেন, আমি ঢাকায় এসেছি শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে, যাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য জনতার প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলছে এবং তারা আত্মসমর্পন অপেক্ষা আত্মবলিদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু এদিন পাল্টা ৩৫ দফা নির্দেশনামা জারী করেন। এতে বলা হয়,

১ সকল সরকারী বিভাগসমূহ, সচিবালয়, হাইকোর্ট, আধাস্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ পূর্বের মতোই বন্ধ থাকবে
২ বাংলা-দেশের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে
৩ জেলা প্রশাসক ও মহকুমা প্রশাসকগণ অফিস না খুলে আওয়ামী লীগ ও সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন
৪ পুলিশ বিভাগও অনুরূপভাবে কাজ পরিচালনা করবেন
৫ রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র চালু থাকবে। তবে গণআন্দোলনের খবর প্রচার না করলে কর্মীরা কাজে সহযোগিতা করবে না
৬ কর-খাজনা দেওয়া বন্ধ থাকবে
৭ তবে কোনো কর আদায়যোগ্য বা আদায়কৃত থাকলে তা বাংলাদেশ সরকারের একাউন্টে জমা হবে। ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মূলত এদিনের একটি সামরিক অধ্যাদেশ জারীর পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত বিবৃতি দেন। এদিন ১১৫ নম্বর সামরিক অধ্যাদেশ জারী করে বলা হয়, দেশে চাকুরীতে সকল বেসামরিক লোককে তাদের কাজে ফিরে যেতে হবে। অন্যথায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বেসামরিক বিভাগের চাকুরীরত কর্মচারীরা এ অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করে এবং শেখ মুজিবের নির্দেশমতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখতে শপথ নেয়।

ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে লেখক সংগ্রাম শিবির বাংলা একাডেমীতে এক সমাবেশে স্বাধিকার আদায়ে নিহত শহীদানের জন্য ঢাকায় একটি স্মৃতি সমাধিক্ষেত্র স্থাপনের দাবী জানায়।

সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সমগ্র বিমান বন্দরে ব্যাপকভাবে ভারী কামান ও বিমান বিধ্বংসী কামান স্থাপনের দ্বারা তাকে অবরোধ করে রাখায় বাংলাদেশের বিমান শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখে।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বর্তমানে ছুটি ভোগকারী বাঙালী সৈনিকদের বাংলাদেশ ত্যাগ না করে অথবা ক্যান্টনম্যান্টের কাজে ফিরে না গিয়ে স্ব স্ব এলাকায় সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানায়। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, স্বাধীন বাংলার সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সশস্ত্র বাহিনীতে অগ্রাধিকার ও পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

খুলনা শহরের মহিলারা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শহর আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার উদ্যোগে আয়েজিত এই বিক্ষোভে খালিশপুর, দৌলতপুরসহ দূর-দূরান্ত থেকে মহিলারা এসে যোগ দেয়। পরে শহীদ হাদিস পার্কে সমাবেশ করে।

বরিশালে হেমায়েতউদ্দীন মাঠে আতাউর রহমান খান এক বক্তৃতায় অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানান। জেলা জাতীয় লীগের সভাপতি আসাদুল হক এডভোকেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এসভায় জনাব খান বলেন, গ্রাম পর্যায়ে সর্বদলীয় ভিত্তিতে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা উচিৎ।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকায় বায়তুল মোকাররমে এদিন এক বিরাট সমাবেশ করে। ছাত্রনেতা নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও রোকেয়া হলের সহসভানেত্রী আয়শা খানম। এতে নূরুল ইসলাম বলেন, সামরিক কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক অধ্যাদেশ উস্কানীমূলক। তিনি বলেন, বাংলার মানুষকে বাংলাদেশের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার অধিকার কারো নেই।

তিনি 'বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, স্বাধীনতার শ্লোগান দেওয়ার প্রয়োজন নাই' বলে এক শ্রেণীর লোক যে বক্তব্য দিচ্ছে তারও তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এসব বলে স্বাধীনতার সংগ্রামকে অন্য পথে নেওয়ার আর সুযোগ নেই।

আয়শা খানম বলেন, বাঙালী তার জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করতে শিখেছে। সুতরাং আর কোনো শক্তি নেই তাকে প্রতিহত করতে পারে।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, শাসকগোষ্ঠী তার মরণ কামড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নবাবপুর হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে শেষ হয়।[২৪৩]

'এখনো সময় আছে'
'আর সময় নাই'

১৪ মার্চ চট্টগ্রাম লালদীঘি ময়দানে জাতীয় শ্রমিক লীগ আয়োজিত সভায় চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান বলেন, পরিস্থিতির ভয়াবহতা এড়াবার জন্য বাংলাদেশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব যে দাবী পেশ করেছেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মেনে নেওয়ার এখনো সময় আছে।[২৪৪]

এদিন ঢাকার সকল দৈনিক সংবাদপত্র মিলে একটি যৌথ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দুনিয়ার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে হয়তো এটি একটি বিরল ঘটনা। সকল দৈনিক পত্রিকা মিলে একটি সম্পাদকীয়ের একটি খসড়া তৈরী করে এবং 'আর সময় নাই' শিরোনামে ১৪ মার্চ (১৯৭১) সকলে একযোগে তা প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

আমরা ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন আসিয়াছে এবং এই মুহূর্তে একবাক্যে একসুরে কয়েকটি কথা বলা আমাদের অবশ্যকর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তেইশ বৎসরের ইতিহাসে জাতি আজ চরমতম সংকটে নিপতিত। ....গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে দেশের আইন-কানুন প্রণয়ন বা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিদের এই অধিকার কেহ অস্বীকার করতে পারেন না। এটি একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিপাদ্যও বটে।

---

২৪৩ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, ১৫ মার্চ ১৯৭১
২৪৪ আজাদ, ১৫ মার্চ ১৯৭১

ক্ষমতায় যাহারা আজ সমাসীন আর ক্ষমতাসীনদের সহিত কানাকানি করার সুযোগ যাহাদের আছে তাঁহাদের ব্যর্থতাই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির কারণ। বহিরাক্রমণ হইতে দেশের সীমান্ত রক্ষাই হইল সামরিক বাহিনীর কাজ। রাজনৈতিক বিতর্কে হস্তক্ষেপ বা পক্ষ গ্রহণ করা তাহাদের কোন দায়িত্বের আওতায় আসে না।......

দেশের দুই অংশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হইবে, তা নির্ধারণের দায়িত্ব দেশবাসী, জনসাধারণ ও তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের।

আমরা মনে করি আজ সময় আসিয়াছে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক জীবনের এই বাস্তব সত্যগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

'শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসুন'

করাচীতে ১৫ মার্চ কালাতের খান আলহাজ্ব মীর আহমদ খান বাংলা দেশে গিয়ে শেখ মুজিব ও বাংলার জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি 'মাদাই' বেলুচ নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা উদ্বোধন কালে একথা বলেন। তিনি বলেন, ২৩ বছর ধরে বাংলা ও বেলুচীরা শোষিত হয়ে আসছে।

তিনি বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য পশ্চিমা নেতাদের সমালোচনা করে শেখ মুজিবের কাছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ করেন।[২৪৫]

১৫ মার্চ সোমবার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা সফরে আসেন। তিনি আসেন দুপুর আড়াইটায়। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের সাথে তাঁর কোন বৈঠক হয় নি। অথচ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল এটা খুব দ্রুত হওয়ার আশা করছিলেন।

ভুট্টোর বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড়

এদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে চমকপ্রদ প্রস্তাব তোলেন সমগ্র পাকিস্তানে তাতে নিন্দার ঝড় উঠে। জামিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতা মাওলানা মুফতী মাহমুদ, ভুট্টোর বক্তব্যের নিন্দা করে

২৪৫ সংবাদ, আজাদ, ইত্তেফাক, ১৬ মার্চ ১৯৭১

বলেন, দেশে একটাই মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকতে পারে,দু'টি নয়। এবং তা' হচ্ছে আওয়ামী লীগ। ভুট্টো তাঁর নিজের স্বার্থেই ক্ষমতার হিস্যা চাচ্ছেন। মুফতী মাহমুদ প্রশ্ন তোলেন, যে ভুট্টো বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে একটিও আসন পায় নি, তারা কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়।

পাকিস্তান দপ্তরে তাহারিকের সাধারণ পরিষদের সভায় মাওলানা এহতেশামুল হক থানবী বলেন, এতোদিনে স্পষ্ট হয়েছে জাতীয় পরিষদ বর্জনের মধ্যে ভুট্টোর কোনো জাতীয় স্বার্থ নিহিত ছিল না, বরং তিনি তার সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির জন্য শেখ মুজিবের উপর চাপ প্রয়োগ করতে চাচ্ছিলেন।

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, ওয়ালী ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, পিডিপি, জামায়াতে ইসলাম প্রভৃতি দলের করাচী শাখা এক যুক্ত বিবৃতিতে করাচীতে পিপলস পার্টির সকল উস্কানিকে উপেক্ষা এবং নগরীতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার আহ্বান জানিয়ে যুক্ত বিবৃতি দেয়। এ সব দলের করাচীর নেতৃবৃন্দ বলেন, পিপলস পার্টির ভাড়াটিয়ারা শহরে সংঘর্ষ বাধানোর চেষ্টা করছে।

করাচীতে পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসান আসকারী ভুট্টোর নিন্দা করে বলেন, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে কথা বলছেন বলে দাবী করছেন। অথচ তিনি কি ভুলে গেছেন, তার দল এ অঞ্চলে শতকরা ৩৮টি ভোটও পায় নি।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাহমুদ, ভুট্টো ও কাইউম খানকে জনগণের শত্রু বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি পিপলস পার্টি ও কাইউম লীগের এম.এন.এ এবং এম. পি এ (জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য) দের দলত্যাগ করার আহ্বান জানান।

পিডিপির প্রধান নূরুল আমিন ভুট্টোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, তিনি পাকিস্তানের দু'টি দেশের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগই পাকিস্তানের একমাত্র মেজরিটি পার্টি এবং এখানে আর কোন দ্বিতীয় মেজরিটি পার্টির অস্তিত্ব নেই।

প্রবীন রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তান আন্দোলনের সময়কার বঙ্গদেশের প্রগতিশীল মুসলিম যুব মানসের নেতা আবুল হাশিম এ দিন বিবৃতি দিয়ে বলেন, ভুট্টো

এতোদিন পাকিস্তানের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার খায়েস মিটাতে ব্যর্থ হয়ে এখন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাচ্ছেন।

খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন, গত জুলাইতেই, এক ইউনিট ভেঙে দেওয়ায় 'পশ্চিম পাকিস্তান' বলে এখন আর কোন শব্দ নেই। তিনি জানতে চান, ভুট্টো পশ্চিমা বলে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছেন কিনা?[২৪৬]

'আর শহীদ মিনার গড়বো না'

স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সগ্রাম পরিষদের এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মোকররমে। নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এ সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ১১৫ নম্বর সামরিক আদেশ প্রাত্যাখান করে বলা হয়, বাংলা দেশে কেবল বাংলার সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানই কোন নির্দেশ জারী করতে পারেন।

অপর এক প্রস্তাবে বাংলাদেশ থেকে সকল পাকিস্তানী বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান হয়।

বক্তৃতায় নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, এক শ্রেণীর দুস্কৃতকারী স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নাম ভেঙে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করছে। এদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা জনতার প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, এ দেশের মানুষ আর শহীদ মিনার গড়বে না। গাজী হয়ে তারা এবার বিদেশী সৈন্যের মোকাবেলা করবে। তিনি আন্দোলনে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

জনাব আ. স. ম আবদুর রব সমাবেশে বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে যাতে ধনিক ২২ পরিবার আর জন্ম না নেয়, তার জন্য তাঁরা সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। তিনি জনগণকে সর্তক করে দিয়ে বলেন, পাকিস্তানী অস্ত্রবোঝাই জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়তে দেওয়া হয় নি, এরা এখন চালনা ও খুলনায় ভেড়ার চেষ্টা করছে। এদের দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে। পরে একটি মিছিল প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে এসে আধঘন্টা কাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রেসিডেন্ট এ সময় এ প্রাসাদেই অবস্থান

---

২৪৬ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, ১৬ মার্চ ১৯৭১

করছিলেন। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ প্রদিক্ষণ কালে হাজার হাজার পথচারীও তাতে স্বত:স্ফূর্তভাবে নেমে পরে।

আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমেদ এদিন এক বিবৃতিতে বলেন, বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন এক নব পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, সারা বাংলাদেশে এখন এক ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান ঘটছে।

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান আবদুর রাজ্জাক এক বিবৃতিতে জানান, কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পোশাক ও টুপী নকল করে মাথায় দিয়ে জনসাধারণের উপর অত্যাচার করছে। এদের দেখতে পেলে '২৫ ২১ ৭৪' টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেন।

পাকিস্তান মেডিক্যাল সমিতি পূর্বাঞ্চল শাখা ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারী চিকিৎসক সমিতির যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ডাক্তারদের এক সমাবেশ মুক্তি সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমানে বাংলা দেশের স্বাধীনতার যে দাবী উঠেছে তার প্রতি ডাক্তারদেরও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। প্রফেসর ডা: আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন, ডা: টি আলী, ডা: নাজমুন্নাহার, ডা: সারোয়ার আলী প্রমুখ।

চট্টগ্রামে লালদীঘি ময়দানে আন্দোলনের চতুর্দশ দিবসে আবুল ফজলের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন, ড. আনিসুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব, জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহববুল হক প্রমুখ।[২৪৭]

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ১৫ মার্চ কর্মীদের মধ্যে এক নম্বর বিশেষ গোপন সার্কুলার প্রচার করে। এতে পূর্ব বাংলার সর্বশেষ পরিস্থিতির আলোকে সশস্ত্র লড়াই ও বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। সার্কুলারে বলা হয়:

'জাতি আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে এবং সেই জন্য নিজস্ব উদ্যোগে সশস্ত্র হইবার চেষ্টা করিতেছে।....

---

২৪৭ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, ১৬ মার্চ ১৯৭১

আমরা আজ এক যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যে রহিয়াছি। এ যুদ্ধ জাতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করিতেছি এবং জয়যুক্ত হইতে চাই।

শ্রেণী শত্রু খতমের লাইন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে হইবে।....

বিপ্লবের বর্তমান স্তরে আমাদের শ্লোগান হইল 'জাতীয় শত্রু খতম কর'। বর্তমান অবস্থায় সরাসরি আওয়ামী লীগের বিরোধিতা মোটেই ঠিক হইবে না।

গ্রামেই সর্বপ্রথম স্বাধীন সরকার ঘোষণা করিয়া তথায় কৃষকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এই স্বাধীন রাজ্য দীর্ঘদিন যাবত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিতে পারে। সেই জন্য স্থানীয় মুক্ত সরকারের নেতৃত্বে এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা যাহাতে কৃষক জনতার উপর স্থানীয় সামন্তবাদী শোষকদের শোষণ বন্ধ হয়।.... স্থানীয় সামন্তবাদী গোষ্ঠিকে প্রথমেই আমরা আক্রমণ করিব না।.... এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই সমগ্র সংগঠনটিকে একটি রেডগার্ড সংগঠনে পরিণত করিতে হইবে'।[২৪৮]

'৮৯ বছরের ইতিহাসে এমন ঐক্য দেখি নি'

বাংলার মুক্তিকামী জনতার সর্বাত্মক অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের পঞ্চদশ দিবসে ১৬মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আড়াই ঘন্টা ব্যাপী আলোচনায় মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু যে গাড়ীতে করে যান তার অগ্রভাগে শোকের প্রতীক কাল পতাকা উড়ছিল।

ভুট্টো এদিন নতুন করে কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাব দেন।

এদিন ছাত্র ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে জননেতা মনিসিংহ সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও সামরিক আইনে দায়েরকৃত সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ প্রদানের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানায়।

লাহোরের গুলবার্গে ৩টি ছাত্র সংস্থার ৬ জন নেতা সকাল ১০টা থেকে ১২ঘন্টার এক প্রতীক অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ভুট্টোর নয়া প্রস্তাবে দুই পাকিস্তানের ইঙ্গিত থাকার প্রতিবাদে তাঁরা অনশনে অংশ নেন।

---

২৪৮ সার্কুলার নম্বর: ১, পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ১৫ মার্চ ১৯৭১ (মূল কপির একটি বর্তমান লেখকের কাছে সংরক্ষিত আছে)

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে পয়লা মার্চের পর থেকে রাজশাহীর ম্যাডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস, জোহা ও মন্নুজান (মেয়েদের ছাত্রী নিবাসে) সৈন্যদের নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন।

পূর্ব পাকিস্তান চারুকারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও মুর্তর্জ বশীরের নেতৃত্বে শহীদ মিনার থেকে এক মিছিল বের করে।

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে কলিম শরাফীর নেতৃত্বে ব্রতচারী আন্দোলনের স্থায়ী অণুশীলন কর্মসূচী শুরু হয়। ব্রতচারী আন্দোলনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে ব্রতচারী অনুশীলন হবে।

ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক মালিবাগ চৌধুরী পাড়ায় এক সমাবেশে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ কায়েমের আহ্বান জানায়।

উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী গণসঙ্গীত ও গণনাট্য স্কোয়াড বের করে এবং ট্রাক যোগে স্বাধীনতা আন্দোলনের আলোকে রচিত 'শপথ নিলাম' নাটক পরিবেশন করে।

১৭ মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর ৫২ তম জন্মদিন। জনতা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে গেলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্মদিনই কি আর মৃত্যু দিনই কি?

বায়তুল মোকাররম মসজিদে আছর নামাজের পর মাওলানা শেখ মোহাম্দ ওবায়দুল্লাহ বিন সায়িদ জালালাবাদী বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন।

এ দিন বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে দ্বিতীয় দফা বৈঠক করার জন্য প্রেসিডেন্ট ভবনে যান। প্রেসিডেন্ট ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানের সাথেও এক বৈঠকে মিলিত হন।

মাওলানা ভাসানী চট্টগ্রামে এক জনসভায় বলেন, তার ৮৯ বছরের আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় জনগণের এমন ঐক্য ও উৎসাহ আর কখনো দেখেন নি। তিনি আওয়ামী লীগের সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দানের জন্য জনতার প্রতি আহ্বান জানান। মাওলানা ভাসানী আরো বলেন, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ ধরণের ঘোষণা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য থাকতে পারে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সেনাবাহিনী তলবের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করার কথা জানায় সামরিক কর্তৃপক্ষ।[২৪৯]

১৮ মার্চ বঙ্গবন্ধু সামরিক কর্তৃপক্ষের তদন্ত কমিশন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, বাংলা দেশের মানুষ এই কমিশনের সাথে সহযোগিতা করবে না। তিনি নির্দেশ দেন, কেউ যেন এই কমিশনের সদস্য না হন কিংবা সদস্য হিসেবে কাজ না করেন।

বিমানবাহিনীর সাবেক জোয়ানরা এদিন ঢাকায় শহীদ মিনারে এক সমাবেশ করে বাংলার মুক্তি সংগ্রামকে ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের ন্যায় রূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে।

প্রাক্তন উইং কমাণ্ডার বাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সশস্ত্র সংগ্রামের বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে কর্তব্য ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়।

তাঁরা দৃপ্ত কন্ঠে বলেন, আমরা সৈনিক ছিলাম, আমরা জানি কি করে শত্রুকে আঘাত করতে হয়। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে আমরা জনতাকে যুদ্ধ পরিচালনা শিক্ষা দিব। কেবল নেতার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি। তাঁরা বলেন, আমরা স্বাধীন বাংলা বিমান বাহিনী গঠন করবো। প্রাক্তন স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনীর সমন্বয়ে সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেন।

পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ শহরের বিভিন্ন যায়গায় মহিলাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ও শরীর চর্চা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করে।[২৫০]

পাকিস্তান-বাংলা যুদ্ধ শুরু

ঢাকায় যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বাংলা দেশের নেতা শেখ মুজিবের সাথে আলাপ চালাচ্ছেন তখন স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রথম মাইল-ফলকের উন্মোচন করে জয়দেবপুরের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও স্থানীয় জনসাধারণ যৌথভাবে।

১৯ মার্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ জয়দেবপুরে অবস্থানরত এক ব্যাটেলিয়ান বাঙালী সৈন্যকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেয়, কিন্তু বাঙালী সৈন্যরা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। ঢাকা থেকে একদল পাঞ্জাবী সৈন্য এ নির্দেশ কার্যকরী করতে গিয়েছিল।

২৪৯ দৈনিক পূর্বদেশ, ইত্তেফাক, আজাদ, ১৮ মার্চ ১৯৭১
২৫০ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, ১৯ মার্চ ১৯৭১

এখবর আশেপাশের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হকের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ বাঙালী বিদ্রোহী সেনাদের পক্ষে লড়ার জন্য রাস্তায় নেমে আসে। গ্রামবাসী রাস্তাগুলোতে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। জয়দেবপুরে অবস্থিত অস্ত্র নির্মাণ কারখানার রাস্তাও গ্রামবাসী বন্ধ করে দেয়।২৫১

এর পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নির্বিচারে গুলী চালায় নিরীহ গ্রামবাসীর উপর। কিন্তু পাল্টা গুলীও শুরু হয়ে যায়। কমপক্ষে ২০ জন এতে নিহত হয়।

এদিনের এক সরকারী ভাষ্যে বলা হয়, ঢাকার প্রায় ২২ মাইল দূরবর্তী জয়দেবপুরে স্থানীয় জনসাধারণ এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে গুলী বিনিময়ের ফলে উভয় পক্ষের লোকই হতাহত হওয়ার পর উক্ত এলাকায় কারফিউ জারী করা হয়।

এতে আরো বলা হয়, সামরিক বাহিনীর জনৈক কমাণ্ডার গতকাল বিকেলে জয়দেবপুরে মোতায়েন সৈন্যদের নিয়মিত পরিদর্শন শেষে ঢাকা আগমনের পথে বাধা পান। এখান থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। জনতা জয়দেবপুর বাজারের রেলক্রসিংয়ের উপর যে ট্রেনটি এনে রেখেছিল, তাদের তা সরাতে বলা হলে তারা এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে। এর পর সৈন্যরা ট্রেনটি ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে জনতা তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে। এতে ৩জন সৈন্য গুরুতরভাবে জখম হয়। সৈন্যরাও পাল্টা গুলী বর্ষণ করলে ২জন নিহত এবং ৫জন আহত হয়।

জয়দেবপুর উত্তেজিত জনতা সৈন্যদের উপর গুলীবর্ষন করে। সৈন্যদের গাড়ীর চাকা নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং জানালার কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়। জনতা সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্রাদি কেড়ে নেওয়ার জন্য অগ্রসর হলে সৈন্যরা গুলী বর্ষণ করে। ফলে ১ জন নিহত হয়।

এরপর উক্ত কমাণ্ডার এবং তার সৈন্যরা ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে অন্তত অর্ধ ডজন প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে সন্ধ্যায় ঢাকা পৌঁছায়।২৫২

২০ মার্চের সংবাদ এবং আজাদ রিপোর্ট করে পাকিস্তানী সৈন্যদের একখানি গাড়ী রেশন সংগ্রহ করতে গেলে জনগণ বাধা দিলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

২৫১ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬৭
২৫২ দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ মার্চ ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, সামরিক কর্তৃপক্ষ যেখানে বলে বেড়াচ্ছে, তাদের সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাহলে জয়দেবপুরের এক বাজারে গিয়ে সেনাবাহিনী নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর গুলি চালাল কিভাবে?

বঙ্গবন্ধু এ দিন বিক্ষুব্ধ বিজ্ঞান কর্মচারীদের এক মিছিল তার বাস ভবনে আসলে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে পাকিস্তানী রক্তচোষা সামরিক বাহিনীকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা আর কত রক্ত চাও? আর কত রক্ত পান করলে তোমাদের তৃষ্ণা মিটবে?'

এ দিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংকট নিরসনে উভয় পক্ষের ৩জন করে উপদেষ্টা এতে যোগদান করেন। প্রেসিডেন্টের পক্ষে সাবেক আইন মন্ত্রী এ. আর. কর্ণোলিয়াস, লে: জেনারেল পীরজাদা ও কর্নেল হাসান এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ড: কামাল হোসেন আলোচনায় অংশ নেন।

এদিন শুক্রবার বাদ জুমআ মসজিদে মসজিদে শহীদানের আত্মার মাগফেরাত কামনায় এবং আহতদের আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।[২৫৩]

১৯ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা কায়েমের সংগ্রাম দুর্বার করে তোলার জন্য একটি প্রচারপত্র বিলি করে। এতে বলা হয়:

--'আমরা জনগণের এই মহান বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সঠিক নীতিতে অগ্রসর করিয়া লইয়া এমন একটি 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের আহবান জানাইতেছি, যে রাষ্ট্রে শ্রমিক কৃষক ছাত্র মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ উন্মুক্ত হইবে।

প্রচারপত্রটির বক্তব্যের আরেকটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কোনো কোনো মহল থেকে তৎকালীন সাধারণ অবাঙালী বিহারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বপূর্ণ সংগ্রামেরও এতে সমালোচনা করা হয়:

---

২৫৩ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, ২০ মার্চ ১৯৭১

'তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা এই সংগ্রামকে ভুলপথে ঠেলিয়া দেওয়ারও প্রচেষ্টা করিতেছে। ইহারা 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা'য় তাহাদের শ্রেণীস্বার্থ হাসিলের লক্ষ্য হইতে বাঙ্গালী জনতাকে বুঝাইতে চায় যে এই সংগাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে এবং এমনকি তাহারা আরও বুঝাইতে চায় যে এই সংগ্রামে পূর্ব বাংলার অবাঙ্গালী মেহনতী জনগণও আমাদের জনতার দুশমন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে শাসক গোষ্ঠী আমাদের সংগ্রামকে দমন করিতে চাহিতেছে উহারাই পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণকেও শোষণ করিতেছে। তাই এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, পূর্ববাংলার অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধেও নয়। এই সংগ্রাম পরিচালিত করিতে হইবে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও উহাদের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে।'[২৫৪]

ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের সামরিক মহড়া

২০ মার্চ পূর্ব বাংলার রাজধানীতে ঘটে আরেকটি অবিস্মরনীয় ঘটনা। এদিন ছাত্র ইউনিয়নের ট্রেনিংপ্রাপ্ত শত শত গণবাহিনী রাজপথে ডামি রাইফেল কাঁধে নিয়ে মার্চপাস্ট করে। এ দৃশ্য ঢাকার মানুষের কাছে নতুন। জনতা বাঙালী ছাত্র-যুবকদের অস্ত্র হাতে নিয়ে কুচকাওয়াজ করতে দেখে আন্দোলিত হয়ে উঠে এবং করতালির মাধ্যমে বাংলার যুবশক্তিকে অভিনন্দন জানায়।

এর পূর্বে সকাল সাড়ে নয়টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ছাত্র ইউনিয়ন গণবাহিনীর প্রথম শিক্ষাশিবিরে আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। দশদিন প্রশিক্ষণ শেষে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা শিবিরের সমাপ্তি ঘটে। এবং পরদিন রোব-বার ২১ মার্চ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শুরু করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

এই সময় রৌদ্রকরোজ্জ্বল ময়দানে মোট ১২টি প্লাটুনে বিভক্ত হয়ে গণবাহিনীর সদস্য-সদস্যাগণ প্যারেড, শরীরচর্চা ও রাইফেলের কলাকৌশলাদি প্রদর্শন করে।

প্রদর্শনীর পূর্বে ছাত্র ইউনিয়নের পতাকা উত্তোলন ও গণবাহিনীর শপথ গ্রহণ করান সংগঠনের সভাপতি নুরুল ইসলাম।গণবাহিনী প্রিয় মাতৃভূমি পূর্ব বাংলাকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়াবাদ পুঁজির শোষণ থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক জনতার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করার শপথ গ্রহণ করে।

---

২৫৪ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩৩

ছাত্রইউনিয়নের বিপুল সংখ্যক ছাত্রীকর্মীও এদিনের রাজপথের রুট মার্চে অংশ নেয়।[২৫৫]

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্ব স্ব শাখাকে প্যারেডের নির্দেশ দিয়ে ২১ মার্চ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হলে বিকেল ৪টায় সকলকে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানায়।

বঙ্গবন্ধু এদিন ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব দিবস উপলক্ষে ২৩ মার্চ বাংলায় ছুটি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য ২৩ মার্চ এযাবৎ পাকিস্তান দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল।

জয়দেবপুরে জনতা-সেনাবাহিনী সম্মুখ যুদ্ধের পর যে কারফিউ জারী করা হয়েছিল তা একটানা ম্যারাথন গতিতে চলতে থাকে। এদিনের সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী এ ম্যারাথন কারফিউ ২৯ ঘন্টা চলার পরও তুলে নেওয়া হয় নি। এর মধ্যে জনগণকে ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয় নি। বের হলেই তাদের প্রতি গুলী বর্ষণের নির্দেশ ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত রাজনীতিক মিয়া মোমতাজ দৌলতানা ও মাওলানা মুফতী মাহমুদ এদিন বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে তাঁর সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। পরে কাল পতাকা, জয়বাংলা ও বাংলার মানচিত্র খচিত সবুজ লাল পতাকা শোভিত বঙ্গবন্ধুর গাড়ীতে করে তারা হোটেলে ফিরে যান।

ঢাকায় পাকিস্তানী অতিথি রাজনীতিকরা নিজেরা এক রুদ্ধদ্বার ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তানের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মোমতাজ দৌলতানা, ন্যাপের ওয়ালীখান, জামায়তে ওলামায়ে ইসলামের মাওলানা মুফতী মাহমুদ, পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সরদার শওকত হায়াত খান, পশ্চিম পাকিস্তান ওয়ালী ন্যাপের গাউস বকস বেজেঞ্জো প্রমূখ এই বৈঠকে অংশ নেন। এদিন পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনজীবী এ.কে ব্রোহীও করাচী থেকে ঢাকায় আসেন।

বঙ্গবন্ধু এদিন কোনো প্রকার আলোচনার খবরে বিভ্রান্ত না হয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে এক বাণীতে বলেন, সত্যাগ্রহ চলতেই থাকবে।

২৫৫ আজাদ,২১ মার্চ ১৯৭১

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এদিনও তাদের নাম ভেঙে চাঁদা আদায়ের প্রতিবাদ করে এক বিবৃতি দেয়।[২৫৬]

প্রকৃতপক্ষে এরকম বিবৃতি মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৪ নেতা দিয়ে আসছিলেন। শহরের বিভিন্ন স্থানে এক শ্রেণীর কর্মীদের চাঁদা আদায়, গাড়ী আটকিয়ে সার্চ করা ও অন্যান্য আপত্তিজনক কাজ-কর্মে লিপ্ত হতে দেখা যায় এবং নেতৃবৃন্দের কাছে একের পর এক অভিযোগ আসতে থাকলে তাঁরা এ সম্পর্কে ঘন ঘন বিবৃতি দিচ্ছিলেন। ১৬ মার্চ থেকে এজন্য সংগ্রাম পরিষদ তাদের বসানো চেকপোস্টও প্রত্যাহার করে নেয়। বস্তুত কিছু কর্মী এসময় মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিচ্ছিল।

ভুট্টোর পুন:আগমন

২১ মার্চ পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো অভূতপূর্ব কড়া নিরাপত্তায় নির্বাচনের পরে দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা এসে পৌঁছান। তাঁর সাথে দলের সেক্রেটারী জেনারেল জে.এ. রহিম, মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী, গোলাম মোস্তফা জাতো, মমতাজ আলী ভুট্টোসহ ১২জন উপদেষ্টা ছিল। বিমানবন্দর ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তিনি বিরূপ সংবর্ধনা লাভ করেন। দৈনিক আজাদ রিপোর্ট করে, এমনকি হোটেলের লিফটও তাঁকে বহনে রাজী হয় নি। ভুট্টো লিফটে উঠতে গেলে অকস্মাৎ তা অচল হয়ে পড়ে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদিন এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। এদিনের বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দীন আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এদিন আগত হাজার হাজার মিছিলকারীর উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, আন্দোলন শিথিল হবে না।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এদিন এক বিবৃতিতে ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবস পালনের আহবান জানায়। ৪ নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচী ঘোষণা করে বলেন,

---

২৫৬ সংবাদ, ইত্তেফাক, আজাদ, ২১ মার্চ ১৯৭১

১ এদিন ভোর ৫টায় সরকারী ও বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন
২ ভোর ৫টায় প্রভাতফেরী ও শহীদের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ
৩ ৯টায় পল্টন ময়দানে জয়বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ
৪ ১১টায় বায়তুল মোকররমে ছাত্র জনসভা

শীতলক্ষার বুকে নারায়নগঞ্জে ছাত্রজনতা দুপুর একটায় মহিলা-পুরুষের যৌথ উদ্যোগে এক দীর্ঘ জাহাজ মিছিল বের করে স্বাধিকারের দাবীতে শ্লোগান দেয়।

বঙ্গবন্ধুর সাথে পাকিস্তানী বিশিষ্ট আইনজীবী এ. কে ব্রোহী দেখা করেন।

ভাসানী ন্যাপের পূর্বাঞ্চল শাখার সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান যাদু মিয়া এক বিবৃতিতে, জয়দেবপুরের ঘটনায় দু:খ প্রকাশ করে গণহত্যার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনগণের কাছে আহবান জানান।

বৈঠক আর বৈঠক

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অনেক আলাপ আলোচনার পরও শেখ মুজিবকে রাজীকরাতে ব্যর্থ হয়ে ২২ মার্চ তাঁর ঘোষিত ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন পুনরায় স্থগিত করতে বাধ্য হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জানান, ৭ মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় তিনি যে ৪ দফা শর্তারোপ করেছেন তা না মানা পর্যন্ত তিনি কোনো অধিবেশনে বসতে পারেন না। এদিন ইয়াহিয়া, মুজিব এবং ভুট্টোর তিনপক্ষের শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াহিয়া-মুজিব মোট ৫ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই ত্রি-পক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বঙ্গবন্ধু জানান, তিনি ত্রি-পক্ষীয় বৈঠকের কথা জানতেন না। প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করতে গিয়ে তিনি সেখানে ভুট্টোকে দেখতে পান।

এছাড়া, প্রেসিডেন্ট ঢাকায় তাঁরই মতো আসা পশ্চিম পাকিস্তানী সকল অতিথি রাজনীতিকদের নিয়ে দুই ঘন্টা ব্যাপী এক বৈঠক করেন। এতে মিয়া মোমতাজ দৌলতানা, সরদার শওকত হায়াত খান, মাওলানা মুফতী মাহমুদ,ওয়ালী খান, গাউস বখশ বেজেঞ্জো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রেসিডেন্ট এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে সারাদিন বৈঠক করেই কাটান। প্রেসিডেন্ট তাঁর শাসনকালীন সময়ের সবচেয়ে কঠিন

২৫৭ সংবাদ, ইত্তেফাক, আজাদ, ২১ মার্চ ১৯৭১ ২২ মার্চ ১৯৭১
২৫৮ আজাদ ২৩ মার্চ ১৯৭১

সময়টি এ সময় ঢাকায় কাটাচ্ছিলেন। তিনি ৩ মার্চ প্রথম জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। পরে তা বাতিল করেন। এরপর ১০ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক আহবান করেন। পরে তা আবার বাতিল করেন। ২৫ মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহবান করে তা আবার বাতিল করার মধ্য দিয়ে একের পর এক তাঁর ব্যর্থতার ছবি পাকিস্তানের রাজনীতিতে ফুটে উঠে।

২২ মার্চ যশোরে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে এক বিরাট সমাবেশ শেষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী করে। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক লাঠি, তীর, ধনুক ও বেলচাসহ শহরে মিছিল করে। এই সময় সারা শহরে মাইকযোগে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়।

এদিন কোটচাঁদপুরেও প্রায় ৪ হাজার আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী র‍্যালী করে এবং তারপর আওয়ামী লীগের স্থানীয় সমাবেশে যোগদান করে।

সিলেটে এদিন হাজার হাজার মহিলা বিক্ষোভ মিছিল করে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তাঁদের প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

২৩ মার্চ : দিবসের দিবস

২৩ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনন্য দিন। বঙ্গবন্ধু এদিনটিতে ছুটি ঘোষণা করেছিলেন।

ভোর পাঁচটায় বিদ্রোহী বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজ হাতে তাঁর বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়ে দেন। আর এরই মাধ্যমে ২৩ বছরের পাকিস্তানী পাঞ্জাবী শাসনের থেকে মুক্তির ঘোষণা আনুষ্ঠানিকতা লাভ করে।

বেলা ১২টায় তাঁর বাসভবনে আগত এক মিছিলের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমরা নিশ্চয়ই শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালাতে চাই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোনো আক্রমণ আমরা সহ্য করবো।

বঙ্গবন্ধু বলেন, সেই ভাল সিপাহসালার যিনি কম রক্তপাতে সফলতা অর্জন করতে পারেন। তিনি বলেন, গত ২২ দিনের অসহযোগ আন্দোলনে ক্ষমতাসীন চক্রের

মাজা ভেঙ্গে দিয়েছি। বাংলাদেশে যাতে একটিও শোষণকারী থাকতে না পারে, সেই-জন্য ব্যাপক আন্দোলন অব্যাহত রাখা হবে।

২৩ মার্চ বিভিন্ন দল ও ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন নামে দিবসটি পালন করে। স্বাধীনবাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দিবসটি প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করে। ভাসানী ন্যাপ-স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস, বাংলা জাতীয় লীগ (অলি আহাদ) - স্বাধীন বাংলাদেশ দিবস, কৃষক শ্রমিক পার্টি-লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন দিবস, বাংলা ছাত্র লীগ-প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক-বাংলা দিবস হিসেবে ২৩ মার্চ পালন করে।

কাক ডাকা ভোর থেকেই 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানের মধ্য দিয়ে দিবসের সূচনা হয়। প্রভাত ফেরী এবং সর্বত্র নতুন বাংলার পতাকা উড়িয়ে নেচে ছাত্র-যুবকরা মিছিল করে বেড়ায়।

এই দিনের কর্মসূচীর প্রধান আকর্ষণ ছিল পল্টন ময়দানে সকাল ৯টায় জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও মহড়া। প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে 'জয় বাংলা বাহিনী'র কুচকাওয়াজ শুরু হয়।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃচতুষ্টয় 'জয় বাংলা বাহিনী'র অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জয় বাংলা বাহিনীর দুটি দল যুদ্ধের মহড়া প্রদর্শন করে। কুচকাওয়াজ শেষে জয় বাংলা বাহিনী ও উপস্থিত জনতার এক বিরাট অংশ মার্চ করতে করতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় প্রদক্ষিণ করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে উপস্থিত হয়। বঙ্গবন্ধু এখানে জয়বাংলা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন।

প্রতিরোধ দিবসের শেষ পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা মো: শাহজাহান। বক্তৃতা করেন, আ.স. ম. আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী ও তোফায়েল আহমদ প্রমূখ। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, আর লাহোর প্রস্তাব নয়, এবার সরাসরি স্বাধীন বাংলা কায়েম করবো। তাঁরা আরো বলেন,

উপনিবেশবাদী শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ অবশ্যই একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করবে।

ঘটনাবহুল এদিনে বাংলার ঘরে ঘরে, অফিস-আদালতে বাংলাদেশের পতাকা শোভা পায়। সর্বত্র মুক্ত আকাশে পতপত করে উড়তে থাকে নতুন স্বাধীন সোনার বাংলার পতাকা। এমনকি মহামান্য ভুট্টো যে হোটেল ইন্টাকন্টিনেন্টালে উঠেছিলেন তার শীর্ষদেশেও উড়তে থাকে বাংলাদেশের সত্য সুন্দর বিজয় নিশান। ঢাকায় অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসগুলিও তাদের ভবনের শীর্ষে নতুন পতাকা উড়িয়ে দেয়।২৫৯

দিবসটির প্রধান আকর্ষণ ছিল পৃথিবীর মানচিত্রে এই প্রথম নতুন বাংলাদেশের নতুন পতাকা। উচ্ছ্বসিত হয়ে এদিনের ঢাকার একটি ইংরেজী পত্রিকার শিরোনাম হয়, "A new Flag is born'. এতে লেখা হয়:

'A new flag is born today-a flag with a golden map of Bangladesh implanted on a red circle placed in the middle of deep green rectangle base. This is the latest flag added to the total list of the flags representing various states and nations of the contemporary world. This is the flag for 'Independent Bangladesh'. This is the flag that symbolizes the emancipation of 75 million Bangalees.'২৬০

প্রেসিডেন্ট সারাদিন ক্যান্টনমেন্টে

এদিনও প্রেসিডেন্ট ও বঙ্গবন্ধুর উপদেস্টাদের নিস্ফল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ড: কামাল হোসেন এবং প্রেসিডেন্টের এ. আর কর্নেলিয়াস, লে: জেনারেল পীরজাদা এবং কর্নেল হাসান এতে যোগ দেন। বৈঠকে আওয়ামী লীগের নেতারা তাঁদের নীতিতে অটল এবং অবিচল থাকেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এদিন সারাদিন ক্যান্টনমেন্টে কাটান। পরে পশ্চিম পাকিস্তানী ৫ জন নেতার সাথে বৈঠক করেন।

---

২৫৯ আজাদ ২৪ মার্চ ১৯৭১
২৬০ দি পিপল (ঢাকা), ২৩ মার্চ ১৯৭১

ভুট্টো সারারাত তাঁর দলের উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠক করেন[২৬১] এবং চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রের কুমতলব আঁটেন।

সংকট ঘনীভূত

২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এম. ভি সোয়াত জাহাজ থেকে সামরিক বাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্র খালাস করার কথা শহরে ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার মানুষ বন্দর এলাকা ঘেরাও করে রাখে। সৈন্যরা যাতে শহরে প্রবেশ করতে না পারে এবং অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে চালান করতে না পারে তার জন্য সারা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা ক্যান্টনমেন্টের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী পথের কয়েকটি পুলও নষ্ট করে দেয়। এর মধ্যে প্রতিরোধকারী জনতার উপর সেনাবাহিনী গুলী ছুঁড়ছে বলেও খবর পাওয়া যায়।

রংপুর শহরে অকস্মাৎ সান্ধ্য আইন জারী করা হয় এবং অবাঙালী বিহারী অধ্যুষিত সৈয়দপুর শহরে সাদা পোশাকধারী সেনাবাহিনীর অস্ত্রধারীরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বলে খবর বের হয়।।

দৈনিক আজাদ এক গুরুতর সংবাদ পরিবেশন করে বলে সৈন্যবাহী একটি বিদেশী বিমান ২৪ মার্চ পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের কোন এক অজ্ঞাত স্থানে গোপনে অবতরণ করে।[২৬২]

সব মিলিয়ে বাংলার রাজধানী ঢাকা ২৪ মার্চ এক অনিশ্চিত ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে কাটায়। দুপুরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে একটি বিশাল মিছিল তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি দৃপ্ত কন্ঠে বলেন, কেউই শেখ মুজিবের মাথা ক্রয় করতে পারবে না। অন্য কেউ শহীদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।

আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে এক বৈঠকের পর এসে বলেন, 'আওয়ামী লীগ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে প্রস্তুত নয়'।

---

২৬১ আজাদ, ২৪ মার্চ ১৯৭১
২৬২ ঐ ২৫ মার্চ ১৯৭১

এদিনই দলে দলে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ঢাকা ত্যাগ করতে থাকেন। বিমানবন্দরে মিয়া দৌলতানা বলেন, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তেই যাচ্ছেন। 'সব ঠিক হইয়া যাইবে'।

সর্বশেষ ঢাকা আগমনকারী খান আবদুল কাইউম খান মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু ভুট্টোর দল বলেন, তারা ঢাকা ত্যাগ করছেন এই জন্য যে, বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সমস্যার প্রশ্নে আলোচনার জন্য তাদের উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই।

টেলিভিশনে এদিন রাতের কোনো অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব হয় নি। টেলিভিশনের সকল কর্মচারী এখানে প্রহরারত সেনাবাহিনীর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কোনো প্রকার অনুষ্ঠান প্রচার করতে অস্বীকার করে। সৈন্যরা জোর করে টেলিভিশনে গণঅনুষ্ঠান প্রচারে হস্তক্ষেপ করলে কর্মচারীরা বাধা দেয়। এ সময় সেনাবাহিনীর একজন সদস্য একজন টেকনিশিয়ানকে মারধোর করে বের করে দিলে সকল কর্মচারী ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে।[২৬৩]

পরাধীন বাংলার শেষ জনসভা

পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হায়দার আকবর খান রণো এবং পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান সালু ২৪ মার্চ এক বিবৃতিতে দুই সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ২৫ মার্চের পল্টন ময়দানের জনসভা সফল করার আহবান জানান।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, এদিন পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।[২৬৪]

২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে স্বাধীনতাকামীদের শেষ জনসভা করেন রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রণো এবং কাজী জাফর আহমদ। কাজী জাফর আহমদ এদিন শেষ বক্তা হিসেবে পরাধীন বাংলায় সর্বশেষ বক্তৃতা করেন।[২৬৫]

অন্যদিকে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীও একটি প্রবন্ধে ২৫ মার্চ সাবেক হাবিব ব্যাংকের কর্মচারীদের একটি সভায় বক্তৃতা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন।[২৬৫ক]

---

২৬৩ আজাদ, ২৫ মার্চ ১৯৭১
২৬৪ ঐ
২৬৫ প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে প্রাপ্ত তথ্য (তথ্য অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা থেকে প্রচারিত 'তথ্য বিবরণী') তারিখ: ১২ আগস্ট ১৯৮৯
২৬৫ক নূরে আলম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত

তবে মার্চের ২৫ তারিখে এই একটি সভা ব্যতিরেকে পয়লা মার্চ থেকে এই দীর্ঘ অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে মাও সেতুং-এর চিন্তাধারা অনুসারী বলে পরিচিত চীনপন্থী কোনো ছাত্রসংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, এমনকি ভাসানী ন্যাপের তৎপরতাও বিস্মকরভাবে অনুপস্থিত। একমাত্র মাওলানা ভাসানী এসময় কিছু জনসভা করে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু মার্চের উত্তাল দিনগুলোর প্রতিদিনকার কর্মসূচীতে দৈনিক পত্রিকা সমূহে এ দলগুলোর কোনোই খবরা খবর নেই।

রাশেদ খান মেনন এ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সময় আমরা অস্ত্র সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সায়েন্স ল্যাবরেটরী থেকে এসময়েই আমরা বিস্ফোরক দ্রব্য ছিনতাই করি। এজন্য অসহযোগ আন্দোলনে আমরা ছিলাম না'।[২৬৬]

কিন্তু পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের (মাহবুবউল্লাহ পন্থী) নেতা মাহফুজউল্লাহ অসহযোগ আন্দোলনে চীনপন্থী ছাত্রইউনিয়নের সকল গ্রুপের অসহযোগ আন্দোলনে অনুপস্থিতি সম্পর্কে বলেন, 'ষাটের দশকের শেষদিক থেকে নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রভাব চীনপন্থী সকল কমিউনিস্ট গ্রুপ ও ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যেই পড়ে। এখানে শুধু মাত্রাভেদ ছিল, এছাড়া সবাই কম-বেশী শ্রেণী-শত্রু খতমের গলাকাটার লাইনেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ফলে বুর্জোয়া রাজনীতির বিপক্ষে গণসংগঠন বিলুপ্ত করারও একটা তাত্বিক প্রক্রিয়ায় সকলেই বিভ্রান্ত ছিল। এই বিভ্রান্তিটা ছিল মূলত নেতৃপর্যায়ে, সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা ছিল না। ফলে নেতৃবৃন্দ একটা ভুল সিদ্ধান্তে অসহযোগ আন্দোলনকে 'অর্থহীন' ভেবেছিলেন। তাঁরা একে গণসংগঠনের রাজনীতি ও বুর্জোয়া রাজনীতির অংশ ভেবেছিলেন।

ফলে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেও (মাহবুবউল্লাহ, মেনন, জাফর প্রমুখ ৭০ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন) যখন বাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্য রাস্তায় নেমে পড়লো তখন তারা পিছিয়ে থাকলেন। জনগণের আন্দোলনে ও স্বাধীনতার প্রাক প্রস্তুতিতে তারা অংশ নিলেন না'।

এ প্রসঙ্গে ছাত্রনেতা মাহফুজউল্লাহ আরো বলেন, '১৯৬৫ সালের পূর্ববর্তী ও ৬৫ সালের পরবর্তী কমিউনিস্ট চিন্তাধারার মধ্যেও পার্থক্য ছিল। ৬৫ পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দ ছিলেন, ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি ইত্যাদি বইপড়া কমিউনিস্ট, কিন্তু ৬৫ পরবর্তীরা আইয়ুব খানের খারাপ কাজের মধ্যেও একটা ভালকাজ পেয়েছিলেন, তা ছিল, চীনের থেকে লাল বই আমদানীর অবাধ সুযোগে মৌলিক সমাজতন্ত্রী বইয়ের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছিল তারা। ফলে চেতনায় নতুন কর্মীরা অনেক

২৬৬ সাক্ষাৎকার : রাশেদ খান মেনন

অগ্রসরমান ছিল এক্ষেত্রে। এতে নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয় পার্টিতে। এ দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া যখন তীব্র তখনই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ফলে বৃহত্তর অর্থে চীনপন্থী বিপ্লবীরা জনগণের আন্দোলনে অংশ নিতে পারল না'।২৬৭

মাহফুজউল্লাহ জানান, 'মতিন আলাউদ্দিনের পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সম্পর্ক ছিল। এই পার্টি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে এটা চলতে পারে কিনা এ প্রশ্নে কিন্তু পার্টিতে তখনও বিতর্ক ছিল। তবে চীনাপন্থী অনুসরণকারী দলগুলোর মধ্যে দেবেন শিকদার, আবুল বাসার সব সময়ই স্বাধীনতার প্রশ্নে স্পষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে, দেবেন শিকদার পার্টিতে সবসময়ই এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া এ অঞ্চলের জনগণের সাথে শোষক শ্রেণীর দ্বন্দ্বের অবসান হবে না। তিনি বলতেন, স্বায়ত্তশাসনে এ দ্বন্দ্বের মীমাংশা হবে না।'২৬৮

একটি চিরকুট

ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি নূরুল ইসলাম জানান, ২৫ মার্চ সকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে নিয়মিত সামরিক ট্রেনিং শুরু করার পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টি নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ থেকে একটি 'চিরকুট' পান। তাতে এ দিন রাত থেকেই পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়। 'চিরকুটে' আমাদের অবিলম্বে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ ও এর প্রস্তুতিতে আনুসঙ্গিক কাজ সারতে বলা হয়।

তিনি বলেন, 'আমরা সাথে সাথেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ি এবং পাড়ায় পাড়ায় সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে জণগণকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে মাইকিং করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের বলা হয়, সকল ছাত্রকে নিয়ে হল ত্যাগ করতে। কেউ কেউ এ নির্দেশ মেনে হল ত্যাগ করলেও অনেকে অনুধাবন করতে পারেনি। ফলে অনেক হলেই বেশ কিছু ছাত্র শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। ছাত্র ইউনিয়নের এস. এম হলের নেতা আজিম ও জগন্নাথ হলের নেতা সুশীলও সে রাতে হলে থেকে যান। তারা হলত্যাগকারী শেষ দলটিকে বলে-ছিলেন, 'সাধারণ ছাত্রদের কিছু যেহেতু হলে থেকে গেল,তাই নেতৃপর্যায়ে কারো কারো থাকা দরকার'। ফলে সে রাতে তাঁরাও সাধারণ ছাত্রদের সাথে নিহত হন'।২৬৯

২৬৭ সাক্ষাৎকার : মাহফুজউল্লাহ
২৬৮ ঐ
২৬৯ সাক্ষাৎকার : নূরুল ইসলাম

স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ:
বাংলাদেশের
ছাত্র আন্দোলনের
গৌরবোজ্জ্বল
অধ্যায়

পাকিস্তানী সৈন্যরা ২৫ মার্চ রাতে কামান, মর্টার রাইফেল নিয়ে অতর্কিতে দিকে দিকে বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তখন গ্রেফতার হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাঁর সর্বশেষ বাণী বাংলার মানুষের কাছে পাঠালেন,

'This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'[১]

(এই-ই হয়তো তোমাদের জন্য আমার শেষবাণী। আজকে থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। যে যেখানেই থেকে থাক, যে অবস্থায় থাক, হাতে যার যা আছে, তাই দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তোল। ততোদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে, যতোদিন পর্যন্ত না দখলদার পাকিস্তানীদের শেষ সৈনিকটি বাংলাদেশের মাটি থেকে, বহিষ্কৃত হচ্ছে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হচ্ছে।)

বার্তাটি পরে ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পড়ে শোনান হয়।

জেনারেল টিক্কা খানের জনসংযোগ অফিসার সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, পাকিস্তান রেডিওর সরকারী তরঙ্গের (ওয়েভ লেংনথ-এর) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকেও ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবের এই ঘোষণা ক্ষীণ কন্ঠে ভেসে উঠেছিল।[২]

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন ই পি আর ওয়ারলেস যোগে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করছিলেন তখন সবেমাত্র পাকিস্তানী বাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হচ্ছে। ফার্মগেট এসে সবেমাত্র পৌঁছেছে এবং প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। এরপর তারা পিলখানায় ই পি আর ও রাজারবাগে পুলিশের দুর্গ আক্রমণ করে। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এ খবর পেয়েছিলেন। ফলে

---

১ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র :* তৃতীয় খণ্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৮২) পৃষ্ঠা ১ [পরে শুধু 'স্বাধীনতার দলিল' উল্লিখিত]

২ সিদ্দিক সালিক, *নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল,* (ভাষান্তর : মাসুদুল হক), (ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮) পৃষ্ঠা ৮৫
[সিদ্দিক সালিক ১৯৭১ সালে ঢাকায় হানাদার পাকিস্তানীদের গণসংযোগ অফিসারের দায়িত্ব পালন করছিলেন-লেখক]

তিনি আরেকটি বার্তা ঢাকার টি এণ্ড টি মারফত পাঠালেন। ঢাকার টি এণ্ড টি-র (টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন) এক্সচেঞ্জ তখনো খোলা ছিল। সর্বশেষ যে বার্তাটি তিনি পাঠালেন, তাতে বলা হলো,

'পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর সদর দপ্তর আর রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ওপর আক্রমণ করেছে। সমস্ত শক্তি জড় করে প্রতিরোধ করুন আর স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুতি নিন'।[৩]

বিদেশী লেখক রবার্ট পেইন খুব অবাক হয়ে এ সম্পর্কে লিখেছেন,

'খবরটি কিভাবে কোত্থেকে এলো তা ভেবে কেউ বসে থাকলো না। সারা পূর্ব পাকিস্তানের শহরে-বন্দরে খবরটি ছড়িয়ে গেল। এটাই ছিল পাকিস্তানী বাহিনীর প্রথম মারাত্মক ভুল যে তারা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল না করেই পিলখানা আর রাজারবাগে আক্রমণ চালায়'।[৪]

বঙ্গবন্ধুর এই দিনের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তুতি সম্পর্কিত বিবরণ পাওয়া যায় খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন,

'...২৫ মার্চের কালরাত্রি। রাত সাড়ে আটটা-নয়টা নাগাদ। বৈঠকখানা ঘরে তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কর্ণেল ওসমানী, ডক্টর কামাল হোসেন, আবদুল মান্নান, আমিরুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ঘরে জায়গা নেই। বঙ্গবন্ধু পাশের বাথরুমে এক একজন নেতাকে ডেকে নিচ্ছেন এবং কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলে বিদায় দিচ্ছেন। আমার যখন ডাক পড়লো, তিনি বললেন: আজ রাতেই ইন্দোনেশিয়ার মতো সেই হত্যাকাণ্ড হতে চলেছে বাঙালাদেশে।... যদি পাক বাহিনী বাঙলাদেশ আক্রমণ করেই বসে, তবে নির্দেশ পাঠিয়েছি স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্যে।... আমি যদি দেশত্যাগ করে পালিয়ে যাই, তবে ঢাকা শহরসহ সমগ্র বাঙলাদেশ নরপশুরা একেবারে ধ্বংস করে ছাড়বে।... আমি তা সহ্য করতে পারবো না, তার চেয়ে মৃত্যুই আমার শ্রেয়'।[৫]

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ বলেছেন এর পরের কথা,

'২৫ শে মার্চ রাত এগারটায় বঙ্গবন্ধু ই পি আর ওয়ারলেস মারফত "enemy has strad us, hit them back' -উক্ত বার্তাটি বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় প্রেরণ করেন'।[৬]

---

৩ রবার্ট পেইন, *ম্যাসাকার*, [বাংলাদেশ-গণহত্যার ইতিহাসে ভয়ংকর অধ্যায়] (ভাষান্তর :গোলাম হিলালী), (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রকাশের তারিখ নেই) পৃষ্ঠা ১৬-১৭
৪ রবার্ট পেইন প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৭
৫ খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *মুজিববাদ* (ঢাকা: সাম্য প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৫৭৭-৭৮
৬ শাজাহান সিরাজ, সম্পাদকের কার্যবিবরণী, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ১৯৭২ (প্রচার সম্পাদক, মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত), পৃষ্ঠা ৩২

পাকিস্তানের আক্রমণকারী সামরিক সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই (আগস্ট, ১৯৭১) 'পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট সম্পর্কে' যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিল, তাতেও স্বীকার করা হয়েছে।'

'২৫ মার্চ দিনগত রাতে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা অনুযায়ী সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটন এবং 'স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের' অভ্যুত্থান বাস্তবায়িত করার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে প্রেসিডেন্ট (ইয়াহিয়া-লেখক) পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং সরকারের (পাকিস্তানের-লেখক) কর্তৃত্ব, পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান।'[৬ক]

পাকিস্তান সেনাবাহিনী: আক্রমণের পরিকল্পনা ও নকশা

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও অন্যান্য পাকিস্তবনী নেতৃবৃন্দ আলোচনার ভান করে মূলত ভেতরে ভেতরে রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছিলেন। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ এ সত্যটি টের পেয়েছিলেন অনেক পরে। ২৫ মার্চ রাত থেকেই পাকিস্তানী আর্মীরা আক্রমণ করতে পারে এমন একটা গুজব সকাল থেকেই শহরে চলছিল।

ফলে নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা দিনের বেলাতেই বঙ্গবন্ধুর সাথে শেষ দেখা করে সরে পড়েন। বাঙালী সৈনিক, পুলিশ, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লোকজন, ছাত্র এবং অন্যান্যরা বঙ্গবন্ধু এবং কর্ণেল ওসমানীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলো। শহরের রাস্তায় এই জন্য অসংখ্য ব্যারিকেডও তারা তৈরী করে ফেলেছিলো, যাতে সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করতে না পারে।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের সর্বোচ্চমহল আক্রমণের সময় ঠিক করে ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১টা থেকে (ঘড়ি অনুযায়ী এ সময় ২৬ মার্চ শুরু হয়ে যায়)। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে এই নারকীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে দ্বন্দ্ব ছিল। মেজর জেনারেল খাদিম ও রাও ফরমান আলী প্রথমে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, ফলে এরই মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাঁদের বিকল্প মেজর জেনারেল জানজুয়া এবং এ মিঠঠাকে এনে ঢাকায় 'স্ট্যাণ্ডবাই' রেখে দেওয়া হয়েছিল।

পাকিস্তানীরা মাঝরাতের এই আক্রমণের নাম দিয়েছিলো 'অপারেশন সার্চ লাইট'। সময় ঠিক হয়েছিল রাত ১.০০ মিনিট। ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে। নিম্নোক্ত পরিকল্পনায় দায়িত্ব ভাগ করা হয়:

৬ক পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট সম্পর্কে শ্বেতপত্র, পাকিস্তান সরকার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ, তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দফতর, ঢাকা, ৫ আগস্ট, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৪০

১ পিলখানায় অবস্থিত ২২ নম্বর বালুচ রেজিমেন্ট সেখানে বিদ্রোহী ৫ হাজার বাঙালী ই পি আর সেনাকে নিরস্ত্র করবে এবং তাদের বেতার কেন্দ্র দখল করবে

২ ৩২ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ১ হাজার বাঙালী পুলিশকে নিরস্ত্র করার

৩ ১৮ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট নবাবপুর ও পুরনো শহরে হামলা চালাবে

৪ ২২ নং বালুচ, ১৮ ও ৩২ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বাছাই করা একদল সৈন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হল আক্রমণ করবে

৫ বিশেষ সার্ভিস গ্রুপের এক প্লাটুন কমাণ্ডো সৈন্য শেখ মুজিবের বাড়ী আক্রমণ করবে এবং তাঁকে জীবন্ত ধরে আনবে

৬ ফিল্ড রেজিমেন্ট দ্বিতীয় রাজধানী এবং বিহারীদের এলাকা (মিরপুর-মোহম্মদপুর) পাহাড়া দেবে

৭ ভয় দেখানোর জন্য ট্যাংক বহরের একটি ছোট্ট স্কোয়াড্রন তৈরী থাকবে। প্রয়োজন হলে তারা গোলাবর্ষণ করবে

৮ উপরিউক্ত সৈন্যরা রাস্তায় প্রতিরোধ হলে তা ধ্বংস করে দেবে এবং তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ীতে হানা দেবে।

পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল অভিযান শুরু হবে রাত ১টা থেকে। তাই অল্প আগে যার যার 'পজিশনে' চলে যাবে। কিন্তু কোনো কোনো বাহিনী মনে করলো রাস্তায় দেরী হয়ে যেতে পারে, তাই রাত ১১-৩০ মিনিটেই তারা বের হয়ে যায়। এবং ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরে বের হয়ে প্রথমেই তারা বাধা পেল ফার্মগেটে--ব্যারিকেড ও জয় বাংলা শ্লোগান থেকে--যুগপৎভাবে।

ফলে যে গুলীর আওয়াজ শোনা যাওয়ার কথা ছিল রাত ১টা থেকে তা শুরু হয়ে গেল রাত সাড়ে ১১টা থেকেই। গুলীর আওয়াজের সাথে 'জয় বাংলা' ধ্বনি মিশে একাকার হয়ে গেল। বোঝা গেল, অস্ত্রই বিজয়ী হয়েছে।

এ সময় প্রথম গুলীটি যখন বর্ষিত হল, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিও-র সরকারী তরঙ্গের (ওয়েভ লেংনথ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবের ক্ষীণ কন্ঠস্বর ভেসে এলো। ওই কন্ঠের বাণী মনে হল আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে 'গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা করলেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তখন আকাশে। গভীর রাতে তিনি ঢাকা ছাড়েন। সম্ভবত তিনি তখন কলম্বো-করাচীর আকাশের মাঝপথে।

পাকিস্তানী কমাণ্ডোরা গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে মুজিবের বাড়ীর সামনে এসে তাঁর বাড়ীর প্রহরীদের পাল্টা গুলীর সম্মুখীন হল। এক পর্যায়ে প্রহরীদের নিরস্ত্র করতে সমর্থ হয় এবং ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার করে চিৎকার করে মুজিবকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানায়। মুজিবের কক্ষ বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। পাকিস্তানী কমাণ্ডোরা গুলী করে তালা ভাঙলো এবং মুজিবকে গ্রেফতার করলো, তারপর ওয়ারলেসে খবর পাঠালো— 'বড় পাখিটা খাঁচার ভেতরে'।

মুজিবকে তাঁর সামনে আনা হবে কিনা এমন প্রশ্নে জেনারেল টিক্কা, গর্জে উঠলেন, 'আমি তাঁর চেহারা দেখতে চাই না।' ফলে মুজিবকে নিয়ে যাওয়া হল আদমজী স্কুলে। পরের দিন তাঁকে ফ্লাগ স্টাফ হাউসে এবং তার তিন দিন পর করাচীতে তাঁকে সরিয়ে ফেলা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো দখল করতে রাত ৪টা বেজে গেল। তখন ভোর হয়ে আসছিল। ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে যুদ্ধ হল। ছাত্ররা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছিল। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগলো ছাত্রদের আবাসস্থলগুলি দখল করতে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ও পিলখানায় ই পি আর সদর দপ্তরে নির্দিষ্ট সময়েই বাঙালী পুলিশ ও জোয়ানদের নিরস্ত্র করা হয়।

ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে রকেট দিয়ে হামলা করা হয়েছিল। কক্ষগুলো বেশীর ভাগই পুড়ে কয়লায় পরিণত হল কিন্তু দেওয়ালগুলো অক্ষত থাকলো। কয়েক ডজন অর্ধদগ্ধ রাইফেল ও কিছু ছড়ানো ছিটানো কাগজ তখনো ধিকি ধিকি জ্বলছিল।

সূর্য যখন উঠে গেছে, তখন ভুট্টোকে তাঁর হোটেল কক্ষ থেকে বের করে আনা হল এবং সেনাবাহিনীর প্রহরায় বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। গত রাতে সেনাবাহিনীর অভিযানকে 'লারকানার লারকা' ভুট্টো প্রশংসা করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহকে ধন্যবাদ, পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে'।[৭]

ইকবাল হলে প্রতিরোধ দুর্গ

গভীর রাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (বর্তমান জহুরুল হক হলে) ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের পরেও পাকিস্তানী সৈন্যরা পলাশীর মোড়ে সমাবেশ করেছিল ট্যাংক বাহিনীর--একমাত্র ইকবাল হল মোকাবেলার জন্য।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইকবাল হলে পাল্টা গুলীর আওয়াজও পাওয়া যায়। এগুলি থ্রি নট থ্রি রাইফেলের--ছাত্র প্রতিরোধকারীদের।

ইকবাল হলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রেল সড়কের বস্তিতেও আগুন লাগিয়ে দেয় হানাদার বাহিনী। হলে ঢুকে সৈন্যরা প্রতিটি ঘরের তালা ভেঙে আসবাব-পত্র ইত্যাদিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। যাকে সামনে পায়, তাকেই গুলী করে হত্যা করে। ষ্টুয়ার্ড জলিল সে রাতে ইকবাল হলে ছিলেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

২৬ মার্চ ভোরে ইকবাল হলের যেখানেই দৃষ্টি পড়ে, সেখানেই দেখা গেল লাশ আর লাশ। আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।[৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডী

ঘটনাক্রমে বেঁচে যাওয়া কালীরঞ্জন শীল স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, 'একাত্তরের পঁচিশে মার্চ... শহরে নানা রকম জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ঐ দিনটিও গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমিও সমস্ত দিন মিটিং, প্যারেড, মিছিল করে রাত ১১ টার দিকে হলে ফিরলাম। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অল্পক্ষণের মধ্যে। হটাৎ মাথার কাছাকাছি বোমার এক বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সজাগ হয়েই শুনি চতুর্দিকে শুধু গগণ-

---

৭ সিদ্দিক সালিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৮
৮ *স্বাধীনতার দলিল*, পূর্বোক্ত, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১১-৮১৫

বিদারী টর-টর-টর শব্দ আর মাঝে মাঝে সে শব্দকে ছাপিয়ে গুর-গুর-গুরুম শব্দ এবং দালান কোঠা কেঁপে উঠছিল।...

আমি তিন তলার বারান্দা দিয়ে নুয়ে নুয়ে উত্তর দিকের লেট্রিন ও বাথরুমের কাছে গেলাম। দেখি উত্তর বাড়ীর সমস্ত আলো নিভানো। মিলিটারী হলে ঢুকে টর্চের আলোতে ছাত্রদের খুঁজে খুঁজে বের করে এনে সামনের মাঠে শহীদ মিনারের কাছে গুলী করে মারছে।... ভারী কামানের গোলা বর্ষণ হচ্ছে। কোন কোন স্থানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। এক সময় এসেমব্লির সামনে ডায়নিং হলটি জ্বলতে দেখলাম। উত্তর বাড়ীর কয়েকটি রুমেও আগুন জ্বলতে দেখলাম।...

হটাৎ এক সময় দেখা গেল, সলিমুল্লাহ হলের দিক থেকে ৪০-৫০ জন মিলিটারী দক্ষিণ বাড়ীর ঘরের দিকে এল এবং দরজা ভেঙে খাবার ঘরে ঢুকলো।... কয়েকজন চিৎকার করে মারা গেল বুঝতে পারলাম।... হলের মধ্যে তখন চিৎকার আর গুলীর শব্দই শোনা যাচ্ছিল।... বাইরের মতো হলের মধ্যেও চললো সমস্ত রাত গোলাগুলি আর আগুন।

এক সময় কোন এক দিকে আযানের শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আরো কয়েকদিকে আযান শোনা গেল। মনে হল আযানের এমন করুণ সুর— এতো বিষন্ন সুর কোনোদিন শুনিনি।... ভোরের দিকে মাইকে কারফিউ জারীর ঘোষণা শুনলাম।...

বেলা হল। এক সময় আমার কাছাকাছি বারান্দায় অনেকের কথা শুনতে পেলাম। ছাত্ররা কথা বলছে তা নিশ্চিত হয়ে আমি লেট্রিনের দরজা খুলে বের হলাম। বেরিয়েই দেখি সিঁড়ির মাথায় মেশিনগান তাক করে মিলিটারী দাঁড়িয়ে আছে আর কয়েকজন ছাত্র একটি লাশ ধরাধরি করে নামাবার চেস্টা করছে।... আমাকেও ধরতে হল লাশ।...

সেখান থেকে আমাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন দিকে নিয়ে গেল লাশ বয়ে আনতে। আমাদের অংশটিকে নিয়ে গেল ড: গুহ ঠাকুরতা যে কোয়ার্টারে থাকতেন সেই দিকে। সেই বিল্ডিং-এর সিঁড়ির কাছে অনেককগুলি লাশ পড়ে ছিল।... অনেক লাশ রাস্তায় আগেই জমা করা ছিল। বয়ে আনা লাশগুলিও জড়ো করলাম এগুলির পাশে। পরে নিয়ে গেল ঐ বিল্ডিং-এর সামনে দোতলা বাংলো বাড়ীটিতে।...

কতগুলো লাশ এভাবে বহন করেছি ঠিক মনে নেই। শেষ যে লাশটা টেনেছিলাম তা ছিল দারোয়ান সুনীলের। তার শরীর তখনও গরম ছিল।... সামনে চেয়ে দেখি সুইপারদের মাঠে এনে দাঁড় করিয়েছে গুলী করার জন্য।... বুঝলাম এবার আমাদের পালা।... সামনেই দেখি ড: গোবিন্দ দেবের মৃতদেহ।... আমার সাথে যে ছেলেটি লাশ টানছিল সে গোবিন্দ দেবের লাশটি দেখে বললো, 'দেবকেও মেরেছে তবে আমাদের আর মরতে ভয় কি?' কি ভেবে, আমি দেবের লাশের পশ্চিম পাশ ঘেষে সুনীলের লাশসহ শুয়ে পড়লাম। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা তখন আমার ছিল না। চোখ বুঁজে পড়ে থেকে ভাবছিলাম, এই বুঝি লাথি মেরে তুলে গুলি করবে। এক সময় ভাবছিলাম, তবে কি আমাকে গুলি করেছে, আমার তখন কোন অনুভূতি নেই।...

এই সময় দেখলাম কে একজন গুলী খেয়েও হামাগুড়ি দিয়ে শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাথা তুলে দেখি... গাড়ী বা মিলিটারী নেই। চতুর্দিকে এক নজর দেখে নিয়ে....। নুয়ে নুয়ে বস্তির মধ্যে গেলাম।...

সেদিন ছিল শুক্রবার এবং জুমার নামাজের সময়'।[৯]

কালীরঞ্জন শীলের বর্ণিত জগন্নাথ হলের এই বীভৎস ঘটনার স্বাক্ষী হয়ে আছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মুভি ক্যামেরা। ২৬ মার্চ সকালে জগন্নাথ হলের পার্শ্ববর্তী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নূরুলউল্লাহ দেখতে পান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুভি ক্যামেরাটি জানালা দিয়ে তাক করে একটি টেলিস্কোপ লাগিয়ে ধরে রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখা গণহত্যার এই টেপটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল হিসেবে এখনো সংরক্ষিত আছে।

মুভি ক্যামেরার টেপটিতে রয়েছে:

'১ জীবিত ছাত্ররা নিহত ছাত্রদের লাশ হলের ভেতর থেকে বের করছে
২ মৃতদেহগুলি এনে সব এক জায়গায় জমা করা হচ্ছে
৩ জীবিত ছাত্রদের দিয়ে এমন করে লাশ টানিয়ে আবার তাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হচ্ছে
৪ এক ফাঁকে দু'জন লোক সামনে স্তুপ করা মৃতদেহগুলির মধ্যে শুয়ে পড়লো

৯ *বাসন্তিকা* (হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯২১ - ১৯৮১, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১) পৃষ্ঠা ২৫৬-২৬৩

৫ খান সেনারা চলে যাওয়ার পর শুয়ে পড়া দু'জন উঠে প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে লাগলো'।[১০]

উল্লেখ্য, লাশের মধ্য থেকে উঠে উর্দ্ধেশ্বাসে দৌড়ে পালানোর দৃশ্যের দু'জনের একজন হলেন পূর্বোক্ত কালীরঞ্জন শীল।

এ রোমাঞ্চকর নারকীয় দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন আরো একজন। তিনি পরিমল গুহ (জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক)। পরিমল গুহ ২৫ মার্চ রাতে হল প্রাঙ্গনে এক ম্যানহোলের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি দেখেছেন জগন্নাথ হলের হত্যাযজ্ঞ।

তিনি বলেন, '২৬ মার্চ সকাল ১১ টা। হানাদার সৈন্যরা ৫ জনকে ধরে নিয়ে এল হলের ভেতরে। তাদের দিয়ে বিভিন্ন কক্ষ, হলের ছাদ, বারান্দা থেকে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত লাশগুলো নিয়ে ট্রাকে তুললো। হলের মাঠের মাঝখানে আগে থেকেই একটি বিরাট গর্ত খুড়ে রাখা হয়েছিল। লাশগুলো সেখানে নিয়ে এল মাটি চাপা দেওয়ার জন্য। এই ৫ জনকেও সেখানে নিয়ে গেল। তারপর ঠিক গর্তের পারে তাদের দাঁড় করিয়ে গুলি করলো। সবাই সাথে সাথে লুটিয়ে পড়লো।... হানাদার খুনীরা সবাই চলে গেল গাড়ী হাকিয়ে।... হটাৎ এই মৃতের স্তুপ থেকে একজন লোক উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালাল।... আমি স্পষ্ট দেখলাম এই ভাগ্যবান ব্যক্তি কালীরঞ্জন শীল'।[১১]

রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও
পিলখানা ই পি আর দপ্তর ছিন্নভিন্ন

২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আরো দু'টি অন্যতম লক্ষ্য ছিল, তার একটি রাজারবাগ পুলিশ লাইন, অন্যটি পিলখানাস্থ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স (ই পি আর)-এর সদর দপ্তর।

গভীর রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দুর্ধর্ষ ৩২ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাদের ভাষায় 'আওয়ামী লীগের মুখ্য সশস্ত্র জনশক্তির উৎস রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ভয়ানক ধরণের উদ্দেশ্যপ্রবণ ১ হাজার বাঙালী পুলিশকে নিরস্ত্র' করতে

১০ *স্বাধীনতার দলিল*, পূর্বোক্ত, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২২-২৬
১১ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২১

অভিযান পরিচালনা করে।

একই সময় তারা পিলখানাস্থ বাঙালী ই পি আর-দের উপরও একই উদ্দেশ্যে চড়াও হয়।

বাঙালী পুলিশ ও ই পি আর দের নিরস্ত্র করতে গিয়ে পাক সেনারা নিধনযজ্ঞ শুরু করলো। ট্যাংক আর মেশিনগানের গুলীতে নিশ্চিহ্ন করে দেয় দু'টি হেড কোয়ার্টার। ধ্বংস স্তুপের মাঝে মিশে যায় শতাধিক পুলিশ-কর্মচারীর ছিন্ন দেহ।[১২]

রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় ই পি আর-এর সদর দপ্তরের উপর পাকিস্তানীদের নির্বিচার ও ঢালাও আক্রমণ চালাবার সংবাদ সারাদেশে অভাবনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। ফলে বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও থানায় সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুক্ত অধিকাংশ বাঙালী আত্মরক্ষা ও দেশাত্মবোধের মিলিত তাগিদে উচ্চ মহলের আহবান ও নির্দেশের আগেই বিদ্রোহ শুরু করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরা সর্বত্র এবং কোথাও কোথাও প্রত্যক্ষ যুদ্ধও শুরু করে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ যুদ্ধে ই পি আর-দের অংশ গ্রহণ ছিল অনেক বেশী ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত। স্বাধীনতার পর মুক্তিসেনাদের মধ্যে যে বীর সূচক পদক ঘোষিত হয় তার একটা বড় অংশই পায় ই পি আর-এর যোদ্ধারা। তবে মুক্তিযুদ্ধে সারাদেশের প্রায় ৪০ হাজার পুলিশও অনন্য ভূমিকা পালন করে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকিস্তানী হানাদারেদের নির্বিচার পুলিশ হত্যার প্রতিক্রিয়ায় এই ব্যাপক অংশ গ্রহণে অগ্নি জ্বেলেছিল।[১৩]

ই পি আর ও পুলিশ ঘাঁটিতে আক্রমণের প্রস্তুতির বিবরণ পাওয়া যায় একজন বিদেশী সাংবাদিকের লেখায়:

'পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণের একটি প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিলো ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর ব্যারাক। বাঙালীদের নিয়েই তৈরী ছিলো সীমান্তের শান্তিরক্ষী এই বাহিনী। ছাত্রাবাসগুলোর ব্যাপারে যেমন নির্দেশ ছিলো, তেমনি পিলখানায় অবস্থিত এ ব্যারাকের একটি প্রাণীও যেন বেঁচে না থাকে এমনি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।... ব্যারাকে, প্রায় একশ জনকে হত্যা করা হলো। যারা আত্মসমর্পণ করলেন

---

১২ শামসুল হুদা চৌধুরী, *একাত্তরের রণাঙ্গন* (প্রকাশক : মায়িদ হাসান চৌধুরী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৪) পৃষ্ঠা ২৯

১৩ মঈদুল হাসান *'মূলধারা'*৭১ (ঢাকা : ইউ পি এল, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৪, ৫, ৬ এবং *একাত্তরের রণাঙ্গন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮ ও *'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেলস'*, বি ডি আর স্মরণিকা, ১৯৮৯ পৃষ্ঠা ৭-১৪

তাঁদেরকেও বেয়োনেট চার্জে মেরে ফেলা হলো। এ হত্যাযজ্ঞ ছিল জগন্নাথ হলের মতোই গণহত্যাযজ্ঞ।...

পুলিশ স্টেশনেও জ্বলে উঠলো হত্যার আগুন। রাজারবাগের পুলিশদের ব্যারাকে ট্যাঙ্ক, বাজুকা আর স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে আক্রমণ চালানো হলো। পূর্ব সতর্কতার কারণে পুলিশের সদস্যরা নিজেদের রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা চালায় অত্যন্ত ঋজুভাবে। পরে পাঞ্জাবী সৈন্যরা বলেছিলো, ভয়াবহ যুদ্ধ সেইরাতে রাজারবাগেই হয়েছিলো। খুব উন্নতমানের অস্ত্র না থাকলেও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা সমস্ত ছাউনি জ্বলে যাবার পরও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিলো। খুব অল্প কয়েকজন পুলিশ সে রাতে জীবিত ছিলেন'।[১৪]

লাশের শহর ঢাকা

২৫ মার্চ কালরাতে কি অসংখ্য মানুষকে মারা হয়েছে ঢাকা শহরে তার খবর কেউ পায় নি। কারণ ২৬ ও ২৭ মার্চ দু'দিন ছিল কারফিউ। ঘর থেকে কেউ বের হতে পারে নি। কিন্তু শহরের পয়:পথ ও রাস্তা-ঘাট পরিস্কার করার সুইপার, ডোমরা একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তার সাক্ষী হয়ে আছে। ইতিহাসে এ পৈশাচিক কালরাতের সাক্ষী হয়ে থাকতে তারা বাধ্য হয়, কারণ পাকিস্তানী সেনারা রাস্তা-ঘাট, নদী, মাঠ, প্রান্তরে পড়ে থাকা অসংখ্য গলিত লাশ লুকিয়ে ফেলতে চাইলে সুইপার-ডোমদের প্রয়োজন হয়। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে এসব গলিত লাশ লুকিয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ভয়াবহ এবং দু:সাহসিক এই কাজটি যারা সেদিন করেছিল তাদের কয়েকজনের বর্ণনা নিম্নরূপ:

মোঃ সাহেব আলী (সুইপার ইন্সপেক্টর) বলেন,

'২৮ মার্চ সকালে রেডিওতে সকল কর্মচারীকে কাজে যোগদানের চরম নির্দেশ দিলে আমি ঢাকা পৌরসভায় যাই। পৌরসভার কনসারভেন্সী অফিসার ইদ্রিস মিয়া আমাকে ডোম নিয়ে অবিলম্বে ঢাকা শহরের বিভিন্ন যায়গায় পড়ে থাকা লাশ সরিয়ে ফেলতে বলেন।
আমার দল আমার সাথে যেসব লাশ তুলেছে তার বেশীর ভাগই সরকারী কর্মচারী,

---

১৪ রবার্ট পেইন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩

পুলিশ, আনসার ও পাওয়ারম্যানদের খাকী পোশাক পরা বিকৃত লাশ। ২৬ মার্চই আমি বাবুবাজার পুলিশ ফাঁড়ির কাছে ১০জন পুলিশের পোশাক পরা ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত লাশ দেখতে পাই। ঢাকা জজকোর্টের কোণায় দেখি ১০ জন ভিক্ষুক এবং রিক্সামিস্ত্রীর উলঙ্গ লাশ। ২৯ মার্চ ঢাকা মিডফোর্ড-এর লাশঘর থেকে দু'ট্রাক লাশ তুলেছি।

৩০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ছাদ থেকে ১৮ বছরের রূপসী এক ছাত্রীর উলঙ্গ লাশ তুলেছি। তার গায়ে কোনো গুলীর চিহ্ন ছিল না। দেখলাম তার মাথার চুল ছিড়ে ফেলা হয়েছে, লজ্জাস্থান তার পেট থেকে ফুলে অনেক উপরে উঠে আছে, যোনিপথও রক্তাক্ত। আমি একটি চাদর দিয়ে লাশটি ঢেকে নীচে নামিয়ে আনলাম। রোকেয়া হলের সার্ভেন্ট কোয়াটারের ভেতর প্রবেশ করে ৫ জন মালীর স্ত্রী-পরিজনের ৫টি লাশ এবং পুরুষের ৮টি লাশ পাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্নিকটে অবস্থিত শিববাড়ী তেতালা থেকে এক হিন্দু অধ্যাপক, তার স্ত্রী ও তার দুই ছেলের লাশ তুলেছি। সংগৃহীত এসব লাশ স্বামীবাগ আউটকলে ফেলে দেই।

৩০ মার্চ ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে তিন ট্রাক লাশ তুলে স্বামীবাগের গর্তে ফেলেছি।

ইকবাল হলে কোনো লাশ পাইনি। পাকিস্তানী সেনারা এখানকার লাশ পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। বস্তী এলাকা থেকে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসা ১০ জন নর-নারীর লাশ জগন্নাথ হলে পাই। ঢাকা হলের ভেতর থেকে ৪ জন ছাত্রের উলঙ্গ লাশ পাই।

পয়লা এপ্রিল ঢাকা ষ্টেডিয়ামের মসজিদের পূর্ব দক্ষিণ দিক থেকে কয়েকজন ছাত্রের পচা লাশ পাই। মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজের হল থেকে ১০জন ছাত্রের ক্ষত বিক্ষত লাশ তুলেছি।

কিছুদিন পর সাধনা ঔষধালয়ের মালিক প্রফেসর যোগেশ চন্দ্রের রক্তাক্ত তাজা লাশ বেয়নেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পাই। তাকেও স্বামীবাগের গর্তে ফেলে আসি।

কচুক্ষেত, ড্রাম ফ্যাক্টরী, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়ের বাজার, পিলখানা, গণকটুলী, ধানমণ্ডী, কলা-বাগান, কাঠালবাগান, তেজগাঁও মাদ্রাসা, বুড়িগঙ্গা নদী প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রায় প্রতিদিনই এরপর থেকে নিয়মিত লাশ তুলেছি।'

লাল বাহাদুর ডোম বলে,

'২৯ মার্চ সকালে মিটফোর্ড লাশ ঘর থেকে দু ট্রাক লাশ তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি।

ছ'দিন পর শাখারী বাজারে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলতে দেখি। ট্রাক নিয়ে আমরা মন্দির থেকে ছ'জন যুবকের পচাঁগলা লাশ তুলেছি। লাশ পঁচে পোকা হয়ে গিয়েছিল। গলিত লাশ দেখে আমরা ভীত হয়ে পড়েছিলাম'।

পরদেশী ডোম বলে,

দু'দিন পর 'শাখারী বাজারে আগুনের লেলিহান শিখা, জ্বলতে দেখি। ট্রাক নিয়ে আমরা মন্দির থেকে দু'জন যুবকের পচাগলা লাশ তুলেছি। লাশ পচে পোকা হয়ে গিয়েছিল। গোলিত লাশ দেখে আমরা ভীত হয়ে পড়েছিলাম।

পরদেশী ডোম বলে,

'শাখারী বাজারে প্রবেশ করে দেখি ঘরে ঘরে নারী পুরুষের অগণিত লাশ। মেয়েদের অধিকাংশ লাশ দেখলাম উলঙ্গ, দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারো কারো যোনিপথে লাঠি ঢুকানো আছে।

বিহারীরা শাখারী বাজারের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনা-দানা লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা অবিরাম গুলী বর্ষণের মুখে প্রাণের ভয়ে দুই ট্রাক লাশ তুলে আর সেখানে প্রবেশ করার সাহস পাই নাই'।[১৫]

---

১৫ সাক্ষাৎকার : সাহেব আলী, সুইপার ইন্সপেক্টর, ঢাকা পৌরসভা এবং লালবাহাদুর ডোম, পরদেশী ডোম, *স্বাধীনতার দলিল*, পূর্বোক্ত, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫-৫২

পিপল, সংবাদ, ইত্তেফাকে আগুন

২৫ মার্চ রাতে এবং মার্চের অন্যান্য দিনগুলোতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর রুদ্র রোষের আর যে সমস্ত জিনিস ভস্মীভূত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল, ইংরেজী দৈনিক 'দি পিপল,' ইত্তেফাক এবং সংবাদ। ৩টি পত্রিকাই জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সংবাদ কার্যালয়ে সাংবাদিক শহীদ সাবের সহ আরো কয়েকজন কর্মচারী নিহত হলেন।

একমাত্র দৈনিক ইত্তেফাক জ্বালিয়ে দিয়ে পাক বাহিনী অনুতপ্ত হয়েছিল এবং এই জন্য কয়েকদিন পরই তা আবার মেরামত করে দেয় পাক বাহিনীই। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী 'ইত্তেফাক' জ্বালিয়ে দেওয়াটা ভুল হয়েছিল বলে মনে করে।[১৬]

বিদেশীর চোখে সেই কালরাত

একজন মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল, তিনি ২৫ মার্চ রাত সম্পর্কে লিখেছেন,

'ভোর চারটা নাগাদ গোলাগুলির আওয়াজ কমে এলো, তবুও মাঝে মাঝে অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সারা রাত বিভিন্ন রকমের বিচিত্র ভৌতিক শব্দে ভরা ছিলো। ভোর হতে দেখা গেল ধ্বংসস্তুপ থেকে তখনও কালো ধোঁয়া উঠে আকাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঢাকা যে একরাতে কতোটা বদলে গিয়েছে তা কিন্তু সহজে বোঝা গেল না।...

সে রাতে ৭০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়, গ্রেফতার হলো আরো ৩,০০০। ঢাকায় ঘটনার শুরুমাত্র হয়ে ছিলো। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে সৈন্যরা বাড়িয়ে চললো মৃতের সংখ্যা, জ্বালাতে শুরু করলো ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, লুট আর ধ্বংস তাদের নেশায় পরিণত হলো যেন। রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতেদেহগুলো কাক-শেয়ালের খাবারে পরিণত হলো। সমস্ত বাংলাদেশ হয়ে উঠলো শকুন তাড়িত শ্মসানভূমি।

২৬ তারিখ সকালে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিকদের ঢাকা ত্যাগ করতে বলা হলো। কড়া পাহারায় তাঁদের বিমানবন্দরে নিয়ে সেখানে তাঁদের ফিল্ম, নোটবুক সবই বাজেয়াপ্ত করা হলো। এতেও হলোনা, সাংবাদিকদের সাবধাণও করে দেয়া হলো যে, গতরাতে ঢাকায় যা কিছু তাঁরা দেখেছে, সে সম্বন্ধে কোন কিছু না লেখাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক।[১৭]

---

১৬ অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ* (অনুবাদ : রনাব্রি (রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী), ঢাকা: পরমা ১৯৮৮) পৃষ্ঠা ১২৯

১৭ রবার্ট পেইন, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২০

রবার্ট পেইন এরপর আরো লিখেন,

'মাসের পর মাস পূর্ব পাকিস্তানের সব অঞ্চলেই এই হত্যালীলা চলতে থাকলো। অত্যন্ত পরিকল্পিত ছিলো পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এ হত্যাযজ্ঞ। নিরীহ মুসলমান কৃষকদের প্রতিনিয়ত হত্যা করে চলছিলো এ সমস্ত মুসলমান সৈন্যরা। প্রতিরোধহীন সমস্ত মানুষকে হত্যা করা তাদের সিগারেট-মদ খাবার অভ্যেসের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার আগে পর্যন্ত এই অভ্যেস যে ফলাফল নিয়ে এসেছিল, তা হচ্ছে ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু।[১৮]

পাইকারীভাবে গণহত্যার স্বীকৃতি রয়েছে খোদ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত দলিলেও। 'পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট সম্পর্কে, যে শ্বেতপত্র পাকিস্তানী সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েতেই প্রকাশ করেছিল,তাতে বলা হয়,১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ রাত পর্যন্ত এক লাখেরও বেশী মানুষের 'জীবননাশ' হয়েছিল।[১৮ক]

রবার্ট পেইন তাঁর 'ম্যাসাকার' গ্রন্থে, সিদ্দিক সালিক, তাঁর 'উইটনেস টু সারেণ্ডার' গ্রন্থে এবং এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস তাঁর 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে জানিয়েছেন, ২৫ মার্চের রাতের ঘটনাবলীর পর জুলফিকার আলী ভুট্টোকে কড়া সামরিক পাহাড়ায় ২৬ মার্চ সকালে করাচীর উদ্দেশ্যে বিমানে তুলে দেওয়া হয়। ম্যাসকারেনহাস বলেন, 'বিমানে তুলে দেওয়ার আগে ভুট্টোকে ঢাকার পোড়ামাটি ও গণহত্যার লীলা ঘুরে ঘুরে দেখানো হয়েছিল'।

এসব দেখার পরও, ভুট্টো বলেছিলেন, 'আল্লাহর অসীম দয়া, পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।[১৮খ] পরদিন পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় ভুট্টোর এ মন্তব্য শিরোনাম হয়েছিল।

কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর কন্যা বেনজীর ভুট্টো তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন এর চেয়েও চমকপ্রদ সংবাদ। বেনজীর বলেছেন, ২৫শে মার্চ-এর ঘটনার পরও জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৭ মার্চ পর্যন্ত ঢাকায়ই অবস্থান করছিলেন। ২৬ মার্চ সকালে তিনি ঢাকা ছেড়েছিলেন একথা সত্য নয়। বেনজীর লিখেছেন,

"On March 27, 1971, he (Z.A Bhutto---Hannan) was actually in East Pakistan capital city of Dacca for another round of talks with Mujib when his worst fears were realised. Yahya Khan ordered in the army to quell the insurrection. Alone in his hotel room, my father wathed Dacca go up in flames, sick at heart at the Generals' invitable solution of force.'[১৯]

---

১৮ ঐ, পৃষ্ঠা ২১

১৮ক পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট সম্পর্কে শ্বেতপত্র, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ, তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দফতর, পাকিস্তান সরকার, ঢাকা, ৫ আগস্ট, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৪১

১৮খ রবার্ট পেইন পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫, ম্যাসকারেনহাস, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৩১ এবং সিদ্দিক সালিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৮

১৯. Benazir Bhutto, Daughter of the East, (London, Mandarin, 1989) P. 52.

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ২৫ মার্চের পর থেকে যে সব ঘটনা ঘটাতে থাকলো তার নজির দুনিয়ার ইতিহাসে তুলনা-রহিত। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিনী সৈন্যরা যে সব হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল তার মধ্যে 'মাইলাই' নামক গ্রামে যে নিষ্ঠুর গণহত্যা চালিয়েছিল তা আধুনিক সভ্যতাকে নিস্তব্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে এরকম অসংখ্য 'মাইলাই' হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল যা বহির্বিশ্বের নজরে প্রথমে আসে নি।

দেশে দেশে এ ধরণের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে এক শ্রেণীর সেনাবাহিনী জড়িত হয়েছিল বলে এক সময়ে সেনাবাহিনীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের প্রশ্নেও কথা উঠেছিল। এ ধরণের পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের জন্যেই এ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের "Political Killings by goverments' গ্রন্থে একটি কঠিন মন্তব্য করেছিল। গ্রন্থটিতে সামরিক বাহিনী সম্পর্কে এক প্রতিবেদকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়:

'They do'nt do anything, nothing. so I realized that the army is a school for murderers'.[১৯ক]

আন্তর্জাতিক সংস্থাটির প্রতিবেদনের এই মন্তব্য আর কোন কোন দেশের জন্য সত্য, তার মূল্যায়নে না গিয়েও বলা যায়, পাকিস্তানের সামরিক সরকারের জন্য ছিল তা নির্জলা সত্য। দিনের পর দিন পাকিস্তানের জনগণের খাজনার পয়সার সিংহভাগ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল এই খুনী বাহিনী। পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রণালয়ের বাজেট বিবৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজস্ব খাতের সিংহভাগের টাকা শোষণ করে নিয়েছে প্রতিরক্ষা খাত।

আধুনিক অর্থে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ছিল না পাকিস্তানী অস্ত্রধারী প্রতিরক্ষা বাহিনী। প্রথম থেকেই এই বাহিনীতে লোভী, মদখোর, লুটেরা, খুনী এবং ক্ষমতা পিয়াসী পাঞ্জাবী অধিবাসীরা জেঁকে বসেছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত যে সারণীটি এরপর এখানে দেখানো হয়েছে তাতে বোঝা যাবে, পাকিস্তানের মোট রাজস্বের বড় অংশ প্রতিরক্ষা ব্যয় হিসেবে এদের লালন-পালনের জন্যই ব্যয় হয়েছে।

১৯ক *Political Killings By Govornments*, An Amanesty International Report (London Amnesty International Publications, 1983.

পাকিস্তানের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিবৃতি[২০] ১৯৪৭ – ১৯৭১		
বছর	মোট রাজস্ব (মিলিয়ন রূপীতে)	প্রতিরক্ষা ব্যয়
১৯৪৭-৪৮	১৯৯	১৫৪
১৯৪৮-৪৯	৬৬৮	৪৬২
১৯৪৯-৫০	৮৮৫	৬২৫
১৯৫০-৫১	১,২৭৯	৬৫০
১৯৫১-৫২	১,৪৪৮	৭৭৯
১৯৫২-৫৩	১,৩৩৪	৭৮৩
১৯৫৩-৫৪	১,১১১	৬৫৩
১৯৫৪-৫৫	১,১৭৩	৬৩৫
১৯৫৫-৫৬	১,৪৩৬	৯১৭
১৯৫৬-৫৭	১,৩৪১	৮০১
১৯৫৭-৫৮	১,৫২৫	৮৫৪
১৯৫৮-৫৯	১,৯৫৯	৯৯৭
১৯৫৯-৬০	১,৯৭৮	১,০৪৪
১৯৬০-৬১	২,১২৩	১,১১২
১৯৬১-৬২	২,৩১৭	১,১০৯
১৯৬২-৬৩	২০,৪৬	৯৫৪
১৯৬৩-৬৪	২,৮৩০	১,১৫৭
১৯৬৪-৬৫	৩,৩০১	১,২৬২
১৯৬৫-৬৬	৩,৭৯৮	২,৮৫৫
১৯৬৬-৬৭	৪,৪৮৫	২,২৯৪
১৯৬৭-৬৮	৪,৭০৪	২,১৮৭
১৯৬৮-৬৯	৫,৭৭৪	২,৪২৭
১৯৬৯-৭০	৬,৪৮৪	২,৭৬০
১৯৭০-৭১	৬৪,১৮৮	২৭,৪৭০

জনগণের পয়সার রাজস্ব আয়ের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ দ্বারা উপনিবেশবাদী সামরিক বাহিনী নিয়ে তাই দেশে দেশেই প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশ আর্মী জার্নালে লেখা এক নিবন্ধে মেজর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ,(তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) জানিয়েছেন, ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৫২টি দেশে ৮৮টি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল।[২১]

২০ *The Budget in brief 1970-71*, Ministry of Finance, Gornment of Pakistan, Islamabad 1970 PP. 184 - 87 and *Annual Budget statement, 1971-72*, Ministry of Finance, Government of Pakistan, Islamabad 1972, PP 2-3

২১ Major Geneal H. M Ershad ndc. Psc, *"Role of the Military in under Devolope countries'*, Bangladesh Army journal, january, 1979

ফলে দুনিয়ায়, বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে ও দেশগঠনমূলক কাজে ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক আছে। জেনারেল এরশাদ একই প্রবন্ধে বলেন,

'The role of the military especially in the context of a national army, should very much be that of participant in the collective effort of the nation, towards the achievement of progres, economic emancipation and political freedom in developing countries'.[২২]

জেনারেল ওসমানী অবশ্য সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়ানোর বিষয়টি সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

'I must also point out that the role of the defence service in the national (political, to be precise) structure of a country depends on the social and political system of that country'.[২৩]

আটরশির পীরসাহেব, হযরত মাওলানা খাজা ফরিদপুরী অবশ্য রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর অংশ গ্রহণের ধারণাকে একেবারে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

'The most important and sacred role of Army is to depend the motherland. They can assist the civilian goverment in times of emergency and natural calamity. But they cannot have any role to play in ruuning the goverment in normal times. The Army should became strang and deciplined, maintaining a high professinal standard'.[২৪]

রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর জড়ানোর এসব প্রশ্ন অবশ্য বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটেই এসেছে। বাংলাদেশের রাজনীতি ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গের এই বিতর্কটির সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার (দক্ষিণ ভিয়েতনাম

২২ মেজর জেনারেল এইচ এম এরশাদ, প্রাগুক্তি

২৩ General (retired) MAG osmany "Role of the Arme Forces in Bangladesh' Weekly Holiday, Janury and 10 1982

২৪ The Far Eastern Economic Review, April, 7

ছাড়া) একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন দেশের সামরিক বাহিনী গ্রামের কৃষক-শ্রমিকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে নাই'।[২৪ক]

এ প্রসঙ্গেই এসেছে, বাংলাদেশের রাজনীতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের প্রশ্নটি:

'It is even more so in Bangladesh because the armed services were at the fore-front of the liberation war, they were drawn into the political power-play'.[২৫]

কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এই ঐতিহ্য ছিল না। দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ইত্যাদির বালাই এর মধ্যে কখনো ছিলনা। এ ছিল একটি উপনিবেশবাদী শক্তি। ক্ষমতা লিপ্সায় তারা আকন্ঠ নিমজ্জিত ছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর এই পৈশাচিক রূপের ছায়া পড়েছে রবার্ট পেইনের লেখায়, যেখানে তিনি এই সেনাবাহিনীর কুখ্যাত প্রধান ইয়াহিয়া খানের ছবিটি এঁকেছেন:

'নারীতে আসক্তি ছিল ইয়াহিয়া খানের। প্রায়ই নাইট ক্লাবে তার সাথে দেখা যেতো জন চারেক মেয়েকে। সরকারী তহবিল থেকে টাকা-পয়সা নেয়ার ব্যাপারে তার জুড়ি ছিল না। নারী আসক্তি নয়, প্রচণ্ড মদখোরও ছিলেন ইয়াহিয়া খান। ব্যবহারে ভদ্রতা শব্দটি সম্ভবত তার অভিধানে ছিল না। রেডিও-টিভিতে তার ভাষণগুলো বেরিয়ে আসতো ভাবলেশহীন কাটা কাটা শব্দ হিসেবেই। আবরণ দিয়ে বা ভান করেও ইয়াহিয়া খান তার বর্বরতাকে ঢাকতে পারেন নি।......

কাথাবার্তা মেধায় মননে ইয়াহিয়া খানের সাধারণ যোগ্যতাও ছিল না। দেশের সার্বিক সামাজিক-রাজনীতিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে তার অজ্ঞতা ছিল পাহাড় প্রমাণ। নিছক সৈনিক হিসেবেই বেড়ে উঠেছিল ইয়াহিয়া খানের জীবন।..... ক্ষমতা, সম্পদ, নারীসঙ্গ খুব চমৎকার উপভোগ করতেন ইয়াহিয়া খান। নিজে মদ খেতে পছন্দ তো করতেনই, আনন্দ পেতেন মদ খাইয়েও।.....

বর্তমান যুগে এ ধরণের শাসক যে কিভাবে টিকে আছে সেটা ভীষণ আশ্চর্যের বিষয়। এসব অযোগ্য শাসককেই বা জনসাধারণ কিভাবে মেনে নিচ্ছে সেটাও একটা বিরাট প্রশ্ন হিসেবে এসে যায়'।[২৬]

২৪ক আবু মাহমুদ *'লে. জে. এরশাদের প্রতি খোলা চিঠি'*, প্রেক্ষিত (লিয়াকত আলী সম্পাদিত) জুলাই, ১৯৮৬

২৫ Hossain Muhammad Ershad, A Soldier Speaks, The Makaing of a Democratic Nation. (প্রকাশক ও প্রকাশনার তারিখ নেই) P.8

২৬ রবার্ট পেইন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬

উপনিবেশবাদী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধটুকুও যে ছিল না, তার পরিচয় পাওয়া যায় অন্য আরেকজন পাকিস্তানী সেনাপতির পরিচয়ে। রবার্ট পেইন বলেন,

'হত্যাযজ্ঞ চলছে এমনি এক সময়ে টিক্কা খানকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কেন এতো মানুষ হত্যা করছেন? জবাব দিয়েছিলেন, আমি মানুষকে নিয়ে ভাবছিনা, ভাবছি দেশকে নিয়ে।'[২৭]

পেইন আরও একজন পাকিস্তানী সেনানায়কের পরিচয় স্ফুট করেছেন। পেইন লিখেছেন,

'অন্যদিকে রাওফরমান আলী কিন্তু ভাবছিলেন মানুষের কথাই। পুরো ন'টি মাস ঢাকাতে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার হোতা ছিলেন তিনিই। অথচ তাকে দেখলে কখনোই একজন হত্যাকারীর মতো মনে হতো না।...... কারণ তিনি এমন এক জোড়া চশমা পড়তেন যাতে করে তাকে একজন জেনারেলের চাইতে একজন অল্প বয়েসী অধ্যাপকের মতোই লাগতো বেশী।

হত্যাকারী অর্থাৎ হত্যার আদেশ দানকারী হিসেবে রাওফরমান আলী ছিলেন, একেবারে নির্বিকার। ২৫ মার্চের রাতে তিনি বলেছিলেন, বাঙালীদের আমি চল্লিশ ঘন্টার মধ্যে শেষ করে ফেলবো। সেই রাতে তার সামনে ছিল ঢাকার প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ, পাশে একগুচ্ছ টেলিফোন। তার আদেশ প্রচার করবার জন্যে সামনে ছিল একটা টেপ রেকর্ডারও। তার অর্ডারগুলো তিনি ইংরেজীতেই দিয়েছিলেন। সেই টেপ পরে পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে শোনা গেছে তার নরম অথচ দৃঢ় গলায় দেয়া আদেশগুলো। এই আদেশের পরে সেই একই গলায় শোনা যায়, 'কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না; মনে করবে কিছুই হয়নি। তোমাদের কোন কিছুরই ব্যাখ্যা দিতে হবে না। আবারো বলছি, চমৎকার কাজ করছো তোমরা'।

আত্মসমর্পণের পর তার ড্রয়ারে কিছু কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল। কিছুকিছু বিক্ষিপ্ত কথা তাতে লেখা ছিল। এ রকম একটা কাগজে লেখা ছিল, 'পূর্ব পাকিস্তানের সবুজকে লালরঙে রাঙ্গিয়ে দিতে হবে'। এই লাল, কামউনিজমের লাল নয়, পূর্ব পাকিস্তানের রক্তেই এই লাল তৈরী হয়েছে'।[২৮]

---

২৭ রবার্ট পেইন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫
২৮ ঐ পৃষ্ঠা ২৮

২৫ মার্চ সারারাত মৃত্যুর তাণ্ডব খেলে ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। তিনি বলেন:

'জাতি মারাত্মক সংকটের মুখোমুখী হয়ে আসছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামীলীগ আহূত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। ঘটনা প্রবাহ অত্যন্ত দ্রুত মোড় নেওয়ায় যথাশীঘ্র সম্ভব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দেশদ্রোহীতা করেছে। সে এবং তার দল তিন সপ্তাহাধীক কাল আইনী কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করেছে। তারা পাকিস্তানের পতাকা অবমাননা করেছে এবং জাতির পিতার ছবি বিকৃত করেছে। তারা বিকল্প সমান্তরাল সরকার চালানোরও চেষ্টা করেছে।......

কয়েক সপ্তাহ আগেই আমার শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ পরিস্থিতির মোকাবেলা এমনভাবে করতে হয়েছে যাতে আমার শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে পরিকল্পনা ব্যাহত না হয়...... তাঁর (শেখ মুজিবের-লেখক) প্রস্তাবিত ঘোষণা একটি ফন্দি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই লোকটি এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু। আর তারা চাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান, দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত হয়ে যাক। সে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতার প্রতি আঘাত হেনেছে। এই অপরাধের শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

আমরা কিছু ক্ষমতা লিপ্সু ও দেশপ্রেমহীন মানুষকে এ দেশ ধ্বংস করে ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলতে দেবো না।

দেশের বর্তমান ভয়ারহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমি দেশব্যাপী সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বলতে গেলে একে রাজনৈতিক দল হিসেবে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হল। এ ছাড়া আমি সম্পূর্ণভাবে প্রেস সেন্সরশীপ আরোপ করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'[২৯]

২৯ স্বাধীনতার দলিল, পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৭

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও তৎকালীন আন্দোলন ও সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত একজন রাজীনীতিবিদ লেখকের কাছে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

'প্রথমত শেখ মুজিব তাঁর দলের ছাত্র শাখার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তরুণ ছাত্রকর্মীরা একের পর এক কর্মসূচীকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে থেকে ফিরে আসা আর সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত যদি এমনটা ঘটতো, ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো শেষ পর্যন্ত ৬দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র মেনে নিতেন, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াত? পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ অবস্থার চিহ্নে ক্ষত লেগেই থাকতো। কিংবা শেখ মুজিবই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতায় যেতে পারতেন কি না সন্দেহ।

তৃতীয়ত মাওলানা ভাসানী ও তাঁর কিছু অতিউৎসাহী অনুসারী এমন সব বক্তৃতা, বিবৃতি দিচ্ছিলেন যাতে আওয়ামী লীগ সকল দিক থেকেই ফাঁদে পরে যায়। প্রাথমিক অবস্থাতেই তাঁদের স্বাধীনতার শ্লোগান, (শেখ মুজিবের ম্যান্ডেট পাওয়ার পরও) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথকে সঙ্কুচিত করেছে।

চতুর্থত এ বিশ্লেষক আরো বলেন, ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান যাদুমিয়া, নির্বাচনের পর শেখ মুজিবের সাথে দেখা করতে আস ভুট্টোকে বিমানবন্দরে মাল্যভূষিত করতে গিয়েছিলেন। অথচ এ সময় মাওলানা ভাসানী স্বাধীনতার শ্লোগান দিচ্ছেন, আবার পাকিস্তানী নেতা ভুট্টোকেও মাল্য ভূষিত করছেন।

এ বিশ্লেষক আরো বলেন, মাওলানা ভাসানীর প্রতিনিধি হিসাবে যাদুমিয়া হোটেল ইন্টারকনে ভুট্টোর সাথে দেখা করে তাঁকে শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যাদুমিয়া ভাসানী ন্যাপের পক্ষ থেকে বলেছিলেন, তাঁরা শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান না। এর পরিণতি হিসেবে তিনি ভুট্টোকে আশ্বাস দেন, বেসামাল পূর্ব পাকিস্তানকে তাঁরা সামলাবেন। এখানে উল্লেখ্য, যাদু মিয়া শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন নি। ভারতে গিয়ে আবার পালিয়ে এসেছিলেন। মাওলানা ভাসানী যাদুর মিয়ার মতোই

করতে পারেন ভেবে তাকে সতর্ক প্রহরায় রাখা হয়েছিল। এদের নেতা আনোয়ার জাহিদ মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনম্যান্টে সেনাবাহিনীকে 'মুরগী সাপ্লাই' করার ঠিকাদারী গ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্লেষক বলেন, শেখ মুজিব জনগণের ভোটে ম্যান্ডেট পেয়ে সমস্যায় ছিলেন। কারণ নির্বাচিত দলের নেতা হিসাবে তিনি যা খুশী তা বলা বা করার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। তাঁর উপর তখন অনেক দায়িত্ব এসে গিয়েছিল। একজন খাঁটি বাঙালীর পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভবনাকে তিনি সত্যিকার অর্থে প্রথম অবস্থায় সম্ভবত নষ্ট করতে চান নি। ২৩ বছর পাঞ্জাবীদের হাতে পূর্ব বাঙলার মানুষের শোষিত হওয়ার ঘটনাকেও তিনি মনে রেখেছিলেন। এর বদলা ও অর্থনৈতিক সাম্য দুই পাকিস্তানে আনার জন্য কিছু দিন যে একজন বাঙালীর পাকিস্তানের ক্ষমতার শীর্ষে থাকা দরকার তার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করছিলেন।

তাছাড়া এক ঐতিহাসিক বাস্তবতায় জন্ম নেওয়া পাকিস্তানের ভাঙনের দায়িত্ব শেখ মুজিব নিজের হাতে নিতে চান নি। তিনি বিশ্ববাসীকে এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওযার পরও পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলো না। তারাই আগে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পাকবাহিনী সশস্ত্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুতরাং বাঙালীদের আর স্বাধীনতা ঘোষণা করা ছাড়া পথ থাকলো না। ক্ষমতা লিপ্সু পাকিস্তানী সামরিক চক্র ও ভুট্টোর মিলিত ষড়যন্ত্রই পাকিস্তানকে এক থাকতে দিল না।

ক্ষমতা হস্তান্তর জটিলতায় শেখ মুজিবের কতক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক ব্যর্থতাও ছিল। আজীবন শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন একলাচলা নীতির ধারক-বাহক। এজন্য নির্বাচনের আগে বিভিন্ন দল ও গ্রুপের আহবান সত্ত্বেও তিনি সারা পাকিস্তানব্যাপী ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় নির্বাচনী ঐক্য গঠনেও সম্মত হন নি। ৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেন বটে কিন্তু তা এককভাবে পূর্ব পাকিস্তানের আসনের মাধ্যমেই। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কোনো আসন পায় নি। ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি সিন্ধু ও পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, ফলে এ দু'দলই মূলত শক্তিশালী আঞ্চলিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়।

শেখ মুজিব এ ক্ষেত্রে ভাল কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিতেন যদি সিন্ধুর জিয়ে সিন্ধের নেতা জে.এম. সৈয়দ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের

সংখ্যাগিরষ্ঠ দল খান আব্দুল ওয়ালী খান, মাওলানা মুফতী মাহমুদ প্রমুখ প্রগতিশীল পাকিস্তানী নেতাদের নিয়ে একটি কোয়ালিশনের প্রচেষ্টা নিতেন। কিন্তু শেখ মুজিব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হয়েই থাকতে চাইলেন। যদি তিনি এরকম একটা বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা করতেন তাহলে ভুট্টো তাঁর ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় বেকায়দায় পড়তেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব এসব পথে চিন্তা করেননি। ফলে সব মিলিয়ে শেখ মুজিব পাকিস্তানের ক্ষমতা পেলেন না। অন্যদিকে, মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতেও পারলেন না। যে স্বপ্ন একদিন তাঁকে তাড়িত করে বেড়াতো, সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের সময় তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকলে এ মুক্তিযুদ্ধ আরো গৌরবের হতে পারতো। তিনি চিনতে পারতেন শত্রু-মিত্র (দলের এবং দলের বাইরের), ভয়াবহতা দেখতে পারতেন, বুঝতে পারতেন স্বজন হারানোর বেদনা কতো কঠিন, তাহলে এতো সহজেই পাকিস্তানী যুদ্ধ অপরাধী এবং তাদের সহযোগী আলবদর-রাজাকাররা 'মক্কা বিজয়ের' মতো ক্ষমা পেত না। পরবর্তী কালেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্নের প্রশ্ন উঠতো না।

তবু মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামেই যুদ্ধ চললো, তিনিই ছিলেন এর স্থপতি এবং সকল স্বপ্নের কেন্দ্র বিন্দু'।[২৯ক]

রেডিওতে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার যে বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন তা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই পি আর)-এর ওয়ারলেস যোগে প্রথম পাঠনো হয় চট্রগ্রামে। চট্রগ্রামে বার্তাটি গ্রহণ করেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ হান্নান।

চট্রগ্রামে এর পূর্বেই ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর সৈন্যরা এবং স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতারা মিলে ঠিক করলেন চট্রগ্রামে যে যুদ্ধ হচ্ছে তা জনগণকে বেতার মারফত জানানো প্রয়োজন। এর মূল উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর অফিসার যিনি ই পি আর-এর চট্রগ্রামস্থ সদর দপ্তরে এ্যাডজুটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন জনাব রফিকুল ইসলাম (মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য পরে তিনি 'বীর উত্তম' খেতাব পেয়েছিলেন)। বেতার ঘোষণার একটি খসড়া আওয়ামী লীগ নেতারা তৈরী করে দিয়েছিলেন। এতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাত থেকে

২৯ক সাক্ষাৎদানকারী তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন

বাঙালীদের জীবন বাঁচানোর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদন ছিল। এ ছাড়া, বাঙালীদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে, শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বানও ছিল।

কালুরঘাটস্থ চট্টগ্রাম রেডিও ট্র্যান্সমিটার সেন্টার (পরে এটি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে পরিচিত হয়েছিল) থেকে ঘোষণাটি ২৬ মার্চ দুপুর আড়াইটায় জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নামে প্রচার করলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ হান্নান। রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে এই প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা। আর এর মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কর্মসূচীর প্রথম সূত্রপাত।[৩০]

কিন্তু চট্টগ্রামের বাঙালী সৈন্যদের মধ্যে ঐকমত্য হল না। ই পি আর এডজুটেন্ট রফিকুল ইসলাম তাঁর সৈন্যদের ক্যান্টনমেন্টের পেছনে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু মেজর জিয়াউর রহমান তাদের নিয়ে যান কালুরঘাট সেতুর দিকে। ফলে বাঙালী সৈন্যরা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

পরে রেডিওতে এসে মেজর জিয়াকে সংগ্রামরত সৈন্যদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করে ডেকে আনেন আওয়ামী লীগ নেতারা। ২৭ মার্চ (১৯৭১) মেজর জিয়া চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্রে অনুরুদ্ধ হয়ে এ ভাষণ দিতে এসে নিজেকে 'প্রেসিডেন্ট' হিসেবে ঘোষণা করে দেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

মেজর জিয়াকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা সংশোধন করতে বলা হলে তিনি ঘোষণাটি নতুন করে বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেন।[৩১] তিনি বলেন,

'I Major Ziaur Rahman do hearby declair independents of Bangladesh on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'.[৩২]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এটি ছিল তৃতীয় ঘোষণা যা মেজর জিয়া স্বকন্ঠে করেছিলেন।

---

৩০ রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে (এ টেল অব মিলিয়নস)* (ঢাকা; মুক্তধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৬) পৃষ্ঠা ৯১

৩১ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭

৩২ 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে', স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মুক্তিযুদ্ধের গান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট নিবেদিত ক্যাসেটে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বকন্ঠ থেকে হুবহু সংগৃহীত

. প্রস্তুতি ছাড়াই সর্বাত্মক যুদ্ধ

দুনিয়ার কোন মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এমন ঘটনা আছে কিনা সন্দেহ যে, ব্যাপক প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক পরিকল্পনা ছাড়াই বড় ধরণের যুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু নিজে যুদ্ধে উপস্থিত থাকবেন এবং সকল সাংগঠনিক দিক তিনি দেখবেন এরকম একটি পরিকল্পনা তার ছিল। তাজউদ্দিন আহমদকে এজন্যই তিনি ঢাকার শহরতলীর এক গ্রামে ২৫ মার্চে বঙ্গবন্ধু অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধু কি জন্যে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কাছে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ধরা দিয়েছিলেন তা আজো অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। অনেকে মনে করেন, বঙ্গবন্ধুকে না পেলে ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসের সম্ভাবনা ছিল--এমন আশঙ্কা থেকেই তিনি শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কেউ কেউ পরবর্তীকালে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, 'বঙ্গবন্ধু শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ রফার আশায় ছিলেন'।

কিন্তু এ আশঙ্কা নিছক বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও অনন্য সাধারণত্বের প্রতি ঈর্ষা ছাড়া কিছু নয়। কারণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায়, পাকিস্তানীদের থেকে এমন আশা আর ছিল না। অন্যদিকে ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ছাত্রলীগের যুদ্ধের মহড়ায় সালাম গ্রহণ ও বাংলাদেশের পতাকা উড়ানোর পর বাঙালীদের পক্ষ থেকেও এই রকম আপোষের সম্ভাবনার আশামাত্রও রাখা হয় নি। যদি বঙ্গবন্ধুর মনে সামান্যতমও আশা থাকতো, তাহলে তিনি অন্তত একটি নতুন পতাকা উত্তোলন করতেন না, একটি নতুন পতাকা উত্তোলনের অর্থ অত্যন্ত গুরুতর এবং গুরুত্বপূর্ণও। সবচেয়ে বড় কথা হল, গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে গিয়েছিলেন।

তবু পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধ শুরু হল পাকিস্তানী বাহিনী বিরুদ্ধে দিকে দিকে।

২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানীদের ভয়াবহ হামলার পরও ঢাকা শহরে লড়াই হয়েছে। ২৭ মার্চ ঢাকা সেনানিবাস থেকে লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেন তেজগাও ড্রাম ফ্যাক্টরীর কাছে প্রায় ৩৫০ জন ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র, শ্রমিকের এক মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১২৬ জন পাক সেনা হতাহত হয় এখানে।

৩০ মার্চ মহাখালীতে আক্রমণ চালাতে গিয়ে শহীদ হন শামসুল আলম নামে একজন ই পি আর। ৩১ মার্চ আসাদ গেটে রাত ৩টায় আক্রমণ চালিয়ে ৫ জন পাক সেনা হত্যা করা হয়।

পয়লা এপ্রিল এই মুক্তিযোদ্ধা দলটি পাকিস্তানীদের সর্বাত্মক আক্রমণে শেষ পর্যন্ত হয় নিহত অথবা গ্রেফতার হয়ে যায়।[৩৩]

৬ এপ্রিল ই পি আর-এর সিপাই নান্নু, আকতার, জাহাঙ্গীর, সাইদুর রহমান যাত্রাবাড়ী রোডে একটি পাকিস্তানী দলের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে কয়েকজনকে হত্যা করে।[৩৪]

বগুড়ায় ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় সর্বদলীয় স্থানীয় হাইকমাণ্ড গঠন করা হয়। এতে সর্বাধিনায়ক হন এডভোকেট গাজীউল হক। অন্যান্য সদস্যরা হলেন,

১ ডা: জাহিদুর রহমান (আওয়ামী লীগ)
২ মাহমুদ হাসান খান (আওয়ামী লীগ)
৩ মোখলেসুর রহমান (মোজাফ্‌ফর ন্যাপ)
৪ আবদুল লতিফ (কমিউনিস্ট পার্টি)

২৫ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত সরাসরি যুদ্ধ করে বগুড়া শহরকে মুক্ত রাখেন বাঙালী সেনাবাহিনী, ই. পি. আর., ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকের মিলিত বাহিনী। স্কুলের ছাত্র টিটু, হিটলু, ছনু, ও দশম শ্রেণীর ছাত্র তারেক সম্মুখ সমরে অস্ত্র হাতে শহীদ হয়।[৩৫]

সারা দেশেই এভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয় এবং চলতে থাকে।

সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম সম্পর্কে আওয়ামী লীগের অপরিপক্কতা

সাধারণভাবে আওয়ামী লীগ ছিল বুর্জোয়া এবং পেটি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন একটি রাজনৈতিক দল। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে বিশেষ করে শ্রমিকরা এবং

৩৩ *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০-৩১
৩৪ ঐ, পৃষ্ঠা ১২৯
৩৫ স্বাধীনতার দলিল, পূর্বোক্ত, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮০-৪৯১

সত্তরের সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে কৃষকরা এই দলের মূল ভিত্তি ও স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক-কৃষকের সম্মিলিত কোটি মানুষের প্রাণ-প্রিয় দল হয়ে দাঁড়ায় আওয়ামী লীগ।

কিন্তু এ দলের কেন্দ্র থেকে মহকুমা-থানা নেতৃবৃন্দের শ্রেণী চরিত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন পূর্বের তুলনায় ঘটে নি। দেশ যখন দ্রুতই একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন আওয়ামী লীগ কেন, পরিস্থিতি সত্যিকার অর্থেই কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিরই নিয়ন্ত্রণে ছিল না।

শহরের বাইরে গ্রাম পর্যায়ে এমনকি অজ পাড়াগায়ে পর্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যবহারের বন্দুক কিংবা পাখি শিকারের বন্দুক নিয়ে হাজার হাজার জনতা ৭১-এর মার্চ মাসে স্বত:স্ফূর্ত মিছিল করে বেড়াচ্ছিল। এ সময় যে কোনো আয়োজিত জনসভাতেই দূর-দূরান্ত থেকে জনতাকে বন্দুক নিয়ে মিছিল করে আসতে দেখা যেত।

সুতরাং অনভিজ্ঞ এবং বিপ্লবের রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন গ্রামের সংগ্রামী মানুষকে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেশের সাধারণ মানুষের মতো নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ নেতারাও ছিলেন সমানভাবেই অনভিজ্ঞ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মহকুমা (বর্তমানে জেলা) ও থানা (বর্তমানে উপজেলা) আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে অপরিপক্কতাও লক্ষ্য করা যায়। এ প্রবণতা জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়েও ছিল।

মার্চের উত্তাল দিনে ঢাকার অদূরে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী থানায় স্বত:স্ফূর্ত মানুষের একটি সশস্ত্র মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জনতা বাঁশ-লাঠিসহ রুদ্র রোষে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিছিল জেলা বোর্ডের যে রাস্তাই অতিক্রম করছিল, তার চতুর্পার্শ্বের মানুষজন তাতে সশস্ত্র হয়ে যোগ দিচ্ছিল। পাখি শিকারের বন্দুক কাঁধে করে কেউ কেউ মিছিলে যোগ দেয়। এতে মিছিল এবং মিছিলকারীদের চেতনায় গুণগত পরিবর্তন ঘটে। মিছিলকারীরা অবশেষে ধলেশ্বরী নদী তীরবর্তী আবদুল্লাপুর গ্রামে এসে সমবেত হয়।[৩৬]

এখানে সমবেত হওয়ার কারণ ছিল থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আ:ওয়াহেদ বেপারীর গ্রাম এটি। তিনি খবর পেয়ে ছুটে আসেন সমাবেশের কাছে। ঘটনাক্রমে

---

৩৬ বর্তমান গ্রন্থের লেখক একজন স্কুল ছাত্র হিসেবে সেদিন এ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন

সেদিন তার বাড়ীতে থানা আওয়ামী লীগের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। মুন্সীগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ সে সভায় কেন্দ্রীয় কোনো বার্তা নিয়ে আলোচনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনিও হাজার হাজার সশস্ত্র মানুষের উদ্দেশ্যে জঙ্গী ও উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে জনতার মাঝ থেকে একজন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন, 'গ্রামে পাকিস্তানী মিলিটারী চলে আস্‌লে আমরা কি করবো'?

মহকুমা আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, 'ভাইসব, মিলিটারী চলে আসলে আপনারা শুকনা মরিচের গুড়া ঘরে রাখবেন। রাস্তা দিয়ে মিলিটারী আস্‌লে তা বাতাসে উড়াইয়া দিবেন। ওদের চোখ জ্বলতে থাকলে ওরা চইলা যাইব'।

এ সময় আরেকজন প্রশ্ন করেন, 'যদি চোখ না জ্বলে, বাড়ীতে এসে পড়ে। তখন কি করবো?' আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, 'তখন ঘরে বালু রাখবেন। ঘরে ঢুকতে চাইলে সুযোগ মতো ওদের চোখে বালু ছিটাইয়া দিবেন। ওরা কানা হইয়া যাইবো'।

বস্তুত: ২৫ মার্চের কয়েকদিন পরই স্থানীয় জনগণ আওয়ামী লীগ নেতার এ অপরিপক্ক প্রতিরোধ কৌশলের বাস্তবতা হাড়ে-হাড়ে টের পায়। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়েই এ থানায় পাকিস্তানী সেনাদল আগমন করে। ফিরে যাওয়ার সময় এ আবদুল্লাপুর গ্রামেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ১১ জন গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। নেতাদের বর্ণিত মরিচের গুড়া, বালি, অথবা বাঁশ-লাঠি এমনকি পাখি শিকারের বন্দুক পর্যন্ত প্রতিরোধ কৌশল হিসাবে কাজে লাগার প্রশ্নই আসে নি।

সশস্ত্র সংগ্রামে বাঙালীর ঐতিহ্য

১৯৭১ সালে মার্চ মাসে বিদ্রোহী বাঙালী জাতি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাঁধে অস্ত্র তুলে নেয়। অনেক মনে করে শান্ত-শিষ্ট বাঙালী এই প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লাভ করলো। প্রকৃতপক্ষে হাজার বছরের বাঙালীর ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, যুগে যুগে বাঙালী প্রতিবাদ-প্রতিরোধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রাম বাঙালীর ঐতিহ্যের অনুসারী। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাঙালী জীবনে যে ঘটনা ঘটলো তা ইতিহাসেরই একটি ক্রমপরিণতি মাত্র, যাতে এই প্রথম ব্যাপক বাঙালী-সমাজ অংশ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে অষ্টম শতকে (আজ থেকে হাজার বছর আগে) পাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানকার কৈবর্ত-কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিতে দেখা যায়। ঐ সশস্ত্র সংগ্রাম শ্রেণী সংঘর্ষে রূপ নিয়েছিল। কৈবর্তদের বিদ্রোহী নেতা দিব্যোক সংগ্রামে জয়লাভ করে রাষ্ট্র সংগঠন দখলও করে ছিলেন।[৩৭]

গরীব মেহনতী মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা এই প্রথম এবং এখন পর্যন্ত শেষবারের মতো অধিষ্ঠিত হয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মনসামঙ্গল কাব্যের সুবিস্তৃত অংশ জুড়ে উচ্চ শ্রেণীর মতাদর্শীদের বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর মানুষের সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। মনসামঙ্গলের এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেও জয়লাভ করেছিল নিম্নশ্রেণীর মানুষের দলই--নাগরা, নাগদের মাতা মনসা এবং কৈবর্তরা। কৈবর্ত জেলেদের সাথে নেমে পড়েছিল কৃষকরাও। শ্রেণীসংঘর্ষে উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক জেলে ও অন্যান্য কোমগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলির মৈত্রীর এই কথা বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় ঘটনা। সাহিত্যে প্রতিফলিত এসব ঘটনা নিশ্চয়ই সমকালীন সমাজ-মানস দ্বারা পরিপুষ্ট। কিছু কিছু সাহিত্য-দলিলে বাংলাদেশের অতি আদিযুগের স্মৃতিও জড়িয়ে আছে।[৩৮]

বাংলাদেশে সমগ্র মুঘল শাসন জুড়ে ও তার পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনামলে কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ পরিলক্ষিত হয়। মুঘল শাসনের শেষ পাদ থেকে এ বিদ্রোহ সশস্ত্র রূপ নেয়। এসব বিদ্রোহের স্বরূপ ছিল বিভিন্ন রকম। কখনো কখনো দেখা দিয়েছে আঞ্চলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। কখনো ধর্মগত বিরোধ ও উৎপীড়নও বিদ্রোহের উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। তবে শ্রেণীগত শোষণ-বঞ্চণা এবং নিপীড়নও অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। জাতীয় দাবী স্বাধীনতার প্রশ্নেও বাঙালীরা বৃটিশ যুগে অস্ত্র ধরে।

নিম্নে বাংলার সশস্ত্র বিদ্রোহের কতকগুলি কালপঞ্জি উল্লিখিত হলো, যা থেকে এ অঞ্চলে বিচিত্র রকম সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের একটি ছবি অনুমান করা সম্ভব হবে:

---

৩৭ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব), (জোৎস্না সিংহ রায় কর্তৃক সংক্ষিপ্ত) (কলিকাতা, কে, এল মুখোপাধ্যায় ও লেখক সমবায় সমিতি, ১৩৮২) পৃষ্ঠা ১৬০-৬১

৩৮ মোহাম্মদ হাননান, 'বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব', বাংলা একাডেমীতে প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ, ১৯৮৬

১. কৈবর্ত বিদ্রোহ : পাল আমল (অষ্টম শতক)।
সশস্ত্র সংঘর্ষের পর কৃষকের ক্ষমতা দখল।

২. সন্দ্বীপ বিদ্রোহ (১৭৬৪), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩),বাকেরগঞ্জ বিদ্রোহ (১৭৯২) এবং এই সময়কার উপজাতীয় বিদ্রোহ।

এ বিদ্রোহ ও সংঘর্ষগুলির কারণ ছিল মূলত আঞ্চলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। অঞ্চল-ভিত্তিতে এগুলি ব্যাপকতা লাভ করে।

৩. ফকির সন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), সিলেট বিদ্রোহ (১৭৮২, ১৭৯৯), কুমিল্লার ফিরিঙ্গী খেদাও বিদ্রোহ (১৯৮৭)।

এ প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির পটভূমি ছিল ধর্মীয় কারণ। কিন্তু পরে তা জন-প্রিয় গণবিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়।

৪. ১৭৬৭ সালে সিলেট-ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগণায় কৃষক বিদ্রোহ ও তাদের স্বাধীন প্রলেতারিয়েত রাজ্য প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে অনন্য ঘটনা।

জমিদারের অন্যায় অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ক্রীতদাস সমশের গাজী এই অঞ্চলের যুবক-কৃষকদের সংগঠিত করে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করতে থাকেন। হিন্দু, মুসল-মান যুবক ও কৃষকরা সমশের গাজীর বাহিনীতে দলে দলে যোগদান করেন এবং সম্মুখ সমরে স্থানীয় জমিদারকে পরাজিত করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।[৩৯]

নোয়াখালী জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, সমশের গাজী তার স্বাধীন রাজ্যে গরীব ও মেহনতী ভূমিহীনদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বন্টন করে ছিলেন। এবং গরীব জনগণের কর-খাজনা মওকুফ করে দিয়েছিলেন।[৪০]

৫. ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ এবং তার পূর্ববর্তী কৃষক প্রতিরোধ (১৮২৪-১৮৩৩)

৬. সুসং বিদ্রোহ (১৮২৪), নেতা টিপু শাহ

৭. ফরায়েযী ও ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৩১), নেতা তিতুমীর (১৮২৭), ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে সশস্ত্র যুদ্ধ।

---

৩৯ সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলিকাতা: ডি. এন. বি. এ ব্রাদার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০) পৃষ্ঠা ৫৭-৬০

৪০ Noaklai District Gzetteer, P.23

৮. তুষখালী বিদ্রোহ (১৮৫৮-১৮৭৫)

৯. নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬১)

১০. পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭৩)

উপরিউক্ত বিদ্রোহগুলি মূলগতভাবে ছিল সামন্তবাদ বিরোধী, অন্তত এসব বিদ্রোহে সামন্তবাদ, রাজতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র প্রভৃতি প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছিল। পূর্ববর্তী অন্যান্য বিদ্রোহের তুলনায় এ বিদ্রোহগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের সমপর্যায়ভুক্ত।

১১. এরমধ্যে ১৮৫৭ সালে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভারতের সিপাহীরা যে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে তাতে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষও জড়িয়ে পড়েছিল। বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর অন্যতম বাকল্যাণ্ড তার রচিত গ্রন্থে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের সময়কালীন বাংলাদেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন নিম্নক্তোভাবে :

'রাজশাহী বিভাগে সব সময়ই একটা আশঙ্কা ছিল।...সমস্ত নদীয়া এলাকা ও কৃষ্ণনগরে এবং যশোরের মধ্য দিয়ে একটা অশান্তভাব চারদিক ছেয়ে পড়েছিল। বর্ধমান ও ছোট নাগপুর অঞ্চলে ছিল বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা।... বাংলাদেশে এমন একটা জেলা ছিল না, যা থেকে প্রত্যক্ষ বা ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা ছিল না'।[৪১]

যে মাসে পশ্চিমবঙ্গের বারাকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ করার পর চট্টগ্রামের সিপাহীরাও (১৮নভেম্বর) বিদ্রোহ করে এবং এ সময় ভয়ে ও সন্ত্রস্ত হয়ে নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল জেলার ইংরেজ কর্মচারী ও স্থানীয় জমিদাররা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এ বিদ্রোহ দমাতে যোগ দেয়। কিন্তু ফরিদপুর ও বাখেরগঞ্জ অঞ্চলের জনগণ ফরায়েজী আন্দোলনকারীদের সাথে মিলে সিপাহীদের সমর্থনে বিক্ষোভ ও জনসভা করতে থাকে। এই সময় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ফরিদপুরের বিখ্যাত ফরায়েজী নেতা দুদু মিঞা।

---

৪১ Buckland, *Bengal Under Lt. governors* Vol,1,pp, 67-68

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ৪দিন পর ২২নভেম্বর (১৮৫৭) ঢাকা দুর্গেও বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এখানে সিপাহীদের নিরস্ত্র করতে গেলে তারা দুর্গের কামান দখল করে নেয়। ঢাকায় সশস্ত্র যুদ্ধের পর এখানে ৪১ জন স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী সিপাহী শাহাদাৎ বরণ করেন।[৪২]

ঢাকায় এই বিদ্রোহের সময় ঢাকার খাজারা (নবাব সলিমুল্লাহর পূর্বপুরুষরা) ইংরেজদের পক্ষে এগিয়ে আসে এবং বিদ্রোহীদের ধ্বংস করতে সহযোগিতা করে। এই জন্য ইংরেজ সরকার খাজা আব্দুল গণি ও আব্দুল আহমদ খানকে, পুরস্কৃত ও খেতাব প্রদান করে। খাজারা 'নবাব' উপাধি পান এখান থেকেই।[৪৩]

খাজারা 'নবাব' উপাধি নিয়ে যখন ইংরেজদের দালালী করছেন, তখন কেরামত আলী নামক একজন বাঙালীর নেতৃত্বে জনগণ সিপাহীদের সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলছেন। বাকল্যাণ্ড এ আন্দোলনকে বলেছেন, 'গণ্ডগোল'।[৪৪]

এই সময়ের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের ছোঁয়া বাংলাদেশের মানুষের মাঝে সংগঠিতভাবে কি প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং তা কি ভয়ানক বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর জন্য, তারও বিবরণ রয়েছে বাকল্যাণ্ডের গ্রন্থে :

'ঢাকা বিভাগে গণ্ডগোল বাধাবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দলের অভাব ছিলনা।... সিলেটের...... অনেককেই খুব বিপদজনক মনে হতো। সব থেকে বিপদজনক ছিল ঢাকা শহর, সেখানকার প্রচুর মুসলমান জনসাধারণ সরকারের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না'।[৪৫]

কার্ল মার্কসের কাছে এ বিদ্রোহ জাতীয় মর্যাদার স্থান পেয়েছিল। তিনি তাকে 'স্বাধীনতা যুদ্ধে'র অভিধায় চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। মার্কস এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, বিদ্রোহীরা সশস্ত্র সংগামে অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইউরোপীয়ান অফিসারদের হত্যা করছে। হিন্দু-মুসলমান তাদের বিদ্বেষ পরিহার করে মূল শত্রুকে চিনতে

---

৪২ প্রমোদ সেনগুপ্ত, *ভারতীয় মহাবিদ্রোহ*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৮৪), পৃষ্ঠা ১৫

৪৩ Buckland, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৪ এবং আরো দেখুন, মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭

৪৪ *Buckland, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৪*

৪৫ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১-৪২

পেরেছে। আর এর ফলেই হিন্দু সিপাহীরা দিল্লীতে একজন মুসলমানকে (বাহাদুর শাহকে-লেখক) সিংহাসনে বসানোর মতো ঔদার্য দেখাতে পেরেছে। মার্কস আরো উল্লেখ করেন, বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহীদের মধ্যে নয়, ছড়িয়ে পড়েছে জনতার মধ্যেও। পরিশেষে মার্কস, বেঙ্গল আর্মীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শৌর্য-বীর্য লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন,

'বেঙ্গল আর্মীর বিদ্রোহ নি:সন্দেহে পারস্য ও চীন যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত'।[৪৬]

১২. ১৯০০ থেকে ১৯১৮ সালে সমগ্র বঙ্গদেশ ছিল ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর জন্য ভয়ানক দুর্যোগের সময়। এ সময় স্বাধীনতাকামী ছাত্র, যুবক সম্প্রদায়, অস্ত্র তুলে নেয় ইংরেজ হটানোর আন্দোলনের চরম পর্যায় হিসেবে। বঙ্গদেশে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টি ইংরেজদের কাছে 'ত্রাস' হিসেবে পরিগণিত হয়। অনুশীলন সমিতির মূল ঘাটি ছিল ঢাকা।

১৩. ১৯৩০ সালে এ ধারার বিপ্লবী নেতা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠিত হয়। তবে বিদ্রোহীদের পরিকল্পনায় অস্ত্রাগার লুন্ঠনই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করারও পরিকল্পনা করেছিলেন। স্থির হয়েছিল এ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হবেন বিপ্লবী নেতা সূর্যসেন।[৪৭]

১৮ এপ্রিল সূর্য সৈনিকরা অস্ত্রাগার আক্রমণ করে ও ২২ এপ্রিল ইংরেজ বাহিনী সমূলে উৎপাটিত হয়ে পরাজয় বরণ করে। ১৭৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে যাওয়ার পর সমগ্র ভারতে, এই বঙ্গদেশে ইংরেজদের এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধে পরাজয়।

১৪. নানকার বিদ্রোহ (১৯২২,১৯৪৯)

১৫. টংক আন্দোলন(১৯৩৭-১৯৪৯)

১৬. তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭)

১৭. নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ (১৯৪৯-৫০)

---

৪৬ মার্কস - এঙ্গেলস, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯৫৭-৫৯), (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন) পৃষ্ঠা ৪১
৪৭ পূর্ণেন্দু দস্তিদার, 'চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুন্ঠন' বাংলাদেশ সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন (সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন সম্পাদিত) (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬), পৃষ্ঠা ২৮৫

উপরিউক্ত সশস্ত্র আন্দোলনগুলির সবকয়টিই বৃটিশ যুগ থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অবস্থা পর্যন্ত বিরাজ করেছিল। এই সশস্ত্র সংগ্রামগুলির সাথে কমিউনিস্ট পার্টি যুক্ত ছিল। বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো রাজনৈতিক শক্তি সশস্ত্র সংগ্রামের পরিচালনা ও সংগঠিত করার সাথে যুক্ত হল। ফলে এর বিস্তৃতি, প্রভাব ও আলোড়ন সমগ্র উপমহাদেশকে তোলপাড় করেছিল।

এই সময়ের একটি সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনাকারীর স্মৃতিচারণে এ সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়:

'লড়াই সংগঠিত করার লক্ষ্যে পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় স্থান ঠিক করার জন্য কমরেডদের নির্দেশ দেওয়া হল।বলা হল সামনা-সামনি নয়, গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করতে হবে। এর জন্য সত্তর মাইল ব্যাপী পাহাড় এলাকায় নয়টি ক্যাম্প গঠিত হল।...

আমাদের হাজং কারিগর কমরেডরা প্রথমে দু'টি গাদা বন্দুক তৈরী করলেন।... বন্দুক গুলো এত সুন্দর ও মসৃণ ছিল যে তা যন্ত্রে তৈরী আসল বন্দুকের সাথে তুলনা করা যেত। এভাবে আমাদের কারিগরেরা গোটা পঞ্চাশেক গাদা বন্দুক তৈরী করেছিলেন। এ ছাড়া তারা বড় বড় কতকগুলো বন্দুকও তৈরী করেছিলেন। এ গুলোতে পলিতা দিয়ে এক সঙ্গে ত্রিশ চল্লিশটি গুলি ছোড়া যেত। তারা এ গুলোকে কামান বলতো।

...এ সময় হাজং মেয়েদের রাইফেল চালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যান্য ভলান্টিয়ারদের রাইফেল চালনা ও গেরিলা কায়দায় শিক্ষিত করা হয়। ভলান্টিয়ারদের রাইফেল চালনা ও গেরিলা কায়দায় শিক্ষিত করা হয়'।[৪৮]

১৮. ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাঙালী জীবনের সশস্ত্র সংগ্রাম সর্বশ্রেণীর জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে পরিণত হয়। প্রতিটি বাঙালী ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলে এই সশস্ত্র সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ নেয়। এটা ছিল হাজার বছরের বাঙালীর সংগ্রামী জীবনের একটি প্রায় চূড়ান্তরূপ।

---

৪৮ মণিসিংহ, *'টংক আন্দোলন,'* (পূর্বোক্ত *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* গ্রন্থে সম্পাদিত প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা ৩৬৯-৭০

অসহযোগ আন্দোলনের চরম অবস্থার পরও পাকিস্তানী মহলের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিব চূড়ান্তভাবে কিছুই বুঝতে পারেন নি। পাকিস্তানীদের পক্ষ থেকে বড় ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে ঠিক কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার সুস্পষ্ট রূপ ঠিক করা ছিল না। বঙ্গবন্ধু শুধু বলেছিলেন, যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে। এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে।

সশস্ত্র সংগ্রাম, কোনো অস্থায়ী সরকার, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কাউকে কিছু বলে যান নি। সম্ভবত মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে তিনি থাকছেন এবং নিজেই সবকিছু পরিচালনা করবেন এমন একটা চিন্তা থেকেই তিনি এ ব্যাপারে অধিক আর কিছুই বলেন নি। শুধু তাজউদ্দিন আহমদকে তিনি ২৫ মার্চ (১৯৭১) সন্ধ্যায় ঢাকা শহরের আশ-পাশে কোনো এক গ্রামে অপেক্ষা করতে বলে বলেছিলেন, 'শীঘ্রই তাঁরা পুনরায় একত্রিত হবেন'।[৪৯] এর আগে ৫ কিংবা ৬ মার্চ (১৯৭১) বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দিন আহমদকে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারের সাথে আলাপ করার জন্য গোপনে পাঠিয়ে ছিলেন ভারতের সাহায্যের প্রত্যাশায়।

তাজউদ্দিন আহমদ ঢাকার শহরতলীর নির্দিষ্ট স্থানে বঙ্গবন্ধুর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এবং পরে তাঁর গ্রেফতারের খবর নিশ্চিত হয়ে কলকাতা চলে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন কোনো কিছুই প্রস্তুত নেই। এমনকি ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাছেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ভারত সরকারের কোনো বার্তা নেই। ফলে তাজউদ্দিন আহমদ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করার মনস্থির করলেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাজউদ্দিনকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ দেওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেন্ট ৩১ মার্চ একটি প্রস্তাব পাশ করে যে, বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়েছে জানতে পারলে পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামকে সাহায্য করার কথা বিবেচনা করা হবে।

তাজউদ্দিন আহমেদ ৩ এপ্রিল তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা এই অস্ত্রটি কাজে লাগালেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন, ২৫-২৬ মার্চেই শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে একটি সরকার গঠিত হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ হাইকমাণ্ডের সকলে এই মন্ত্রিসভায় আছেন, তাজউদ্দিন আহমদ নিজে এ সরকারের

---

[৪৯]সাক্ষাৎকার: তাজউদ্দিন আহমদ, প্রধানমন্ত্রী, স্বাধীন বাংলা সরকার, *মূলধারা '৭১* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৮-৯

প্রধানমন্ত্রী বলে পরিচয় দেন। বস্তুত তাজউদ্দিন আহমদের সে পদ পাওয়ার একশত ভাগ যোগ্যতাই ছিল। অন্তত বঙ্গবন্ধু তাঁকে অন্যান্য নেতার তুলনায় সবচেয়ে বেশী মর্যাদাই দিতেন।

তাজউদ্দিন আহমদের উপস্থিত এ বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছিল। কারণ এ বৈঠকের পরই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করেছিল।

কিন্তু তাজউদ্দিন আহমদ আটকে গেলেন তাঁর সতীর্থ বন্ধুদের কাছ থেকেই। বিশেষ করে ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও আওয়ামী লীগ নেতা চিত্তরঞ্জন সুতার তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইলেন না--তাঁরা কোনোভাবেই তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মানলেন না (শেষ পর্যন্তও মানেন নি)।

এর মধ্যে তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তিযুদ্ধের করনীয় ও কর্মসূচী তৈরী করে একটি বেতার ভাষণ দেওয়ার খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন ভারতের শিলিগুড়ির অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে। কিন্তু কলকাতায় উপস্থিত চিত্তরঞ্জন সুতার ৪২ জন আওয়ামী লীগ ও যুব নেতার স্বাক্ষর করে এই বেতার বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠান।

কলকাতায় তখন আওয়ামী লীগের বড় নেতাদের মধ্যে একমাত্র এইচ. এম. কামরুজ্জামানই উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাজউদ্দিন বিরোধীদের সাথে যোগ দিলেন। ফলে তাজউদ্দিন একটি পুরনো ডাকোটা বিমান নিয়ে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের খুঁজে বের করতে রওয়ানা হলেন। দু:খজনক হলেও সত্য যে, এই দু:সময়েও তাজউদ্দিন আহমদকে অন্যান্য নেতাদের খুঁজে বের করতে হয়েছিল। মালদহ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, রূপসা, শিলচর হয়ে আগরতলা পর্যন্ত পথে পথে তিনি খুঁজে বের করেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, আব্দুল মান্নান, সৈয়দ নজরুল, খোন্দকার মোশতাক ও কর্নেল ওসমানীকে।

১০ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশী সরকার এক অধ্যাদেশ জারী করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাজউদ্দিন আহমদ একটি বেতার ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি সারাদেশের যুদ্ধ প্রতিরোধের বিস্তারিত বিবরণ দেন।

তিনি বলেন, 'আজ প্রতিরোধ আন্দালনের কথা গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে। হাজার হাজার মানুষ আজকের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন।...... সাগর পারের বাঙালী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন আমাদের অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য পাঠাচ্ছেন।

সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর খালেদ মোশাররফকে আমরা সমর পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছি।.... মুক্তি বাহিনী......শত্রুসেনাদের সিলেট ও কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্টের ছাউনিতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে।....

চট্রগ্রাম ও নোয়াখালি অঞ্চলের সমর পরিচানার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের উপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্রগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে উঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী ও বীর চট্রলের ভাই-বোনেরা যে সাহসিকতার সাথে শত্রুদের মোকাবেলা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রতিরোধ স্ট্যালিন-গ্রাডের পাশে স্থান পাবে।....

ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মেজর সফিউল্লার উপর। আমাদের মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।....

....মেজর ওসমানের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কুষ্টিয়া ও যশোহর জেলার। কুষ্টিয়ার ঐতিহাসিক বিজয়ের পর আমাদের মুক্তিবাহিনী সমস্ত এলাকা থেকে শত্রু বাহিনীকে বিতাড়িত করেছে।....

উত্তরবঙ্গে আমাদের মুক্তিবাহিনী মেজর আহমদের নেতৃত্বে রাজশাহীকে শত্রুর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছেন। মেজর নজরুল হক সৈয়দপুরে ও মেজর নোয়াজেস রংপুরে শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ণ অবরোধ করে বিব্রত করে তুলেছেন।....

আপাতত: আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের মুক্ত এলাকায়। পূর্বাঞ্চলের সরকারী কাজ পরিচালনার জন্য সিলেট-কুমিল্লা এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের আর একটি কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।....

ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতবর্ষ এই নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে তাঁদের হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে এবং সোভিয়েত রাশিয়া অবিলম্বে এই হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন বন্ধ করবার আহবান জানিয়েছে।....

আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস; কারণ প্রতিদিনই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে, এবং আমাদের এ সংগ্রাম পৃথিবীর স্বীকৃতি পাচ্ছে'।[৫০]

১১ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ আগরতলায় মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত করেন। ১৫ এপ্রিল কলকাতায় এসে পাকিস্তানের বাঙালী ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলীকে বাংলাদেশের আনুগত্য ঘোষণা দানে স্বীকৃত করান। ১৭ এপ্রিল 'মুজিবনগরে' নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।[৫১]

বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধীন সরকারের এই শপথ অনুষ্ঠান ছিল অনন্য সাধারণ ঘটনা, শপথ অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়:

'গাড়ীগুলো শেষ পর্যন্ত এসে থামলো একটি বিশাল আমবাগানের মধ্যে। এই গ্রামটির নাম বৈদ্যনাথতলা, জেলা কুষ্টিয়া, মহকুমা মেহেরপুর। কিছু লোক সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে চেয়ার সাজাচ্ছে, অধিকাংশই হাতল ভাঙা চেয়ার, কাছাকাছি গ্রামের বাড়িগুলো থেকে জোগাড় করে আনা। জায়গাটিকে ঘিরে রাইফেল আর এল এম জি হাতে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পঁচিশ-তিরিশ জন সৈন্য, তাদের ঠিক মুক্তিবাহিনীর ছেলে বলে মনে হয় না, খুব সম্ভবত প্রাক্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একটি বিদ্রোহী বাহিনী।....

আশপাশের গ্রাম থেকে ধেয়ে এসেছে বিপুল জনতা। অস্ত্রধারী সেনাদের বৃত্ত ভেদ করে তারা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারছে না বলে অনেকেই আমগাছগুলোতে চড়তে শুরু করেছে।....

অনুষ্ঠান শুরু হল এগারোটার পর। তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সবাই এসে গেছেন। তবে যাঁর উপস্থিতি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ছিল, তিনি নেই, তিনি আসবেন না। শেখ মুজিব যে কোথায় আছে তা এখনো জানা যায় নি। তবু অনুপস্থিত শেখ মুজিবর রহমানের নামই ঘোষণা করা হলো রাষ্ট্রপতি হিসেবে।

---

৫০ স্বাধীনতার দলিল, পূর্বোক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮-১৫
৫১ *মূলধারা'৭১*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮-১৮

সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ। মন্ত্রিসভার অন্য তিন জন সদস্য হলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এইচ. এম কামরুজ্জামান এবং এম মনসুর আলী। বাংলাদেশ সৈন্য বাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ নিযুক্ত হলেন রিটায়ার্ড কর্নেল ওসমানী।

এর সাতদিন আগেই কলকাতার থিয়েটার রোডের অস্থায়ী মুজিবনগর থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করা হয়েছিল। আজ, ১৭ই এপ্রিল, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার, ঐতিহাসিক দলিলটি পাঠ করলেন চীফ হুইপ ইউসুফ আলী'।[৫২]

ইপিআর-এর ৪ উইং-এর একটি সুসজ্জিত দল ক্যাপ্টেন মাহবুবুল হাসানের নেতৃত্বে গার্ড অফ অনার দিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে।[৫৩]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: প্রাক প্রস্তুতির কয়েকটি স্মারক চিহ্ন[৫৪]

মহাভারতের একটি গল্প নিম্নরূপ: বলিরাজার নি:সন্তান মহিষী সুদেষ্ণা জন্মান্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে পাঁচ পুত্র জন্ম দেন। এরা যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। দীর্ঘতমা পরে সুদেষ্ণাকে বর দিয়ে বলেন, 'তোমার, পুত্রগণের অধিকৃত রাজ্যসমূহ তাদের নামে খ্যাত হইবে'।

কিংবদন্তী আছে যে, তার থেকেই অঙ্গের নামে 'অঙ্গদেশ', বঙ্গের নামে 'বঙ্গদেশ', কলিঙ্গের নামে 'কলিঙ্গদেশ', পুণ্ড্রের নামে 'পুণ্ড্রদেশ' ও সুহ্মের নামে 'সুহ্মদেশ' গঠিত হয়।

তবে প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদেই প্রথম 'বঙ্গে'র নাম পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এ এলাকার লোকদের বলছে 'দস্যু', ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাভারত বাংলার সমুদ্রতীরবর্তী লোকদের বলছে 'ম্লেচ্ছ', ভাগবত পুরাণ বলছে 'পাপ' এবং এদের

---

৫২ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্ব-পশ্চিম*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৯), পৃষ্ঠা ৮৫-৮৭

৫৩ *'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেলস'*, বি.ডি.আর স্মরণিকা ১৯৮৯ পৃষ্ঠা ৭-১৪

৫৪ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালে ঠিক আকস্মিক ছিল না। দীর্ঘদিনের ইতিহাস, ঐতিহ্য, চেতনা এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম এর পেছনে কাজ করেছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এ স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিনা তাও আলোচনার দাবী রাখে। আলোচ্য অধ্যায়টির প্রস্তাবনার মূল উদ্দেশ্য তা-ই

ভাষাকে বলা হয়েছে অসুর ভাষা। এছাড়া, আর্যাবর্তের বাইরের লোকজন যেখানে বাঙলা ও বাঙালীরা অন্যতম, তারা রাক্ষস, পক্ষী, দৈত্য, নাগ প্রভৃতি নামেও অভিহিত হতো।

'আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প' নামে এক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আর্য ভাষা-ভাষী লোকেরা অসুর জাতিভুক্ত।

আর্যসংস্কৃতির সীমানার বাইরের অংশকে আর্যরা 'দস্যুদের দেশ' বলে অভিহিত করেছিল। বিদেহ পর্যন্ত এগিয়ে আর্যরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল একমাত্র প্রাচ্যদেশে কথিত, এ অসুরদের দ্বারাই। এ অসুরদের দেশকে তারা 'ব্রাত্যদেশ' বা বেদবহির্ভূত দেশ বলে অভিহিত করতো। সেজন্য আর্যাবর্তের কোনো লোক যদি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বাংলাদেশে আসতো, তাহলে তাকে 'পুনোষ্টম' নামে এক যজ্ঞ সম্পাদন করে পবিত্র হতে হতো।

প্রাচীনকালে বঙ্গ বা বাঙ্গাল নামে যে জায়গা বোঝাত তা আজকের বাংলার (বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার) একটা অংশমাত্র। সে সময় বাংলাদেশ নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। এককেটি কোমের নামে জনপদের নাম হয়েছে– বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ়। এদের ছিল আলাদা আলাদা রাষ্ট্র।

কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের আমলে বঙ্গের দু'টি বিভাগ ছিল, একটি বিক্রমপুর ভাগ, অন্যটি নাব্যমণ্ডল (বাখরগঞ্জ জেলা থেকে পূর্ব দিকে সমুদ্র পর্যন্ত)।

হরিকেল নামে বাংলার একটি জনপদের কথা পাওয়া যায়, তাতেও বলা হয়েছে এর সীমা বাখরগঞ্জ জেলা থেকে সিলেট পর্যন্ত। চন্দ্রদ্বীপও ছিল এর আরেকটি নাম।

সমতট নামে বাংলাদেশের আরেকটি প্রাচীন জনপদ যার সীমা ত্রিপুরা থেকে চব্বিশ পরগণা ছিল বলে অনুমান করা হয়। বৌদ্ধযুগে পূর্ববঙ্গকেই সমতট বলা হতো।

বঙ্গাল নামেও আলাদা জনপদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সমস্ত পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র এলাকা জুড়ে সমগ্র ভূখণ্ডই ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

পুণ্ড্রবর্ধন-এর রাজধানী ছিল বগুড়ার মহাস্থানগড়। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা।

আবার বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং পাবনা মিলে ছিল বরেন্দ্রী জনপদ।

রাঢ় জনপদের রাজধানী ছিল কোটিবর্ষ। বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া জেলা, দক্ষিণ রাঢ় হিসেবে চিহ্নিত হলেও প্রাচীন সুহ্ম জনপদ ছিল এটি।
মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, কাটোয়ার প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে প্রাচীন বজ্রভূমি।
গৌড় নামেও একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। মুর্শিদাবাদ,বীরভূম গৌড়ের আদি কেন্দ্র হলেও এক সময় সমগ্র বাংলাদেশকেই 'গৌড়' বলা হতো।

ষষ্ঠ শতকে বঙ্গঅঞ্চলে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সাথে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রেরও পত্তন হয়।

সপ্তম শতক থেকে রাজা শশাঙ্কের আমলে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদকে এক সূত্রে গাঁথবার একটা প্রচেষ্টা চলে। পাল ও সেন আমলেও তার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। পাঠান আমলে এসে 'বঙ্গ' নামে বাংলার সকল জনপদ সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ হয়। আকবরের আমলে এসে 'সুবাবাংলা' এবং ইংরেজ আমলে 'বেঙ্গল' (Bengal) নামে তা একটি প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে।

বস্তুত বাংলার প্রাচীন ইতিহাস এভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায়, দিল্লীর মুসলিম সুলতানদের শাসনকাল বাদ দিলে স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রায় দু'শ বছর হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ গঠনের ইতিহাসে একটি 'মাইলস্টোন'। অর্থাৎ এই সুলতানী আমলেই প্রথম গৌড় ও বঙ্গ মিলে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এই রাষ্ট্রে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলা নামের একটি দেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান। উপাধী 'বঙ্গশাহী'। এর অধিবাসীরা 'বাঙালী' এবং রাষ্ট্রের নাম হল 'বাংলাদেশ'।

কিন্তু ১৫৩৯ সালে এই ঐক্যবদ্ধ বঙ্গদেশ আবার স্বাধীনতা হারালো। এই সময় বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। নাম দেওয়া হল তার 'সুবা বাংলা'। আর এ বঙ্গের রাজধানী হল ঢাকা।

পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুনের যুদ্ধে ক্লাইভের কাছে নবাব সিরাজদ্দৌলা হেরে যাওয়ায় বাংলার স্বাধীনতা বন্ধক থাকে ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা রাজধানী গড়ে কলকাতায়। কলকাতা ভারতেরও রাজধানী হল।[৫৪ক]

৫৪ক. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব) পূর্বোক্ত, সুভাস মুখোপাধ্যায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (ঢাকা: মুক্তধারা, বাংলাদেশ সংস্করণ, ১৯৮৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাঙলা বিভাগ থেকে, মনসুর মুসা সম্পাদিত, ১৯৭৪ এ '*বাঙলাদেশ*' নামক গ্রন্থে অধ্যাপক আকরম হোসেনের প্রবন্ধ যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৬) অতুল সুর, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস* (কলকাতা; জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬) প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রস্তুতকৃত

১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর বৃটিশ সরকার ঐক্যবদ্ধ বাংলায় আবার হস্তক্ষেপ করে। এ সময় একজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ প্রশাসক মন্তব্য করেন, 'ঐক্যবদ্ধ বাংলা ইংরেজের পক্ষে একটি বিপদজনক শক্তি, বিভক্ত হলে বাংলাদেশ আর আমাদের তেমন বিপদে ফেলতে পারবে না'।[৫৫]

ফলে 'বঙ্গ' ভঙ্গ হলো। ঢাকা আবার রাজধানী হল, তবে শুধু পূর্ববঙ্গের, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হল কলকাতা। বাঙালীরা তা মেনে নিল না। ফলে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল হল। কিন্তু কলকাতা থেকে রাজধানী চলে গেল দিল্লীতে। ঢাকারও রাজধানী হওয়াতে আবার ছেদ পড়লো। ক্ষিপ্ত হল পূর্ব বাংলা। ফলে বলা হল তাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয় করে দেওয়া হবে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।[৫৬]

১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ লাহোর সম্মেলনে এক প্রস্তাব পাশ হয়। এটা ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' বলে পরিচিতি লাভ করে। বঙ্গদেশের তৎকালীন প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ আবুল হাশিম লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করেছিলেন এই ভাবে, 'লাহোর প্রস্তাবে কেবলমাত্র যেসব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাবি করা হয় এবং কার্যত ভারতের সকল জাতির ও প্রদেশের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করা হয়। এই প্রস্তাবে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য সাংস্কৃতিক ইউনিটগুলোকে স্বেচ্ছায় ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুযোগসহ পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দেওয়া হয়'।[৫৭]

আবুল হাশিমের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বৃটিশ শাসিত ভারতে মুসলিম প্রধান যে বাংলা আছে তা পুরোটা আলাদা একটা দেশ হতে পারে। এবং তা মুসলিম রাষ্ট্র না হয়েই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল বাঙালী জাতির একটি দেশ। এমন করে হতে পারে হিন্দু প্রধান পাঞ্জাবও সকল ধর্ম নির্বিশেষে একটি আলাদা রাষ্ট্র। আবার জনগণ চাইলে সার্বভৌমত্ব নিয়েই ভারত ইউনিয়নে এগুলি থাকতে পারবে।

কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের অনেক বিকৃত ব্যাখ্যাও শুরু হল। ১৯৪৭ সালের ৪ মে মুসলিম লীগ নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এক বিবৃতিতে বলেন,

---

৫৫ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ* (কলকাতা: চারুথেকে, ১৯৮০) পৃষ্ঠা ১০

৫৬ এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণের জন্য *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, (পরে 'বা.ছা. আ.ই' উল্লিখিত), প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য

৫৭ অমলেন্দু দে, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা: প্রয়াস ও পরিণতি* (কলিকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৭৫) পৃষ্ঠা ২৯

'মসলিম বাংলা লাহোর প্রস্তাবের আদর্শ রূপায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও জিন্নাহর নেতৃত্বের প্রতি অনুগত। ৩০ এপ্রিল জিন্নাহর বিবৃতিতে যেভাবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, বাংলা ও আসাম সহ একটি সার্বভোম মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে, তাই হল আমাদের আদর্শ। সুতরাং পাকিস্তানের অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন অবান্তর। ভারতের মুসলমানরা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি এবং আমাদের উদ্দেশ্য হল একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা। সুতরাং আমি পৃথক বঙ্গভূমি গঠনের বিরোধিতা করি। যাঁরা হিন্দু -মুসলমানের মিলিত বাঙালী জাতির একটি পৃথক সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কথা বলেন, তাঁরা আমাদের শত্রুদের হাতের ক্রীড়নক'।[৫৮]

অন্যদিকে, ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দুদের দল 'হিন্দুমহাসভা' বাংলার হিন্দুদের জন্য কমিটি গঠন করে। ৪ এপ্রিল বঙ্গীয় হিন্দুসভার সম্মেলনে সভাপতি নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যেহেতু মুসলিম লীগ বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর, সেজন্য হিন্দুরাও বাংলায় একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকারের অধীনে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করবে।...... আমরা বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে মারফত হিন্দুদের জন্য একটি পৃথক মাতৃভূমি চাই'।[৫৯]

হিন্দু মহাসভার এ আন্দোলন এক পর্যায়ে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দকেও ছাড়িয়ে গেল। ২২ এপ্রিল (১৯৪৭) দিল্লীতে এক জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পাকিস্তান যদি গঠিত নাও হয়, মুসলিম লীগ যদি মন্ত্রী মিশন পরিকল্পিত দুর্বল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা মানিয়াও নেয়, তাহা হইলেও বাংলার হিন্দু মেজরিটি অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিতে হইবে'।[৬০]

হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যকার এইসব সাম্প্রদায়িক নেতারা যখন 'হিন্দু বাংলা', 'মুসলিম বাংলা' নিয়ে উন্মত্ত পাগলে পরিণত হয়েছেন, তখন তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ বিভক্ত করা যায় না। অমি এক যুক্ত ও বৃহৎ বাংলাদেশ গঠনের পক্ষপাতি। যদি বাংলাদেশ বিভক্ত হয় তাহলে তা সমগ্র বাঙালীর আত্মহত্যার সমতুল্য হবে।.... যদি বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে বাংলাদেশ একটি মহান দেশে পরিণত হবে এবং ভারত বর্ষের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী হবে।'

---

৫৮ Star of India, 5May, 1947, (অমলেন্দু দে-এর গ্রন্থে উদ্বৃত)
৫৯ অমৃত বাজার পত্রিকা, ৫ এপ্রিল, ১৯৪৭
৬০ ঐ ২৫ এপ্রিল ১৯৪৭

তিনি আরো বলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশ নিজেই তার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে।.... আমি বিভক্ত ভারতে এক স্বাধীন, অবিভক্ত ও সার্বভৌম বাংলাদেশের চিত্র কল্পনা করছি'।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী এমনকি যদি বঙ্গ-ভাগ রোধ সম্ভব নাও হয়, তবুও শুধু পূর্ববাংলাকে নিয়ে আলাদা স্বাধীন দেশের চিন্তাও করেছিলেন। তিনি বলেন, 'যদি পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগ করতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে পূর্ববঙ্গ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান করতে পারবে'।

তিনি বলেন, 'আমি যে স্বাধীন বাংলাদেশের কল্পনা করছি তা ভারতের কোন অঞ্চলের অংশ হিসেবে থাকবে না।.... বাংলা ভাগের অর্থ হল হিন্দু ও মুসলমানের উভয়ের সর্বনাশ করা'।[৬১]

বাংলার অপর একজন রাজনীতিবিদ শরৎচন্দ্র বসু আরো সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের বিরোধিতা করে বলেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জটিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ হবে কতগুলো সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন। এখানে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সম্মিলন ঘটবে। তার মধ্য দিয়ে এমন একটা মনোভাব গড়ে উঠবে যার ফলে দেশের সীমান্ত, জাতি ও শ্রেণী সম্পর্কে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা লোপ পাবে।

তিনি বলেন, দেশভাগে সম্মত হওয়া ভারতের স্বাধীনতা ও সামাজিক অগ্রগতির পথে মস্ত বড় অন্তরায় হবে। তার ফলে বিভক্ত প্রদেশসমূহ সাম্রাজ্যবাদীদের, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ও প্রতিক্রিয়াশীলদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হবে।[৬২]

মুসলিম লীগের প্রগতিবাদী নেতা আবুল হাশিম বাংলা ভাগের চক্রান্তের স্বরূপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এখন সময় এসেছে সত্য কথা বলার। সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য বিকৃত চিন্তার ও সুবিধাবাদী নেতৃত্বের আত্মসমর্পন করা প্রজ্ঞার ব্যভিচার।.... ভারতের বর্তমান বৈপ্লবিক চিন্তার উৎস হল বাংলাদেশ।..... আমাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক মনোভাব দেখে..... বিদেশী শোষকেরা শঙ্কিত। স্বাধীন

---

৬১ অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭-৯, ১৭,২০
৬২ ঐ পৃষ্ঠা ২১-২৪

ও ঐক্যবদ্ধ বাংলায় তাদের অসুবিধা হবে, তা তারা সহজেই বুঝতে পারছে।..... ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রস্তুত অজস্র মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে হিন্দু ও মুসলিম গুণ্ডাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারাই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে বাংলা বিভাগের পরিবেশ তৈরী করেছে।[৬৩]

রাজনৈতিক দল হিসেবে একমাত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'ঐক্যবদ্ধ বাংলার' কথা বলে। কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য ঐক্যবদ্ধ বাংলার মতো ভারতের ১৭টি জাতীয় ইউনিটের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কথাও বলে।

কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে, ভারতবর্ষ হল সতেরটি স্বাধীন জাতির এক পরিবার। কংগ্রেসের 'ভারতবর্ষ হল একটি জাতি' এবং মুসলিম লীগের 'মুসলমানেরা একটি পৃথক জাতি'--এই দুই তত্ত্বকেই কমিউনিস্ট পার্টি নাকচ করে দেয়। তারা বলে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকারসহ এই ১৭টি সার্বভৌম জাতির স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করলে ভারতের ঐক্যবদ্ধ রূপ বজায় রাখা সম্ভব হবে। কমিউনিস্ট পার্টির মতে এই ১৭টি আলাদা জাতীয় ইউনিট হল, ১. তামিলনাড়ু ২. অন্ধ্রপ্রদেশ ৩. কেরালা ৪. কর্ণাটক ৫. মহারাষ্ট্র ৬. গুজরাট ৭. রাজস্থান ৮.সিন্ধু ৯. বেলুচিস্তান ১০. পাঠানস্থান ১১. কাশ্মীর ১২. পাঞ্জাব ১৩. হিন্দুস্থান ১৪.বিহার ১৫. আসাম ১৬. বাংলা ১৭. উড়িষ্যা।[৬৪]

উভয় বাংলায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের বক্তব্য নিয়ে সর্বশেষ চেষ্টা চালিয়ে যান।

আবুল হাশিম, কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও নেত্রকোনায় এর উপর দু'টি সেমিনার অনুষ্ঠান করেন। শরৎবসু ও আবুল হাশিম এক গোপন বৈঠকে স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলার নীল নকশা প্রায় চূড়ান্ত করেন। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'য় তা প্রকাশিত হলে রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করে। ফলে বাংলা ভাগ করার ষড়যন্ত্রকারীরা দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দু'টো প্রতিষ্ঠানই ছিল শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী দ্বারা পরিচালিত। তাদের ভাগ্যের জন্যই বাংলা ভাগের খুব প্রয়োজন ছিল। পশ্চিম

---

৬৩ অমলেন্দু দে পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭-২৭
৬৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৮২-৮৫

বাংলার প্রয়োজন ছিল বিড়লা, ডাল মিয়াদের আর পূর্ববাংলার বাজার আদমজী ইস্পাহানীদের জন্যে দরকার ছিল।[৬৫]

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বৃটিশ সরকার ঘোষণা করে যে বৃটিশদের হাত থেকে ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করা হবে। এই ঘোষণায় ভারত বিভাগের কথা বলা হয়। তাছাড়া বাংলার ও পাঞ্জাবের সমস্যা উল্লেখ করে বলা হয়, এই দু'টো প্রদেশের আইন সভার সদস্যরা দু'টো অংশে বিভক্ত হয়ে পৃথক ভাবে বসবেন।

২০ জুন শুক্রবার বাংলার আইন সভার সদস্যরা বাংলাকে দু'টো অংশে বিভক্ত করার পক্ষে ভোট দেন।

বাংলা এভাবে আবার বিভক্ত হল। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ–এই দুই নামে। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হল পূর্ববঙ্গ, ভারতে অন্তর্ভুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ।

অনেক পরে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত পূর্ব বাংলার নাম দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তান। এভাবে বাংলা তার 'বাংলা' নামটিও হারায়।

উপর থেকে চাপানো সিদ্ধান্ত যেভাবেই কার্যকরী হোক না কেন, বাঙালী মনে স্বাধীনতার চেতনার স্ফূরণ ঘটতেই থাকে। পাকিস্তান জন্মের অল্প কয়েকদিন পরই ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে দু'টো ভাষা আন্দোলনের জঙ্গী ও আপোষহীন মনোভাব ছিল বাঙালী মনের সেই আবেগ ও চেতনার উজ্জীবনেরই ফল। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ভোট দিয়ে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের কবর রচনা করে বাঙালীরা বাংলা ভাগের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রতিশোধ নেয়।

৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর পূর্ববঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হন শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক। শপথ নেওয়ার কিছুদিন পরই তিনি যান পশ্চিম বাংলা সফরে। এ.কে ফজলুল হক বৃটিশ আমলে উভয় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলি তিনি অতিবাহিত করেন কলকাতায়। সাবেক বাংলার প্রধানমন্ত্রী সারা বাংলার ভূতপূর্ব রাজধানী কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে আবেগে বলে ফেলেন, 'অতীতের কর্মক্ষেত্রে এসে তিনি রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদের কথা ভুলে যান'।

---

৬৫ কামরুদ্দিন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (বিস্তারিত বা. ছা. আ. ই. প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত)

একই সময় 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় ফজলুল হকের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। এতেও ফজলুল হকের একই ধরণের আবেগময় কথাকে রং চড়িয়ে ছাপানো হয়।

পাকিস্তানের সকল সংবাদপত্রে এ খবরগুলি ফলাও করে ছাপা হয়। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার উদ্বৃতি দিয়ে বলা হয়, ফজলুল হক পূর্ব বাংলার পূর্ণ আজাদী দাবি করেছেন। এর অর্থ পূর্ব বাংলাকে করাচী থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া, ফজলুল হককে পাকিস্তানের এক নম্বর দুশমন বলে বর্ণনা করেন। এবং বলেন, ফজলুল হক পূর্ব বাংলার আজাদী ঘোষণা করে ভারতের সাথে সংযুক্ত করার ষড়যন্ত্র করছেন। একই সঙ্গে তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বলেন, এটা নয়াদিল্লী, পিকিং ও মস্কোর দালাল।[৬৬]

ফলে অগণতান্ত্রিকভাবে এক কলমের খোঁচায় বাংলার মানুষের রায়কে নস্যাৎ করে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই ভাঙনের যাত্রা শুরু। পাকিস্তানকেও টিকিয়ে রাখতে বন্দুক নিয়ে আসে সামরিক বাহিনী। শুরু হয় সামরিক শাসন। ১৯৭১ সালের শেষদিন পর্যন্ত পাকিস্তান এই সামরিক শাসনেই ছিল। যে সামরিক শাসন তার (পাকিস্তানের) বুকে চড়ে বসেছিল তা তাকে গলাটিপে হত্যা করে ছাড়ে।

ফজলুল হক সেদিন (১৯৫৪) কলকাতায় সত্যি সত্যি কি বলেছিলেন, আর কেনইবা বলেছিলেন, তা আজো রহস্যাবৃত হয়ে আছে। তবে এর থেকে যতো কিছুই হোক, ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা বা আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা এটাই প্রথম। এ আরেকটি চিহ্ন-সরণী।

কমিউনিস্ট নেতা দেবেন সিকদার ১৯৫৬ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি আলোচনা কমিউনিস্ট পার্টিতে তুলেছিলেন।

অন্য একটি সূত্র এ সম্পর্কে বলেন যে, দেবেন সিকদারের ১৯৫৬ সালের স্বাধীনতার দাবীর প্রশ্নটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে হয়তো, তবে এব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই যে দেবেন শিকদার বরাবরই প্রথম থেকে বাংলার পূর্ণ

---

৬৬ খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *ভাসানী যখন ইউরোপে* (ঢাকা, মুক্তধারা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮), পৃষ্ঠা ৫৭,১২৯

স্বাধীনতার বিষয়টি পার্টিতে তুলেছেন এবং কর্মী মহলে প্রচার করেছেন। তিনি একটি বিশ্বাস তার মস্তিষ্কে প্রোথিত করে নিয়েছিলেন যে, শোষক শ্রেণীর সাথে বাংলার মানুষের যে দ্বন্দ্ব তা পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অবসান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি বলতেন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনেও এ সংকট ও দ্বন্দ্ব যাবে না।[৬৭]

দেবেন সিকদার জানিয়েছেন, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটির যে সম্মেলন কলকাতায় আয়োজন করা হয়েছিল তাতে কমরেড কুমার মৈত্র পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা সম্মেলনে ৩২ থেকে ৩৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। তখন পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলছিল বলে সংসদে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সম্মেলনে যোগদান করতে পারন নি। এই সংসদ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, মোহাম্মদ তোয়াহা, সরদার ফজলুল করিম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং শহীদুল্লাহ কায়সার। সম্মেলনে কুমার মৈত্র প্রস্তাবিত স্বাধীনতার দাবী শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয় নি।[৬৮]

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কাগমারী সম্মেলনে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায় না হলে 'আচ্ছালামু আলায়কুম' জানানোর বাসনা প্রকাশ করেন। অবিলম্বে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করে মাওলানা ভাসানী বলেন, তা না হলে ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলা 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বলার প্রবণতা অনুভব করতে পারে। মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকার মাওলানা ভাসানীর এই 'আচ্ছালামু আলায়কুম' এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এর মাধ্যমে মাওলানা ভাসানী সরাসরি স্বাধীনতার আহ্বান জানান নি, তবে স্বাধীনতার বিকল্পের ধারণার বীজ বপন করেছিনেল।[৬৯]

প্রকৃত প্রস্তাবে মাওলানা ভাসানীর এ সময় কড়া রাজনৈতিক মন্তব্য কতটুকু সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত ছিল তা বলা আজকে কষ্টকর হলেও, এটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে একটি অবশ্যম্ভাবী দিক নির্দেশ। কারণ তৎকালীন

---

৬৭ সাক্ষাৎকার: মাহফুজউল্লাহ (সাধারণ সম্পাদক, বাংলা ছাত্র উইনিয়ন, ১৯৭২)
৬৮ দেবেন সিকদার, *উপমহাদেশে কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি* (ঢাকা, মুক্তধারা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮) পৃষ্ঠা ১১০
৬৯ শাহ আহমদ রেজা, *'স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক আন্দোলন এবং মওলানা ভাসানীর আচ্ছালামু আলাইকুম'* সপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৩ আগস্ট ১৯৮৫

রাজনৈতিক মহলে ও পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে যে আলোড়ন ঘটেছিল তা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ও সংসদ সদস্য মওলানা আতাহার আলী এক বিবৃতিতে বলেন, 'জনাব ভাসানী পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিদ্বেষ ও তিক্ততার প্রচারণা চালাইয়া ও পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান এছলামী জামহুরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, লেনিন গেট, গান্ধী গেট, সুভাষ গেট প্রভৃতি নামে তোরণ নির্মাণ করিয়া পাকিস্তানকে কি ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে চান তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন'।

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, 'পাকিস্তান এছলামী জমহুরিয়াকে 'আচ্ছালামু আলাইকুম' না বলিয়া প্রয়োজন হইলে জনাব ভাসানী সাহেবকে 'আচ্ছালামু আলায়কুম' জানাইবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাইতেছি'।[৭০]

দৈনিক আজাদ এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে 'পাকিস্তান সম্পর্কে কোন পাকিস্তানীর মুখে পাকিস্তান বিচ্ছেদের মারাত্মক কথা যে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হইতে পারে ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল?.... পাকিস্তানের প্রতি ইহা রাষ্ট্রদ্রোহের উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।'[৭১]

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদে স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমদ। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, আসহাবউদ্দিন আহমদ এবং শেখ মুজিবর রহমান এর সমর্থন করে বক্তৃতা দেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ জানিয়েছেন, প্রস্তাবটি তিনি তুলেছিলেন। এবং আওয়ামী লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও শেখ মুজিব তা সমর্থন করেছিলেন।[৭২]

তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন এর খোন্দকার মোশতাক আহমদ। তিনি প্রস্তাবক এবং সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, 'আপনারা একেবারে স্বাধীন হতে চান'?

পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান। তিনি বিতর্কে অংশ না নিয়ে এ সময় তার দপতরে 'বিশ্রাম' নিচ্ছিলেন'।

৭০ শাহ আহমদ রেজা, প্রাগুক্ত
৭১ আজাদ, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭
৭২ সাক্ষাৎকার: অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (সভাপতি: ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)

৬ এপ্রিল আতাউর রহমান খান এক বিবৃতি দিয়ে জানতে চান, 'পূর্ব বাংলার নেতারা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বলতে ঠিক কি বোঝাতে চান'।[৭৩]

১৯৫৭ সালের ২৬ মার্চ শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমাবেশে এসব বিষয় উত্থাপন করেছিলেন। তিনি ছাত্রদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে প্রাদেশিকতার মনোভাব উস্কে দিয়ে কিছু ব্যক্তি নায়ক হতে চাচ্ছেন এবং এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের সঙ্গে একত্রে থাকতে চায় না'।[৭৪]

১৯৫৭ সালের ২৫ ও ২৬ জুলাই মাওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা খান আবদুল গাফফার খান, ওয়ালী খান, মাহমুদুল হক ওসমানী সহযোগে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। (পাকিস্তান আওয়ামী লীগের) বিদ্রোহী অংশ, পূর্ব বাংলা গণতন্ত্রী দল, পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি মিলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টি গড়ায় নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টিরও ভূমিকা ছিল।

ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ন্যাপ (N.A.P)–এর বানান সম্প্রসারণ করেছিলেন 'নেহেরু এইডেড পার্টি' বলে।

কিন্তু প্রচারণা ও প্ররোচনা সত্ত্বেও ন্যাপের তৎপরতার জন্য পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনায় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায়। পূর্ব বাংলার স্বাধীন আলাদা সত্তার চিন্তার সাথে এর সমাজ দর্শন হিসেবে যুক্ত হয় সাম্যবাদী চেতনার ধারণা।

ইস্টবেঙ্গল লিবারেশন পার্টি

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করার পর নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহে গঠিত হয় ইস্টবেঙ্গল লিবারেশন পার্টি। দলের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করা এ দলের মুখ্য কাজ।

---

৭৩ সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৩ আগস্ট ১৯৮৫
৭৪ শাহ আহমদ রেজা, পূর্বোক্ত

দলের ৩ জন সদস্য জনাব আবদুর রহমান সিদ্দীকি ও খন্দকার ফজলুর রহমান ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় সমর্থক এবং এ.এম সাঈদ ছিলেন ন্যাপ দলীয় সমর্থক।

নভেম্বর মাসেই (১৯৫৮) আলী আসাদের নেতৃত্বে (তাঁর পিতা ছিলেন স্থানীয় ন্যাপ নেতা তাসিরউদ্দিন আহমদ) জামালপুরে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে নেত্রকোণায়, এবং এ মাসের মাঝামাঝিতে টাঙ্গাইলে এর গোপন শাখা গঠিত হয়।

১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ব্রহ্মপুত্র নদীতে একটি বড় নৌকায় এ পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় এ পার্টি তার প্রথম শাখা খুলে।

এরপর পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা ভারতে চলে যায় অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ভারত থেকে তারা কিছু পোস্টার ও প্রচারপত্রও ছাপিয়ে আনে। এগুলি প্রধানত রাজনৈতিক নেতা ও প্রদেশের বিভিন্ন বার লাইব্রেরী, স্কুল ও কলেজের নামে ডাকে পাঠানো হতো। শেরেবাংলা এ.কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এদের তৎপরতা সম্বন্ধে অভিহিত ছিলেন। শেখ মুজিবের সাথে লিবারেশন ফ্রন্টের কর্মীরা যোগাযোগ রাখতো এবং শেখ মুজিব তাদের অর্থ সাহায্য করতেন তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭৫]

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ লিবারেশন পার্টির সাথে রাজনৈতিক নেতাদের যোগাযোগের সূত্র কখনোই বের করতে পারে নি। লিবারেশন পার্টি প্রচারিত পোস্টার ও প্রচারপত্র নিয়ে তারা অনেক অনুসন্ধান করেছে। কিন্তু এর সাথে রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিত্বের সংযোগ খুঁজে পায় নি। যদিও গোয়েন্দা বিভাগ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নেতাদের জড়িয়ে এ সম্পর্কে ভেবেছে। কিন্তু কখনোই মূল সূত্র খুঁজে পায় নি।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ সম্পর্কিত গোপন প্রতিবেদন (গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরী করা) এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য:

'সামরিক শাসন উৎখাত, সামরিক নেতাদের হত্যা এবং নিজস্ব সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী সমেত স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, এবং অন্যান্য

---

৭৫ স্বাধীনতার দলিল, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১ এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রা-য় ২১ জানুয়ারী ১৯৮৮ ও ৮ এপ্রিল ১৯৮৮ সংখ্যায় নূরউদ্দিন আহমদ, আশরাফ হোসেন ও আব্দুর রহমান সিদ্দিকীর চিঠি

যুদ্ধের আহবানের সমর্থনে পূর্ব পাকিস্তানে মধ্যে মধ্যে যেসব পোস্টার, লিফলেট ও অন্যান্য প্রচার সামগ্রী পাওয়া যায় তাতে স্বাভাবিকভাবেই ওয়ানের ভ্রান্ত ধারণা ও ভীতির সৃষ্টি হয়।.......

পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশন পার্টির নামে যারা প্রচারপত্র বিলি করেন তাদের একজনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি কলকাতায় গিয়ে সেখানে কয়েক ব্যক্তির সংগে সাক্ষাৎ করলেও তারা কথায় প্রকাশ হয় যে, পোস্টারগুলো আওয়ামী লীগের এক প্রাক্তন মন্ত্রী, একজন অধ্যাপক ও অন্যান্য স্থানীয় লোকদের অনুরোধে প্রস্তুত করা হয়। সে চিঠিতে নিজস্ব সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী সমেত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রস্তাব করা হয় এবং যাতে কোন কোন ব্যক্তি শীর্ষস্থানীয় পদে আসীন হবেন তার তালিকাসহ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের নিকট পাঠানো হয় তা পেশোয়ারে নিয়োজিত একজন বিক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট পূর্ব পাকিস্তানী এয়ারম্যানের কাজ বলে প্রতীয়মান হয়। সাম্প্রতিক সময়ে তৃতীয়বারের মতো ঢাকার সচিবালয়ের বাইরে যে সব পোস্টার দেখা যায়, যাতে প্রতিরোধ আক্রমনের অনির্দিষ্ট দিনের নাম করে শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়, এসব সচিবালয়ের কোন কর্মচারী লিখেছে বলে মনে হয়।.....

পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশন পার্টির পোস্টারগুলোতে লাল তারকা খচিত আকর্ষনীয় নকশা ছিল আর সেগুলি বার এসোসিয়েশনের আইনজীবী সমিতির সচিব ও সদস্যদের, সাংবাদিক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি জেলায় প্রচার করা হয়।....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও আঞ্চলিক মনোভাবাপন্ন ছোট্ট বুদ্ধিজীবীর দল আছে। ঢাকা ও বাইরে অধ্যাপক-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নিবৃতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের রেকর্ড ভালো নয়, আর এটা নি:সন্দেহ যে ছাত্রদের চিন্তাভাবনার ওপর এ দলটির অশুভ প্রভাব পড়েছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরোধী ন্যাপ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সদস্যরা সাধারণভাবে এধরণের তৎপরতায় ইন্ধন যোগায়।

৩৩টি আভ্যন্তরীণ লীফলেট ও পোস্টারের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি ৩ টি, জনসংঘ ১২টি ও অবশিষ্টগুলি অন্যান্যরা বের করে। ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি ধরে নেয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছিল একটি আলাদা জাতি এবং তাদের লক্ষ্য ছিল এ প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপ বিচ্ছিন্ন করা।....

স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টির সংগঠকদের খুঁজে বের করা হয়। তাদের দু'জনকে নিরাপত্তামূলক বন্দী রেখে অন্যান্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তার ফলে ১৯৬০ সালের জুলাই - এর মধ্যে এ দলের তৎপরতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

এর অধিকাংশ লীফলেট ও পোস্টারের উৎপত্তি হয়েছিল ঢাকা শহরে। বগুড়া শহরে চারটি পোস্টার খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের বিরোধী কিছু ছাত্র সেগুলি লেখে বলে সন্দেহ করা হয়। দুটো জায়গায় পোস্টারিং -এ অধুনালুপ্ত ন্যাপের কিছু ব্যক্তি জড়িত ছিল। এর একটি ঘটে বরিশাল জেলার ভোলায়। সেখানে অপরাধীদের ধরা হয় এবং তাদের মামলা এখন বিচারাধীন। অপরটি ঘটে সিলেটে এবং সেখানে তদন্ত চলছে।

দেখা যাচ্ছে যে, সামরিক আইনের সূচনা থেকে সমস্ত পোস্টারিং ছিল বিপথগামী ব্যক্তি বিশেষের কাজ এবং এর পেছনে কোন সুসংগঠিত দল ছিল না। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার হায়াত খানের পোস্টারিং-এর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ১৯৬০ - এর মার্চে মানুষ যখন ঈদুল ফিতর উদযাপনে ব্যস্ত তখন তিনি একাকী কিছু পোস্টার লিখে তার কিছু ঢাকার দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দেন'।[৭৬]

আওয়ামী লীগ-কমিউনিস্ট পার্টির বৈঠক: স্বাধীনতার প্রস্তাব

১৯৬১ সালে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আনুষ্ঠানিক গোপন বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে মিলিত সংগ্রামের যৌথ কর্মসূচী প্রণয়নই তার মূল উদ্দ্যেশ্য ছিল।

বৈঠক আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিবর রহমান ও তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মণি সিংহ ও খোকা রায় যোগদান করেন। দুই পক্ষের মধ্যে লিয়াজোঁ-কর্তা হিসেবে উপস্থিত থাকেন সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী। আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন ঢাকায়। দু'দলের ৪ দফা আলোচনায় তিনিও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

---

৭৬ স্বাধীনতার দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩-৪১ (পূর্ব পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন প্রতিবেদন) (মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

এ বৈঠকগুলোতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের যে কর্মসূচী তৈরী করা হয়, তাতে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার দাবীর কর্মসূচী উত্থাপন করেন, 'শেখ মুজিব তুললেন একটি মৌলিক প্রশ্ন। তিনি বললেন, এসব দাবী-দাওয়া কর্মসূচীতে রাখুন, কোন আপত্তি নেই, (শেখ মুজিব এ প্রসঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর কথা বলছিলেন-লেখক)। ঐ কিন্তু একটা কথা আমি খোলাখুলি বলতে চাই, আমার বিশ্বাস, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন এসব কোনো দাবীই পাঞ্জাবীরা মানবে না। কাজেই স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালীর মুক্তি নেই। স্বাধীনতার দাবীটা আন্দোলনের কর্মসূচীতে রাখা দরকার'।৭৭

পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর হাতে সবচেয়ে বেশী নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। শেখ মুজিবরের প্রস্তাব নীতিগতভাবে সমর্থন করে কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু তারা সে সময়কার বাস্তব সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রস্তাবটির অপরিপক্কতা সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে বলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতার প্রস্তাব নীতিগতভাবে সমর্থন করে। কিন্তু এ দাবি নিয়ে আন্দালন গড়ে তোলার সময় এখনো আসেনি। জনমত সেভাবে তৈরী হয়নি। কাজেই এ দাবি তুললে সেটা হবে আগাম পদক্ষেপ। তাতে আন্দোলনের ক্ষতি হবে এবং শাসকগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতাবাদের অজুহাতে আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে'।

শেখ মুজিব সহজেই কমিউনিষ্ট পার্টির যুক্তি মেনে নেননি। এতে পরে হস্তক্ষেপ করেন ঢাকায় অবস্থানরত আওয়ামী লীগ প্রধান শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সোহরাওয়ার্দীর মতামতই শেখ মুজিবকে সেদিন স্বাধীনতার কর্মসূচী নেওয়া থেকে নিবৃত্ত করে। শেখ মুজিবের ভাষায়, 'লীডারও আপনাদের মতে সায় দিয়েছেন'।৭৭ক

স্বাধীন পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির 'রাজনৈতিক চিঠি'

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও পঞ্চাশের দশকের শেষে এবং ষাটের দশকের প্রথমার্ধে স্বাধীনতার কথা আলোচিত হতে থাকে। পার্টির মধ্যে সারাদেশব্যাপী যে এই আলোচনা ও দাবী ব্যাপক রূপ নিয়েছিল তা বোঝা যায় ৬২ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির একটি রাজনৈতিক চিঠি থেকে। পার্টি সকল সভ্যদের ভেতরে এ

---

৭৭ বজলুর রহমান, ৬২-র ছাত্র আন্দোলন : নেপথ্য প্রস্তুতি, একটি ঐতিহাসিক বৈঠক, সাপ্তাহিক একতা, ১৯ আগস্ট ১৯৮৮ এবং খোকা রায়, সংগ্রামের তিন দশক (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬) পৃষ্ঠা ১৮২-৮৩

৭৭ক ঐ,

সম্পর্কিত কৌতূহল দমন ও কেন্দ্রীয় কমিটি এ সম্পর্কে কি ভাবছে তা জানানোর জন্যই এই গোপন চিঠিটি প্রেরণ করে। এতে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে বলা হয়:

'এই দাবীর মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি নিহিত রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে 'পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা আমরা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। কিন্তু 'বর্তমানে যেভাবে.... 'স্বাধীন পূর্ব বাংলার' দাবী উঠিতেছে তাহা রাজনৈতিক দিক হইতে যুক্তি সঙ্গত ও সমর্থন যোগ্য নয়। তাহা ছাড়া বর্তমানে এইরূপ দাবী উত্থাপন করা আমরা অপরিপক্ক এবং অসময়োচিত মনে করি।....

কিন্তু যাহারা স্বাধীন পূর্ব বাংলা দাবী উত্থাপন করিবেন আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকিব। আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে যে, এই দাবীর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ রহিয়াছে'।[৭৮]

কমিউনিস্ট পার্টিতে সম্ভবত এ বিতর্ক এই সময়টায় তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এ সময়কার পার্টির বিভিন্ন দলিলপত্রে স্বাধীনতা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের ঘন ঘন আলোচনা, চিঠি, সার্কুলার তা-ই প্রমাণ করে।

জুলাইতে পার্টি সদস্যদের কাছে পাঠানো 'রাজনৈতিক চিঠি'র মাত্র দেড়মাস পরেই তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর আর একটি দলিল প্রস্তুত করা হয়। এতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার দাবী সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপিত হয়। এতে বলা হয়:

'এই রাষ্ট্রের অর্ন্তগত বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা যত বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন যত জোরদার হইবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তিও তত দুর্বল হইয়া পড়িবে। এই আবস্থায়, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি বিশেষত: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মত দুইটি পৃথক অঞ্চল নিয়া একটি মাত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ভবিষ্যতে পাকিস্তান রাষ্ট্র একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িতে পারে'।[৭৯]

---

৭৮ স্বাধীন পূর্ববঙ্গ দাবী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির 'রাজনৈতিক চিঠি' পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৪ জুলাই, ১৯৬২

৭৯ জেলা ইউনিটগুলোর কাছে প্রেরিত পার্টির সভ্যদের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ২৮ আগস্ট, ১৯৬২

১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (চতুর্থ সম্মেলনে) ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত যে রাজনৈতিক রিপোর্ট উথাপিত হয় তাতেও স্বাধীনতা সম্পর্কিত কর্মীমহলে চিন্তা ভাবনার পর্যালোচনা করা হয়।

এ সম্পর্কে প্রবীণ দুই কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহ ও অমল সেন বলেন, স্বাধীনতা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির এই সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ হলো, এমনিতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। তার উপর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কমিউনিস্টদের উপর ছিল খড়গ হস্ত। এ আমলে সবচেয়ে নির্যাতীত ছিল কমিউনিস্টরা। কিছু হলেই কমিউনিস্টদের উপর তা চাপিয়ে দিত। ফলে কমিউনিস্টরা এসব ব্যাপারে একটু সতর্ক ছিল।

তাঁরা বলেন, সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ভাবিনি, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিষয়টা এতো দ্রুত আগাবে। তবে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, বিশ্বাসও ছিল। আসলে জনগণের মাঝে, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে, বিচ্ছিন্নভাবে এসব চিন্তা ছিল। তবে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পরে খুব দ্রুতই জনগণ এটা গ্রহণ করে নেয়। এতো দ্রুত যে সব কিছু ভাল করে বোঝার আগেই ঘটনাটা শুরু হয়ে যায়, এমনকি প্রস্তুতি ছাড়াই যুদ্ধ শুরু হয়।[৮০]

১৯৬৬: ৬ দফা

১৯৬৬ সালে এসে শেখ মুজিব লাহোরে ৬ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ৬ দফা হচ্ছে, বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ। প্রকৃতপক্ষে, ৬ দফাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্মারক চিহ্ন হিসেবে না দেখার কোনো যুক্তি নেই। সত্যি কথা বলতে কি, পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য ৬ দফা প্রণয়ন করা হয়নি। অন্তত: আর কোনো বিষয়ের দিকের না তাকিয়েও বলা যায়, শেখ মুজিব এক পাকিস্তানে যে দু'টি স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলেন, তা আর কিছু নয়— বাংলাদেশে স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকেই।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ জানিয়েছেন, '৬ দফা পরিকল্পনা পেশের সময় শেখ মুজিব তাঁকে এবং রুহুল কুদ্দুসকে ডেকে বলেছিলেন, 'আসলে এটা ৬ দফা নয়, এক দফাই। ঘুরিয়ে বললাম শুধু'।[৮১]

---

৮০ সাক্ষাৎকার : মণি সিংহ (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা) ও অমল সেন (ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের নেতা)

৮১ সাক্ষাৎকার : আধ্যাপক মোজাফফর আহমদ

এ প্রসঙ্গে মোজাফফর আহমদ আরো বলেন, '৪৭ সালে কলকাতা থেকে এসেই শেখ মুজিব 'পাঞ্জাবী খেদাও'-এর ডাক দিয়েছিলেন। তিনি এটা প্রকাশ্যেই করতেন। মুজিব যা বিশ্বাস করতেন, তা অবশ্যই করে ছাড়তেন, কখনো নানা কৌশল করতেন, কিন্তু কাজটা তিনি ঠিকই করে ছাড়তেন। ৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদে মোজাফফর আহমেদ কর্তৃক উত্থাপিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব আওয়ামী লীগের বিরোধিতা সত্বেও মুজিব তা প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন।[৮২]

১৯৬৬ সালে লাহোরে ৬ দফা দাবী পেশ করার পর করাচীতে এসে শেখ মুজিবের এটি ব্যাখ্যা করার কথা ছিল। কিন্তু করাচীতে তিনি অপমানিত হন, এমনকি তাঁকে হত্যা করারও একটা অপচেষ্টা করা হয়। ফলে তিনি তার করাচী-পরিকল্পনা বাতিল করেন।

১৩ এপ্রিল করাচী থেকে ফিরলে তাঁকে (শেখ মুজিবকে) ঢাকা বিমান বন্দরে স্বাগত জানাতে আগত ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে ঐদিনই তিনি তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করতে ডেকে পাঠান।

শেখ মুজিব এদিন ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের কাছে আওয়ামী নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এদের (আওয়ামী লীগ নেতাদের— লেখক) অধিকাংশই মুসলিম লীগ থেকে এসেছে— হতাশ হয়ে, সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে। তাদের দিয়ে ৬ দফার আর্দশ বাস্তবায়ন করা যাবে না। আওয়ামী লীগ প্রবীণ নেতাদের একটা বড় অংশ পাকিস্তানপন্থী বলে শেখ মুজিব এদিন তাঁর সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জেলায় জেলায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দখল করার জন্য ছাত্রলীগের তরুণ নেতাদের নির্দেশ দেন এবং ৬ দফার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলেন।[৮৩]

তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে '৬ দফা' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ৬ দফা কোথা থেকে এসেছিল, কে তার রচয়িতা,— এ নিয়ে বির্তক আজো শেষ হয়নি। শেখ মুজিব কর্তৃক ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করার পর সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তৎকালীন ভাসানী ন্যাপ, চীনপন্থী কমিউনিস্ট

৮২ সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ

৮৩ সাক্ষাৎকার : শামসুজ্জামান চৌধুরী (তিনি ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মনির একজন ঘনিষ্ট সহচর হিসেবেও খ্যাত ছিলেন, বর্তমানে তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন আধিকারিক)

গ্রুপসমূহ এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)। এদের মতে, ৬ দফা আসলে প্রণয়ন করেছিলো আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা (সি. আই. এ)। লক্ষ্য ছিল, আইয়ুব খানকে বিপাকে ফেলে আরো বেশী ঘনিষ্ঠতা আদায় করা। তবে ৬ দফার জন্ম সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং প্রমাণিতও হয়নি।

অনেকে মনে করেন, ৬ দফা আসলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বাঙালী সি.এস.পি অফিসার, জনাব রুহুল কুদ্দুস, শামসুর রহমান খান, আহমদ ফজলুল রহমান প্রমুখ দ্বারা সৃষ্ট। এই মতেরই একটি অংশ মনে করেন, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপকসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের যৌথ সৃষ্টি।

ভিন্ন একটি সূত্রের ধারণা, ৬ দফা ভারতের একদল বামপন্থীদের রচনা। তাঁরা তা তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা খোকা রায়ের কাছে তুলে দেন। খোকা রায় দেন অধ্যাপক মোজফফর আহমদ ও পীর হাবিবুর রহমানের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে এটা যায় জনাব খায়রুল কবীরের (কৃষি ব্যাংকের প্রাক্তন মহাব্যপস্থাপক) হাতে। জনাব কবীর এটা শেখ মুজিবের কাছে পৌছে দেন।

একদল মনে করেন, ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের মূলনীতি নির্ধারক কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরা যে সুপারিশ করেছিল ৬ দফা ছিল তারই ভিত্তি।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর আইয়ুব খান কর্তৃক ঢাকায় আহূত সর্বদলীয় সভায় পেশ করার জন্য প্রায় ৫০ জন রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীর যৌথ উদ্যোগে রচিত ৭ দফার অধিকল হচ্ছে ৬ দফা। এটা জনাব খায়রুল কবীরই রাজনীতিবিদদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বলে একটি মত দাবী করেন।

একটি অংশ অবশ্য এ প্রচারণাও চালাতো যে, আইয়ুব খানই তাঁর বিশিষ্ট আমলা আলতাফ গওহরকে দিয়ে তা রচনা করান এবং খায়রুল কবীরের হাতে তুলে দেন। উদ্দেশ্য ছিল, এ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটা।

৬ দফা সম্পর্কে এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ও মতামতের কারণে তা আজো রহস্যাবৃত হয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু ৬ দফাই শেষ পর্যন্ত এক দফা —বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্ম দেয়। এবং শেখ মুজিবই প্রথম সাহস করে তা প্রকাশ্যে (লাহোরে) উত্থাপন করে পাকিস্তানের ভিতকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন।

৬ দফার রূপরেখা:

প্রস্তাব এক
শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব দুই
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব তিন
মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে। (ক) সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময় যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা, বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব চার
রাজস্ব, কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সব রকম করের ক্ষমতা শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব পাঁচ
বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে
(খ) বাহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারধীন থাকবে
(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মিটাবে
(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না
(ঙ) শাসনতন্ত্র অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব ছয়
আঞ্চলিক বাহিনীর গঠন ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।[৮৪]

শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস

১৯৬৮ সালের পয়লা ডিসেম্বর সিরাজ সিকাদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন স্বাধীনতার আহবান জানিয়ে একটি থিসিস রচনা করে। এতে বলা হয়:

'পূর্ব বাংলার সামাজিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত মূল দ্বন্দ্বগুলো বিদ্যমান:

১ পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব
২ পূর্ব বাংলার বিশাল কৃষক জনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব
৩ পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে
ক সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের
খ সংশোধনবাদ বিশেষত সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ও
গ ভারতীয় সামম্প্রসারণবাদের দ্বন্দ্ব
৪ পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব

৮৪ শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচী (পুস্তিকা), (প্রকাশক: আব্দুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা ২, পুনর্মুদ্রণ, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯, মূল্য: ০.২৫ পয়সা) -এ থেকে সংক্ষেপিত

পূর্ববাংলার বিপ্লব ও তার চরিত্র সম্বন্ধে থিসিসে বলা হয়:

পূর্ববাংলার বিপ্লব হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।... এ বিপ্লবের একটি চরিত্র হলো সশস্ত্র বিপ্লব।... সভাপতি মাও-এর ভাষায় বন্দুকের নলের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে।

এ বিপ্লবের আর একটি চরিত্র হলো দীর্ঘ স্থায়ী সংগ্রাম। এ বিপ্লবে দ্রুত বিজয়ের সম্ভাবনা খুবই কম।... এ বিপ্লবের আর একটি চরিত্র হলো গ্রাম্য এলাকা দ্বারা শহর ঘেরাও এবং পরে শহর দখল।... এ বিপ্লবের আরেকটি চরিত্র হলো ঐক্যফ্রন্ট গঠন।... বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্তশাসন ও বিভিন্ন উপজাতিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। এতে জনগণের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিন্ত করা হবে।[৮৫]

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি: জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা

১৯৬৯ সালের প্রথমার্ধে কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রণো ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে গঠিত হয় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি। দল গঠনের পরপরই তাঁরা রচনা করেন স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী।

এতে ভূমিকায় বলা হয় :

'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির পক্ষ হইতে আমরা জনতার বিপ্লবী চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী আপনাদের নিকট পেশ করিতেছি। আসুন মহান চীন, ভিয়েতনাম, পশ্চিম বাংলার নকশাল বাড়ী, প্যালেস্টাইনের আরবদের মুক্তি সংগ্রাম হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করি। আসুন মহান মাও সে তুঙের শিক্ষাকে আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি ও গ্রহণ করি 'বন্দুকের নলই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস'।

পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কর্মসূচী হিসেবে প্রস্তাব উত্থাপন করে এতে বলা হয়:

---

৮৫ স্বাধীনতা দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৮৬

'সকল বিপ্লবী শ্রেণী সমূহের... ও দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়াদের সকল রাজনৈতিক অধিকার থাকবে। কিন্তু জনগণের শত্রু... ও প্রতিবিপ্লবীদের কোন রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থাকিবেনা।...

বিপ্লবের মধ্য দিয়া যে গণফৌজ গড়িয়া উঠিবে, বিপ্লবোত্তর যুগে তাহাই রাষ্ট্রীয় গণফৌজ হিসাবে পরিগণিত হইবে।...

এই সশস্ত্র গণফৌজ ছাড়াও সমগ্র জনগণকে অস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করা হইবে এবং গণমিলিশিয়া গঠন করা হইবে।...

সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়তার সহিত বিরোধিতা ও প্রতিহত করা।...

যাহারা প্রতিবিপ্লবী ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।...

'খোদকৃষকের হাতে জমি' এই নীতির ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হইবে।...

রাষ্ট্র সকল মহাজনী প্রথা বাতিল করিবে। মহাজনদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।...

জনগণের জীবিকাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেনা এমন ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও পুঁজিবাদী উৎপাদনে রাষ্ট্র বাধা প্রদান করিবে না।

রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও পরিচালনায় মূল ও ভারী শিল্প গড়া হইবে।...
মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের রাষ্ট্রীয় খরচে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে।...

যে সমস্ত তরুণ তাহাদের শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রাখিয়া বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করিবে, বিপ্লবোত্তর যুগে তাহাদের শিক্ষা ও প্রতিভার বিকাশের জন্য রাষ্ট্র সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে'।৮৬

৮৬ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ৪৪৭-৪৬১

ষাটের দশকের শুরুতে গোপন একটি পাঠচক্র ('নিউক্লিয়াস') ছাত্রলীগে কাজ করতো, যা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করতো--এরকম একটা দাবী বর্তমানে কয়েকটি মহল প্রচার করেন। এ প্রচারের ভিত্তিতে একজন বিদেশী লেখক লরেন্স লিফশুলৎস লেখেন:

'সাম্প্রতিক পার্টি দলিল ও এদের নেতৃবৃন্দের কথাবার্তা অনুযায়ী ১৯৬২ সালে একদল সচেতন যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'নিউক্লিয়াস' গঠন করে।.... বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এদের ভূমিকা ছিল অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলো থেকে আলাদা ধরণের।.... এরা কয়েকজন ব্যক্তিকে ঘিরে একটা 'নিউক্লিয়াস' গঠন করে। এইসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে একজন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান।..... সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে এরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেয় ও দলের সাথে নিজেদের আত্মস্থ করে। এরা বরাবরই ছিল দলের ভেতর একটি সুস্পষ্ট, সচেতন ও স্বাধীন 'নিউক্লিয়াস'।[৮৭]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সত্যি সত্যি যদি সচেতনভাবে ছাত্রলীগে এমন একটি 'নিউক্লিয়াস' গঠিত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তা একটি ঘটনা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দেলনের ইতিহাসে তা তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান লেখক বিষয়টি নিয়ে তাই বিভিন্ন সূত্রে আন্তরিকভাবে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের স্বার্থেই তার একটা মীমাংসা হওয়া উচিৎ।

বর্তমান লেখক এ বিষয়ে সিরাজুল আলম খানের এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। পাঠককে তা জানানো যেত। কিন্তু সিরাজুল আলম খান তা আমাকে প্রকাশ করার অনুমতি দেন নি। তবে এতোটুকু বলা যায়,'নিউক্লিয়াস' সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ইতিবাচক।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ১৯৬৭-৬৮ সালের সভাপতি ফেরদৌস আহমদ কোরেশী (ষাট সালের একেবারে গোড়া থেকেই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন) আমাকে জানান, 'ছাত্রলীগের ষাটের দশকের তথাকথিত 'নিউক্লিয়াসের' কথা কখনো ঐ দশকে শুনিনি। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় রাজনীতির

---

৮৭ লরেন্স লিফশুলৎস, *অসমাপ্ত বিপ্লব: তাহেরের শেষ কথা* (অনুবাদ: মুনীর হোসেন), (ঢাকা: কর্নেল তাহের সংসদ, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা ৪১-৪৩

সাথে যুক্ত থাকার কারণে এমন একটা বিষয় আমার জানার কথা। কিন্তু কোনোদিন এসবের তৎপরতা দেখিনি। এটা প্রচাররিত হয় স্বাধীনতার পরে, জাসদ গঠনের পর থেকে। তিনি বলেন, এটা উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। কারো কারো বাংলাদেশের স্বাধীনতায় 'অতিরিক্ত' অবদান দেখানোর মানসেই এই প্রচারণা, এবং এ প্রচার রাজনৈতিক অসততার পরিচায়ক'।[৮৮]

ষাটের দশকের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন একজন প্রভাবশালী সদস্যও আমার কাছে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ছাত্রলীগে এমন সংগঠিত তথাকথিত 'নিউক্লিয়াসের' কথা আমার জানা ছিল না। তবে আজ যারা তা দাবী করেন, সে সময় স্বাধীনতার প্রশ্নে তাদের ভূমিকা ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থি'।

তিনি বলেন, '১৯৬৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে কারণে-অকারণে বারবার শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হচ্ছিল। একবার সিলেটে, আরেকবার ময়মনসিংহে, এমন করে শেখ মুজিবকে বারবার টানা-হেঁচড়া করতে থাকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার। আমরা পল্টনে এর প্রতিবাদে একটি সমাবেশ ডাকি ৮মে তারিখে। মঞ্চে শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধাভরে ও পাকিস্তানী জুলুমের প্রতিবাদে একটি চেয়ার খালি রাখা হয়েছিল'।

তিনি আরো বলেন, 'আমি (শামসুজ্জামান চৌধুরী-লেখক), আবুল কালাম আজাদ (বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতা ও অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-লেখক) এবং সায়েদুল হক সাদু (আদমজীর শ্রমিক নেতা ছিলেন) মাইকে শ্লোগান দিতে ছিলাম, 'পিণ্ডি না ঢাকা : ঢাকা ঢাকা' 'জাগো জাগো : বাঙালী জাগো' ইত্যাদি। কিন্তু সেদিন সিরাজুল আলম খান এবং শাহ মোয়াজ্জেম (ছাত্রলীগে এ দু'জন এক গ্রুপ হয়ে কাজ করতেন) আমাদের হাত থেকে মাইক কেড়ে নেন এবং এ ধরণের শ্লোগান দেওয়ার জন্য ভৎর্সনা করেন'।[৮৯]

লিফশুলৎস এক জায়গায়, চীনপন্থী কমিউস্টিদের সাথেও এ নিউক্লিয়াসের যোগাযোগের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এদের মধ্যে তিনি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির কথাও উল্লেখ করেছেন।[৯০]

---

৮৮ সাক্ষাৎকার : ফেরদৌস আহমদ কোরেশী (সভাপতি: পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ১৯৬৭-৬৮)
৮৯ সাক্ষাৎকার : শামসুজ্জামান চৌধুরী, পূর্বোক্ত
৯০ নরেন্দ লিফশুলৎস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২

এ গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা রাশেদ খান মেননের সাথেও বর্তমান লেখক আলাপ করেন। জনাব মেনন লেখককে বলেন, 'নিউক্লিয়াস সম্পর্কিত তথ্য পরবর্তীকালের বানানো কথা। কোনোদিনও এরকম চক্রের অস্তিত্বের কথা তাঁরা শোনেন নি'।

রাশেদ খান মেনন বরং এ ব্যাপারে একটি তথ্য দেন যা তৎকালীন পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার চেতনা সম্পর্কিত তথ্যকে আলোকিত করে। তিনি বলেন 'ষাটের দশকের প্রথমার্ধে আমরা যখন জেলে ছিলাম, তখন হাস্যচ্ছলে আমরা অনেক সময়ই 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট' –এর পরিচয় দিতাম। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমরা শাহ মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে কে. এম ওবায়দুর রহমানকে লিবারেশন ফ্রন্টের অধিনায়ক বানিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমাদের হাস্যরসেও সেদিন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই ফুটে উঠতো'।[৯১]

বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানে ষাটের দশকের প্রথমার্ধ থেকেই বিভিন্ন ছাত্র-যুব মানসে স্বাধীনতার চেতনা স্ফূরিত হয়ে উঠছিল। এরকম বহুগ্রুপের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা 'স্বাধীনতা' আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য বিভিন্ন কমিটি, সংসদ, সংস্থা গঠন করেছিলেন। এরকম একটি পাঠচক্রের অস্তিত্বের সন্ধান বর্তমান লেখক পান।

'বঙ্গবাহিনী' গঠন

১৯৬২ সালে ঢাকা শহরের কয়েকটি পাড়ার স্বাধীনতাকামী তরুণ মিলে গঠন করে 'বঙ্গবাহিনী'। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ের ক্যাডার সৃষ্টি করা। এর সদস্য ছিল শেখ আলী আককাস (বর্তমানে দৈনিক খবরে কর্মরত), সৈয়দ কুতুবর রহমান (বর্তমানে ন্যাপ মোজাফ্‌ফরের একজন কর্মী), মোফাজজল হোসেন, হারুন-উর-রসিদ (বর্তমানে তথ্য অধিদপ্তরের সিনিয়র কর্মকর্তা) প্রমুখ। তবে এদের মূল সংগঠক ছিলেন হারুন-উর-রসিদ (তিনি পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মাত্র চারজন 'ওয়ার করস্‌পনডেন্ট'-এর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ৬২ সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগদেন)।

৬২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে 'বঙ্গবাহিনী'র পক্ষ থেকে এক বিরাট আকৃতির ফুলের মালা দিয়ে পুরো শহীদ মিনার চত্বরকে আচ্ছাদিত করা হয়।

---

৯১ সাক্ষাৎকার : রাশেদ খান মেনন (বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি)

মালাটির মাঝে লেখা ছিল 'ববা' (পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য 'বঙ্গবাহিনী'র সংক্ষিপ্ত এই নামকরণ করা হয়েছিল)। পরদিন ইত্তেফাকে এর ছবি বের হয়।

'বঙ্গবাহিনী'র সংগঠকরা স্কুল-কলেজ থেকে সদস্য সংগ্রহ করেন। নিজের দেশ সম্বন্ধে জানতে নিয়মিত পাঠচক্র-আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো। এতে পাকিস্তানের সংহতির তত্ত্ব-'পাখির দুটো ডানা। একটি ডানা ভাঙলে আমরা বাঁচব না'-এ শ্লোগানকে নাকচ করা হতো।

'বঙ্গবাহিনী'-র সদস্যদের গড় বয়স ছিল ১৫ থেকে ১৬ বছর। এর সদস্যদের চোখে-মুখে দেশপ্রেম জ্বল জ্বল করতো। এদের একজন এ জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীতেও যোগ দেন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের পর অনেক বাঙালী অফিসার যখন বীরত্বের জন্য খেতাব ও পিস্তল উপহার নিচ্ছিলেন আইয়ুব খান থেকে, তখন বঙ্গবাহিনীর সেনা অফিসারটি আইয়ুব খানকে গুলী করে হত্যা করতে উদ্যত হন।

১৯৬৯ সালে এসে 'বঙ্গবাহিনী'র সদস্যরা পূর্ব বাংলা যুব পরিষদ গঠনে উদ্যোগী হন। জনৈক ফিরোজ, সরোজ কান্তি দে (চট্টগ্রাম) প্রমুখ এদের সাথে যুক্ত হয়। এ সময় ফেরদৌস কোরেশীও যুব পরিষদ গঠনে উদ্যোগী হন। ফেরদৌস কোরেশী যুব পরিষদ গঠনের জন্যে ঢাকার টিপু সুলতান রোডে যে সভাটি আহবান করেন তাতে বঙ্গবাহিনীর কর্মী-সমর্থকরাও যোগ দেন। কিন্তু সংগঠনের নাম ও কর্মসূচীর প্রশ্নে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংগঠনের নামের আগে 'পূর্ব বাংলা' না 'পূর্ব পাকিস্তান' হবে এটাই ছিল মূল বিতর্ক। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী এসব যুবকরা সে সভায় বলেন, যে পাখি এক ডানা নিয়ে চলতে পারে না, তাকে নিয়ে আমরা ভাবছি না। 'পূর্ব পাকিস্তান' এখন মৃত। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন নিয়ে এখন কথা হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথাই চিন্তা করছি'।

বঙ্গবাহিনীর সদস্য জনৈক ফিরোজের মাধ্যমে এই পর্যায়ে ছাত্রলীগের অপর প্রাক্তন নেতা সিরাজুল আলম খানের সাথেও তাদের আলাপ হয়। এই পর্যায়ে এদের সাথে যুক্ত হন আহমদ ছফা ও চৌমহনী কলেজের ছাত্র শাহ আলম। তাঁদের বৈঠকে একটি ঘোষণাপত্র রচনার করার জন্য হারুন-উর-রসিদকে এবং গঠনতন্ত্র রচনা করার জন্য ফিরোজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসব ঘটনা যখন ঘটছে তখনও ১৯৬৯ সালে ১১ দফা প্রণয়ন করা হয় নি।

শেখ মুজিবের প্রশ্নে সিরাজুল আলম খান এদের কাছে বলেন, শেখ মুজিব স্বাধীনতায় বিশ্বাস করুন আর না করুন, তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা আনতে হবে। কারণ পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিবের কথা শোনে এবং শুনবে।

তবে কথা হয়েছিল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের কমিউনিস্ট প্রভাবিত 'যুবলীগ'-এর ন্যায় হবে এ সংগঠন। এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য।

শেষ পর্যন্ত ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে এসব পারিকল্পনা সব ভেস্তে যায়। এবং এরপর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। উদ্যোক্তারা বলেন, যে ঘোষণাপত্র তারা সেদিন তৈরী করেছিলেন তা ছিল একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সরকারের রূপরেখা। পৃথিবীর যে কোনো একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ এই রূপরেখার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে।[৯২]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা:
আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট: বৈষম্য চিত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও অসন্তোষ গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তি তৈরী হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক গোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে নির্বাচার শোষণ ও নিবর্তনের মধ্য দিয়ে। দিনের পর দিন অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের চালচিত্র থেকে পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলায়।

১৯৬১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক রেহমান সোবহান লাহোরে এ সম্পর্কে প্রথম প্রকাশ্য বিতর্কের সূচনা করেন। আইয়ুবের 'জনপ্রিয়' সামরিক শাসন তখনো মাথার উপর খরতপা সূর্যের মতো বহ্নিমান। ঠিক এই সময়ে রেহমান সোবহান জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো (বি. এন. আর) আয়েজিত এক সেমিনারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান-এই দুই প্রদেশের জন্য দুই পৃথক অর্থনীতির সুপারিশ করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

---

৯২ সাক্ষাৎকার : হারুন-উর-রশিদ (ষাটের দশকে বঙ্গবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা মুক্তিযুদ্ধের সময় মাত্র ৬ জন রণাঙ্গন প্রতিনিধির মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অধিদপ্তরের উর্ধতন আধিকারিক)

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গ ও অর্থনীতিবিদগণ আলোচ্য সেমিনারে যোগদান করেন। রেহমান সোবহানের এ বক্তব্য পরদিন পাকিস্তানের সামরিক বিধি -নিষেধের মধ্যেও ফলাও করে সংবাদপত্রে ছাপা হয়।

রেহমান সোবহান বলেন,

"The policy of separate economics should be implemented within the fram work of regional autonomy giving each wing full control over all its resourses both domestic and foreign. All in comes from regional and foreign exchange should be under the control of regional administration'.[৯৩]

তিনি এভাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে পৃথক দুই অর্থনীতি বাস্তবায়নের কথা বলে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন কথিত পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধির মধ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানের "ultimately benefite; ধারণাকে নাকচ করে দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'There is no real evidence to think that East Pakistan will ultimately receive direct benefit from investments being made in west Pakistan'.[৯৪]

এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপকগণ ড. মাহমুদ হোসেন ও অন্যান্যরা পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্যের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে দেশবাসীকে চোখের সামনে এই জাজ্বল্যমান সত্যকে তুলে ধরেন। ফলে 'Two economy Theory'-র আলোচনা তর্ক-বিতর্ক তখন ছাত্রদের মুখে মুখে।

এই সময়ই ঘটনাক্রমে আইয়ুবের দুই মন্ত্রী লে. জেনারেল কে. এম শেখ ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা সফরে আসেন। তাঁরা ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ে এসময় এক ছাত্র সমাবেশেও বক্তব্য রাখেন। ছাত্ররা তাদের পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানায়। অর্থনীতি বিভাগের একজন ছাত্র জিয়াউদ্দিন মাহমুদ (ইনি ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ছিলেন) দুই অর্থনীতির সম্ভাব্যতা ও তার উপযোগিতা নিয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের মতামত দাবী করলে মন্ত্রীদ্বয় হতভম্ব হয়ে পড়েন। এরপরও ছাত্ররা বিভিন্ন রকম প্রশ্নবানে তাদের

৯৩ পাকিস্তান অবজারভার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১
৯৪ ঐ

বিদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু তারা সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন। ফলে ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং এক পর্যায়ে দুইমন্ত্রী 'দুই অর্থনীতির' সমর্থক ছাত্রদের হাতে লাঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন।[৯৫]

এর কয়েক মাস পরেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাথে ঢাকা সফরে আসেন। আইয়ুবের ঢাকার মাটিতে পা ফেলার সাথে সাথেই পয়লা ফেব্রুয়ারী (১৯৬২) ছাত্ররা প্রথম প্রকাশ্য মিছিল করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। কিন্তু আইয়ুবের মন্ত্রী মঞ্জুর কাদেরের পূর্ব নির্ধারিত একটি কর্মসূচী ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাহস করে এই উত্তপ্ত অবস্থার মধ্যেও তিনি আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। কলাভবনের ১০৪ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ছাত্ররা আঞ্চলিক বৈষম্য প্রশ্নে তাঁর কাছ থেকেও মতামত দাবী করে। তিনি ছাত্রদের সন্তোষজনক মতামত দিতে ব্যর্থ হলে ছাত্ররা তার কলার চেপে ধরে এবং কক্ষ থেকে বের করে দেয়। একদল ছাত্র আইয়ুবের এই মন্ত্রীর গায়ে থুথু পর্যন্ত ছিটিয়ে দেয়। পরে তাঁকে 'পিটানি' দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।[৯৬]

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে পূর্বাঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অংশ গ্রহণের পশ্চাতে কাজ করেছে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক প্রশ্নের চেতনা। এ চেতনা থেকেই শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচী রচিত হয়েছিল। বস্তুত ৬ দফা ছিল মূলতই একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচী যা পাকিস্তানের রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করে।

এর বিপরীতে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক ও শোষক গোষ্ঠী কর্তৃক সর্বাধিক প্রচারিত বিষয়টি ছিল 'জাতীয় একীভবন নীতি' বাস্তবায়ন সম্পর্কিত। এর মূল বিষয় ছিল দুই পাকিস্তানের মধ্যকার আন্ত; অর্থনৈতিক সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখা। এতে তাঁরা 'এক পাকিস্তান অর্থনীতি তত্ত্ব' বলে অর্থনৈতিক সংহতির কথা প্রচার করতেন। পশ্চিম পাকিস্তানী এই গোষ্ঠী প্রচারিত 'অর্থনৈতিক একতা', 'আঞ্চলিক সহযোগিতা', 'অর্থনৈতিক একীভবন' 'অর্থনীতির সম্ভাব্য একীভূতকরণ' ইত্যাদি বহুল জনপ্রিয় শব্দগুলির স্বরূপ একে একে বাঙালী অর্থনীতিবিদরা উন্মোচন করতে থাকেন।

---

৯৫ কাজী আকরাম হোসেন, *ছাত্র ইউনিয়ন, বায়ান্ন থেকে বাষট্টি: একটি পর্যায়ের উত্তরণ*, গৌরবের সমাচার (রজত জয়ন্তী প্রকাশনা), ১৯৭৭ এবং
সাক্ষাৎকার: রাশেদ খান মেনন ও পঙ্কজ ভট্টাচার্য (বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টি)

৯৬ এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, *বা. ছা. আ.* ই-এর দ্বিতীয় খণ্ড

বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই 'দুই অর্থনীতি'র চেতনার প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হয় পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান যে সংবিধান রচনা করেন তাতে দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রার অসমতা দূর করার বিষয়টি সাংবিধানিক নীতি হিসেবে গৃহীত হয়। এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটা বিজয়। কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘটছে দুই পাকিস্তানে এটা পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী অবশেষে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এর ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা কমে এল না বরং দিন দিন এর মাত্রা চক্রীতিতে বেড়েই চললো।

পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনার কার্যকালে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমান হয়েছিল ৮০ টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২০৫টাকা। পাকিস্তানীরা দাবী করে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসে দুই প্রদেশের মাথাপিছু ব্যয়ের বৈষম্য কমানো হয়েছিল। কিন্তু তাতেও দেখা যায়, মাথাপিছু পূর্ব পাকিস্তান ১৯০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তান ২৯২ টাকা।[৯৭]

১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় হয়েছিল ৯৭০ কোটি টাকা। এটা দেশের মোট বরাদ্দের ৩১ শতাংশ। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে এই ব্যয় ছিল ২,১৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ৬৯ ভাগ।[৯৮]

পাকিস্তানের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদের অংশীদারীত্বেও যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল তা তাদের সরকারী রেকর্ড থেকেও প্রমাণ মেলে। এখানে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়ের টাকার হিসেব থেকেই বিষয়টা আঁচ করা সম্ভব:[৯৯]

	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
পুঁজি বিনিয়োগ	৪২১.৭৯	১৬৩.৩০
খুচরা ব্যয়	২৬১.৫১	৭৩.০৬

অথচ আয়ের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বহির্বাণিজ্যে প্রথম দশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান যেখানে ৪০৭.৬ কোটি টাকার ঋণাত্মক ভারসাম্য ছিল,

৯৭ Report of panel of Economists on second Five year plan, 1960-65, Karachi, 1960

৯৮ Outline of the fourth Five year plan (1970-75), Islamabad, January, 1970

৯৯ Roport of the Advisiory panasls for the fourth five year plan, 1970-75. vol, 1-11, Islamabad, 1970

পূর্ব পাকিস্তান যেখানে ৪৬৮.৯ কোটি টাকা ধনাত্মক ভারসাম্য বজায় রাখে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারীতে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান ২০০ কোটি টাকার বেশী বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেয়। অথচ কি আশ্চর্য! 'পুরস্কার স্বরূপ' পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রথম দশ বছরের প্রতি বছর প্রায় ৪০ কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্যাদি আমদানীর সম্ভাবনা থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে।[১০০]

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের যে বিশাল বোঝা সমগ্র পাকিস্তানের মাথায় চেপে বসলো, তা মেটানো শুরু হলো পূর্ব পাকিস্তানের ধনাত্মক আয় থেকে। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি মেটানোর বাজার হিসেবে এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবহৃত হতে থাকলো। শুধু এখানেই ব্যাপারটা থেমে থাকলো না, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এ সময়েই সম্পদও পাচার হতে থাকে। অর্থনীতিবিদদের মতে শুধু ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্তই প্রতিবছর পূর্ব অঞ্চল থেকে পশ্চিম অঞ্চলে জাতীয় আয়ের ২% পাচার হতো।[১০১]

এটা আনুমানিক বছরে প্রায় ২৫ কোটি টাকা (বর্তমান হিসেবে বছরে প্রায় কয়েকশত কোটি টাকা তৎকালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেত)।

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরো সমস্যা ছিল। বিভিন্ন খাতে এর জন্য যত ব্যয় নির্ধারণ করা হত (পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় তা যতোই কম হোক), সেই নির্ধারিত টাকাটিও শেষ পর্যন্ত ব্যয় করা হতো না। অর্থাৎ বৈষম্য চিত্রের কাগজপত্রের হিসেবের চেয়ে, প্রকৃত হিসেব ছিল আরো গুরুতর। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের জন্য ২৪১.১ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়, আর প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয় নির্ধারিত অঙ্কের ৬২% অর্থাৎ ১৪৯.১৮ কোটি টাকা।[১০২]

পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী ও অবাঙালীদের অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি ও শোষণের রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের বাইরে ছিল বেসরকারী ব্যক্তিপুঁজি। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে অবাঙালী ব্যক্তি পুঁজি অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় নানাভাবে। এ বিষয়ে

১০০ এস. এস বারানভ, *পূর্ব বাংলা: অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-১৯৭১)*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৯৮৬), পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

১০১ *ঐ, পৃষ্ঠা ৫৫*

১০২ Economic servcy of East pakistan, Dacca 1967-70,

ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো বড় ভূমিকা পালন করে। দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাংক হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ছিল পুঁজিপতি গোষ্ঠী হাবিব ও দাউদ পরিবারের নিয়ন্ত্রাধীন। পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে একচেটিয়া অনুপ্রবেশ করে।

অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান জানান, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে ২৫ হাজার অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পরিবার বাস করতো। তারা সমগ্র প্রদেশের প্রায় ৬ হাজার বাড়ীতে বাস করতো।[১০৩]

'মনোপলি' দৌরাত্ম পূর্ব পাকিস্তানের কি ব্যাপক ও গুরুতরভাবে শুরু হয়েছিল এ পরিসংখ্যান থেকে তা অনুমান করা চলে।

তবে পঞ্চাশের দশক থেকেই স্থানীয় বাঙালী পুঁজির সাথে এই অবাঙালী পুঁজির দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ অবাঙালী পুঁজির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বাঙালী পুঁজি পেরে না ওঠার কারণে। বাঙালী পুঁজিপতিরা শোষণের একচেটিয়া অধিকার লাভের আশায় একটি অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ঝোঁকও পরিলক্ষিত হয় (এরা পরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নেয়)।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত কৃষিই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির প্রধান খাত। জনসংখ্যার ৯৩% বসবাস করতো গ্রামে। ১৯৬১ সালের এক নির্বাচিত জরীপ অনুসারে গ্রামীণ জনগণের মাথাপিছু গড় আয় পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ২৮.৪ টাকা। আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৩১ টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে জরীপে অন্তর্ভুক্ত পরিবারের ৭৮%-এর গড় আয় ছিল ২৫ থেকে ১৯৯ টাকার মধ্যে আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৮১%-এর আয় ছিল ৫০ থেকে ২৪৯ টাকার মধ্যে।[১০৪]

অর্থনৈতিক অবস্থার এই সামগ্রিক অসাম্যে পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে বৈষম্যের মাত্রা নিয়তই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর প্রভাব পড়ে পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু সামগ্রিক গড় আয়ের ক্ষেত্রেও। নিম্নের চিত্রটি ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু গড় আয়ের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের চিত্রকে প্রকটিত করে:

---

১০৩ Rehman sobhan, *'Nationalisation of Industries in Bangladesh: Background and Problems'*, 1973, (বারানভের গ্রন্থে উদ্ধৃত)
১০৪ এস. এস. বারানভ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬

পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় [১০৫]						
(টাকায়)						
	৬৪-৬৫	৬৫-৬৬	৬৬-৬৭	৬৭-৬৮	৬৮-৬৯	৬৯-৭০
সমগ্র পাকিস্তান	৩৫২	৩৫৮	৩৬৬	৩৮২	৩৯১	৪০৩
পূর্ব পাকিস্তান	২৮২	২৮৩	২৭৮	২৯৩	২৯২	২৯৯
পশ্চিম পাকিস্তান	৪১২	৪১৩	৪৩৩	৪৫২	৪৬৯	৪৮৩
বৈষম্য %	৩৮.১	৩৭.৫	৪৩.৭	৪২.৯	৪৬.৭	৪৭.১

সারণীটি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে দুই পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭০ সাল এসে ক্রমাগত বৃদ্ধিই পেয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে বৈষম্যের হার যেখানে ছিল ৩৮.১, ১৯৬৯-৭০ সালে এসে সেই বৈষম্যের হার গিয়ে দাঁড়ায় ৪৭.১-এ। ব্যতিক্রম ছিল ১৯৬৫-৬৬ সাল। এই বছর বৈষম্যের প্রায় ১% ভাগ কমে এসেছিল। এর কারণও স্পষ্ট, কারণ এ বছরটি আইয়ুব খানের নির্বাচনের বছর। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে কিঞ্চিৎ সুবিধা দেওয়ার চিন্তা শাসকগোষ্ঠীর তখন থাকতে পারে। তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে বৈষমের হারের ব্যবধ্যন ছিল আরো বেশী।

পাকিস্তানের দুই অংশের প্রাকৃতিক অসংগতিও এই দুই প্রদেশের সংহতির একটা বড় বাধা হয়ে দেখা দেয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক পার্থক্য মৌলিকভাবেই বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন ৮০৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার যা পূর্ব পাকিস্তানের আয়তনের চেয়ে প্রায় ৬ গুণ বেশী (১৪২.৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার)। দেশের দু'অংশের আবহাওয়ার পার্থক্যও ছিল বিস্তর। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমী আবহাওয়া আর পশ্চিম পাকিস্তানে শুষ্ক ও উত্তপ্ত আবহাওয়া। প্রাকৃতিক ও আবহাওয়াগত পার্থক্য দেশের দুই অংশের কৃষি উৎপাদনে প্রভাব ফেলে। পূর্ব পাকিস্তানের জনবসতি প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ৬ গুণ বেশী। অর্থাৎ যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৫৬ জন আবাস পশ্চিম পাকিস্তানে সেখানে মাত্র ৫৪ জনের বাস।[১০৬]

১০৫ বিভিন্ন বছরের অর্থনৈতিক জরীপ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ছকটি তৈরী করেছেন এস. এস. বারানভ
১০৬ Stalistical Digest of Bangladesh, সংখ্যা, ৮, পৃষ্ঠা ৮-১৩

শুধু এতোটুকুই নয়, ষাটের দশকের শেষ দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকেও পশ্চিম পাকিস্তান এগিয়ে ছিল। রেলপথে পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় প্রতিবছর দুই গুণ বেশী যাত্রী এবং তিনগুণ মালামাল পরিবহন করা হত। জনপথের দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে হাইওয়ের দৈর্ঘ্য ছিল ২,৩৮৮ মাইল আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ১০,৬০৯ মাইল।[১০৭]

অন্যদিকে, শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজকে যা সবচেয়ে বেশী আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ করেছিল, তা ছিল সত্যি নির্লজ্জ ধাচের বৈষম্য।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন তাদের দ্বাদশ কেন্দ্রীয় সম্মেলনে 'শিক্ষা সমস্যা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে' ১৯৬৮ সালের পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদনের সূত্র থেকে উদ্ধৃত করে জানায়, পূর্ব পাকিস্তানের এসময় শিক্ষাখাতে মাথাপিছু সরকারী ব্যয় মাত্র ৫·৬৩ টাকা, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ৮·৬৬ টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী স্কুলের সংখ্যা ৯০ টি, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা ৬৫৩টি। পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী কলেজের সংখ্যা ৩১টি, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারী কলেজের সংখ্যা ১১৪টি।[১০৮]

রিপোর্টটিতে শিক্ষা বৈষম্যের একটি সারণীও দেওয়া হয়। এতে উল্লেখিত হয়:

শিক্ষাবর্ষ	মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা		কলেজের সংখ্যা		বিশ্ববিদ্যালয়	
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাক	পশ্চিম পাক	পূর্ব	পশ্চিম
১৯৪৭-৪৮	৩,৪৮১	২,৫৯৮	১	২		
১৯৬০-৬১	৩,১৪০	২,৯৭০	৯২	১৬৫	২	৪
১৯৭০-৭১	৩,৯৬৪	৪,৪৭২	২২৫	২৭৫	৫	৭

১০৭ এস. এম. বারানভ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৫

১০৮ *শিক্ষা সমস্যা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট*, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (৩১/১ হোসেনী দালান রোড, ঢাকা হইতে প্রচার সম্পাদক কামালউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ১৯৭০), পৃষ্ঠা ১২-১৩

প্রকৃতপক্ষে ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭সাল থেকে পাকিস্তানের পূর্ব অংশে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক চরম নৈরাজ্য নেমে আসে। শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতি পাকিস্তানের অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এসে পড়ে। ফলে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হারে শিক্ষার হার দ্রুত কমে যেতে থাকে, খুব বেশী পরিমানে ছাত্ররা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা শুরু করে এবং সর্বোপরি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এসময় লুপ্ত হয়ে যায়। পাশাপাশি দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন গতিতে আগাচ্ছে। পশ্চিমে শিক্ষার হার যেমন বাড়ছিলো, তেমনি বাড়ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও, ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের (Drop out) সংখ্যা ছিল পূর্ব অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়ও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে অনেক কম। অথচ জনসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী।

পাকিস্তানের সরকারী পরিসংখ্যান ব্যুরো, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ীই দেখা যাবে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতোই পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ও তৎকালীন পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শাসনকর্তাদের কাছে কতো বেশী অবহেলার বিষয় ছিল।

১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৩৩টি। মাত্র পাঁচ বছর পরেই ১৯৫৪-৫৫ সালে দেখা গেল তার সংখ্যা নেমে এসেছে ২৬,০০০-এ।[১০৯]

মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই সাড়ে তিন হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উঠিয়ে দিয়ে কয়েক লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করা হয়। ষাটের দশকে এসে এই হার একটু বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় একেবারেই কম।

ষাটের দশকের পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও শিক্ষক সংখ্যার একটি চিত্র নিম্নে দেখানো হল। কৌতূহলী পাঠক দেখতে পাবেন, এর পরের একটি ছক যা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উভয় পাকিস্তানের তুলনামূলক পরিসংখ্যান হিসেবে এসেছে এবং তাতে বৈষম্যের কি নিলর্জ্জ প্রকাশ ঘটেছে।

---

১০৯ *Education For All,* Papers and Proceedings of the symposia, East Pakistan Education week, 1966-67,

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সংখ্যার খতিয়ান।[১১০]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	১৯৬১–১৯৬৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		শিক্ষক সংখ্যা	
	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
বিশ্ববিদ্যালয়*	৪	৪	৫৬৮১	৬৮৩২
মহাবিদ্যালয় পুরুষ	৭৫	৮০	৫৬,৭০৩	৭০,৩৪৮
উচ্চবিদ্যালয় ,,	১,৭৪৬	১,৮০৫	৮,৩৫,৬৩১	৪,৭৩,৮৩৩
প্রাথমিক বিদ্যালয় ,,	২৪,৯৫৪	২৫,৩৫১	৩২,৬৭,০৭৯	২৬,৬৩,৬৬২
মহাবিদ্যালয় মহিলা	১০	১১	২,২৪৪	৫,০৯৫
উচ্চবিদ্যালয় ,,	১০৭	১১৯	৩৯,৫০৬	৬২,২৯১
প্রাথমিকবিদ্যালয় ,,	১,৭৯৩	১,৮০৩	১,৫৬,১৪৮	৯,৭২,০০৮

*বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার মধ্যে এই সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫৭ জন ছাত্রী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন ছাত্রীকে এর মধ্যে ধরা হয়েছে।

১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এই চিত্রের থেকে বড় একটা হেরফের হয়নি। এই প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক)-এর সংখ্যা ছিল ২৫,৯০২

১১০. Directorate of Education, East Pakistan, quoted in statistical Digest of East Pakistan, No 2, 1964, East Pakistan Bureau of statistics, P 188

এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিকা)-এর সংখ্যা ছিল ১,৭৪৭। অর্থাৎ মোট ২৭,৬৪৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।[১১১]

পঞ্চাশ দশক থেকে ষাট দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত উভয় পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে অত্যন্ত দু:জনক চিত্র ভেসে উঠবে। দেখা যাবে, প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং শিক্ষকরা ছিল অবহেলিত এবং অবনমিত।

উভয় প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছকটি লক্ষণীয়।[১১২]

প্রতিষ্ঠানে ধরণ	১৯৫০-৫১	৫৮-৫৯	৫৯-৬০	৬০-৬১	৬১-৬২	৬২-৬৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	৩৭,২৫৮	৪৪,২২৪	৪৪,৪৮৪	৪৭,৫৭৪	৫১,৬৬৭	৫৫,৪৯২
পূর্ব পাকিস্তান	২৬,৩৫২	২৬,৬৮৮	২৬৫৮৩	২৬,৬৬৫	২৬,৭৪৭	২৭,১৫৪
পশ্চিম পাকিস্তান	১০,৯০৬	১৭,৫৩৬	১৭,৯০১	২০,৯০৯	২৪,৯৩০	২৮,৩৩৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	৬,৩৮২	৬,০৩০	৬,০৯৬	৬,১১০	৬,৫৬৫	৬,৯৬৩
পূর্ব পাকিস্তান	৩,৫০৭	৩,০৬১	৩,০৫৩	৩,১৪০	৩,২৫৪	৩,৩৭৭
পশ্চিম পাকিস্তান	২,৮৭৫	২,৯৬৯	৩,০৪৩	২,৯৭০	৩,৩১১	৩,৫৮৬
শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	১১৪	৯৬	১০২	১০৪	৯৮	৯৯
পূর্ব পাকিস্তান	৮২	৪৮	৪৭	৪৮	৪৮	৪৮
পশ্চিম পাকিস্তান	৩২	৪৮	৫৫	৫	৫০	৫১

উপরের ছকটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি এবং এটা তৎকালীন সরকারেরই পরিসংখ্যান। পূর্ব পাকিস্তানে ছাব্বিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৯৫০ সালে, বার বছর পর তা মাত্র এক হাজারেরও কম সংখ্যায় বাড়লো। আর পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫০ সালে এগার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় বার বছরে আটাশ হাজারেরও বেশী হয়ে গেল। মাধ্যমিক বিদ্যালয় বার বছরে পূর্ব পাকিস্তানে কমে গেল আড়াইশতের মতো আর পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়ে গেল দেড় হাজারেরও বেশী।

---

১১১ Education for All, পূর্বোক্ত, Pss

১১২ Statistical Digest of East pakistan, পূর্বোক্ত p.192

এই বৈষম্যের পরিকল্পনা একেবারে উপরতলা থেকেই করা হতো। যে হামুদুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের কাছে এতো ঘৃণিত তাঁর প্রতিবেদনেও এই বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কিভাবে রাতারাতি এতো বড় বৈষম্য উভয় প্রদেশে ঘটে গেল তাঁর বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখছেন,

'১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন ২৬,৩০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল তখন পশ্চিমে ছিল ১৮,০০০। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬০-৬৫--লেখক) প্রস্তাব করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫,২০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১৩,৩০০ প্রাথমিকের গুণগত মান উন্নীত করা হবে যাতে উভয় প্রদেশের এই বয়সের স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যা মোটামুটি শতকরা ৬৩% দাঁড়ায়।[১১৩]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫,২০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হলেও পূর্ব পাকিস্তানে মান উন্নীত করার কথা বলে একটিও নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। অথচ স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যা শতকরা ৬৩ ভাগ করা হবে অর্থাৎ এই শতকরা হারটিও বাড়ানো হবে পশ্চিম পাকিস্তানের শিশুদের স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে। অথচ জনসংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পূর্ব পাকিস্তনের তুলনায় অর্ধেকেরও কম।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পূর্ব পাকিস্তানে সঙ্কট আরো ছিল। শিক্ষক নিয়োগেও এই একই কারণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠান সমূহ বঞ্চিত হয়। নীচের ছকটি তারই উৎকৃষ্ট নমুনা:

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষক সংখ্যার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা:[১১৪]

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	১৯৫০-৫১	৫৮-৫৯	৫৯-৬০	৬০-৬১	৬১-৬২	৬২-৬৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	৯২,০৫৩	১২১,৪২৯	১২৩,৩১০	১৩০,৫৪৫	১৩৭,৩১০	১৪৪,০৯৮
পূর্ব পাকিস্তান	৬৭,৮৮৭	৭৭,১২৩	৭৮,৪৬২	৮০,৫২৪	৮২,৪৭৭	৮৬,৪৬৩
পশ্চিম পাকিস্তান	২৪,১৬৬	৪৪,৩০৬	৪৪,৮৪৮	৫০,০২১	৫৪,৮৩৩	৬২,৬৩৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	৪৫,৪৭০	৫৩,৬০৩	৫৪,৯২৬	৫৮,৮১৫	৬৩,৪৯৪	৬৮,২৪১
পূর্ব পাকিস্তান	২৩,৬৯০	২২,৭৯৬	২৩,৫৭১	২৪,৪৫৪	২৫,৩১৮	২৭,৫১০
পশ্চিম পাকিস্তান	২১,৭৮০	৩০,৮০৭	৩১,৩৫৫	৩৪,৩৬১	৩৮,১৭৬	৪০,৭৩১

১১৩ Report of the commission on the student problems and welfare, Ministry of Education, Government of Pakistan, 1966, p113

১১৪ Central Bureau of Education, Goverment of Pakistan

চিত্র অনুযায়ী পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষক সংখ্যা ষাটের দশকে গিয়ে মাত্র উনিশ হাজার বৃদ্ধি পায় আর পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা দাড়াঁয় চল্লিশ হাজারে কাছাকাছি। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি হামুদুর রহমানও তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন এবং অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক আরেকটি চিত্র তিনি এই সঙ্গে তুলে ধরে ছিলেন। সে হচ্ছে দুই অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের লজ্জাজনক বৈষম্যচিত্র।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল:[১১৫] (পঞ্চাশের দশক)
পূর্ব পাকিস্তান
ক. মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত): টা ৮০-১-৯০-২-১০০
খ. মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণহীন): টা ৬০-৭০-২-৯০
গ. মেট্রিক-নিম্ন (প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত): টা ৫৫-১-৬০-২-৮০
ঘ. মেট্রিক-নিম্ন (প্রশিক্ষণহীন): টা ৪৫ নির্ধারিত।
পশ্চিম পাকিস্তান
ক. মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত): নিম্নতম গ্রেড (জুনিয়ার) টা ১০০-৪-১৪০-৫-১৭৫
খ. মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত): নিম্নতম গ্রেড (সিনিয়র) টা ১১৫-৫-১৮০-৭-২১৫
গ. ১০% সিলেকশন গ্রেড: টা ২১৫-১৫-৩০৫

বিচারপতি হামুদুর রহমান উল্লেখ করেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষকদের এই বেতন-ক্রমটি সংশোধিত হওয়ার পরের। ধরে নেওয়া যায়, এর পূর্বে অবস্থাটি ছিল আরো করুণ।

পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে এই অবহেলা ও বঞ্চনার কারণে প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্র পর্যন্ত এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়ে বিদ্যালয় পরিত্যাগে বাধ্য হয়। আর খুব স্বাভাবিক কারণেই বিদ্যালয় পরিত্যাগের শতকরা হার ছিল পূর্ব পাকিস্তানে অসামান্যভাবে বেশী।

---

১১৫ *Report of the commission of student problem and welfare*, Govt. of Pakistan. Ministry of Education (Karachi), 1966

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রহ্রাসের হার:[১১৬]				
বার্ষিক পর্ব	তালিকাভূক্তি প্রথম শ্রেণী-	তালিকাভূক্তির পঞ্চম শ্রেণী	বার্ষিক হার	পরিত্যাগের
১৯৪৮-৪৯ থেকে ৫২-৫৩	১৬,০৮,৬৭৪	১,৫৬,৯০৩	৯.৭	৯০.৩
১৯৫২-৫৩ থেকে ৫৬-৫৭	১৫,৫৭,৯৪৭	১,৯৪,২৫১	১২.৪	৮৭.৬
১৯৫৬-৫৭ থেকে ৬০-৬১	১৪,৬০,০২৩	২,৪৭,২৩৯	১৬.৯	৮৩.১
১৯৬০-৬১ থেকে ৬৪-৬৫	১৭,৪৪,০২১	৪,৩৭,৯৭৯	২৫.১	৭৪.৯

এই ছাত্রহ্রাসের চিত্র পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবিত হবে।

পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের শতকরা হার:[১১৭]

পর্ব	পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৮-৬২	৭৪.২	৮১.৮	৫৭.৬
১৯৬০-১৯৬৪	৭২.৮	৭৮.৮	৫৬.২

এই সময়ের এশিয়ার বেশ করেকটি দেশের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রহ্রাসের একটি তুলনামূলক চিত্র।[১১৮]

দেশ	পর্ব	শতকরা হার
শ্রীলঙ্কা	১৯৫৯	৩৪
কোরিয়া	১৯৬০	১৬
তাইওয়ান	১৯৫৯	৮
ভারত	১৯৫৬-৫৭	৬৫
মালশিয়া	১৯৬১	১৬
পাকিস্তান	১৯৫৮	৭৩

১১৬ Education For All, পূর্বোক্ত, p .154

১১৭ Education in Progress Proceedings of the symposia, East pakistan Education week, 1968, p.96

১১৮ Proceeding of the symposia, East pakistan Education week, 1968, p.19

পাকিস্তানে এই ব্যাপক ও বিপুল সংখ্যক ছাত্রের বিদ্যালয় পরিত্যাগের আর্থ-সামাজিক কারণ সুবিদিত। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষাক্ষেত্র চরম অবহেলার শিকার হয়ে পড়ে। এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থবরাদ্দ কমে যায়। নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। নীচের পরিসংখ্যানটি থেকে দেখা যাবে ১৮৮৬ সালের তুলনায় ১৯৬৫ সালে এসে ছাত্র-প্রতি ব্যয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০ বছরে বেড়েছে মাত্র ১২ টাকা। দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রস্ফীতির হিসেবে বৃটিশ যুগের তুলনায় পাকিস্তান আমলে এসে এই ব্যয় প্রকৃতপক্ষে তুলনামূলকভাবে কমে আসে।[১১৯]

বছর	বঙ্গদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) ব্যয় (জন প্রতি)	পূর্ব পাকিস্তানে (ছাত্র ছাত্রী মিলিত) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যয়
১৮৮৬-৮৭	টাকা ২.২	
১৮৯৬-৯৭	টাকা ২.৩	
১৯০-০৭	টাকা ২.৯	
১৯১৬-১৭	টাকা ৩.৫	
১৯২৬-২৭	টাকা ৪.০	
১৯৩৬-৩৭	টাকা৩.৫	
১৯৫৭-৫৮		টাকা ৯.৮
১৯৫৯-৬০		টাকা ১১.৬
১৯৬৪-৬৫		টাকা ১৪.৬

পাকিস্তান আমলের শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যয়ের একটি ভিন্ন চিত্র:

public Expenditure on education as % G.D.P Budget.[১২০]

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৯-৭০
ব্যয় G.DP	০.৬	০.৬	০.৯	১.৫
ব্যয় budget	১৭.৮	১০.৮	৮.৬	১০.০

১১৯ Papers and Proceedings of the symposia, East pakistan Education week, 1966-67, P.159

১২০ শিক্ষা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ১৯৮১ সালের সেমিনারে পঠিত প্রফেসর তাহেরুল ইসলামের প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ১৬৪

public Expediture on Education ১২১			
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৯-৭০
প্রাথমিক	৩৮.৭৮	৩৫.৬৭	৩১.৩৫
মাধ্যমিক	১৯.৪২	২২.১৯	১৮.৯৬
উচ্চ মাধ্যমিক	৬.২৫	৪.৬৪	৬.২৬
বিশ্ববিদ্যালয়	৮.২১	১১.০০	১৪.৩৬

Grouth rat of Govt. Expenditure on Education[১২২]		
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	১৯৬০-৬১থেকে ১৯৬৫-৬৬	১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৮-৯৬
প্রাথমিক	১২.৯	১৯.৩
মাধ্যমিক	১৮.০	১৮.৬
উচ্চ মাধ্যমিক	৮.২	৩৩.০
বিশ্ববিদ্যালয়	২২.০	৩১.০

শিক্ষাক্ষেত্রের বৈষম্যের একটি অতিরিক্ত চিত্র পাওয়া যায় ভিন্ন একটি সূত্র থেকে। এতে পাকিস্তানের ২০ বছরের শিক্ষাচিত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। চিত্রটি নিম্নরূপ:[১২৩]

শিক্ষার মাধ্যম	পশ্চিম পাকিস্থূর্বপাকিস্তান →			
	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮,৪১৩	৩৯,৪১৮	২৯,৬৬৩	২৮,৩০৮
	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৫-৬৬	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৫-৬৬
মাক্ষ্যমিক বিদ্যালয়	২,৫৯৮	৪,৪৭২	৩,৪৮১	৩,৯৬৪
	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৫-৬৬	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৫-৬৬
মহাবিদ্যালয়, মেডিক্যাল				
প্রকৌশল	৪০	২৭১	৫০	১৬২
কৃষি কলেজ	৪	১৭	৩	৯
বিশ্ববিদ্যালয়	৮		৫	

১২১ শিক্ষা ও পরিকল্পনা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা, ১৬৪
১২২ ঐ, পৃষ্ঠা ১৬৬
১২৩ *Bangaldesh Documents,* Part I, Ministry of External Affairs New Delhi (প্রাকাশনার তারিখ নেই) পৃঠা ১৯

উপরিউক্ত সারণী অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য চিত্র ভয়াবহ। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে ২০ বছরে যেখানে ৫ গুণ বেশী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল, পূর্ব পাকিস্তানে সেখানে ২০ বছরে ১টি স্কুলও বাড়লো তো না-ই, বরং পূর্বের মোট সংখ্যা থেকেই কমে গেল।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে ১৭৬% ভাগ, পূর্ব পাকিস্তানে সেখানে মাত্র ১১৪% ভাগ। কলেজ প্রতিষ্ঠার চিত্রও তাই। ২০ বছরে পশ্চিমে কলেজ বেড়েছে ৬৭৫%, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে ৩২০% ভাগ, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি মহাবিদ্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়েছে ৪২৫% ভাগ, পূর্ব পাকিস্তানে সেখানে মাত্র ৩০০% ভাগ।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই জাজ্বল্যমাত্র বৈষম্য চিত্রের স্বীকৃতি পাওয়া যায় পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খানের প্রধান দোসর এবং গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খানের ভাষ্যেও। ১৯৬৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে মোনায়েম খান বলেন,

"In the field of Prinary education there was with a single pucca primary school building worth the name during all the years after independence up to 1961. This was indeed a very sad state of affairs.[১২৪]

ভিয়েনায় অবস্থিত একদল বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের জাতীয় পারিকল্পনা কমিশন, পাকিস্তানের ২০ বছর, সেন্ট্রাল ব্যুরো অব এডুকেশন, কেন্দ্রয়ী পরিসংখ্যান অফিস, পাকিস্তান ইয়ার বুক, ১৯৭০, পাকিস্তান অর্থনৈতিক জরীপ ইত্যাদি দলিল সমাবেশে 'কেন বাংলাদেশ?' নামে যে পুস্তিকা তৈরী করেন, তাতে পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্যের আরো বিভিন্ন রকম চিত্র তুলে ধরা হয়:[১২৫]

---

১২৪ *Some Speeches of Abdul Monem Khan,* Governor of East pakistan, (প্রকাশনার নাম ও তারিখ নেই) পৃষ্ঠা ৩১

১২৫ *Bangladesh Documents* Port I, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০

বিভিন্ন বিভাগ	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী
কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস	৮৪%	১৬%
ফরেন সার্ভিস	৮৫%	১৫%
বিদেশে মিশন প্রধান (সংখ্যা)	৬০	৯
সৈন্যবাহিনী	৯৫%	৫%
প্রধান সারির সেনা অফিসার (সংখ্যা)	১৬	১
পাইলট	৮৯%	১১%
আর্মড ফোর্স (সংখ্যা)	৫০০,০০	২০,০০০
পাকিস্তান এয়ারলাইনস (সংখ্যা)	৭,০০	২৮০
পিআইএ পরিচালক সংখ্যা	৯	একজন মাত্র
পি আই এ আঞ্চলিক ম্যানেজার সংখ্যা	৫	কেউ ছিল না
রেলওয়ে বোর্ড পরিচালক	৭	একজন মাত্র

এই 'কেন বাংলাদেশ?' পুস্তিকায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের চিত্রও তুলে দেওয়া হয়:[১২৬]

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
জনসংখ্যা	৫৫ মিলিয়ন	৭৫ মিলিয়ন
ডাক্তার	১২,৪০০	৭,৬০০
হাসপাতালের আসন সংখ্যা	২৬,০০০	৬,০০০
পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩২৫	৮৮

উক্ত পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত (চাউল) এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য আটা (গম)। এবং দুই প্রদেশে এই প্রধান খাদ্য মূল্যের তুলনামূলক চিত্রও দেওয়া হয়:[১২৭]

দ্রব্য	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
চাউল (প্রতিমণ)	১৮ টাকা	৫০ টাকা
গম (প্রতিমণ)	১০ টাকা	৩৫ টাকা

১২৬ Bangladesh Documents, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১
১২৭ ঐ, পৃষ্ঠা ২১

এসব চিত্র ছিল নিদারুণ। সচেতনভাবে পরিকল্পনা মাফিক পূর্ব পাকিস্তানকে ঠকানোর ও শোষণের যড়যন্ত্র ছিল এ সব। দুনিয়ার ইতিহাসে এ ঘটনা বিরল। পূর্ব-পশ্চিমের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এই অসাম্য ও অসংগতি ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকেও প্রথম স্বায়ত্তশাসনের ন্যূনতম দাবীতে টেনে নিয়ে যায়। 'ইসলামের নাম করে একমাত্র যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছিল তারও বাঁধন ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে। সময়মতো সেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকারটুকুও দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানী পাঞ্জাবী শাসক ও শোষকবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিতে বাঙালীরা এক মুহূর্তের জন্যেও দেরী করে নি। প্রয়োজনে অস্ত্রতুলে নিতেও তারা পিছপা হল না--যা ইত:পূর্বে ছিল শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তব একটি কল্পনাও।

একটি কৃত্রিম অধ্যায়ের সমাপ্তি

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবাল (কবি ইকবাল নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন) ১৯৩০ সালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত বলতে তিনি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে বুঝিয়েছিলেন। মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ তার চিন্তায় ছিল না। ইকবাল ঠিক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি চিন্তা করেন নি, কারণ তিনি নিজে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তাঁর জীবন দর্শন ছিল, পাশ্চাত্যের চরম বস্তুবাদ ও প্রাচ্যের চরম অদৃষ্টবাদের সম্মিলনে গড়া। ইকবাল একটি স্বাধীন দেশের কথা বলেছেন এমনও নয়, তিনি বলেছিলেন, এটা বৃটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় হোক কিংবা আওতা বহির্ভূত হোক আপত্তি নেই। তবে স্বায়ত্তশাসিত হবে একথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন।[১২৮]

১৯৩৩ সালে লণ্ডনে চৌধুরী রহমত আলীর নেতৃত্বে একদল মুসলিম ছাত্র 'পাকিস্তান' শব্দটি তৈরী করেন এভাবে- 'P' অর্থে Punjab (পাঞ্জাব), 'K' অর্থে Kashmir (কাশ্মীর), 'S' অর্থে Sind (সিন্ধু) এবং 'stan' অর্থে Baluchistan (বেলুচিস্তান)।[১২৯]

এভাবে তাঁরা একটি নতুন রাষ্ট্রের কল্পনা করেন যাতে পাশাপাশি অবস্থিত চারটি মূল ভূখণ্ড সংস্পর্শিত ছিল। আলোচ্য এই "PAKISTAN' শব্দটিতে এমনকি এবার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও বাদ যায়। 'পূর্ব বাংলা' নামের গন্ধ তো পাকিস্তান শব্দটিতে ছিলই না।

১২৮ মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, *পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি* (ঢাকা, ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ১৯৬৯) পৃষ্ঠা ১৫৭

১২৯ ঐ, পৃষ্ঠা ২

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে সার্বভৌম দেশ গঠনের কথা বলা হয়। কিন্তু মুসলিম লীগের একদল নেতা পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পূর্ব বাংলাকে নিয়ে হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পাঞ্জাব-সিন্ধুর সাথে জোড়া দিয়ে একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র গড়ার জন্য গো ধরে বসে রইলেন। তাঁরা এজন্য যুক্তি-তর্কের সকল খেই হারিয়ে চরম সাম্প্রদায়িক উস্কানী তুলে শেষ পর্যন্ত হাজার মাইল দূরে অব-স্থানে থাকা দুটো আলাদা ভূখণ্ড নিয়ে একটি নতুন দেশ গড়ে তবে ছাড়লেন।

কিন্তু সর্ব ভারতীয় অসাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা পাকিস্তান পরিকল্পনার সারবত্তা খুঁজে পান নি, তাঁরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের স্মৃতিকথায় তার ছোঁয়া পাওয়া যায়।:

'মুসলিম লীগ বর্ণিত পাকিস্তান পরিকল্পনাটি সম্ভবপর সমস্ত দিক থেকে আমি বিচার করে দেখেছি। ভারতীয় হিসেবে আমি সমগ্র ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে এর কী অর্থ দাঁড়াবে তা খতিয়ে দেখেছি। ভারতের মুসলমানদের ভাগে এর কী ফলাফল ঘটতে পারে একজন মুসলমান হিসেবে আমি তা যাচাই করে দেখেছি।

পরিকল্পনাটির সমস্ত দিক বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এটি শুধু সারা ভারতের পক্ষেই নয়, বিশেষ করে মুসলিমদের পক্ষে হানিকর। এবং বস্তুতপক্ষে এতে সমস্যা যত না মিটবে তার চেয়ে ঢের বেড়ে যাবে।

একথা স্বীকার না করে পারছি না যে, 'পাকিস্তান' শব্দটাই আমার কাছে অরুচিকর। এ থেকে মনে হয় পৃথিবীর কতকাংশ শুদ্ধ বাকি সব অশুদ্ধ। শুদ্ধ আর অশুদ্ধ বলে এলাকা ভাগ করা ইসলাম বহির্ভূত; এর সঙ্গে বরং সেই গোঁড়া ব্রাহ্মণের মিল বেশি, যা মানুষ আর দেশকে শুচি আর ম্লেচ্ছ ভাগ করে।...

অধিকন্তু, এ রকম মনে হয় যে, পাকিস্তান পরিকল্পনার পেছনে রয়েছে একটা হার মানার লক্ষণ। ইহুদিদের জাতীয় বাসভূমির দাবির ছকে এটি খাড়া করা হয়েছে। এতে স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছে যে, ভারতীয় মুসলমানেরা অখণ্ড ভারতে সুবিধে করে উঠতে পারবে না, বিশেষভাবে সংরক্ষিত একটা কোণে নিজেদের গুটিয়ে নিতে পারলেই তারা খুশি হবে।...

এই পটভূমি দেখলে পাকিস্তানের দাবির কোনো জোর থাকে না। গোটা ভারতই আমার ভূখণ্ড এবং আমি এর রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলার

অংশীদার-একজন মুসলমান হিসেবে আমার এই অধিকার আমি কিছুতেই বিসর্জন দিতে রাজী নই। বাপ-দাদার কাছ থেকে যে সম্পদ আমি পেয়েছি, তা ছেড়ে দিয়েই শুধু তার একটা টুকরো মাত্র নিয়ে খুশি হওয়া—আমার কাছে এটা নিশ্চিতভাবে কাপুরুষতা বলে মনে হয়।....

কেউ তর্ক করে বলতে পারেন, পাকিস্তান যদি খোদ মুসলমানদেরই স্বার্থের এত পরিপন্থী হয় তাহলে বিরাট সংখ্যক মুসলমানেরা কেনইবা এর প্রলোভনে পড়ে ভেসে যাচ্ছে? হিন্দুদের মধ্যে একদল সাম্প্রদায়িক উগ্রচণ্ডী মনোভাবের মধ্যে এর উত্তর মিলবে।...

প্রতিপক্ষের কাজকর্মে লীগ ভক্তরা আরও বেশি উৎসাহ পেল। ওদের সাদা আচে অসার যুক্তি হল, হিন্দুরা যখন পাকিকস্তানের বিরুদ্ধে এতটা খড়গহস্ত, তখন ওতে নিশ্চয়ই মুসলমানদের লাভ আছে। এমন একটা আবেগোন্মত্ততার আবহাওয়া তৈরী হল যে, ঠাণ্ডা মাথায় তার লাভ-ক্ষতি বিচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।... বর্তমানের উন্মাদনা কেটে গেলে এবং ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি বিবেচনা করার অনুকূল সময় হলে, আজকের সমর্থকেরা নিজেরাই পাকিস্তানকে মুসলিম স্বার্থের পক্ষে হানিকর বলে তা অগ্রাহ্য করবে।...

ভারতের যা অবস্থা, তাতে কোনো কেন্দ্রীভূত এবং একীভূত সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তেমনি ভারতকে ভাগ করে দুটি রাষ্ট্র গড়ার চেষ্টাও নিস্ফল হবে।...

আমি তাদের একজন, যারা মনে করে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা আর ভেদ-বিভেদের বর্তমান অধ্যায়টি ভারতের জীবনে একটি ক্ষণস্থায়ী পর্ব। আমি দৃঢ়ভাবে মনের করি ভারত তার ভবিতব্যের ভার নিজের হাতে নিলে তখন আর এসব বালাই থাকবে না।... কারো জলাতঙ্ক সারানোর মোক্ষম ওষুধ হল তাকে ধরে জলের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া। তেমনি ভারত যেই দায়িত্বভার ঘাড়ে নিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজে দেখবে, তারপর ভয়ভীতি আর অবিশ্বাস পুরোপুরি টুটে যাবে।

ভাগ্য যখন ভারতের মুঠোয় আসবে, তখন সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস আর বিসংবাদের অধ্যায় ভুলে গিয়ে আসবে আধুনিক দৃষ্টিতে জীবনের হালফিল সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার নতুন পালা। বিভেদ তখনও নি:সন্দেহে থেকে যাবে, কিন্তু তা হবে অর্থনৈতিক--সাম্প্রদায়িক নয়। রাজনৈতিক বিরোধিতা তখনও থাকবে, কিন্তু তার

ভিত্তি ধর্মীয় হবে না-হবে অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে। ভবিষ্যতের বিন্যাস হবে শ্রেণীগত - সম্প্রদায় ভিত্তিতে নয়; নীতিও গড়ে উঠবে সেই ধারায়'।[১৩০]

কিন্তু মুসলিম লীগের নেতারা কোনো যুক্তি আর শুনলেন না। মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলার আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাবও তারা বাতিল করে দিলেন।

একদিন রাত পোহালে (১৪ আগস্ট) হটাৎ করে ভারতবাসী দেখলো, তারা এক একজন এক এক দেশী, কেউবা পরদেশী, কেউ স্বদেশী।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হলেন। তাঁকে পাকিস্তানের 'জাতিরপিতা'ও ঘোষণা করা হল। খেতাব দেওয়া হল 'কায়েদে আজম'। করাচী তাঁর নিজ বাসভূমি, তাই সেখানে করা হল রাজধানী।

কিন্তু এখান থেকেই নতুন করে আরেক অসংগতির যাত্রা শুরু হল। কোনো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকেই করাচী পাকিস্তানের রাজধানী হতে পারে না। রাজধানী হওয়া উচিৎ ছিল ঢাকায়, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বাস ছিল এখানে।

জিন্নাহর মৃত্যুর কয়েক বছর পর পাকিস্তানের নতুন নেতা আইয়ুব খানের বাসভূমি যেহেতু পাঞ্জাব ছিল, সেহেতু সিন্ধু প্রদেশ থেকে রাজধানী চলে গেল পাঞ্জাবে, তাও আবার লাহোরে নয়, প্রথমে রাওয়ালপিণ্ডি, আরো একবার পরিবর্তিত হয়ে ইসলামাবাদে। ৩ বার তারা এভাবে একমাত্র রাজধানী পরিবর্তন করেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই খাতে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি বড় অসংগতি ছিল এর 'ইসলামী' খোলসের। পাকিস্তানের মূল নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে 'ইসলামী' ভাবধারার কোনো সাযুজ্য ছিল না। নেতারা একটি 'ইসলামী প্রজাতন্ত্রে'র কথা মুখে বলতেন, কিন্তু নিজেদের জীবন ছিল 'অনৈসলামিক' কর্মতৎপরতায় পরিপূর্ণ।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রধান মাওলানা আবু আলা মওদুদী এ সম্পর্কে একবার একটি মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মন্তব্যটি বিতর্কিত হয়েছিল, কিন্তু কথাটি ছিল সত্য। মওদুদী বলেছিলেন, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের কখনও ইসলামী রাষ্ট্র

১৩০ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল* (অনুবাদ: সুভাষ মুখোপাধ্যায়), (ঢাকা: ইউ.পি. এল, ১৯৮৯) পৃষ্ঠা ১৩৭-৪০

১৩১ এ সম্পার্কে বিস্তারিত আলোচনা 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রাক প্রস্তুতির কয়েকটি স্মারক চিহ্ন' অধ্যায়ে করা হয়েছে

প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলন তখন এমন সব ব্যক্তির হাতে ছিল যাদের হাত থেকে ইসলামিক রাষ্ট্র আশা করা যেত না।[১৩২]

মাওলানা মওদুদী তাঁর 'সিয়াশী কাশমকাশ' গ্রন্থেও এমন মন্তব্য করে বলেছিলেন, দু:খের বিষয় কায়েদে আজম থেকে আরম্ভ করে ছোটখাট অনুসারী পর্যন্ত এমন একজনও নেই যে ইসলাম ভাবাপন্ন ও ইসলামী ধ্যান-ধারনার অধিকারী এবং বিভিন্ন বিষয়কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার-বিবেচনা করেন।[১৩৩]

অথচ পাকিস্তানের নেতারা হর হামেশাই ইসলাম ও মুসলিম ভাতৃত্বের কথা বলে ক্ষমতায় থেকেছেন। কেউ যুক্তিসঙ্গত কোনো কথা বললে তাকে 'ইসলাম বিরোধী', 'পাকিস্তান বিরোধী', 'ভারতের দালাল' এমনকি 'কাফের' বলতেও কুন্ঠিত হয় নি। সবই তারা করেছেন, ইসলাম ও ধর্মের নাম করে। পূর্ব বাংলা যখনই তার ন্যায্য হিস্যার প্রশ্ন তুলেছে, তখনই তারা 'ইসলাম গেল', 'ইসলাম গেল' চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন এবং নিপীড়ন, নির্যাতন চালিয়েছেন। মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব, কমরেড মনিসিংহ সহ প ূর্ব বাংলার নেতাদের 'ভারতের দালাল', 'ইসলাম বিরোধী' প্রভৃতি খেতাব দেওয়া হয়েছিল।

অথচ পাল্টা পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন নেতাদের ব্যক্তি পরিচয় তুলে ধরলে খুবই লজ্জাকর দিক বেড়িয়ে পড়বে। ভাবতে অবাক লাগে, কি করে তথাকথিত এই ধর্মরাজ্যের অধিপতিরা অধর্ম করে বেড়িয়েছেন।

প্রথমত, পাকিস্তানের 'জাতিরপিতা' 'কায়েদে আজম' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রসঙ্গ ছিল খুবই কৌতুককর। জিন্নাহর পূর্ব পুরুষরা মুসলমান ছিলেন না। ভারতের মহাত্মা গান্ধী এবং পাকিস্তানের জিন্নাহ দু'জনই একই অঞ্চলের "(Kathiawar Peninsula)' -- এর অধিবাসী এবং একই জাত গোষ্ঠী (caste) থেকে এসেছিলেন। 'জিন্নাহর দাদা ছিলেন 'কনভার্টেট' মুসলিম'।[১৩৪]

জিন্নাহর একজন জীবনীকার এম. এইচ, সয়ীদ জানিয়েছেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব পূরুষরা ছিলেন চামড়ার ব্যবসায়ী এবং রাজকোটের খোজা পরিবার থেকে তারা এসেছিলেন। এ পরিবার পরে করাচীতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে।[১৩৫]

---

১৩২ পাকিস্তান টাইমস, ২৭ আগস্ট ১৯৭০

১৩৩ দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ আগস্ট ১৯৭০

১৩৪ Carry collins and Dominisque Lapierre, *Freedom at Midnight,* (New Delhi, Tagang Paperbacks, twenty First edition, 1986) P.101

১৩৫ M. H. Saihid, *The Sound of Fury. A Political study of M.A. Jinnah* (New Delhi, Document press, 1981) p. 17-18

'ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট'-এর লেখকগণ জানিয়েছেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন এবং শুক্রবারে জুমআ নামাজ কখনো তিনি পড়েছেন এমন ইতিহাস জানা নেই। পবিত্র গ্রন্থ কোরআন ও সৃষ্টিকর্তার কোনো স্থান জিন্নাহর পৃথিবীতে ছিল না। জীবনের শেষ তিনটি বছর তিনি বেঁচেছিলেন, ইচ্ছাশক্তি, হুইস্কি এবং সিগারাটের উপর ভর করে,শূকরের মাংসও তিনি ভক্ষণ করতেন:

"The more improbable leader of India's Moslem masses could hardly be imagined. The only thing Moslem about Mohammed Ali Jinnah was his parents religion. He drank ate pork, religiously shaved his beard each morning and just as religiously avoided... the mosque each Friday. Bod and the Koran had no place in Jinnah's vision of the world.
He was a frail sick man who already in the words of his physician, had been living for three years on will power, whisky and cigarettes.'[১৩৬]

এসব ঘটনা পাকিস্তানে একেবারে অজানিত ছিল এমন নয়। কিন্তু সাধারণ্যে এর বেশী প্রচার ছিল না। কারণ তাহলে পাকিস্তানের ফাঁপা বেলুনের ভিত-এ কাঁপন অনেক আগেই লেগে যেত।

দু'জন উৎসাহী পাকিস্তানের ইতিহাসে অনুসন্ধিৎসুর পাঠক আমাকে জানিয়েছেন, পাকিস্তনের সকল কিছুতেই এতো বেশী অসংগতি ও গোঁজামিল ছিল যে, এর টিকে থাকার কোনো যুক্তিই আর ধারণ করতে পারছিল না। তাঁরা বলেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বলা হতো, 'পাকিস্তানের পিতা' কিন্তু তাঁর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে বলা হতো 'মাদারে মিল্লাত' অর্থাৎ মাতা। এখানে গুরুতর অসংগতিটি হল, দুই আপন ভাই-বোন কি করে 'মাতা-পিতা' হয়।[১৩৭]

পাকিস্তানের যে জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছিল, 'পাকসার জামিন, সা'দ বাদ' তা ছিল ফার্সী ভাষায় রচিত। এ ভাষাতেই তা গীত হতো। এখানে আশ্চর্যকর কৌতুকপূর্ণ দিকটি হল, পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের ভাষাই ফার্সী ছিল না। নিজের জাতির নিজস্ব জাতীয় গান পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলেরই ভাষায় হতে পারেনি। এর চেয়ে আর কি দু:খজনক ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকি উর্দুও পাকিস্তানের

---

১৩৬ Freedom at midnight, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০২-১০৩
১৩৭ সাক্ষাৎকার, শামসুজ্জামান চৌধুরী ও হারুন -উর-রসিদ,

কোনো অঞ্চলের ভাষা ছিল না কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে উর্দু চালানোর চেষ্টা পাকিস্তানী-নায়করা করেছেন, অথচ সেই উর্দুতেও জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয় নি।

পাকিস্তানের এর পরের নেতাদের মধ্যেও এরকম নানা অসংগতি লক্ষণীয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হওয়ার পর যেসব 'ত্রাণকর্তা' পাকিস্তানের পালের বৈঠা ধরেছেন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তাদের অন্যতম। তিনি বিয়ে করেছিলেন একজন খ্রীষ্টান রমণীকে। অন্য একজন শাসনকর্তা ফিরোজ খান নুনও, বিয়ে করেছিলেন খ্রীষ্টান রমণী ভিকারুন্নেসাকে (বর্তমানে ঢাকায় এই ভদ্র মহিলার নামে একটি স্কুল রয়েছে)। পাকিস্তানের একজন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়ার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন ঘরের কাজের লোক। শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিয়ে করেছিলেন একজন রাশিয়ান মেয়ে।

তাঁরা অবশ্যই ব্যক্তিগত জীবনে অন্য ধর্মের মেয়েকে (মুসলমানরা একে বিধর্মী বলে) বিয়ে করতে পারেন, কিন্তু ইসলামী আইন অনুযায়ী তখন আর তাঁরা মুসলমান থাকেন না। কিন্তু বলা হয়েছিল, পাকিস্তান একটি মুসলিম দেশ এবং এর নাম ছিল 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র'। কিন্তু একজন অমুসলমান সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের শাসনকর্তা হন কিভাবে। অথচ মুখে ইসলামের নামে ছিলেন তাঁরা 'জান কোরবান'।[১৩৮]

পাকিস্তানের (ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের) শেষ প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ছিলেন একজন দর্জির ছেলে। নারী,মদ, নাইটক্লাব, অর্থ উজাড় ইত্যাদি নিয়েই তিনি পরে থাকতেন অধিকাংশ সময়।[১৩৯]

একটি টাইপরাইটার ও পাকিস্তান

পাকিস্তান জন্মের পর 'কায়দে আজম' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বললেন, তিনি পাকিস্তান অর্জন করেছেন কেবলমাত্র তাঁর সেক্রেটারী ও তার টাইপরাইটার দিয়ে। জিন্নাহের একজন ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর জীবনী- লেখক এম. এইচ. সয়ীদ এ মন্তব্যের সত্যতা স্বীকার করেছেন,

"Jinnah is on record to have claimed : I have won Pakistan with the help of my secretary and his typewriter.[১৪০]

১৩৮ পাকিস্তানের ইতিহাসের একজন উৎসাহী পাঠক আমাকে এই সঙ্গে আরো যোগ করেছেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর স্ত্রী রতনবাঈ (যিনি পরে জিন্নাহকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন) ছিলেন পারসী অগ্নিউপাসক। সূত্রটি আমাকে আরো জানান, বেনজীর ভুট্টোর পূর্বতন পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হকের মা ছিলেন কাদিয়ানী এবং জিয়াই আবার কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর মাতাও অগ্নি উপাসক ও নিষিদ্ধ পল্লীর মহিলা ছিলেন বলে সূত্রটি জানিয়েছেন।

১৩৯ রবার্ট পেইন, *ম্যাসাকার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩-২৪

১৪০ M. H. Saiyid, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪৭

এবং এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর যে অহংবোধের জন্ম নিয়েছিল তা পাকিস্তানের সর্বনাশ করে ছেড়েছিল। কারণ ভুল-শুদ্ধ যাই হোক, পাকিস্তান অর্জনের পেছনে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সাধ ছিল। বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানের শ্রম এর সাথে মিশেছিল। জিন্নাহর উপরিউক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করা হয় এবং একমাত্র তাঁর নিজের অবদানকেই উচ্চকিত করে তোলা হয়।

জিন্নাহ তাঁর রাজনৈতিক জীবনে পাকিস্তানের শক্তিতে দ্বিতীয় আঘাত করেন ঢাকায় এসে। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম এবং শেষবারের মতো ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় তিনি তাঁকে দেখতে আসা পূর্ববঙ্গের লাখো বঙ্গভাষীকে একরকম 'জুতো পেটাই' করেন। তিনি বঙ্গভাষীদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন:

'আপনাদের পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এব্যাপারে যদি কেউ আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে যে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু'।[১৪১]

বলাবহুল্য, বাংলাভাষী লাখো মানুষের মুখে তিনি 'জাতির পিতা' হয়ে 'থুতু' ছিটিয়ে যান তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি। অথচ পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলেরই ভাষাই উর্দু ছিল না। কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের মাতৃভাষা ছিল উর্দু (তিনি ভারতের উর্দু অঞ্চল থেকে এসেছিলেন)। আর কিছু আমলা, যারা ভারতের উর্দু-ভাষী অঞ্চল থেকে পাকিস্তানে এসেছিল, তাদের ভাষা ছিল উর্দু। এই মুষ্টিমেয় লোক ক্ষমতার জোরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল অউর্দু ভাষীদের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিলেন।

পূর্ববঙ্গে এ থেকে এই যে ঘৃণার বীজ বপন করা হল তা আর শোধরানোরও চেষ্টা করা হয় নি।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে তার জনবিস্ফোরণ ঘটলে পূর্ব বাংলায় প্রথম সচেতনভাবে স্বাধীন চেতনা সুসংবদ্ধ হয়।

১৯৫৪ সালে নির্বাচন দিলে পূর্ব বাংলার মানুষ এদেশে জিন্নাহ, পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের কবর রচনা করে। সত্যি সত্যি এ অঞ্চলে মুসলিম লীগ আর 'মেরুদণ্ড সোজা' করে দাঁড়াতে পারেনি, পাকিস্তানের শেষদিন পর্যন্ত।

---

১৪১ *জাতির পিতা বলেছেন* (পুস্তিকা), (ঢাকা, প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র বিভাগ, পাকিস্তান সরকার, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৬), পৃষ্ঠা ২৭

কিন্তু ৫৪ সালের নির্বাচনের পর এর ফলাফল পাকিস্তানের 'কিং-মেকার'রা (পাঞ্জাবী প্রভাবিত আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী এবং অমেরিকা) মেনে নিতে পারে নি। ফলে পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্টের সরকার তাঁরা ভেঙেদেন এবং নানা ধরণের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মধারা পরিচালনা করতে থাকেন। পূর্ব বাংলার প্রায় সকল রাজনীতিবিদই ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সাল এই তিনবছর কোনো না কোনোভাবে এ ষড়যন্ত্রে পা দেন এবং এক বিস্ময়কর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন।

পাকিস্তানের ক্ষমতা লোভী সামরিক বাহিনী ক্ষমতাদখলের জন্য এরকমই একটি বিশ্রী রাজনৈতিক পরিবেশ চাচ্ছিলেন। পূর্ববাংলার নেতারা বেশ ভালভাবেই এদের ফাঁদে পা দেন। প্রথম ইস্কান্দার মীর্জা এবং কয়েকদিন পর আইয়ুব খান সশরীরে ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানে সামরিকতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু করেন।[১৪২]

প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা লোভী সেনানায়কদের জন্যই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ভেঙে যায়। সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকদের প্রধান্য ছিল প্রথম থেকেই। তাঁরা নিজেদের পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং রাজনীতিবিদদের খেলার গুটি মনে করতেন।

আইয়ুব খানের ভাষায়, 'রাজনৈতিক কর্মকর্তা হিসাবে যাঁরা জনাব লিয়াকত আলী খানের পরে এলেন তাঁরা কর্তব্য কর্মের উপযুক্ত প্রমাণিত হলেন না। দেশ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা তাঁরা না পারলেন উপলব্ধি করতে, না পারলেন সাহসের সংগে সমাধান করতে, একের পর এক তাঁরা অকেজো শাসন পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ চালাতে গিয়ে অবস্থা ব্যবস্থা সব ঘুলিয়ে ফেললেন এবং দেশ দ্রুত সর্বনাশের পথে এগিয়ে চললো'।[১৪৩]

আইয়ুব খান এবং তৎকালীন সামরিক কর্তারা দেশের সংকট বুঝেছিলেন। তবে তাঁরা একটু বেশীই বুঝেছিলেন। এবং এটাই পাকিস্তানের কাল হয়ে দাঁড়াল। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর নাক গলানো যে কত বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 'পাকিস্তান' নামক দেশটি। ৪৭ উত্তর ভারতেও অনেকবার রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে কিন্তু সামরিক বাহিনী কখনোই তাতে ঢুকে পরে 'ভাল করতে' যায় নি। যে রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদের জন্য সংকট সৃষ্টি

---

১৪২ বিস্তারিত দেখুন, বা. ছা. আ. ই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে

১৪৩ আইয়ুব খান, *প্রভু নয় বন্ধু* (একটি রাজনৈতিক আত্মজীবনী), (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী-ঢাকা-লাহোর, ১৯৬৮) পৃষ্ঠা ৬৩

হবে জনগণই তার শায়েস্তা করবে, সে যতো বড় ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন, জনগণের রোষ তাকে ভস্মিভূত করে দেবে। ৫৪ সালে 'জনপ্রিয় মুসলিম লীগ' এবং ৬৯ সালে লৌহমানব আইয়ুব খানের পতন তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কিন্তু পাকিস্তানে সেনাবাহিনী, ইতিহাসের এ পাঠ শুনতে রাজী নয়। তাঁরা বন্দুক নিয়ে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান রক্ষার জন্য এসেছিলো, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্দুক কাঁধে নিয়ে থেকেছে, পাকিস্তান রক্ষা করতে পারে নি। বরং পাকিস্তানকে গোরস্থানে পাঠিয়ে তবে ব্যারাকে ফিরে গেছে, এর আগে নয়।

উপমহাদেশ সম্পর্কে একজন প্রখ্যাত বৃটিশ বিশ্লেষক রজনী পাম দত্তের বিশ্লেষণেও উপরিউক্ত মন্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। দত্ত বলেন,

'পাকিস্তানের সমগ্র কাঠামোতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ফাটল এবং অস্থিতিশীলতার প্রকাশ ঘটিয়াছে একের পর এক সামরিক একনায়কত্বের প্রবর্তনের মধ্যে'।[১৪৪]

পাকিস্তানের শুরু থেকেই এই সামরিক নায়করা দেশের শাসন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে পড়ায় যে 'বিষবৃক্ষের বীজ' এ ভাবে রোপিত হয়েছিল, তার থেকে পাকিস্তানের বিপদকে আর রক্ষা করা গেল না। এরা নিজেদের যেমন করে ভাবতে থাকলেন ইসলামের একমাত্র ধ্বজাধারী, তৈমুর লং আর নাদির শাহের উত্তরসুরী, তাদের ছাড়া ইসলাম আর পাকিস্তান বাঁচবে না-এ ধারণা শুধু মিথ্যা প্রতীয়মান হল না, পাকিস্তানের চরম সর্বনাশ করে ছাড়লো।

টিক্কা খানের প্রথম বেতার ভাষণ

এই সর্বনাশের চরম প্রকাশ ঘটানোর জন্য ১৯৭১ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকায় পাঠান জেনারেল টিক্কা খানকে। টিক্কা খান মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় নতুন গভর্নর হওয়ার নিয়োগপত্র নিয়ে ঢাকা এসেছিলেন। কিন্তু শপথ নিতে না পারায় তিনি অনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নিতে পারেন নি।

২৫ মার্চের কালরাতের হত্যাকাণ্ডের পর ১০ এপ্রিল তিনি শপথ নেন এবং ১৯ এপ্রিল তিনি এক বেতার ভাষাণ দেন। তিনি অত্যন্ত কঠিন স্বরে বলেন,

১৪৪ রজনীপাম দত্ত, *'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক তাৎপর্যময় সংগ্রাম'*, লেবার মার্শাল,(জুন, ১৯৭১, লণ্ডন), সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ, ১লা, জুলাই ১৯৭১ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত

'আধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ এমন এক পথ ধরেছিল যাতে... আমাদের এই দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেত।... রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, যারাই আওয়ামী লীগে ছিল তারাই জাতির সংহতি ও অখণ্ডতার বিরোধী। যারাই পাকিস্তানের মঙ্গল চান তাদের ভয় করার কোন কারণ নেই।...

সশস্ত্র বাহিনী, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশের কিছু লোক কর্তব্যস্থান ছেড়ে গেছে। যারা নিজেদের ইউনিটে পুনরায় যোগদান করবে.... তাদের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সহানুভূতিমূলক আচরণ করা হবে। আমি তাদেরএই সুযোগ গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি। অন্যথায় তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হবে'।[১৪৫]

বঙ্গ শার্দুলরা এক হলেন

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে বাঙালী সৈনিকদের প্রথম যুদ্ধ হয় ১৯মার্চ জয়দেবপুর সেনানিবাসে। (পূর্বে এ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে)।এখানে ছিলেন মেজর সফিউল্লাহ। তিনি পরে ময়মনসিংহ অঞ্চলে সরে পড়েন।

দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় চট্রগ্রামে। এখানে ২৬মার্চ কুমিরায় পাকিস্তানী সেনাদের সাথে বাঙালী ইপিআর সেনাদের দ্বিতীয় সরাসরি যুদ্ধ হয়। চট্রগ্রামে কালুরঘাটে মেজর জিয়া চতুর্দিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে বড় ধরণের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। তিনি ২৬ মার্চ রাতে তাঁর বাহিনী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যান এবং কিশোরগঞ্জে মেজর সফিডল্লাহ ও চট্রগ্রামে অবস্থানরত মেজর জিয়ার সাথে যোগাযোগ করেন।

দিল্লীতে যখন ৪ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ ভারত সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা সাজাচ্ছিলেন, ঠিক তখন সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর কমান্ডারগণ প্রতিরোধ যুদ্ধের নকশা প্রণয়নে একত্রিত হলেন। এতে যোগ দিলেন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী, লে. কর্নেল আবদুর রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সফিউল্লাহ, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর মমিন চৌধুরী প্রমুখ বঙ্গশার্দূলরা।

---

১৪৫ দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

বৈঠকে সমস্ত বিদ্রোহী ইউনিটের সমন্বয়ে সম্মিলিত মুক্তিফৌজ গঠন করা হয় এবং কর্নেল ওসমানীকে তা পরিচলনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১৪৬]

এরপর বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধরত সেনা কমাণ্ডারদের নিয়ে পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১১ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। সারাদেশের যুদ্ধ অঞ্চলকে মোট ১১টি সেক্টরে এই সম্মেলনে বিভক্ত করা হয় এবং সেক্টর কমাণ্ডার নিয়োগ করা হয়।

সম্মেলনে এ ছাড়া কর্নেল এম. এ রব বাংলাদেশ বাহিনীর চীফ অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টন এ.কে খোন্দকার ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন।

এ সম্মেলনে যাঁরা পূর্বে উল্লিখিত বাঙালী সামরিক অফিসারদের ছাড়া আরো যোগদান করেছিলেন, তার মধ্যে, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খোন্দকার, মেজর সি আর দত্ত, মেজর মীর শওকত আলী, উইং কমাণ্ডার এম কে বাশার, মেজর ওসমান চৌধুরী, মেজর রফিকুল ইসলাম, মেজর নাজমুল হক, মেজর এম এ জলিল, মেজর এ আর চৌধুরী প্রমুখ।[১৪৭]

শান্তি কমিটি গঠন

১০ এপ্রিল (১৯৭১) পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক নেতারা ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তানকে রক্ষা ও বাংলাদেশকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে শান্তিকমিটি গঠন করে। পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খয়েরউদ্দিন এ কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত হন (তিনি ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ঢাকা শহর থেকে দাঁড়িয়ে জামানত পর্যন্ত হারিয়েছিলেন)। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন, এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, মৌলভী ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম আযম, পীর মোহসেনউদ্দিন দুদু মিঞা, মাহমুদ আলী, এ এস এম সোলায়মান, আবুল কাসেম, আতাউল হক খান প্রমুখ। প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির মোট সদস্য ছিল ১৪০ জন।

শান্তিকমিটি গঠন করার আগে ৫ এপ্রিল নূরুল আমিনের নেতৃত্বে ১২ জন রাজনৈতিক নেতা এবং ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার হামিদুল হক চৌধুরী (বর্তমান বাংলাদেশ অবজারভারের মালিক) ও গোলাম আযমের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতি-

১৪৬ মঈদুল হাসান, মূলধারা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫
১৪৭ *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৯-৮০

নিখিদল পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসযজ্ঞের হোতা সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খানের সাথে দেখা করেন। দৈনিক সংগ্রামে ৭ এপ্রিল এই সাক্ষাতের আলোকচিত্র ছাপা হয়।[১৪৮]

১৬ এপ্রিল শুক্রবার পিডিপি নেতা নূরুল আমিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল নতুন শপথ নেওয়া পুরাতন গভর্নর টিক্কাখানের সাথে দেখা করেন। তাঁরা টিক্কা খানকে বলেন, জনসাধারণ ভারতের হীন চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে রয়েছে।

এ সময় আরো যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে গোলাম আযম, আব্দুল জাব্বার খদ্দর, মোহন মিয়া, মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ মাসুম, এম এ মতিন (মুসলিম লীগ), তোহা-বিন-হাবিব, মেজর আফসারউদ্দিন প্রমুখ।[১৪৯]

(এদের তৎপরতার আরো সংবাদ পরবর্তী অধ্যায়ে দেখুন)।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণ সংগঠনের আন্তর্জাতিক আবেদন

বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার নির্বিচার গণহত্যা শুরু হলে সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বার্তা প্রেরণ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নামে একটি বার্তা ৪ এপ্রিল (১৯৭১) বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সূমহের শিক্ষকদের কাছে পাঠানো হয়।

এতে কিভাবে বাংলাদেশের শিক্ষক ও ছাত্রদের ঢালাওভাবে পাকিস্তানী সৈন্যরা হত্যা করছে তার বিবরণ ও তালিকা প্রেরণ করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়।[১৫০]

১৮ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় বৃটেনের 'সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায়। এতে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষকদেরসহ গণহত্যার একটা বিবরণ তুলে দিয়েছিলেন। এই বিবরণ সমেত ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং এর এফিলেটেড কলেজসমূহের শিক্ষকরা যারা স্কটল্যাণ্ডে উচ্চশিক্ষায় রত ছিলেন তাঁরা তা বিশ্বের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কাছে প্রেরণ করেন।[১৫১]

---

১৪৮ দৈনিক সংগ্রাম, ৭ এপ্রিল ১৯৭১
১৪৯ ঐ, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
১৫০ স্বাধীনতার দলিল, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫
১৫১ ঐ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫-২৬

স্কটল্যাণ্ডে উচ্চ শিক্ষারত বাংলাদেশের শিমকদের এই একই গ্রুপ ২৩ এপ্রিল অনুরূপ এক বার্তা গ্রেট বৃটেনের সকল ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি প্রেরণ করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সমর্থন কামনা করে।[১৫২]

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.এ. আর. মল্লিক পয়লা জুলাই কলকাতা থেকে দুনিয়ার সকল বিদ্যুৎসাহী সমাজের কাছে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে বার্তা প্রেরণ করেন।[১৫৩]

২০ এপ্রিল ন্যাপ (ওয়ালী) বাংলাদেশ শাখার প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বিবৃতি দেন। একই বিবৃতিতে তিনি বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দেশ এবং জাতিসংঘের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[১৫৪]

৩মে পূর্ব পাকিস্তনের (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পূর্বাপর ইতিহাস (বৃটিশ আমল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত) নিয়ে এক দীর্ঘ চিঠি তৈরী করে এবং তা বিশ্বের সকল দেশের ক্ষমতাসীন ও অক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি সমূহের প্রতি প্রেরণ করে।

চিঠিতে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি অংশ এবং ১৯৬৯-এ মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে অন্যতম স্বাক্ষরকারী পার্টি।

সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন ও মাওবাদী চীনের সমর্থক পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী থেকে বালাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রমকে জয়যুক্ত করতে সাহায্য সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয় এতে। চিঠিতে স্বাক্ষর করেন পার্টি পক্ষে সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম।[১৫৫]

৯ জুলাই জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি মো: শাহজাহান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান বৃটেনের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নেতাদের কাছে এক বার্তায় পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদানে সহযোগিতা না করার জন্য আবেদন করেন।[১৫৬]

---

১৫২ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ২৯
১৫৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩৪
১৫৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬৯
১৫৫ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭৭-৪৯২
১৫৬ ঐ, পৃষ্ঠা ৮৪

৮ আগস্ট শ্রমিক লীগের নেতৃদ্বয় (National Workers league) নামে অপর একটি বার্তা বিশ্বের সকল শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের কাছে বাংলাদেশের শ্রমিকদের উপর পাক হানাদার বাহিনীর অবাধ হত্যা ও নির্যাতনের চিত্র তুলে পাঠানো হয়।[১৫৭]

২১ আগস্ট ন্যাপ (ভাসানী) প্রধান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্যের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে পৃথক পৃথক চিঠি প্রেরণ করেন।

এর মধ্যে চীনের চেয়ারম্যান (চিঠিতে 'প্রেসিডেন্ট' শব্দ রয়েছে--মোহা) মাও সে তুং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এর কাছে লেখা চিঠি ছিল উল্লেখযোগ্য। এ চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, চীনের চিয়াং কাই শেক অথবা রাশিয়ার জার কিংবা পারাধীন ভারতে বৃটিশদের নির্যাতনও পাকিস্তানের সামরিক জান্তার অত্যাচারের চিত্র হার মানবে।

মাওলানা ভাসানী এতে তাঁর নিজস্ব বাড়ী-ঘর পুড়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর সংগৃহীত পুস্তকও ইয়াহিয়ার সেনারা ছাই করে ফেলেছে। তিনি বলেন, জানিনা আমার ফেলে আসা পরিবারের ভাগ্যে কি ঘটেছে।

উল্লেখ্য, মাওলানা ভাসানীর সাথে চীনের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মাওলানার হৃদয়স্পর্শ করা এ চিঠি চীনের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের মন গলাতে পারে নি। মাওলানা ভাসানী সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেঝনেভ, প্রেসিডেন্ট পদগোর্নি, প্রধানমন্ত্রী (চিঠিতে 'চেয়ারম্যান' রয়েছে--মোহা) কোসিগিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পম্পিডু, গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ, যুগোশ্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (মিশর--মোহা)-এর প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত জাতিসংঘ, আরবলীগ ও আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার নেতৃবৃন্দের কাছেও অনুরূপ বার্তা প্রেরণ করেন।[১৫৮]

---

১৫৭ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ৫৬৭-৬৯
১৫৮ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭০-৭৬

বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের ৬ জন নেতা 'সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক' (আহবায়ক, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, সভাপতি লতিফ বাওয়ানী জুট মিল শ্রমিক ইউনিয়ন), মঞ্জুরুল আহসান (সভাপতি, উজালা ম্যাচ ফ্যাকটরী, সাধারণ সম্পাদক, হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন), আহসানউল্লাহচৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক, বন্দর শ্রমিক ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম), লুৎফর রহমান (সভাপতি, কাঞ্চন আঞ্চলিক শ্রমিক ইউনিয়ন), সামসুদ্দোহা (সদস্য, রেলওয়ে শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ), আলমগীর কবীর (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন), একটি বার্তা বিশ্বের সকল শ্রমিক সংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।[১৫৯]

ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ব আবেদন

২০ মে (১৯৭১) বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (সাবেক EPSU-পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন-মতিয়া) বিশ্বের সকল দেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি প্রেরণ করে। ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি নূরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ চিঠিতে বলা হয়, সাম্রাজ্যবাদ আশীর্বাদপুষ্ট পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি।

চিঠিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলা হয়, আমরা যুদ্ধ করছি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ সমর্থনপুষ্ট পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদীদের বিরুদ্ধে। এতে বিশ্বের সকল ছাত্র যুব সংগঠনের প্রতি স্বীকৃতি ও অস্ত্র সাহায্যের আহবান জানিয়ে বলা হয়:

'We appeal all national and international youth and studeants organisations to come forward.

– to demand the recogntion of the Bangladesh Goverment headeby sheikh Mujubur Rahman

-to send us arms money medicine, food, clothing and all other materials to our fighting people.[১৬০]

---

১৫৯ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ৬৪২-৬৪৭
১৬০ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৯৮-৫০৭

ছাত্র ইউনিয়নের এই আবেদন বিশ্বের ছাত্র- তরুণদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। কারণ ছাত্র ইউনিয়নের এই আবেদন আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন (IUS) এবং বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন-এর সমর্থন লাভ করায় দুনিয়ার সকল সমাজতান্ত্রিক দেশ ও গণতান্ত্রিক দেশের প্রগতিশীল ছাত্র-যুব সংগঠনগুলি, মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর পোস্টার ও বিভিন্ন প্রচারপত্রও প্রকাশিত হতে থাকে এবং বৈষয়িক সাহায্য দানের বিষয়টিও অগ্রাধিকার লাভ করে।

এ সম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি নূরুল ইসলাম লিখেছেন, 'ছাত্র ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকল দেশের ছাত্র, যুব ও সকল প্রগতিশীল শক্তির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি বিরাট প্রেস কনফারেন্স করে বিশ্বের সামনে সকল ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়। এটা বিভিন্ন দেশে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ছাত্র ইউনিয়ন দুনিয়ার সকল দেশের ঐ আন্তজার্তিক ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলোর কাছে একটি আবেদন প্রচার করে। তার পরপরই বিভিন্ন দেশের ছাত্র যুবকদের সমর্থন আসতে শুরু করে।ছাত্র ইউনিয়নের কাছে লিখিত চিঠিতে বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন IUS, সোভিয়েত যুব কমিটি সহ দুনিয়ার বহু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংগঠন সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করে'।[১৬১]

ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতির উপরিউক্ত সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য সে সময় অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল আন্তর্জাতিকভাবে। একজন বিদেশী লেখক ১৯৭১ সালের জুন মাসেই প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেন:

'Nurul Islam, President of Bangladesh Students Union (formerly East Pakistan Students Union) said in New delhi : We are sure the People all over the world are today aware of the most atrocious situation created by the West Pakistan military janta in Bangladesh, by perpetrating the most gruesome massacre to the innocent and unarmed people and committing genocide, the brutality of which had even surpassed and excelled the cynically sadistic ferocity of Hitleric Nazis.'[১৬১ক]

---

১৬১ নূরুল ইসলাম; গৌরবের সমাচার, ছাত্র ইউনিয়নের রজত জয়ন্তী প্রকাশনায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩৩

১৬১ক Yatindra Bhatnagar, *Bangladesh Birth of a Nation* (Delhi, Indian school Supply Depot, 1971) P. 133

এরপর লেখক মন্তব্য করেন,

'These are the sentiments of the students all over Bangladesh and thats why Yahya Khans marauders had clear instruction to shootdown as many students as possible. For they are a force in Bangaldesh. The students have always been in the forefrotn in any struggle any where and Bangladesh is no exeption. [১৬২]

ট্রেনিং শুরু

এপ্রিল মাস থেকেই বাংলাদেশ থেকে আগত তরুণ ছাত্র-যুবকদের ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু এই ট্রেনিং ছিল একেবারেই বিচ্ছিন্নভাবে। ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বি. এস. এফ) বিক্ষিপ্তভাবে এ প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। তাতে অস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ের সাহায্য ছিল নিতান্তই অপ্রতুল।

৩০ এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ছাত্র-যুবকদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ভারতের সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এই আয়োজন সম্পন্ন করেন ৯ মে থেকে। তবে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হয় দু'হাজার ছাত্র ও যুবকের প্রথম দলের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল মাত্র ৪ সপ্তাহ। মূলত সাধারণ হালকা অস্ত্র ও বিস্ফোরকের ব্যবহারই এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৬৩]

জুন মাসের শেষ দিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২,০০০ ছাত্র-যুবক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। এরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামান্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়েই পাকিস্তানী বাহিনীকে বেসামাল করে তুললো। এরা ঢাকা-চট্টগ্রামে রেলপথসহ বিভিন্ন স্থল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পণ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়, বড় বড় সেতু ধ্বংস করে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এবং তাবেদার দালালদের সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই নতুন করে আবার থেমে যাওয়া সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হল।[১৬৪]

অনিয়মিত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এই ছাত্র-তরুণদের গেরিলা বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'গণবাহিনী'। কিন্তু তারা জনগণের কাছে পরিচিত হল, 'মুক্তিবাহিনী'

---

১৬২ Yatindra Bhatnagar, *Bangladesh Birth of a Nation* (Delhi, Indian school Supply Depot, 1971) P. 133
১৬৩ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২
১৬৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৬৪

নামে, আবার কোথাও 'মুক্তিযোদ্ধা', 'freedoom fighter' অথবা 'FF' নামেও তারা পরিচিতি লাভ করে। তবে মুক্তিবাহিনী শব্দটিই অপেক্ষাকৃত অধিক জনপ্রিয় শব্দ হিসেবে স্বীকৃত হয়। পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও 'মুক্তিবাহিনী' শব্দটিই ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশ সরকারের কাছে মুক্তিবাহিনী ছিল অনিয়মিত বাহিনী। ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ এবং আনসার, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী ছিল নিয়মিত বাহিনী।

বাঙালী সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র ব্যতিক্রম এই জন্য যে একমাত্র এই দেশের মুক্তিযুদ্ধেই সামরিক অফিসার ও সৈন্যরা সাধারণ এবং রাজনীতি সচেতন ছাত্র-যুবকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে।[১৬৫]

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী (পরে জেনারেল) জানিয়েছেন, সামরিক বাহিনীর ৩টি প্রধান শাখা পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং ই. পি. আর (পরবর্তীকালের বিডিআর) মিলিয়ে প্রায় ২৫,০০০ সৈন্য ও অফিসার মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।[১৬৬]

অন্য একটি সূত্রের মতে, মুক্তিযুদ্ধে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৩,০০০ সদস্য এবং ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ১০,০০০ সদস্য অংশ নেয়।[১৬৭]

তবে বাঙালী অফিসার ও জোয়ানদের একটি বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়ে। এদের মধ্যে প্রায় ১১০০ অফিসার সহ ২৮,০০০ বাঙালী সৈন্য ছিল। এদের মধ্যে ২০ জনের মতো বাঙালী অফিসার পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।[১৬৮]

বীরত্ব কাহিনীর বিপরীত স্রোতও বাঙালী সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল। অনেক বাঙালী সেনাঅফিসার স্বত:স্ফূর্তভাবেই পাকিস্তানীদের পক্ষ হয়ে লড়েছেন। ক্যাপ্টেন এম, এ হাকিম, কাসেদুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং কুমিল্লা সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্তানীদের কাছে 'বীরত্বের' পরিচয় দেন এবং 'সেতারে জুরাত' উপাধী পান।[১৬৯]

১৬৫ আবু মাহমুদ, *'লে, জে এরশাদের প্রতি খোলা চিঠি'*, প্রেক্ষিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২
১৬৬ জেনারেল (অব:) ওসমানী, weekly Holiday পূর্বোক্ত,
১৬৭ A. M. A Muhit, *Emergence of a Nation* (Dhaka: Bangladesh Books International, Ltd. 1978)
১৬৮ Talukder Maniruzzaman, *The Bangladeah Revolution and Its Aftermath*, P. 113. 136
১৬৯ সাক্ষাৎকার : ক্যাপ্টেন (অব:) কাজী খুরশীদুজ্জামান (উৎপল)

ছাত্র ও অন্যান্য মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা

আগস্টের মাঝামাঝি ভারতে ছাত্র-যুবকসহ অন্যান্য পেশার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় দশ হাজারের মতো। বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নেন সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিমাসে ২০ হাজার করে আরো ৬০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দেওয়া হবে। এ ছাড়া নিয়মিত বাহিনীর জন্যও আলাদা ৩টি ব্যাটালিয়ন খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নোয়াখালী, বরিশাল, টাঙ্গাইল, ফরিদপুরে লড়াইরত স্বতন্ত্র গেরিলা গ্রুপের জন্যও অস্ত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভারতীয় নৌবাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশের মাত্র ৩০০ ছাত্রকে ঐতিহাসিক পলাশীর অদূরে ভাগীরথী নদীতে নৌ-মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই নৌ কমান্ডোরা ১৫ আগস্ট থেকে চমক লাগানো নৌ বিধ্বংসী তৎপরতা দেখিয়ে দুনিয়াকে অবাক করে দেয়। আগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে বাঙালী ছাত্র নৌ-কমান্ডোরা সর্বমোট ৫০৮০০ টন জাহাজ নিমজ্জিত করে, ৬৬০৪০ টন জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং বেশ কিছু সংখ্যাক পাকিস্তানী নৌযান দখল করে নেয়। ফলে বিশ্বের বাণিজ্য বহরে ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং চট্টগ্রাম ও চালনায় পাকিস্তান সরকারকে বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

বাংলাদেশের ছাত্র নৌমুক্তিযোদ্ধদের এই অসাধারণ সফলতার পেছনে ছিল সঠিক বাছাই, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং নির্ভুল পরিকল্পনা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এভাবে নৌমুক্তিযোদ্ধারা অনন্য সাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করে।[১৭০]

নভেম্বর মাস পর্যন্ত দলীয় ভাবে বিভিন্ন সংগঠনের মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:[১৭১]

১. মুজিববাহিনী : ১০ হাজার
২. ছাত্রলীগ : ১০ হাজার
৩. ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত বাহিনী: ১৫ হাজার
৪. মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি (চীনপন্থী দল সমূহ) : ৩ হাজার

এছাড়াও অনিয়মিত মুক্তিবাহিনীতে ছাত্রলীগ, ছাত্রইউনিয়ন, আওয়ামীলীগ, ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও চীনপন্থী দলসমূহের সমর্থক মুক্তিযোদ্ধারা ছিল। তবে

১৭০ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮১-৮২
১৭১ লে. জে. বি. এন. সরকার-এর সাক্ষাৎকার, মঈদুল হাসানের পূর্বোক্ত, গ্রন্থে

সাধারণভাবে অনিয়মিত মুক্তিবাহিনীতে বেশীর ভাগ মুক্তিযোদ্ধা ছিল একেবারেই দলীয় রাজনীতি বহির্ভূত। দেশমাতৃকার ডাকেই তারা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল। গণবাহিনী হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাছিল প্রায় ৮৪ হাজার। কেবল এই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরবরাহকৃত মোট অস্ত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় ১লক্ষ ৪০ হাজার।[১৭২]

দলীয় ও নির্দলীয় মুক্তিবাহিনীর ইউনিটসমূহ দেশের অভ্যন্তরে আরো হাজার হাজার ছাত্র-যুবককে ট্রেনিং দিয়ে তাদের দলসমূহে যুক্ত করে নেয়। ফলে ভারতে ট্রেনিং প্রাপ্ত ও দেশের অভ্যন্তরে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধদের সংখ্যা দাঁড়ায় কয়েক লক্ষ।

ভিন্ন একটি সূত্রের মতে, প্রায় দুই আড়াই লক্ষ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-যুবকরা সীমান্ত পাড় হয়ে মুক্তিবাহিনীতে লড়াইয়ের জন্য ক্যাম্পে নাম লিখিয়ে ছিল। এদের মধ্যে কৃষক ও শ্রমিক পরিবার থেকে আগতদের সংখ্যাই ছিল অধিক।[১৭৩]

জিয়াউর রহমান মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী ও প্রাক্তন ছাত্রনেতা এ. এম. এ মুহিত মুক্তিবাহিনীর নিম্নোক্ত তালিকা দিয়েছেন।[১৭৪]

গণবাহিনী : ৮০,০০০

মুজিব বাহিনী : ৮,০০০

কাদের বাহিনী : ৫,০০০

হেমায়েত বাহিসনী : ১,০০০

অন্যান্য গেরিলা গোষ্ঠী : ৩০,০০০

তালুকদার মনিরুজ্জামান জানিয়েছেন, টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনীর নিয়মিত সদস্য ছিল ১৭,০০০ এবং এদের সবাই ছিল ১৪ থেকে ২৪ বছরের স্কুল ও কলেজের ছাত্র। কাদেরীয়া বাহিনীর সহায়ক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর (দেশের অভ্যন্তরে) সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৭২,৫০০ জন এবং এদের সবাই ছিল স্কুল ছাত্র ও কৃষক পরিবার থেকে আগত।[১৭৫]

---

১৭২ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা

১৭৩ Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangadesh,* (Dhaka ; B B I, 1975 P. 49 এবং *The Bangladesh Revolution and Its aftermath,* 113

১৭৪ হাসানউজ্জামান, *সামরিক বাহিনী এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও রাজনীতি* (ঢাকা, ১৯৮৬) পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯

১৭৫ Talukder Muniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath* *P. 117*

সমাজ-রাজনীতি বিষয়ক গবেষক হাসানউজ্জামান জানিয়েছেন, মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সমর্থকরা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় প্রায় ২০, ০০০ গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন রণাঙ্গনে গেরিলা যুদ্ধ চালায়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল-র, পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি দাবী অনুযায়ী যথা ক্রমে ১০,০০০, ১৫,০০০ এবং ১,০০০ গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেয়।[১৭৬]

ছাত্রলীগ- ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ প্রচেষ্টা

ছাত্র-যুবকদের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন -এর একটি যুক্ত বিবৃতি। প্রথম থেকেই এই দুই সংগঠনের একটি যৌথ কার্যক্রম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের একটি প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের থেকে এ ব্যাপারে কোনো সাড়া ছিল না, বরং কতকক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকান্ডই বাধাগ্রস্থ হওয়ার উপক্রম হয়।

এ সম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি নূরুল ইসলাম জানান, তিনি প্রথম থেকেই একটি যুক্ত প্রচেষ্টার জন্য কাজ করেছিলেন। এ জন্য তিনি একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন এই জন্য যে,ছাত্র-যুবকরা ঐক্যবদ্ধ আছে এবং এক সাথে লড়ছে এমন একটা ভাব গড়ে তোলা। এতে সারাদেশে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আশার সঞ্চার হতো। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতারা বিশেষ করে আ. স. ম. আবদুর রব ও নূরে আলম সিদ্দিকী এব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাজাহান সিরাজ ও শেখ শহীদুল ইসলামের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয়। বলা যায়, ছাত্রলীগের এই ২ জনের এবং ছাত্র ইউনিয়নের প্রচেস্টাতেই দেরীতে হলেও শেষ পযর্ন্ত ছাত্রলীগ- ছাত্রইউনিয়ন এক যুক্ত বিবৃতি দেয়।[১৭৭]

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়:

'There is nothing in the world more glorious than sacrificing our lives in the struggle for liberating our motherland.' [১৭৮]

---

১৭৬ হাসানউজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯
১৭৭ সাক্ষাৎকার : নূরুল ইসলাম (সভাপতি : বাংলাদেশ ছাত্রইউনিয়ন, ১৯৭১-৭২)
১৮৮ স্বাধীনতার দলিল, চতুর্থখন্ড, পৃষ্ঠা ৩০০

এতে স্বাক্ষর করেন, ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম,ডাকসুর সহসভাপতি আ. স. ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন।[১৭৯]

ছাত্রলীগ: মুজিব বাহিনী গঠন ও জটিলতা

মার্চের পয়লা তারিখ থেকেই পূর্ব বাংলায় দাবানলের মতো যে জঙ্গী ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ছাত্রলীগের মাধ্যমে, তার নেপথ্যে ছিলেন ছাত্রলীগের ৪জন প্রাক্তন নেতা। প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ ও ডাকসুর সমন্বয়ে গঠিত স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা ছিলেন আ. স. ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন ও শাজাহান সিরাজ। কিন্তু নেপথ্যে যে ৪চার জন প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা এ আন্দোলনকে পরিচালনা করছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ। মূলত ৮ নেতার যৌথ কমাণ্ডেই নির্বাচন পরবর্তী ছাত্রলীগের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল।

শুধু পরিচালিত নয়, ৭১ এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনকে এঁরা এমন একটা পযার্য়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে সেখান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের ফেরার কোনো পথ ছিল না। বস্তুত এই সময়টায় রাজনৈতিক গতিধারায় আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। সত্যি বলতে কি বঙ্গবন্ধুরও কোনো নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত তাদের উপর ছিল না। বরং তারাই আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করে দেয়।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ২৫ মার্চের অভ্যুত্থানের পর ছাত্রলীগের প্রাক্তন ও বর্তমান ৮নেতা কলকাতায় এসে হাজির হন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করা শুরু করে দেন। তবে অজ্ঞাত কারণে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন এ গ্রুপের কার্যক্রম থেকে বাদ পড়েন।[১৮০]

ভারতে এসে সেখানকার বিশেষ করে ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার Research and analysis wing (RAW)-এর থেকে ৭ নেতা বিশেষ সমাদর লাভ

১৭৯ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ৫৯৮-৬০০
১৮০ সাক্ষাৎকার : আবদুল কুদ্দুস মাখন (সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু (১৯৭০-৭২)

করেন। একথা লোকমুখে প্রচারিত ছিল যে, RAW-এর সাথে ৭নেতার এটা প্রথম যোগাযোগ ছিল না, অথবা RAW, ৭নেতার আসার খবর পূর্বেই জানতেন। গুজব ছিল যে, বঙ্গবন্ধু পূর্বাহ্নেই এদের আগমন সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন। বলা হয়েছিল, আওয়ামী লীগের আদর্শবান ছাত্র-যুবকদের বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করার দায়িত্ব থাকবে এই ৭নেতার উপর। এ কথার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি বঙ্গবন্ধু নিহত হয়ে যাওয়ায়। তবে ৭ নেতার প্রতি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার RAW-এর আদর ও সমাদর এবং কার্যপ্রণালী দেখে মনে হয়েছে এরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করতে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের নবগঠিত মন্ত্রিসভা ১৮ এপ্রিল এই ৭নেতাকে দেশের ভেতর থেকে ছাত্র ও যুবকর্মী সংগ্রহ করে আনার দায়িত্ব প্রদান করে। এটা ছিল বাংলাদেশের অস্থায়ী মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত। কিন্তু মন্ত্রিসভাকে এড়িয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম রিক্রুটিং-এর দায়িত্ব ছাড়াও একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন, ট্রেনিং ও পরিচালনার অধিকারও তাদের প্রদান করেন।

দেরাদুনের অদূরে চাকরাতায় RAW-এর তত্ত্বাবধানে তাদের বিশেষ ট্রেনিং জুন মাস থেকে শুরু হয়ে যায় এবং নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। এদের প্রথম দল যখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে বের হয়ে আসে তখন প্রথমে এদের নামকরণ হয় 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স', পরে 'মুজিব বাহিনী'। এবং এই প্রথম জানা গেল তারা আলাদা কমাণ্ডে চলবে, সশস্ত্রবাহিনী প্রধান কর্নেল ওসমানী, এমনকি বাংলাদেশ সরকারেরও কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবেনা এদের উপর। ৭নেতা হয়ে উঠলেন একটি আলাদা সশস্ত্র বাহিনীর স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত অধিনায়ক।[১৮১]

শুধু প্রশিক্ষণ নয়, এদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও টাকা-পয়সা, খাদ্যসহ যাবতীয় রসদের যোগানও দেওয়া হতো RAW -এরই মাধ্যমে। অন্য কেউ, এমন কি বাংলাদেশ সরকারও তাদের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলো না। তাদের যিনি মূল কর্তা হলেন, তিনি জেনারেল ওভান, ভারতের সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। তিব্বত নিয়ে চীনের সাথে ভারতের বিরোধের সময় তিব্বতী যুবকদের গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে সমাজতান্ত্রিক চীনে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম চালানোর জন্য জেনারেল ওভান বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছিলেন। ওভান সম্পর্কে আরেকটি সূত্রে জানা যায়, তিনি ভারতীয় মিজো ও নাগা বিদ্রোহীদের নাশকতামূলক তৎপরতা প্রতিরোধের দায়িত্বেও কিছু দিন কাজ করেন।[১৮২]

১৮১ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭,৮, ৭৭-৮০
১৮২ ঐ, পৃষ্ঠা ৭৯ এবং *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, পৃষ্ঠা ২২৯

মুজিব বাহিনীর ৭নেতার মধ্যে আবার মূল ২নেতার স্রোতধারা অব্যাহত ছিল। এদের একটি শেখ ফজলুল হক মণি, আরেকটি সিরাজুল আলম খানের। শেখ মণি ছিলেন সংগঠক, সিরাজুল আলম ছিলেন তাত্ত্বিক। এ দু'য়ের সমন্বয়ে মুজিববাহিনী একটি স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল সরকারের (তাজউদ্দিন সরকারের বিরোধী হিসেবে) অস্তিত্ব গড়ে তোলে।

মুজিববাহিনীর নেতারা দাবী করেছিলেন, ১. সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে একমাত্র তাঁরাই শেখ মুজিবের মনোনীত প্রতিনিধি ২. আওয়ামীলীগের প্রবীণ নেতারা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হলে বিকল্প নেতৃত্ব হবেন তারাই ৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনো কারণে দীর্ঘায়িত হলে এতে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে পারে, তাহলেও এদের মোকাবেলায় পাল্টা শক্তি হবে এই মুজিববাহিনী।[১৮৩]

তবে কারো কারো মতে, বাংলাদেশের ভবিষৎ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যও তাঁদের ছিল।[১৮৪]

এর ইঙ্গিত মুজিববাহিনী গঠনের শুরুতেই মিললো। তাঁরা শুরুতেই বাংলাদেশ সরকার গঠনের বিরোধিতা করেন। পরে সরকার গঠিত হয়ে গেলে তারা বাংলাদেশের নবগঠিত মন্ত্রিসভা ভেঙে তার পরিবর্তে মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট গঠনের দাবী তোলেন। এই সময় তাঁরা মুজিব বাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশ সরকারের পরিবর্তে শেখ মণির প্রতি আনুগত্যের শপথ করাতে থাকেন।[১৮৫]

কিছুদিন পর তাঁরা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। যে ৪০ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তুলেছিলেন তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণির আত্মীয় আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ আবদুর আজিজ।

এই সময় মুজিববাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর (এফ. এফ.-এর) অস্ত্র কেড়ে নেওয়া শুরু করে। এমনকি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বিভিন্ন যায়গায় মুক্তিবাহিনীর সাথে মুজিববাহিনীর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষও চলতে থাকে। যশোর ও আখাউড়া সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এই দুই বাহিনীর গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে।

১৮৩ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৯
১৮৪ এম. আর আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি* (ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৪) পৃষ্ঠা
১৮৫ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৯

অনেক যায়গা থেকে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্তিবাহিনীর আনুগত্য পরিবর্তন করে তাঁরা মুজিব বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য নিরন্তর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। বাংলাদেশ নৌ কমান্ডোদের সাথেও তাদের বিরূপ আচরণ করতে দেখা যায়।

কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ মোজাফফর সমর্থক ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্র-যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং নিতে তারা আপত্তি তোলে এবং বাধারও সৃষ্টি করে।[১৮৬]

সরকারের সমান্তরাল আরেকটি সরকার এভাবে চলতে থাকায় সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী। তিনি এপ্রিল মাসে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের সম্মতিতে শেখ ফজলুল হক মণি ও অন্যান্য মুজিববাহিনী নেতাদের কাছে রিক্রুটিং-এর জন্য যে অধিকারপত্র দিয়েছিলেন তা আগষ্ট মাসে প্রত্যাহার করে নেন। শুধু তা-ই নয়, কর্নেল ওসমানী হুমকি দেন, যদি মুজিববাহিনীকে শীঘ্রই তাঁর কমাণ্ডের অধীনে না দেওয়া হয় তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন।[১৮৭]

অন্যদিকে, মুজিববাহিনী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে হত্যা করারও একটা পরিকল্পনা করে এবং কমাণ্ডো প্রেরণ করে।[১৮৮]

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ উপায়ান্তর না দেখে বিষয়টি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছেও তোলেন। কারণ এর পূর্বে তাজউদ্দিন আহমদ মুজিববাহিনীর ব্যাপারে মীমাংসা করার জন্য তাঁর উপদেষ্টা মঈদুল হাসানকে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন। মঈদুল হাসান সেখানে ডি. পি. ধর, এমনকি র-এর প্রধান রামনাথ কাও-এর সাথেও আলাপ করেন। কিন্তু মুজিববাহিনীর স্বতন্ত্র কমাণ্ড ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য এই অপ্রীতিকর দ্বৈত কমাণ্ড বিষয়ে ভারত সরকারের নীরব ভূমিকায় বিফল মনোরথ হয়ে তিনি ফিরে আসেন।

২২ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ র-এর অনুপ্রাণিত মুজিববাহিনী সম্পর্কে এই প্রথম সরাসরি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মুজিব বাহিনী সমর্থক সৈয়দ নজরুলের সামনেই) অভিযোগ তোলায় ইন্দিরা গান্ধী, ডি.

---

১৮৬ মঈদুল হাসান পৃষ্ঠা ৮০ এবং *আমি বিজয় দেখেছি*, পৃষ্ঠা ১৭৩
১৮৭ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮০
১৮৮ ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৫

পি. ধরকে এ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩ পক্ষের--ভারত সরকার, বাংলাদেশ সরকার এবং মুজিববাহিনীর সামনাসামনি বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কলকাতায় ৩ পক্ষের বৈঠকে শেখ ফজলুল হক মণি অনুপস্থিত থাকেন। ভারত সরকারের পক্ষে মেজর জেনারেল বি. এন. সরকার ও বিগ্রেডিয়ার উজ্জল গুপ্ত এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তাজউদ্দিন আহমদ ও কর্নেল ওসমানী যোগদান করেন। মুজিববাহিনীর পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ। মুজিববাহিনীর সদস্যরা বৈঠকে দাবী করেন, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কথা বলার জন্য তাঁরাই একমাত্র অধিকার রাখেন। ফলে এ বৈঠকে আলোচনার অগ্রগতিতে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং মীমাংসার সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।[১৮৯]

এর মধ্যে আওয়ামী লীগের একাংশের সাথে মুজিববাহিনীর সংঘাত চরম আকারে পৌছে। ২১ ও ২৭ অক্টোবর কলকাতায় আওয়ামী লীগের কার্যকরী সভায় আবদুল মমিন তালুকদার, শামসুল হক, নুরুল হক, আবদুল মালেক উকিল, এম, এ হান্নান প্রমুখ নেতা প্রকাশ্যে মুজিব বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগ তোলেন এবং এ বাহিনীকে এক কমাণ্ডের অধীনে আনার জোর দাবী করেন।

অন্যদিকে, মুজিব বাহিনীতেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এখানে শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের ব্যক্তিত্বের লড়াই শুরু হয়। শুরু থেকেই এ দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করেছিল। কারণ মুজিব বাহিনীর সদস্যদের শপথনামায় সর্বাধিনায়ক হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে শেখ ফজলুল হক মণির প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে হতো। সিরাজুল আলম খান, শেখ মনির নামে আনুগত্যের বিরোধী ছিলেন।

১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরই মুজিববাহিনীর নেতৃবৃন্দ ঢাকায় পৌছতে সক্ষম হননি। কারণ সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ফজলুল হক মণির বাহিনীর অগ্রাভিযানের পথ নির্ধারণ করা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে। তাঁদের ঢাকায় পৌছতে পৌছতে ইতিহাস অনেকখানি দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল। ঢাকা তখন ভারতীয় বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এবং ভারতের এই সশস্ত্র বাহিনী ছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের প্রতি অনুগত।

---

১৮৯ মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা ১৫২

মুজিবাহিনীর 'গুরু' জেনারেল ওভান ২৬ ডিসেম্বর ঢাকা পৌঁছান। তাঁর আসার সাথে সাথে শেখ ফজলুল হক মণি এক বিবৃতিতে মুজিব বাহিনী নামে স্বতন্ত্র এক বাহিনীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।[১৯০]

প্রকৃতপক্ষে, এসময় মুজিববাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা না করে শেখ মনির আর উপায়ও ছিল না। কারণ পরে দেখা গেল, মুজিববাহিনীর সদস্যরা শেখ মণির প্রতি আনুগত্যের শপথ নিলেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত সিরাজুল আলম খানের অনুগত হয়ে পড়েছে। গত ৯মাসে শেখ ফজলুল হক মণি বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিভিন্ন দর কষাকষি, অনাস্থা, দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর অপর সতীর্থ সিরাজুল আলম খান সারা বাংলাদেশেই মুজিববাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে জড়িত ছিলেন। সিরাজুল আলমের মূল দুই রাজনৈতিক শিষ্য আ. স. ম রব ও শাজাহান সিরাজও একমাত্র মুজিববাহিনীর সাংগঠনিক দিক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

সুতরাং একমাত্র কুমিল্লা ছাড়া মূলগতভাবে সর্বক্ষেত্রেই মুজিববাহিনী সিরাজুল আলম খানের প্রভাবাধীনে চলতে থাকে। কুমিল্লা সিরাজুল আলম খান পেলেন না এই জন্য যে, এখানে মুজিববাহিনীর প্রভাবশালী নেতা ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন নেতৃত্ব করছিলেন। পূর্বাঞ্চল কমাণ্ডের অন্যতম সংগঠক হিসেবে জনাব মাখন কুমিল্লা ও তার আশপাশ অঞ্চলে মুজিববাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয় সাধন করেছিলেন। এবং তিনি ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে ছিলেন শেখ মণির লোক।[১৯১]

ফলে দু একটি অঞ্চল বাদে মুজিববাহিনী সর্বত্রই সিরাজুল আলম খানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এ অবস্থায় শেখ মণি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের মাত্র একমাসের ভেতরেই মুজিববাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

তবে বাংলাদেশ সরকার মুজিববাহিনীকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ৩ জানুয়ারী (১৯৭২) যখন জাতীয় মিলিশিয়া কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠিত হয় তখন সমস্ত দল থেকে ১জন করে সদস্য নেওয়া হলে আওয়ামী লীগের পরও মুজিববাহিনী থেকে দু'জন সদস্য নেওয়া হয়েছিল।

---

১৯০ মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা ২৫৮
১৯১ সাক্ষাৎকার : আবদুল কুদ্দুস মাখন

জাতীয় মিলিশিয়া কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ডটি ছিল নিম্নোক্ত :[১৯২]

১. প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ (সভাপতি)

২. এ, এইচ. এম. কামরুজ্জামান (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)

৩. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ)

৪. মনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস)

৫. অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (ন্যাপ)

৬. মণি সিংহ (কমিউনিস্ট পার্টি)

৭. তোফায়েল আহমেদ (মুজিববাহিনী)

৮. আবদুর রাজ্জাক (মুজিববাহিনী)

৯. রফিকউদ্দিন ভুইয়া (আওয়ামী লীগ)

১০. গাজী গোলাম মোস্তফা (আওয়ামী লীগ)

১১. ক্যাপ্টেন সুজাত আলী (আওয়ামী লীগ)

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজের রিপোর্টে সংগঠনের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ সংক্রান্ত এ বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয় :

'১৯৭১ সনের ১৬ই এপ্রিল তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনকে কেন্দ্র করে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। এই ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির পেছনে ... কতিপয় চেনামুখ অংশগ্রহণ করেছিল।...

ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গেরিলা পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধে রূপ দেয়ার জন্য যুব সমাজ তথা ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীরাই সবচাইতে বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। একমাত্র... সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী ছাড়া আর প্রায় সকলেই অস্ত্র শিক্ষা ও গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণ করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতাদের মধ্যে চারজনের শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ ও সিরাজুল আলম খান সমবায়ে 'মুজিব বাহিনী' গঠিত হয়।... বাংলাদেশ সরকার গঠনের শুরু হতে প্রায় স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ও মুজিববাহিনীর সঙ্গে কোন প্রকার সরাসরি যোগাযোগ ছিলনা। ভারত সরকারের সহযোগিতায় প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতাদের আপন চেষ্টায় 'মুজিববাহিনী' ট্রেনিং ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল'।[১৯৩]

---

১৯২ বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ জানুয়ারী ১৯৭১

১৯৩ শাজাহান সিরাজ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

মুজিব বাহিনী শেষ পর্যন্ত দু'প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী দু'নেতার দ্বন্দ্বে বিভক্ত হয়ে পড়লো। শেখ ফজলুল হক মণির অনুগতরা রক্ষীবাহিনীতে এবং সিরাজুল আলম খানের অনুগতরা জাসদে যোগদান করলো। একজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে বিষয়টি ধরা পড়েছে এমনভাবে:

'মুজিব বাহিনীর নেতারা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন এমন কোনো স্বপ্ন নিয়ে এই বাহিনী গঠন করেন নি নিশ্চয়ই, তাদেন লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিবের উত্তরসুরী হওয়া এবং দেশকে বামপন্থীদের হাত থেকে সম্পূর্ণ 'মুক্ত' করা। স্মরণীয় যে তারা, তাজউদ্দিন আহমদকে সহ্য করতে পারতেন না, তিনি বামঘেঁষা ছিলেন বলে। মুজিব বাহিনীর নেতাদের একাংশ মুজিববাদী হয়ে গেলেন খুব সহজেই, অন্য অংশ দেখলেন সুবিধা হচ্ছে না, প্রতিযোগিতায় পারছেন না, তাই তারা আওয়াজ তুললেন শ্রেণী সংগ্রামের।

আশা ছিল এই আওয়াজে তরুণরা সাড়া দেবে এবং শেখ মুজিব তাদের শক্তি দেখে তাদের দিকে ঝুঁকে পড়বেন। প্রথমটি ঘটলো ঠিকই, কিন্তু দ্বিতীয়টি ঘটলোনা। শেখ মুজিব তাদের দিকে ঝুঁকলেন না।

ওদিকে তারা নিজেরাও বন্দী হয়ে গেলেন নিজেদের রণধ্বনিতে, যা তারা কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন বামপন্থীদের কাছ থেকে। বেরিয়ে আসবেন যে পথ ছিল না। গলার আওয়াজ তাই আরো বাড়াতে হল ক্রমাগত। রাজনীতি বড়ই পরিহাস প্রিয়। বিপ্লব বিরোধীদের সে 'বিপ্লবী' করে দিল।'[১৯৪]

ছাত্র ইউনিয়ন: ট্রেনিং জটিলতা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে যুদ্ধ শুরু হলে হাজার হাজার ছাত্র-যুবক সীমান্তের ওপাড়ে ভারতে চলে যায় ট্রেনিং গ্রহণ করতে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ট্রেনিং গ্রহণ সহজতর ছিল না।

কারণ 'প্রথম দিকে রিক্রটিং সীমাবদ্ধ ছিল কেবল আওয়ামী লীগ দলীয় যুবকদের মধ্যে।... ট্রেনিং এর আগে পর্যন্ত তরুণদের একত্রিত রাখা এবং তাদের মনোবল ও দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় যুব শিবির ও অভ্যর্থনা

---

১৯৪ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *'সময় বহিয়া যায়'*, সংবাদ, ২৮ নভেম্বর ১৯৮৯

শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সব শিবিরে ভর্তি করার জন্য যে স্ক্রীনিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তদানুযায়ী 'বহির্দেশীয় আনুগত্য' (Extra teritorial Loyalty) থেকে যারা মুক্ত কেবল সে সব তরুণরাই আওয়ামী পরিষদ সদস্যদের দ্বারা সনাক্তকৃত হবার পর ভর্তির অনুমতি পেত। পাকিস্তানী রাজনৈতিক পুলিশের এই বহুল ব্যবহৃত শব্দ ধার করে ব্যবস্থা করা হয় যাতে এই সব শিবিরে বামপন্থী কর্মীদের প্রবেশের কোন সুযোগ না ঘটে।... এই মূলনীতি প্রণয়ন করেন যুব শিবির স্কীমের বোর্ড অব কন্ট্রোলের মেম্বার সেক্রেটারী মাহবুব আলম চাষী'।[১৯৫]

প্রকৃত প্রস্তাবে এর প্রধান শিকার হয় ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত ছাত্র-যুবকরা এবং ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মীরা। বামপন্থী কর্মীদের মধ্যে তারাই তখন বেশী মাত্রায় ট্রেনিং গ্রহণ করতে ভারতে আসে।

চীনপন্থী বামকর্মীরা তখনো এতোটা বেশী পরিমাণে ভারতে সমবেত হয় নি কারণ তাদের মধ্যে তখনও মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিতর্ক চলছিল। চীনের বিরোধী ভূমিকা এবং ভারতে আগ্রহ নিয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করতে কোনো কোনো উপদলের অনীহা তখনো দলগুলোতে বিদ্যমান ছিল। একদল দেশের অভ্যন্তর থেকেই প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

ফলে ট্রেনিং গ্রহণে বামপন্থীদের জটিলতার প্রথম ধকল সইতে হয় ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া পন্থী) যারা মস্কো সমর্থিত বলে রাজনৈতিক মহলে পরিচিত।

কিন্তু এই অবস্থাটির ক্রমবর্দ্ধমানহারে পরিবর্তিত হয় নানা কারণে। ভারতের একটি প্রধান রাজনৈতিক দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) ছিল তাদের রাজনৈতিক মিত্র। সিপিআই সেই সময়ে ইন্দিরা সরকারের সাথে সুসম্পর্কের কারণে ভারতের রাজনীতিতে ছিল প্রভাবশালী। ছাত্র ইউনিয়ন ও তার সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলোর ট্রেনিং গ্রহণে বাধা সৃষ্টির বিরুদ্ধে সিপিআই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।সিপিআই-র এই তৎপরতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত গড়ায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থনের ঝুঁকিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুস্পষ্ট পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন ছিল। ইন্দিরা গান্ধী তাই ছাত্র ইউনয়িনের ট্রেনিং এর বিষয়টা সবিশেষ গুরুত্ব দেন। এ ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা বামমনা ডি.পি ধর-এর ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

১৯৫ মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা ২৬

এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের একটি অংশের উদ্যোগে বামপন্থীদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই মুজিব বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছিল। শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন 'মুজিববাহিনী' প্রথম থেকে আবার প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের বিরোধিতা করতে থাকে। ফলে তাজউদ্দিন আহমদও মুজিব বাহিনীকে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বামপন্থী ছাত্র-যুবকদের ট্রেনিং দিতে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেন। এ সম্পর্কে ইন্দিরার উপদেষ্টা ডি.পি. ধরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"Objection to recruit left elements was lifted mainly to offset the influence of Mujib Bahini".[১৯৬]

ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি নূরুল ইসলাম জানান, তাদের ট্রেনিং গ্রহণে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বাধার সৃষ্টির পর সংকট নিরসনে তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এক পর্যায়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত ডি.পি. ধরের সাথেও ছাত্র ইউনিয়নের বৈঠক হয়। এ বৈঠকের ফলে দেশের অভ্যন্তরে মুজিব বাহিনীর সাথে 'সেমসাইড' দুর্ঘটনার আশঙ্কা দুরীভূত হয়।[১৯৭]

বস্তুত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের উদ্যোগ এবং উৎসাহের কারণেই বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও তার রাজনৈতিক মিত্র ন্যাপ (মোজাফফর) এবং কমিউনিস্ট পার্টি শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং -এর সুযোগ লাভে সমর্থ হয়। এই ব্যাপারে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মঈদুল হাসানেরও কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি।

মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বামপন্থীরা ট্রেনিং লাভে সমর্থ হওয়ায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম আন্তর্জাতিকভাবে 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম' তত্ত্বের মর্যাদা পায় বটে, কিন্তু এর ফলে তাজউদ্দিন আহমদকে পাল্টা অনাস্থা প্রস্তাবেরও সম্মুখিন হতে হয়।

ছাত্র ইউনিয়ন প্রথমে ছাত্রলীগের সমন্বয়ে একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিল। এ সম্পর্কে পরবর্তী কালে ছাত্র ইউনিয়নের রিপোর্টে বলা হয়:

'২৫শে মার্চ সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হলে জনগণ ও ছাত্র সমাজের বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি আমাদের সংগঠনের সদস্য-সদস্যরা স্বত:স্ফূর্তভাবে মুক্তি সংগ্রামে

১৯৬ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৫
১৯৭ সাক্ষাৎকার : নূরুল ইসলাম

যোগ দেয়। প্রথম দিকে আমাদের বিপুল সংখ্যক কর্মী মুক্তিবাহিনীতে ট্রেনিং নেয় এবং পাক বাহিনীর মোকাবেলায় এগিয়ে যায়। আমরা প্রথম থেকেই ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ,ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেই। কিন্তু এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি মিলিত ভাবে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলি। পরবর্তীতে আমরা সংগঠনের নিজস্ব নামেও বিশেষ গেরিলা বাহিনী ট্রেনিং ও গেরিলাযুদ্ধ সংগঠিত করি'।[১৯৮]

তবে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক পর পর প্রদত্ত এ রিপোর্টটিতে ছাত্রলীগ, মুজিববাহিনী ও আওয়ামী লীগের একটি অংশ কর্তৃক ছাত্র ইউনিয়নের দীর্ঘ ট্রেনিং-এ বাধা সৃষ্টির কথা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত ছিল। দীর্ঘ ২৪ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির কথা উল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে স্থান পায় মাত্র ৩ লাইনে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়;

'আমাদের ঐক্যের প্রচেষ্টা পুরাপরি সফল না হলেও জনগণের মধ্যে এবং বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামীদের মধ্যে ঐক্য বজায় ছিল। সহযোগী ছাত্রসংগঠনের কিছু কিছু সদস্য বিভেদাত্মক কার্যকলাপ চালায়। আমরা এর তীব্র নিন্দা করি'।[১৯৯]

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকৃত প্রতিবেদনে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত গেরিলা বাহিনীর সদস্য সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়। তাতে বলা হয়;

'আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় হাজার। এবং মুক্তিফৌজ ও গেরিলা বাহিনীতে আমাদের সংগঠনের মোট শক্তি ছিল প্রায় পনের হাজার'।[২০০]

প্রথমদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিদেশে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে আলো-আধারী ধারণা বিরাজ করছিল। চীন বাদে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল বিশ্বে তার ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির মাধ্যমে ছাত্র ইউনিয়ন এ সম্পর্কে বিশেষ প্রচার ও অন্যান্য গণসংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন (IUS) সোভিয়েত যুব

১৯৮ মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট (বাংলাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৭২) পৃষ্ঠা ৬
১৯৯ ঐ, পৃষ্ঠা ৭
২০০ ঐ, পৃষ্ঠা ৬

সংগঠন (কমসোমল), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নকে সহায়তা করে এবং সংহতি প্রকাশ করে। বিশেষ করে এই সংগঠনগুলির জন্যেই প্রগতিশীল বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ে উঠে।২০১

ছাত্র ইউনিয়ন মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে এক বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে দেশের সকল ঘটনাবলী তুলে ধরে আন্তর্জাতিক সংহতির আবেদন জানায়।২০২

১০ মে (১৯৭১) ছাত্র ইউনয়িন বিশ্বের সকল আন্তর্জাতিক যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলির প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন চেয়ে একটি চিঠি প্রেরণ করে। এতে খাদ্য, ঔষধ এবং অস্ত্র চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল।২০৩

বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে এ ছাড়া আর একমাত্র পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নই ভারতের মাটিতে ট্রেনিং –এর জন্য গমন করে। তারা ভাসানী ন্যাপ ও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটিতে যুক্ত থাকে এবং সীমিত সুযোগের মধ্যেও ট্রেনিং গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, ট্রেনিং গ্রহণে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের তুলনায় তারা আরো বেশী সংকটের সম্মুখিন হয়। তবে তারা পশ্চিম বাংলার সেই সময়ের অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী (সিপি.এম) –এর সহায়তা লাভ করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের সংগ্রামী ঐতিহ্য, সৌর্য-বীর্য এবং আত্মত্যাগ ছিল সব মিলিয়ে সমগ্র দুনিয়ার একটি বিরল ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক প্রস্তুতিতে এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত মাটি কামড়ে ছাত্ররা একে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়। একজন নিবন্ধকার মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি দিনে ছাত্রদের ভূমিকা ও ত্যাগকে স্মরণ করে লিখেছেন,

"Every day many students were arrested and driven to cantonments. At first they were asked different questions about the local Mukti Bahini and their supporters'২০৪

---

২০১ সাক্ষাৎকার : নূরুল ইসলাম
২০২ ঐ
২০৩ স্বাধীনতার দলিল, চতুর্থখন্ড, পৃষ্ঠা ৫০২
২০৪ D. K. Dhar. "*The Role of the Student Community in the War of Liberation*' Bangladesh Observer, 16 December, 1972

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৬ সালের পর থেকে আওয়ামী লীগে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করেন। ৬৯ সালে জেল থেকে মুক্তি লাভের পর বাংলার মানুষের কাছে তাঁর অবস্থান ছিল ঈর্ষনীয় পর্যায়ে। ৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের অভাবিত ফলাফলে তিনি পাকিস্তানের রাজনীতির প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় তার অবর্তমানে আওয়ামী লীগের পরবর্তী সারির বেশ কয়েকজন নেতা ছিলেন সমপর্যায়ের প্রতিভাসম্পন্ন। এর মধ্যে মেধা ও মননে এবং সাংগঠনিক দক্ষতায় তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন অন্য সকলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী। কিন্তু আওয়ামী লীগের রাজনীতির ধারার সাথে তিনি ছিলেন কিছুটা বেমানান। এ দিক থেকে বরং সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন আওয়ামী রাজনীতির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। অন্যদিকে, খোন্দকার মোশতাক পূর্ব থেকেই নিজেকে সিনিয়র ভাবতেন। ফলে সব সময়ই তিনি নিজেকে ভিন্নভাবে আওয়ামী লীগে গুছিয়ে রাখতেন।

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতারা যখন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে গেলেন তখন এ সব বিভিন্নমুখী স্রোতধারা ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল।

এপ্রিলের প্রথমেই আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করেন বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়, তাঁর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি। তিনি ৬২-র ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ছাত্র-যুবকদের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শেখ মণি যখন শুনলেন তাজউদ্দিন আহমেদ প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তখন তিনি হচ্ছেন আওয়ামী লীগের প্রথম ব্যক্তি যিনি এর প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন। মন্ত্রিসভা যাতে ঘটিত হতে না পারে তার জন্য তিনি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গ্রুপের নেতাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তাতে ইন্দিরার হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

কিন্তু মন্ত্রিসভা তারপরও গঠিত হয়ে যায়। তখন শেখ মণির নেতৃত্বাধীন উপদল দাবী করতে থাকেন, শেখ মুজিব একমাত্র তাদেরই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনার 'সোল এজেন্ট' নিয়োগ করেছেন। ফলে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে সরকারকে তাদের কমাণ্ডে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব তোলেন। এক পর্যায়ে এসব উদ্যোগ সফল না হওয়ায় তিনি কতিপয় সংসদ সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন

আহমদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও পেশ করেন। এই উপদলটি কর্নেল ওসমানীর বিরুদ্ধেও প্রচারণা শুরু করে। তারা দাবী করতে থাকে যে, ওসমানীর অক্ষমতার জন্যেই মুক্তিযুদ্ধ ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে।

তবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য আওয়ামী লীগে ক্ষতিকর উপদলের জন্ম দেয় খোন্দকার মোশতাকের নেতৃত্ব। এ উপদলের অন্যতম নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের এক অধিবেশনে প্রকাশ্যে তাজউদ্দিন আহমদের পদত্যাগ দাবী করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, এর চাইতে বরং দেশে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ অথবা আপোষ করা ভাল (এ উপদলের কার্যক্রম ভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত রয়েছে)।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন উপদল শেখ মণির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। তবে মোশতাকের নেতৃত্বাধীন উপদলের সাথেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল।

কামরুজ্জামান-ইউসুফ আলীর নেতৃত্বেও একটি উপদল এ সময় জন্ম নেয়। এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান ছিলেন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, কিন্তু তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। সেদিক থেকে কামরুজ্জামান, তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঈর্ষান্বিত ছিলেন। দলে এ নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় কলকাতায় ৬ জুলাই আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায়, নিখিল পাকিস্তান কার্যকরী কমিটি নয়, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটিকেই বৈধ নেতৃত্ব হিসেবে গ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২০৫]

তাজউদ্দিন আহমদ প্রথম থেকেই বামমনা সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার মতাদর্শী ছিলেন। এসত্ত্বেও তিনি রাজনৈতিক মনন ও মেধাসত্ত্বা এবং বুদ্ধিমত্তার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রধান উপদেষ্টা থাকায় আওয়ামী লীগে তাঁর প্রতিপত্তি এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পছন্দ না হলেও তাঁকে অস্বীকার করার উপায় আওয়ামী লীগে সম্ভব ছিল না।[২০৬]

---

২০৫ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫২

২০৬ বাংলাদেশের স্বাধীনতার কিছুদিন পর তাজউদ্দিন আহমদের বিরোধীরা বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর সম্পর্ককে শেষ পর্যন্ত নষ্ট করে দিতে সমর্থ হন। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাজউদ্দিন আহমদকে এ সকল উপদলগুলির বিরামহীন ধাক্কা ও অপপ্রচার সামলাতে হয়েছে। শুধু ঘরেই নয়, বাইরেও বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর কাছে আওয়ামী লীগের যে পরিচয় ছিল তার অবসানেও তাঁকে শ্রম নিয়োগ করতে হয়। আওয়ামী লীগ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মার্কিনপন্থী রাজনীতির ধারক ও বাহক বলে সমাজতন্ত্রী দেশে যে পরিচিতি লাভ করেছিল, তার দ্রুত অবসান ঘটানো ছিল কষ্টসাধ্য। যদি এমন একটি ঘটনা ঘটতো যে, সোভিয়েতপন্থী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (মোজাফফর) মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করতো, তাহলে কেবল ভারতের সমর্থনে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার দু:সাধ্যের বিষয়টি কেবল কষ্ট কল্পনা নয়, বাস্তব সত্যও হতো এটি।

কারণ একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার কারণেই পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে বাংলাদেশের 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ' নিয়ে আলোচিত হয়, এবং এর স্বপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক ও জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে আনা সম্ভব হয়। এটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটি ধ্রুব সত্য, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ কোনো পক্ষেরই নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। এর সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্ত হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের করুণ পরিণতির কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে একটি উপদলের মুক্তিযুক্ত বিরোধী তৎপরতা (অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে) এ সন্দেহের যথার্থতাকে প্রমাণ করে।[২০৭]

একটি ভিন্নসূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, আওয়ামী লীগে তাজউদ্দিন বিরোধিতার শুরু বহুপূর্ব থেকেই। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক ইকবাল হোসেন একটি গ্রন্থে জানিয়েছেন, উনসত্তরের পর ছাত্রলীগে সমাজতন্ত্র বিষয়ক যে কোর্স চালু হয়েছিল তা হটাৎ করেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাজউদ্দিন-এর সাথে যুক্ত না থাকলেও তাঁকে এ জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করা হয় এবং 'রাশিয়ান কমিউনিস্ট' বলে অভিযুক্ত করে তাঁর সাথে ছাত্রলীগের যোগাযোগ রাখা নিষিদ্ধ করা হয়।[২০৮]

---

২০৭ আগ্রহী পাঠক এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য মূলধারা '৭১-এর বিভিন্ন অধ্যায় দেখুন
২০৮ ইকবাল হোসেন, *নীলনকশা* (ঢাকা, জাতীয় পুনর্জাগরণ আন্দোলন, ১৯৭৬) পৃষ্ঠা ১৯

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যই শপথ করেছিলেন যে, দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কেউই ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে ফিরে যাবেন না, কোনো আরাম-আয়েস করবেন না। এ শপথ আওয়ামী লীগের নেতৃপর্যায়ে সকল স্তরে অনুসৃত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য, একমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ ছাড়া এ শপথ কেউ কার্যকরী করতে পারেন নি। তাজউদ্দিন আহমদের এই ত্যাগের সত্যতার স্বীকৃতি মিলে তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধকালীন একজন নেতার কাছ থেকে । তিনি বলেন, তাজউদ্দিন একদিন মাত্র পুরো যুদ্ধ সময়ে রণাঙ্গন থেকে ফিরে তাঁর মৃত্যু পথযাত্রী অসুস্থ সন্তানকে দেখতে গিয়েছিলেন।[২০৯]

পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছেও তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন সবচাইতে আপোষহীন চরিত্রের আওয়ামী লীগার :

"Mr. Tajuddin Ahmed, the Prime Minister of Bangladesh Goverment, recognised by India is more forthrightly secessionist in his out look than was sheikh Mujib.'[২১০]

শুধু মোশতাক আহমদই যে আওয়ামী লীগে প্রবল 'পাকিস্তান পন্থী' ছিলেন তা নয়, আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াও 'স্বাধীন বাংলার' চিন্তাকে সবসময়েই বিরোধিতা করেছেন (মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন)। ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে ঘরোয়া আলাপে অনেক সময়ই তিনি বলতেন,

'পাকিস্তানের জন্ম অগ্রহণযোগ্য। একে একটা জারজ সন্তানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু জারজ সন্তানকেও হত্যা করার অধিকার মা-বাবার কেন, কারোরই নেই'।[২১১]

মোশতাক চক্রের ষড়যন্ত্র

খোন্দকার মোশতাক আহমদ আওয়ামী লীগের জন্মকাল থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। জন্মের সময় তিনি আওয়ামী লীগের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক এবং শেখ মুজিব জুনিয়ার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালে

---

২০৯ সাক্ষাৎকার : ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম
২১০ The times, 16 December, 1971, মূলধারা '৭১ গ্রন্থে উদ্ধৃত
২১১ সাক্ষাৎকার : শামসুজ্জামান চৌধুরী

খোন্দকার মোশতাক যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হয়ে দাউদকান্দি এলাকা থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন এবং আওয়ামী লীগ ছেড়ে কৃষক শ্রমিক পার্টিতে (শেরে বাংলা ফজলুল হকের দলে) যোগদান করেন। ৫৪ সালের নির্বাচনে তাঁর যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন না পাওয়ার পেছনে শেখ মুজিবের হাত সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে গুজব ছিল।

১৯৬৪ সালে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী বলে পরিচিত খোন্দকার মোশতাক আবার আওয়ামী লীগে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এতোদিনে আওয়ামী লীগে একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী শেখ মুজিব তাঁকে ফিরিয়ে নেন। কিন্তু এবার খোন্দকার মোশতাকের আসন আওয়ামী লীগে চলে যায় ৫ নম্বরে। কারণ এর মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এ. এইচ. এম কামরুজ্জান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী প্রমুখ আওয়ামী লীগে প্রভাবশালী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাঁয় যাঁর স্থান করে নিয়েছেন। খোন্দকার মোশতাকের আর কিছু করার ছিল না। সিনিয়র হয়েও তাঁকে অপমানজনকভাবে আওয়ামী লীগের ৫ম স্থানের নেতা হিসেবেই যোগদান করতে হয়।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ৬দফা ঘোষণা করার পর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগে দু'টো ভাগের সৃষ্টি হয়। একটি ৬দফা পন্থী আওয়ামী লীগ, অন্যটি পি. ডি. এম পন্থী আওয়ামী লীগ (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভেমেন্ট নামক রাজনৈতিক জোটে অন্তর্ভুক্ত থাকার আগ্রহীদের নিয়ে আওয়ামী লীগের এ অংশ গড়ে উঠেছিল)। খোন্দকার মোশতাক পি.ডি.এম পন্থী অর্থাৎ ৬দফা বিরোধী আওয়ামী লীগে অবস্থান নেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের অল্প আগে খোন্দকার মোশতাক আবার ৬দফাপন্থী আওয়ামী লীগে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে ফিরে আসেন। খোন্দকার মোশতাকের এছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। কারণ পাকিস্তানের রাজনীতিতে তখন শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ও ভূমিকা আকাশচুম্বী।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এপ্রিল মাসে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলা পৌঁছে মক্কা শরীফ চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তাজউদ্দিন আহমদের কাছে তিনি প্রথম শুনতে পান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হবে, এতে ভারতেরও সহায়তা থাকবে এবং মোশতাক সম্ভাব্য মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। একথা শুনে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং মক্কা যাত্রা স্থগিত করেন।[২১২]

২১২ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েই খোন্দকার মোশতাক, মাহবুব আলম চাষীকে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে বেছে নেন এবং একের পর এক বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সাথে আপোষকরার ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকেন। এব্যাপারে তাঁরা গোপনে মার্কিন প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করতে থাকেন। এমনকি পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোশেফ ফারল্যাণ্ড, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাকের সাথে এক গোপন বৈঠকের আয়োজন পর্যন্ত সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার তাঁর স্মৃতিচারণে লেখেন:

'On september , Farland suggested to Yahya that we contact the Bangladesh "foreign minister'... we would tell him of yahya's willingness to engage in secret talks... such was yahya's quandry that he agreed, [২১৩]

অন্যত্র, কিসিঞ্জারের আরো স্বীকারোক্তি রয়েছে,

'we established contact with the Bangaldesh people in calcutta, and during August, september and october of this year, no fewer than eight such contacts took place. we approached President yahya khan three times in order to begin negotiations with the Bangladesh people in catcutta. The government of Pakistan accepted.'[২১৪]

ভেতরে ভেতর এতোকিছু ঘটে যাচ্ছিল, তার খবর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রায় কেউই রাখতেন না। এ সময় খোন্দকার মোশতাক আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। একই সময় তিনি 'স্বাধীনতা, নাকি শেখ মুজিবের মুক্তি' একটি প্রচারণাও শুরু করেন। কিছু দিন পর ইয়াহিয়া সরকার গোপনে শেখ মুজিবের বিচার শুরু করলে মোশতাক 'স্বাধীনতা, নাকি বঙ্গবন্ধুর প্রাণরক্ষা জরুরী' এ রকম আবেগময়ী প্রচারণা দ্বারা আওয়ামী লীগে দ্বীধা-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করে পাকিস্তানের সাথে আপোষ রক্ষার গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন।[২১৫]

---

২১৩ Henry A kissinger, The white house year, p. 870, মূলধারা গ্রন্থে উদ্ধৃত

২১৪ India Pakistan, Back ground briefing with Henry A. Kissinger on December, 1971, congressional Record, December, 9, 1971, P. 15735, পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত

২১৫ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৮

লরেন্স লিফশুলৎসও তাঁর গ্রন্থে মোশতাক চক্রের এ ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'একাত্তরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারে খোন্দকার মোশতাক ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। লোকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পরম অনুরক্ত। পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষীকে নিয়ে তিনি একাত্তরের শেষের দিকে 'পূর্ব পাকিস্তান সংকট-এর সমাধানের প্রশ্নে মার্কিন প্রস্তাব নিয়ে গোপনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন'।২১৬

অবশেষে বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেলে অক্টোবরে প্রবাসী সরকার মাহাবুব আলম চাষীকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় বটে, কিন্তু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুলের আনুকূল্যে খোন্দকার মোশতাক বেঁচে যান। কিন্তু পাকিস্তানের সাথে আপোষ করে মুক্তিযুদ্ধ গুটিয়ে ফেলে যুদ্ধ বিরতি কার্যকরী করতে তাঁদের প্রচেষ্টার বিরাম ছিলনা। তাঁরা যুদ্ধ বিরতি ও আপোষ রক্ষার পক্ষে প্রচারপত্র ছাপিয়ে গোপনে বিলিও করতে থাকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যখন ঠিক দ্বার প্রান্তে তখন মোশতাক-চাষী চক্র তাদের শেষ আঘাত হানে। শেখ মুজিবের মুক্তির বিনিময়ে একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সই করার জন্যে ১৩ ডিসেম্বর অব্যাহতিপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব মাহাবুব আলম চাষী একটা কাগজ নিয়ে আসেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাছে। কিন্তু পরিস্থিতি তখন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, সৈয়দ নজরুল স্বাক্ষর করলেও যুদ্ধ বিরতি সম্ভব হতো না। কারণ তখন বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমাণ্ড গঠিত হয়ে গেছে। যুদ্ধ বিরতি করতে হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীরও স্বাক্ষর প্রয়োজন হতো। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা তখন তাদের দখলে নিয়ে এসেছে এবং ঢাকার পতন ছিল মাত্র সময়ের ব্যাপার। এ ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনার ৩দিন পরেই, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পুরোপরি স্বাধীনতা লাভ করে শত্রুমুক্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মূল্যায়ন

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মস্কোপন্থী বলে পরিচিত), পাকিস্তানের ইতিহাসে (১৯৪৭-১৯৭১) বলা চলে পুরো সময়টিই ছিল বেআইনী ও নিষিদ্ধ। ফলে কমিউনিস্টরা পঞ্চাশের দশকে আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকে কাজ

---

২১৬ লরেন্স লিফশুলৎস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯

করে, পরে আওয়ামী লীগ থেকে বামপন্থীরা বেরিয়ে এসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলে কমিউনিস্টরা ন্যাপে অবস্থান করেই প্রকাশ্যে কাজ করতে থাকেন। এ দলের মূল শক্তি ছিল ছাত্ররা এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে তাদের সকল কর্মকাণ্ড ও শক্তি প্রদর্শিত হত।

তৎকালীন পাকিস্তানে ন্যাপ (ওয়ালী) ও পূর্ব পাকিস্তানে মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপের এ শাখা আওয়ামী লীগের পরই দ্বিতীয় দল হিসেবে স্বীকৃত ছিল। ন্যাপের এ শক্তির প্রধান উৎস ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তারা এতে পূর্ণশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করে। তাদের অংশ গ্রহণের ফলেই মুক্তিযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনের বিষয়টি নিশ্চয়তা লাভ করে।

পূর্ব পাকিস্তানে কর্মকাণ্ড পরিচালিত অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপগুলোর মতো তাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত মূল্যায়নটি তাই অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক মূল্যায়ন' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন পার্টি প্রস্তুত করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই, আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে। এতে বলা হয়:

'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তাই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ ধারণে উপাদান এই সংগ্রামে বর্তমানে আছে এবং এই সংগ্রামে সফলতা পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করিবে।

কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি মোহ থাকা হেতু আওয়ামী নেতৃত্ব জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন না বলিয়া জনগণের ভিতর ব্যাপক ও তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা জাগিয়া উঠিতেছে না এবং আমাদের সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিক দুর্বল থাকিয়া যাইতেছে।...

মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা আজ ... শত্রু সেনাদলকে অবিরত আঘাত করিয়া উহাদের সন্ত্রস্ত ও ভীত করিয়া রাখিতেছেন। কিন্তু মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকের ভিতরই সঠিক রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে যাহাতে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষতি হইবে।'...[২১৭]

---

২১৭ সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ, ১৫ আগস্ট, ১৯৭১

'এই যুদ্ধে 'বাঙলাদেশ স্বাধীন হইবে' শুধু এই প্রচারই যথেষ্ট নহে। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শ্রমিক' কৃষক, মধ্যবিত্ত ছাত্র, ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি প্রভৃতি শ্রেণীর জনগণের জীবনে যে পরিবর্তন আসিবে ও যে নূতন দিনের সূচনা হইবে, তাহা ব্যাখ্যামূলকভাবে জনগণকে বুঝাইতে হইবে।... জনগণের ভিতর দৃঢ় রাজনৈতিক ভিত্তি সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রাম চালানোর জন্য অপরিহার্য। তাই গ্রামে ও শহরে জনগণের ভিতর সশস্ত্র সংগ্রামের সেই রাজনৈতিক ভিত্তি গড়িয়া তোলার জন্য অবিরত রাজনৈতিক প্রচার ও সংগঠনের কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

এই ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হইবে। শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকরাই সবচেয়ে বিপ্লবী শক্তি এবং এই সংগ্রামে সবচেয়ে জঙ্গী শক্তি। এই শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা বজায় রাখিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহাদের আরও গভীরভাবে টানিয়া আনার জন্য বিশেষ ভাবে কর্মতৎপর হইতে হইবে। এই সংগ্রামে শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সত্যিকারের জনযুদ্ধে পরিণত করিতে হইবে।...

এই সংগ্রামে শত্রুর বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সংগ্রামী শক্তি যথা আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গ্রুপের সমবায়ে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত হইলে আমাদের সংগ্রাম আরও বহুগুণে শক্তিশালী হইবে ...

বস্তুত: আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জয়লাভের জন্য জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের অপরিহার্যতার কথা মনে রাখিয়া এই পথে যত বাধাই থাকুক না কেন – ঐ ফ্রন্ট গঠনের জন্য কমিউনিস্ট কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে'।[২১৮]

ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সমবায়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি একটি বড় ধরণের গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে এবং ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।[২১৯]

মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ ও মুক্তিযুদ্ধ

চীনের মাও সে তুং-এর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী দলগুলোর মধ্যে একটি অংশ মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কলকাতার সমন্বয় কমিটি গঠন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে

২১৮ *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক মূল্যায়ন*, (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ, ১৫, ২২, ও ২৯ আগস্ট ১৯৭১-এর সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত

২১৯ *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*, পূর্বোক্ত, P. 141-142.

(পরে এদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। কিন্তু এ ধারার প্রধান দল ছিল মোহাম্মদ তোয়াহা ও আব্দুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী- লেনিনবাদী)। মুক্তিযুদ্ধে এদের অবস্থান ও ভূমিকাকে একজন বিদেশী সাংবাদিক ও লেখক বলেছেন, 'জাতীয় প্রশ্নে এদের অবস্থান ছিল ভদ্রলোকের ভাষায় দ্বিধান্বিত, 'নিন্দুকের ভাষায় বলতে গেলে দালালীর সমতুল্য'।[২২০]

ষাটের দশকের শেষদিকে (১৯৬৮-৬৯) আব্দুল মতিন ও আলাউদ্দিন আহমদ-এর নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন। তাঁরা বলেন, কৃষক-শ্রমিকের মিলিত নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করা হলে এই অঞ্চলে সমাজতন্ত্রের প্রবেশের জন্য হবে সবচেয়ে অনুকূল পথ।

আব্দুল হক ও তোয়াহা এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, এতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্যমান সংঘাতকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর ফলে অভিন্ন শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশে শহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্বহারাদের সংগ্রাম বিপথে যাবে। হক-তোয়াহা আরো অভিযোগ করেন, মতিন-আলাউদ্দিনের দল শুধু মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তানকে বিভক্তিকরণে সাহায্য করবে মাত্র।[২২১]

কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে যখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পূর্ব বাংলার মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়লো তখন আব্দুল হক এবং মোহাম্মদ তোয়াহা দুজন বিভক্ত হয়ে পড়লেন। আব্দুল হক ভাবলেন, সমস্ত সংঘাতের সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু মাত্র পাকিস্তানের অখণ্ডতা ভাঙ্গার জন্য, আর এর পেছনে মূল নায়ক হচ্ছে সোভিয়েত সমর্থিত ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা। এই তত্ত্বের আলোকে আব্দুল হক মূল শত্রু হিসেবে ভারতকেই চিহ্নিত করেন এবং ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশ নিতে গিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মিত্র হিসেবে কাজ করেন ও মুক্তিযোদ্ধাদের খতমের লাইন গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল হকের এই তত্ত্বের সাথে একমত হতে পারেন নি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে চান, কিন্তু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন পুষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদেরও মেনে নিতে পারেন না। ফলে তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন।

---

২২০ লরেন্স লিফশুলৎস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩
২২১ *Radical Politices*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২-২৩

আব্দুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহা, এ দু'জনের সাথেই মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরা আক্রমণকারী সেনা অফিসারদের সাথে বৈঠক করেছেন এ গুজবের সত্যতার স্বীকৃতি পরে মেলে। একজন পাকিস্তানী সেনা অফিসারের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় হক - তোয়াহার সাথে তাদের নিয়মিত বৈঠক হতো।[২২২]

সর্বহারা পার্টির প্রচারপত্র

মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন, ৭ জুন, ১৯৭১ একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে। এতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিফ্রন্ট গঠন করার কথা বলা হয়। কিন্তু অন্যান্য সকল সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। প্রচারপত্রে বলা হয়:

'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিনিয়ত আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী, সকল দেশপ্রেমিক পার্টি ও জনসাধারণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক পথে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে আহ্বান জানায়। বরিশাল জেলার ঝালকাঠির মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমিকরা এ আহ্বানে সারা দেয়। তাদের অংশ গ্রহণ সহ অন্যানা দেশপ্রেমিকদের নিয়ে স্থানীয় ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করা হয়।

ঐক্যবদ্ধ মুক্তিবাহিনী তফসিলী হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার বৃহত্তম পেয়ারা বাগান, চুরিয়ানা, ডুমুরিয়া, ভীমরুলী এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে।

এই গেরিলা যুদ্ধের রূপ হয় প্রধানত জাতীয় শত্রু খতম করা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকশত জাতীয় শত্রু খতম করা হয়; পাক সামরিক দস্যুদের একখানি লঞ্চ আক্রমণ করা হয় এবং প্রায় তিরিশজন সামরিক দস্যুকে খতম করা হয়, দুজন পুলিশ সহ দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট একটি স্পীড বোট দখল করা হয়।...

পূর্ব বাংলার জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে মেতেছে।... তাদের উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলায়

---

২২২ লরেন্স লিফশুলৎস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

চার পাহাড়ের (সর্বহারা পার্টির এই চার পাহাড় হল, আমেরিকা-রাশিয়া, আমলা-তন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ --লেখক) শোষণ ও লুন্ঠন কায়েম করা এবং চীন বিরোধী, জনগণ ও কমিউনিস্ট বিরোধী, বাংলা-ভারত যৌথ সামরিক জোট স্থাপন করা'।

বামপন্থী রাজনীতির বিশ্লেষণ করে প্রচারপত্রে বলা হয়:

'গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে পূর্ব বাংলার জনগণের মহান জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজন।... এ সময়কার বিপ্লবী অনুশীলনে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক সাংগঠনিক সামরিক লাইনের সঠিকতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মনিসিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী, হক-তোয়াহা নয়া সংশোধনবাদী, দেবেন, মতিন ট্রটস্কি-চেবাদী, কাজী জাফর-রণো ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক চক্র, রাজনৈতিক, সামরিক ও তত্ত্বগত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছে।.....

এ কারণে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমাপ্ত করে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছে। ইহা পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি এবং এর পথ প্রদর্শক তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাওসেতুং চিন্তাধারা।... ইহার প্রয়োগের মাধ্যমেই পূর্ব বাঙলার বিপ্লব বাস্তবায়িত হবে'।২২৩

সর্বহারা পার্টি নিজস্ব দলিলের বাইরে এ দলের আরেকটু পূর্ব ইতিহাস জানা যায়। পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মাহফুজউল্লাহ এ সম্পর্কে জানান, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলের ৬৪৭ নম্বর কক্ষে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন (EBRCM) এর একটি 'নিউক্লিয়াস' গঠিত হয়। এর সদস্য ছিলেন ৭ জন, যথাক্রমে সিরাজ সিকদার, মাহবুবউল্লাহ, নূরুল হাসান, আবুল কাসেম ফজলুল হক, শামসুজ্জোহা মানিক, আমজাদ হোসেন (সাক্ষাৎদানকারী ছাত্রনেতা আরেকজনের নাম স্মরণে আনতে পারেননি-লেখক)।

এই সময় সিরাজ সিকদার, শিল্পপতি নজরুল ইসলামের ফার্মে এক চাকুরী নিয়ে টেকনাফ চলে যান। সেখানে তিনি লোকজন নিয়ে গেরিলা ট্রেনিং শুরু করেন।

২২৩ স্বাধীনতার দলিল, চতুর্থখন্ড, পৃষ্ঠা ৬২০-২৩

ফলে নিউক্লিয়াসের অন্য সদস্যরা সিরাজ সিকদারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কারণ সিরাজ সিকদার কারো সাথে আলাপ না করেই একক সিদ্ধান্তে এই তৎপরতা শুরু করেছিলেন।[২২৪]

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক যুদ্ধ ও রাষ্ট্রের রূপরেখা

৩০ নভেম্বর (১৯৭১) আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কংগ্রেসে মুক্তিযুদ্ধ ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি কর্মসূচী তৈরী করে। এতে উল্লেখ করা হয় :

'পূর্ববাংলার মেহনতি জনগণ ও তার সন্তানদের দ্বারাগঠিত মুক্তিবাহিনীই ছিল এ যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি। আগামী দিনেও স্বাধীন-সুখী-সমৃদ্ধশালী সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে একই নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।...

দেশী-বিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসন ও শোষণ থেকে জনগণকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে, নতুবা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বিঘোষিত শোষণহীন সমাজ হবে অর্থহীন।...

প্রথমত: দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে আনতে হবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা।... দ্বিতীয়ত সকল স্তরের মুক্তিফৌজকে নিয়ে একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, তৃতীয়ত দেশের অভ্যন্তরে ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় সমগ্র জাতির উন্নতি ও কল্যাণার্থে একটি সামগ্রিক কর্মসূচী প্রণয়ন করা।...

রাষ্ট্রের নাম হওয়া উচিত জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা।...

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে মূল বাধা রূপে তিনটি শত্রু.... পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এই তিরটি শত্রু হচ্ছে ১. উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ ২. দেশী সামন্তবাদ ৩. আমলাতান্ত্রিক শোষণ।.....

আনুপাতিক ভোট ব্যবস্থার মাধ্যমে... পার্লামেন্ট গঠন করবে।... নির্বাচনে ব্যক্তি প্রার্থী না হয়ে পার্টি প্রার্থী হবে। জনগণ পার্টিগুলোকে ভোট দেবে। যে পার্টি সারা

---

২২৪ সাক্ষাৎকার : মাহফুজউল্লাহ

দেশে যত ভোট পাবে তা একত্র করে সম্পূর্ণ প্রদত্ত ভোটের অনুপাতে পার্লামেন্টে ঐ পার্টির প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে। তারপর ঐ পার্টি নিদিষ্ট করে দেবে (অর্থাৎ পার্লামেন্টে প্রতিনিধি মনোনীত করে পাঠাবে)। এ ব্যবস্থার কোন ভোটারের ভোট অপ্রতিনিধিত্বমূলক থাকেনা।

ছাত্র ও শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে... ধর্মীয় শিক্ষার অবাধ সুযোগ-সুবিধার বাবস্থা থাকবে।...

বিপ্লবের তিন শত্রু বা তাদের সাহায্যকারী দলালদের কোনরূপ নাগরিক অধিকার বা ভোটাধিকার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবেনা। ঐ নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী শাসন বা প্রশাসন ব্যবস্থায় তাদের কোনরূপ অংশগহণ করতে দেওয়া হবে না'।[২২৫]

মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি: গঠন, দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সমস্যা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে যায় মাও সে তুং -এর চিন্তাধারার অনুসারী (চীনপন্থী বলে পরিচিত) রাজনৈতিক দল, কমিউনিস্ট গ্রুপ ও ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক গণসংগঠনগুলি। এ ধারার সংগঠনগুলির অধিকাংশই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ছিল দ্বিধাহীন। এদের মধ্যে অবশ্য কিছু সংখ্যক ছিল অতিউৎসাহী।

১৯৭০ সালের নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় থেকেই এ ধারার কোনো কোনো সংগঠনে স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে। নির্বাচন পরবর্তী সময়ের একেবারে গোড়া থেকেই একদল স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করেন। মাওলানা ভাসানী দু'একটা বিচ্ছিন্ন অখণ্ড পাকিস্তানের বক্তব্য দিলেও তিনিই মূলগতভাবে এ ধারার স্বাধীনতার বাণী গ্রামময় প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন। (পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে)।

কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর চীনপন্থা অনুসরণকারী (পাঠকের সুবিধার জন্য পরিচিত এ শব্দটি ব্যবহার করাই সঙ্গত হবে-লেখক) রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনসমূহ বিভিন্ন সংকট ও মতাদর্শগত বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তাদের এ সংকট শুরু হয়েছিল পয়লা মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই। এ সময়ে

---

২২৫ স্বাধীনতার দলিল, চতুর্থখন্ড, পৃষ্ঠা ৬০৫-১৫

সমগ্র বাংলাদেশ বিক্ষোভ-প্রতিবাদ-গর্জনে ভেঙে পড়লেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসাহী এ ধারার দল ও তাদের কর্মীরা মাঠে ছিল অনুপস্থিত (মাওলানা ভাসানীর তৎপরতা ছিল এর ব্যতিক্রম)। বিষয়টা আশ্চর্য হলেও সত্য যে, ৭১ - এর অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে চীনপন্থা অনুসরণকারী দল ও সংগঠন সমূহের কোনো তৎপরতার সংবাদ এ সময়ের সংবাদপত্রে নেই। (আন্দোলনে তাদের অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কিত রাশেদ খান মেনন ঐ মাহফুজ উল্লাহর ভাষ্য পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে)।

এই অবস্থায় ২৫ মার্চের পর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দলের সংগঠকরা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। কিন্তু চীনপন্থী দলগুলোর সকলেই ভারতে গেলেন না। কেউ কেউ ভারতকে পাকিস্তানের সমতুল্য মূল্যায়ন করে দেশের অভ্যন্তর থেকেই লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলেন (যেমন সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন, পরে দলটি পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি নামকরণ করে)। এ ধারার কেউ কেউ পাকিস্তান ভাঙার বিরোধিতা করতে থাকে (যেমন, আব্দুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এ মতের উল্লেখযোগ্য দল)। কোনো কোনো দল মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানী বাহিনী এই দুই দলের বিরুদ্ধেই আত্মঘাতী যুদ্ধে অংশ নেয় (মোহাম্মদ তোয়াহার গ্রুপ এ দুর্ভাগ্যজনক কাজটি করেন)।

কিন্তু এরপরও যারা ভারতে গিয়ে সমন্বিতভাবে সকল দলের সাথে জোট করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে যায় তাদের মধ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি (কাজী জাফর, রণো, মেনন নেতৃত্বাধীন), পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন শিকদারের নেতৃত্বাধীন), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার গ্রুপ, নাসিম আলীর নেতৃত্বাধীন), শ্রমিক কৃষক কর্মীসংঘ এবং গণসংগঠনের মধ্যে পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন অন্যতম।

কিন্তু এ ধারার জন্য প্রথম সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে। চীন শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেরই বিরোধিতাই করছিল না, উপরন্তু তারা নরপিশাচ ইয়াহিয়া সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছিল এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে গণহত্যা চালাচ্ছিল তা চীনের তৈরী রাইফেল দিয়েই। মাও সে তুং নিজে এ সব ভূমিকায় প্রকাশ্যে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী চীনপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির জন্য তা গভীর সংকট বয়ে আনে। বাংলাদেশের অন্য সকল রাজনৈতিক দল ও জনগণের কাছে চীনের মতোই তারাও প্রশ্নের সম্মুখীন ও সন্দেহের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকেন।

এর মধ্যে এক পর্যায়ে ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান (যাদু মিঞা) ভারত থেকে পালিয়ে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে স্বইচ্ছায় ধরা দেন। এবং পাকিস্তানের সাথে স্বাধীন বাংলা বিরোধী সমঝোতায় পৌছেন। যাদু মিঞা যখন ভারত থেকে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান ফিরে যান, তখন তিনি রংপুর-কুচবিহার সীমান্ত ব্যবহার করেন। এই সময় মাওলানা ভাসানী, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ও ভারত সরকারের সাথে আলাপ করে এই সীমান্তেই অবস্থান করছিলেন। অনেকে ভাসানীর এই সময়ে সীমান্তে অবস্থান এবং যাদু মিঞার এই সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ এই দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র থাকার কথায় সন্দেহ করে থাকেন।

অবশ্য কয়েকদিন পরেই ভাসানী ন্যাপের জরুরী সভায় কলকাতায় মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে 'রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে, দলের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান যাদু মিঞাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়'।[২২৬]

ভাসানী ন্যাপ নেতা আনোয়ার জাহিদ সম্পর্কেও কথা উঠেছিল। এই 'বিপ্লবী পুরুষ' ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে মুক্তিযুদ্ধের সময় 'মুরগী সাপ্লাই' করার ঠিকাদারী নিয়েছিলেন। তারপরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণেচ্ছুক চীনপন্থী রাজনৈতিক দলগগুলোকে এসব নানা ধরণের অপ্রীতিকর বিষয় মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। আন্তর্জাতিকভাবে চীনের গণবিরোধী ভূমিকার নিন্দা যেমন তাদের সহ্য করতে হচ্ছিল, অন্যদিকে দলের কতিপয় নেতা, সদস্য কিংবা গ্রুপের বিতর্কিত ভূমিকারও সমালোচনা, তাদেরই হজম করতে হচ্ছিল।

এমন একটা অবস্থায় পয়লা জুন (১৯৭১) ভারতের মাটিতে সমন্বিতভাবে নিজেদের ভূমিকাকে স্পষ্ট করতে ও মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে উপরিউক্ত দলগুলো গঠন করে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি। কমিটি গঠনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী (সিপি এম) দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২২৭]

অন্যদিক মশিউর রহমান যাদু মিয়া পাকিস্তানে ফিরে পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টোর সাথে একটি সমঝোতার পরিকল্পনা করতে থাকেন। এ খবর পাকিস্তানে জানাজানি হয়ে গেলে অনেকে পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান নেয়। যাদুমিঞা যে সত্যি একটি

২২৬ Statesman ,16 September, 1971
২২৭ সাক্ষাৎকার : রাশেদ খান মেনন ও নাসিম আলী

সমঝোতার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলেন তা এই সময়ের পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকার সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণিত হয়। জামায়াত নেতা গোলাম আযম এ রকম পরিকল্পনা তৈরী ও এর সাথে যাদুমিয়ার যুক্ত থাকার বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন।[২২৮]

মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠিত হওয়ার পর তারা একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এতে, আওয়ামী লীগ সহ স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গণসংগঠন, শ্রেণী সংগঠন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের কাছে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহবান জানায়। ঘোষণায় আরো বলা হয়,

'সমন্বয় কমিটি মনে করে যে, গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় ক্রমান্বয়ে শত্রুকে দুর্বল করিয়া এবং নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করিয়া দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।... কোনো বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নয়, নিজদের শক্তিতে বলীয়ান হইয়াই এই মুক্তিযুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইবে।... জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষকরাই হইবে গণফৌজের মূল শক্তি'।

ঘোষণায় করণীয় হিসেবে বলা হয়:

১. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে জনতার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের সমবায়ে সর্বদলীয় গণমুক্তি পরিষদ গঠন করতে হবে
২. যে সকল জোতদার জাতীয় মুক্তির সপক্ষে থাকবে তাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পূর্বতন শোষণ লাঘব করতে হবে
৩. জনগণের মধ্যে সামরিক দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রচারও চালাতে হবে
৪. যে সকল ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পাকিস্তানী হানাদারদের সহয়তা করবে তাদের পূর্ণ তদন্তের ভিত্তিতে খতম বা অন্য কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান করা হবে
৫. শহর অঞ্চলে শত্রুকে বিপর্যস্ত ও ব্যস্ত রাখার জন্য 'আঘাত করো ও সরিয়া পড়ো' নীতির ভিত্তিতে গেরিলা তৎপরতা চালাতে হবে'।[২২৯]

কিন্তু সমন্বয় কমিটি গঠনের কয়েকদিন পরেই এর উদ্দেশ্য ও তৎপরতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দেয়। অনেকে একে বিভদাত্মক ও বাংলাদেশ সরকারের সমান্তরাল একটি কার্যকলাপ বলে সন্দেহ করতে থাকে। বিশেষ করে সমন্বয় কমিটির ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতি আনুগত্যের কথা সন্নিবেশিত না থাকায় সন্দেহের মাত্রা আরো বাড়তে থাকে।

---

২২৮ দৈনিক সংগ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
২২৯ স্বাধীনতার দলিল, চতুর্থখন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৯-৫১৫

এ সংকট নিরসনে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি ১০ আগস্ট তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়:

'বাংলার স্বাধীনতা লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের অধিকার প্রত্যেকটি বাঙালী নাগরিকের আছে।... কে ছোট, কে বড়, কে ইয়াহিয়ার প্রদত্ত ১৯৭০ এর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, কি করে নাই, কে সেই নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছে বা পরাজিত হইয়াছে সে কথা বড় নয়, বড় হইল বাংলার স্বাধীনতা।...

সমন্বয় কমিটি কোন জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নয়। বরং সমন্বয় কমিটির তরফ হইতেই জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানান হইয়াছে।...

দ্বিতীয়ত সমন্বয় কমিটি দেশের অভ্যন্তরে জনগণকে সংগঠিত করিয়া যে গেরিলা বাহিনী গঠন ও গেরিলা যুদ্ধের প্রোগ্রাম উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহা কোনো ক্রমেই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী নয়।...

তৃতীয়ত: এই সমন্বয় কমিটি আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন রাজনৈতিক শক্তির বিরোধী কোন শক্তি নয়।'[২৩০]

২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দেবেন সিকদারের সভাপতিত্বে সমন্বয় কমিটির এক বৈঠকে আওয়ামী লীগের বিবদমান বিভিন্ন উপদলের একটি--এ এইচ. এম কামরুজ্জামান ও ইউসুফ আলীর নেতৃত্বের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এমনকি আওয়ামী লীগের এই বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে কাজ করার জন্য বিদ্রোহী গ্রুপের যে কোনো শর্ত মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।[২৩১]

এ সংবাদ আওয়ামী লীগের অপরাপর গ্রুপগুলির কাছে সমন্বয় কমিটি সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করে। যাদু মিয়ার পাকিস্তানীদের কাছে আত্মসমপর্ণের ঘটনা নিয়ে আওয়ামী লীগ এমনিতেই সমন্বয় কমিটির উপর ক্ষুব্ধ হয়ে আসছিল, তার উপর একটি বিতর্কিত উপদলের সাথে গোপন যোগাযোগ সমন্বয় কমিটির তৎপরতায় আরো বাধার সৃষ্টি হয়।

---

২৩০ স্বাধীনতার দলিল, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫৭৬-৭৮
২৩১ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০২

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি দলীয় সরকার গঠিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল প্রায় সব কয়টি প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল। ফলে এর চরিত্র ছিল জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের। কিন্তু জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের তত্ত্বগত যে রূপ তার ছায়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কার্যক্রমে ছিল অনুপস্থিত। ফলে জাতীয় ও আন্তর্জার্তিকভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নটি ছিল প্রশ্নের সম্মুখীন। এদিক থেকে বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত সংকটের মধ্যে ছিল।

বিষয়টা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা গঠনের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সরকারকে সমর্থনকারী সব কয়টি রাজনৈতিক দলের সমবায়ে একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১১ এপ্রিল প্রথম যে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধ ঘোষণা করে সকল রাজনৈতিক দলকে এতে অংশ নেওয়ারও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা বিশেষ করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাংলাদেশের, এই সংঘবদ্ধ জনযুদ্ধে সামিল হতে আহ্বান জানাচ্ছি'।২৩২

মে মাসে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালীদের সকল প্রতিরোধই প্রায় ভেঙে পড়ে। এই বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করেন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই দীর্ঘদিন চলতে পারে, সুতরাং আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী), কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসকে নিয়ে একটি মৈত্রী জোট এই যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তি লড়াইয়ের মর্যাদা দানে সক্ষম হবে।

কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতাদের এটা তিনি বুঝিয়ে উঠাতে সমর্থ হলেন না। ১৯৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ দলীয় সাফল্যে তখনো তাঁরা ছিল মোহাচ্ছন্ন। এছাড়া, তাজউদ্দিন আহমদও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না, বরং নানা রকম উপদলীয় কোন্দলে তিনি বারবার প্রায় বিপর্যস্ত হয়েই পরছিলেন।

---

২৩২ স্বাধীনতার দলিল, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের প্রধান ৩টি বামপন্থী দল, ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী) ও কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে কোনো প্রকার একটা ঐক্যফ্রন্ট গঠন করার মতো অপ্রিয় প্রস্তাব আওয়ামী লীগে তোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো, বিশেষ করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ এটা কিছুতেই মেনে নেবেন বলে মনে হয় নি। কারণ সৈয়দ নজরুল ছিলেন মুজিববাহিনী দ্বারা প্রভাবিত। ভারতের বুকে মুজিববাহিনী সকলের আগোচরে তৈরীই করা হল যাতে মুক্তিযুদ্ধ বামপন্থীদের হাতে চলে না যায়। আর খোন্দকার মোশতাক আহমদ ছিলেন আওয়ামী লীগের চরম ডানপন্থী গ্রুপের নেতা, আদর্শগত কারণেই বামদের নিয়ে কোনো ঐক্যমোর্চা তিনি সহ্য করতে রাজী ছিলেন না।

এছাড়া, অনেক অর্বাচীন মোসাহেবও মুক্তিযুদ্ধের সময় গজিয়ে ছিল যারা এ রকম ঐক্য মোর্চাকে মনে করতো, (ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী), কমিউনিস্ট পার্টি ঐক্যের অজুহাতে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। এম. আর আখতার মুকুল তাঁর গ্রন্থে একথা বারবার অত্যন্ত সচেতনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ দলগুলির অন্যতম 'স্ট্র্যাটেজী ছিল মুজিবনগর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভবিষ্যতে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার পথ প্রশস্ত করা'।[২৩৩]

কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য-সূত্র একথার প্রমাণ করে না। বরং মুক্তিযুদ্ধ থেকে দেশের বামপন্থী দলগুলোকে দূরে রাখার জন্যই একদল সুবিধাবাদী ও মোসাহেব শ্রেণীর লোক আওয়ামী লীগ নেতাদের বেষ্টন করেছিলেন। এছাড়া, আওয়ামী লীগে তো একদল বাম বিরোধী লোক পূর্ব থেকেই ছিল। এ সম্মিলত গ্রুপগুলি মিলে বামপন্থীদের সাথে কোনো প্রকার ঐক্যফ্রন্ট গড়ার বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছিল।

বামপন্থী দলগুলো রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকেই জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের দাবী তুলেছিলেন একথা তারা বারবার বলেছেন। চীনপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে যে 'সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়েছিল তাতে তাদের ঘোষণায় বলা হয়েছিল:

'আমরা মনে করি বাংলার সমগ্র জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ গণসংগঠন ও শ্রেণী সংগঠন এবং প্রতিটি নাগরিকের মহান কর্তব্য পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা রক্ষা করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের সুমহান ব্রত লইয়া এই মুক্তিযুদ্ধে অংশ

---

২৩৩ *আমি বিজয় দেখেছি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৭, ২০৬

গ্রহণ করা। কেননা এই যুদ্ধ সমগ্র জাতির যুদ্ধ, সমগ্র জনগণের যুদ্ধ।... তাই এই সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে আমরা আওয়ামী লীগ সহ স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গণসংগঠন, শ্রেণী সংগঠন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের কাছে এইরূপ একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানাইতেছি'।২৩৪

মস্কোপন্থী দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সাপ্তাহিক মুখপত্রে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের রাজনৈতিক আবশ্যিকতা নিয়ে অনেক নিবন্ধ প্রকাশ করে।

১৮ জুলাই-এ প্রকাশিত এ দলের সাপ্তাহিক 'মুক্তিযুদ্ধ' বলে:

'ইহা সত্য যে গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দল এবং আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের ভিতর প্রধান শক্তি।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী শক্তিগুলি যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ পাকিস্তানের গণবিরোধী শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করিয়াছেন ও ইহাদের হাতে বহু নিপীড়ন ভোগ করিয়াছেন, তাহারা কিছুই নয় বা সেই সাচ্চা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি হঠাৎ শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।...

একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বাঙলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির ভিতর শুধু আওয়ামী লীগের নয়, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ভাসানী ন্যাপেরও প্রভাব আছে। ছাত্র সমাজ বাঙলাদেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগ্রামে একটা গৌরবজনক ভূমিকা পালন করিয়াছে এবং এখন সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামেও তাহা করিতেছে। সেই ছাত্র সমাজের ভিতর কমিউনিস্টরা একটা বিশিষ্ট শক্তি'।২৩৫

এর মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান সমন্বয় কমিটি গঠনের সংবাদে ও জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার দাবীর প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন, 'মুক্তি ফ্রন্ট গঠনের কোন দরকার নাই, সকলে বাঙালাদেশ সরকার তথা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মানিয়া নিলেই সমস্যা চুকিয়া যায়।'২৩৬

২৩৪ স্বাধীনতার দলিল, চতুর্থখন্ড, পৃষ্ঠা ৫১০
২৩৫ সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ, ১৮ জুলাই ১৯৭১
২৩৬ ঐ, ২৬ জুলাই ১৯৭১

এর প্রক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মতাদর্শগত সংগ্রামকে আরো জোরদার করে। সাপ্তাহিক 'মুক্তিযুদ্ধ' এরপর এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, সামরিক দিক থেকেও ঐক্যজোটের প্রয়োজন রয়েছে। পত্রিকাটি উল্লেখ করে:

'মহান কর্তব্য সাধনের জন্যই শত্রুর বিরুদ্ধে বাঙালাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী ছোট-বড় সমস্ত দল ও গ্রুপের একতা জরুরী প্রয়োজন।... এই প্রসঙ্গে আমরা ভিয়েতনামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়াছি যে, সেখানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন দলই 'আমরা বড়দল' বা 'আমরা বেশি বিপ্লবী' বলিয়া বড়াই করিয়া জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনে অস্বীকার করে নাই।...

আমরা বালিয়াছি যে বাঙলাদেশে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সংগ্রামী শক্তির সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন দেশের জনগণের মনে সৃষ্টি করিবে নূতন প্রেরণা, সংগ্রাম হইবে অধিকতর সংগঠিত, দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তির সাহায্য ও সমর্থন পাইতে অধিকতর সুবিধা হইবে এবং এ গুলির ফলে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম এমন দুর্বার শক্তি অর্জন করিবে।...

দু:খের বিষয়, কোন কোন দলের নেতৃত্বের অহমিকা ও বুর্জোয়া সুলভ সংকীর্ণতার জন্য জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত হয় নাই।...

আজ আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রাম এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে যে, জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন আরো অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। গত পাঁচ মাসে আমাদের মুক্তিবাহিনী সংখ্যায় বাড়িয়াছে, তাঁহারা অধিকতর সংগঠিত হইয়াছেন এবং সামরিক দিক হইতে তাঁহারা আজ অধিকতর দক্ষ।...

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই গেরিলা দলগুলির ভিতর পারস্পরিক কোনও যোগাযোগ,কোন সমন্বয় প্রভৃতি নাই।... তা ছাড়া গেরিলা দলগুলি শুধু কোন একটি রাজনৈতিক পার্টির অনুগামী নহে।...

কিন্তু যেহেতু ঐসব দল ও গ্রুপ নিয়া কেন্দ্রীয়ভাবে কোন জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়িয়া উঠে নাই এবং বহুস্থানে গেরিলা দলগুলির ভিতর এলাকা ভিত্তিতেও যোগাযোগ সমন্বয় প্রভৃতি নাই, সেইহেতু এরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে যে, রাজনৈতিক মতভেদহেতু কোন কোন স্থানে বিভিন্ন গেরিলা দলের ভিতর পারস্পরিক গোলমাল বাধিতে পারে।...

তাই শুধু রাজনৈতিক প্রয়োজনেই নয়, বাস্তব সামরিক প্রয়োজনেও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন আজ অপরিহার্য'।২৩৭

আওয়ামী নেতৃত্বের একটি অংশ এই ঐক্য গঠনকে বাধাগ্রস্থ করলেও সরকার ও সরকারের বাইরের একটি অংশ এর প্রয়োজনীয়তা বামপন্থীদের থেকেও বেশী উপলব্ধি করছিলেন। খোদ সরকার প্রধান, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমর্থন লাভের আশায় এ রকম একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ে তোলার 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' কাজ করে যাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি ১০ আগষ্ট তাঁর বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি মইদুল হাসানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাককে বোঝানোর জন্য পাঠান।

মইদুল হাসান, খোন্দকার মোশতাককে একথা বোঝান যে, ভারতের উপর নির্ভরশীলতা কাটাতে হলে তার মস্কো যাওয়া প্রয়োজন। মস্কো যেতে হলে জাতীয় ঐক্য মোর্চা গঠনে তাঁর সায় থাকা উচিৎ । মোশতাক অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও যেতে চান। মইদুল হাসান তাঁকে বলেন, তাহলেও তাঁকে দিল্লী-মস্কো হয়েই সেখানে যেতে হবে। এর ফলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতাও কাটবে।

এর মধ্যে মুজিববাহিনী মে-জুন মাসের মধ্যেই দেশের ভেতরে গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী রাজনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম হবে বলে যে ধারণা পোষণ করেছিল তা কার্যত ব্যর্থ হয়। এমন একটা অবস্থায় দেশের ভিতরের রাজনৈতিক এই শূন্যতা পূরণ করার উদ্দেশ্যে বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের কর্মীদের আগ্রহ ও মনোভাব বিবেচনা করে এক বহুদলীয় কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে পরীক্ষামূলক ভাবে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী করার চেষ্টা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন রাজনৈতিক ভাবেই গ্রহণ করেন।

ঠিক এমন একটা অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর এই সৎ আকাঙ্ক্ষা সফল করে তুললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত ডি. পি ধর। তিনি ২৯ আগষ্ট কলকাতায় এসে বাংলাদেশের প্রবাসী মন্ত্রিসভা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমর্থক

---

২৩৭ সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

সমস্ত রাজনৈতিক দলকে একটি জাতীয় ফোরামে একত্রিত করার বিষয় ভারত সরকারের ইতিবাচক মনবোভাবের কথা জানিয়ে দিয়ে যান। এ ব্যাপারে তাঁর (ডি পি ধরের) মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের বামপন্থী দলসমূহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল শক্তি আওয়ামী লীগের সাথে এমনভাবে গ্রথিত করা, যাতে এই সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি অন্দোলনের রূপ পায়।

ঐক্য বিরোধী আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ডি. পি. ধর-এর এই প্রচেষ্টাকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনে ভারত সরকারের 'চাপ ও হস্তক্ষেপ' বলেই ধরে নেয়। এর ফলে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা জাতীয় ঐক্যজোট-উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন ঠিকই, কিন্তু তাকে কোন কার্যকরী সংগঠনের রূপ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বলা হয়, উপদেষ্টা পরিষদ শুধু 'পরামর্শ দান' করবে।

৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় কলকাতায় জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনের জন্য পাঁচটি দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে মিলিত হন। এতে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা এবং কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিংহ, ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর যোগ দেন। মাওলানা ভাসানী এ সময় দেরাদুন ছিলেন। এ দিন সকালেই তিনি কলকাতায় পৌছেন এবং সভায় যোগ দেন।

খোন্দকার মোশতাক উপদেষ্টা কমিটির কাঠামোর প্রস্তাব করেন। এতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোস্তাক ছাড়াও মন্ত্রিসভার দু'জন সদস্য আওয়ামী লীগের দু'জন সদস্য এবং বাদবাকী দলগুলো থেকে একজন করে সদস্য নেওয়ার কথা বলা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, এর আহবায়ক মনোনীত হন।২৩৮

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সমর্থক সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা' সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে। :

'সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির নিবিড় ও অটুট ঐক্য আরেকবার প্রমাণিত হল, তাতে বাংলাদেশের ভিতরে মুক্তি সংগ্রামীরা যেমন অনুপ্রাণিত হবেন, তেমনি বাইরে বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু দেশগুলোও উৎসাহী হবেন। বস্তুতঃ এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের গুরুত্ব এইখানেই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং উগ্র তত্ত্বসর্বস্বদের সুবিধানীতি ভেদনীতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল'।২৩৯

---

২৩৮ মুঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫-২৬, ৬৪-৬৫, ৭৫-৭৬, ৮৫-৮৮, ৮৯-৯৩
২৩৯ *সাপ্তাহিক জয়বাংলা*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'মুক্তিযুদ্ধ' এ ব্যাপারে সীমিত আশাবাদ ব্যক্ত করে বলে:

'আলোচ্য পরামর্শদাতা কমিটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সমার্থক বা সমপর্যায়ের না হইলেও ইহা নি:সন্দেহে সঠিক পথে এক ধাপ অগ্রগতি।...

দেশবাসী একান্তভাবে আশা করেন যে, এই কমিটি নিছক কাগজে-পত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সংগ্রামী শক্তিগুলির ঐক্য ও সমন্বয়ের কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হউক।... সংযুক্ত কমিটি গঠনের ফলেই সংগ্রামী শক্তিগুলির ঐক্যের সমস্যা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে কিংবা দলীয় সঙ্কীর্ণতা বা বিভেদ পন্থার শক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছে একথা মনে করা ভুল হইবে।'[২৪০]

১২ সেপ্টেম্বর মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্ব ন্যাপের কার্যকরী কমিটির সভায় উপদেষ্টা পরিষদ সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্যই প্রকাশ পায়। ন্যাপ বলে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে জনযুদ্ধ পরিচালনার জন্য কেবল উপদেষ্টা কমিটি গঠন যথেষ্ট নয়, তজ্জন্য প্রয়োজন হল সর্বদলীয় জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করা।[২৪১]

সীমিত ভূমিকার অধিকারী সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। তবুও আওয়ামী লীগের একটি অংশ তা মেনে নিতে পারলো না। উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ৩ দিন পূর্বেই ৫ সেপ্টেম্বর মুজিব বাহিনীর নেতা শেখ ফজলুল হক মণির নিকট-আত্মীয় আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ আবদুল আজীজের নেতৃত্বে ৪০ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য (সংসদ সদস্য) প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের প্রতি আনুষ্ঠানিক অনাস্থা প্রকাশ করে এবং কেবলমাত্র আওয়ামী লীগ সদস্যদের সমন্বয়ে 'জাতীয় মুক্তি পরিষদ' গঠনের দাবী জানায়।

১১ সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিষদ সদস্য এনায়েত হোসেন খানের সভাপতিত্বে এ গ্রুপের পরবর্তী সভায় তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদক এই উভয় পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য আওয়ামী লীগের হাই কমাণ্ডের প্রতি আহবান জানানো হয়। অক্টোবরে তাঁরা তাঁদের একটি সার্কুলার প্রচার করে, তাতে বলা হয়:

'...It is Awami League alone which is eligible and competant to conduct the present war...

---

২৪০ সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
২৪১ Statesman, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

We all are aware that taking NAP (2 groups), Communist Party and congress along with Awami league, a joint front infact has been formed naming a consultative committee for the liberation struggle against the avowed Policy of our leader SK. Mujibar Rahman.'[২৪২]

'রেজাকার' বাহিনী গঠন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইরত মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য মে মাসে (১৯৭১) খুলনায় প্রথম রেজাকার বাহিনী গঠিত হয়। খানজাহান আলী রোডে একটি আনসার ক্যাম্পে ৯৬ জন জামায়াত ইসলামী কর্মী সমন্বয়ে জামায়াত ইসলামের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সহকারী আমীর মাওলানা এ. কে. এম ইউসুফ প্রথম রেজাকার বাহিনী গঠন করেন।

তবে পরবর্তীতে জনগণের কাছে 'রেজাকার' শব্দটি 'রাজাকার' শব্দে পরিণত হয়। আরবী শব্দ 'রেজা', ও ফার্সী শব্দ 'কার' যুক্ত হয়ে 'রেজাকার' শব্দের উৎপত্তি হয়। এর অর্থ স্বেচ্ছায় যারা কাজ করে।[২৪৩] যারা জামায়াত ইসলামের সদস্য ছিল তারা রেজাকার বহিনীতে স্বইচ্ছায়ই নাম লিখিয়েছিল--বাংলাদেশের জন্মকে রুখে দেওয়ার জন্যে। তবে পরবর্তীকালে টিক্কা খানের সরকার সারা প্রদেশে বাধ্যতামূলকভাবেও অনেক চোর-ডাকাত ও অন্যান্য সমাজবিরোধীকে রেজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে।

রেজাকার বাহিনী কোরান ছুঁয়ে শপথ নিতো :

'I shall bear true alligience to the constitution of Pakistan as framed by law and shall defend Pakistan, if necessary, with my life.'[২৪৪]

শান্তি কমিটি গঠন

১০ এপ্রিল (১৯৭০) পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক নেতারা ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তানকে রক্ষা ও বাংলাদেশকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটি গঠন করে। খাজা খয়েরউদ্দিন কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত হন। গোলাম আযম, দুদু মিয়া, এ.

২৪২ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০১
২৪৩ দৈনিক সংগ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
২৪৪ স্বাধীনতার দলিল, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৪১

এস সোলায়মান সহ ১৪০ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিয়োজিত হন। সারাদেশেই এভাবে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। (বিস্তারিত দেখুন ২৬১ পৃষ্ঠায়)।

শান্তি কমিটি গঠনের পর ১৩ এপ্রিল এই কমিটি ঢাকায় এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন গোলাম আযম, খান এ সবুর, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা মাসুম, কবি বেনজীর আহমদ প্রমুখ।

মিছিলের সামনে জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান ও ইয়াহিয়া খানের বড় বড় আলোকচিত্র বহন করা হয়। এ সম্পর্কে পরদিন দৈনিক সংগ্রাম রিপোর্ট করে,

'পাক সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন ও ভারতীয় অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে মিছিলের জনতা বিক্ষোভে গর্জে উঠে। বুড়িগঙ্গার উত্তাল ঢেউ জাগিয়ে মিছিল অগ্রসর হয়। ইসলামপুরের পথ ধরে দু'পাশের জনতা বুকভরা আনন্দ নিয়ে মিছিলের দিকে তাকায়। .... মিছিলে জুতার মালা পরিহিতা ইন্দিরা গান্ধীর একটি কুশপুত্তলিকাও বহন করা হয়।'[২৪৫]

ইসলামপন্থী এসব রাজনৈতিক নেতা ও মাওলানা সাহেবরা যখন ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি নিয়ে মিছিল করছিলেন, তখন ঢাকার মানুষ ধর্মীয় বুলির আড়ালে এসব 'ইসলামপন্থীদের' শেষ পর্যন্ত মূর্তি বানানোর অধ:পতনে বিস্মিত হয়ে পড়ে। রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ইসলামী লোক ও মাওলানারাও শেষ পর্যন্ত কি করে জীবন্ত মানুষের মূর্তি গড়লেন তা ভেবে ধর্মপ্রাণ বাঙালী হতবাক হয়ে পড়ে।

আল শামস গঠিত

আল শামস সশস্ত্র গোষ্ঠিটি গড়ে উঠেছিল মূলত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত বিহারী ও অন্যান্য অবাঙালীদের নিয়ে। পাকিস্তান রক্ষার নামে বাঙালীদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য এদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে অবস্থিত বিহারী-অবাঙালী মুসলমানরা সেখানে কি ভয়াবহ তাণ্ডবের সৃষ্টি করে তার বর্ণনা দিয়েছেন তৎকালে মোহাম্মদপুর জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা লোকমান আহমদ আমীমী। তিনি বলেন:

২৪৫ দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

'সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে আমি মোহাম্মদপুর জামে মসজিদের পেশ ইমাম। ২৬ মার্চ শুক্রবার কার্ফ্যুর মধ্যে জুমআর নামায জামায়াতে আদায় করলাম। ফরয নামাজ শেষে সবেমাত্র সুন্নত নামায শেষ করেছি, হটাৎ কানে ভেসে আসল গুলীর আওয়াজ।....

দেখলাম, সলিমুল্লাহ সাহেবকে (রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সাদী মোহাম্মদের বাবা, বর্তমানে তাঁর নামেই মোহাম্মদপুরের শহীদ সলিমুল্লাহ সড়ক স্থাপিত হয়েছে-লেখক).... কপালে সাদা পট্টি বাঁধা একদল যুবক... চারতলার ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেয়ার চেস্টা করছে। ব্যর্থ হয়ে তাঁকে নিচের তলায় নামিয়ে উপুর্যপরি ছোরার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে। রক্তে ঘরের মেঝে রঙীন হয়ে যায়। একপর্যায়ে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় বাসার পশ্চিম দিকের রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। কাতরাতে কাতরাতে গভীর রাতে তিনি শহীদ হন।... সলিমুল্লাহ সাহেবের চাচা শ্বশুর মরহুম মওলানা সিরাজুল হক গুলীবিদ্ধ হয়ে অবর্ণনীয় দু:খ-দুর্দশা ভোগ করেন।...

এতক্ষণে কপালে সাদা পট্টি বাঁধা ছেলেরা সলিমুল্লাহ সাহেবের বাড়ীর আসবাবপত্র, কাপর চোপড় সবকিছু রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে থাকে এবং লুটপাট করতে থাকে। বাড়ীর প্রায় সব তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। দু'দিন পর্যন্ত আগুন জ্বলতে থাকে।....

২৭ মার্চ শনিবার ফজরের নামাযের জামায়াত শেষে ঘরে ফিরে এসে ওযিফা কালাম পড়া শেষ করেছি। দেখলাম, বেলা সাতটার সময়... কয়েক ব্যক্তি খাটিয়ায় করে কয়েকজনের লাশ দাফন করার জন্যে কবরস্থানে নিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে শহীদ সলিমুল্লাহর লাশও ছিল। আমি তাঁদের জানাযার নামায পড়বার কথা বললে ...বললেন; 'জয়বাংলা' শ্লোগান দানকারীরা ইসলাম থেকে খারিজ, এদের জানাযা হতে পারে না।'... ভাবলাম, এইসব উর্দুভাষীরা কত নিচে নেমে গেছে যে, 'জয়বাংলা' বলায় মুসলমানের জানাযা পড়তে দেবে না।.. সমাজ সেবক শহীদ সলিমুল্লাহর লাশ জানাযার নামায ছাড়াই সমাহিত করা হল। ছোট্ট একটি বাচ্চা, সুরুজ, সিদ্দিক, আনওয়ারা প্রমুখের লাশ একই গর্তে পুঁতে ফেলা হল।...

উপরোক্ত ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে একপর্যায়ে ছোরা মেরে আমাকে শেষ করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়।.... প্রত্যেকদিন বাদ ঈশা মুসল্লীগণ মসজিদে দো'আ ইউনুস পড়তেন। দো'আ করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। আমি নীরবে দো'আ করতাম।

তাই ওদের মনে সন্দেহ দেখা দিল আমি কি পাকিস্তানের জন্য দো'আ করি, নাকি বাংলাদেশের জন্যে? শেষ পর্যন্ত জনৈক অবাঙ্গালী আলেমের দ্বারা দো'আ করান হত।....

১৯৭১-এর ১৫ই জুন বাদ ঈশা তৎকালীন মসজিদ কমিটির তরফ থেকে মসজিদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির চরমপত্র পেলাম।.. পত্রবাহক বললেন: সত্তর জন অবাঙ্গালীর দস্তখত সম্বলিত একটি দরখাস্ত মসজিদ কমিটির সেক্রেটারীর নিকট পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'বাঙ্গালী ইমামের পিছনে নামায পড়তে তারা নারাজ'।[২৪৫ক]

'আল বদর ' বাহিনী গঠন

'রেজাকার বাহিনীর' মতোই 'আল বদর' বাহিনীও প্রথমে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত হয় নি। রেজাকার বাহিনী প্রথম তৈরী হয় খুলনাতে মে মাসে জামায়াতে ইসলামী নেতা মাওলানা এ. কে. এম ইউসুফের নেতৃত্বে।

আল বদর বাহিনী গঠিত হয় তারও আগে ২২ এপ্রিল (১৯৭১) জামালপুরে, ইসলামী ছাত্রসংঘের ময়মনসিংহ জেলার সভাপতি মুহম্মদ আশরাফ হোসাইনের নেতৃত্বে।

'আলবদর' সম্পর্কে দৈনিক সংগ্রাম লেখে:
'আলবদর একটি নাম। একটি বিস্ময়! আলবদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী, আল বদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী, আল বদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আলবদর সাক্ষাৎ আজরাইল'।[২৪৬]

পরে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘের হাইকমাণ্ড তাদের নেতা কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে পরীক্ষামূলকভাবে ময়মনসিংহে আল বদর বাহিনীর জন্য বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া শুরু করে।

২৪৫ক মাওলানা লোকমান আহমেদ আমীমী, *'একাত্তরের ডায়রী থেকে,'* দৈনিক খবর, ২৮ মার্চ ১৯৯০
২৪৬ দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

এরপরই সারাদেশের ইসলামী ছাত্রসংঘের শাখাগুলিকে আলবদর বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়। ঢাকা শহরে আলবদর বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন দুজন, মুহম্মদ শামসুল হক ও শওকত ইমরান। আবদুল হাই ফারুকী (রাজশাহী), সরদার আবদুস সালাম (ঢাকা জেলা), মতিউর রহমান খান (খুলনা), এনামুল হক মঞ্জু, মীর কাশেম আলী (চট্টগ্রাম), আবদুল জাকের মুহমদ আবু নাসের (চট্টগ্রাম), আশরাফ হোসেন (ময়মনসিংহ), মাজারুল ইসলাম (রাজশাহী জেলা) প্রমুখ আলবদর বাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান নিযুক্ত হন। ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় নেতা মতিউর রহমান নিজামী, প্রাদেশিক শাখার প্রধান আলী আহসান মো: মুজাহিদ, নূরুল ইসলাম প্রমুখকে নিয়ে হাইকমাণ্ড গঠিত হয়।

এছাড়া ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা প্রধানরা স্ব স্ব জেলার রেজাকার বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন পূর্বেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা ও ক্যাম্পাসের অন্যান্য মাঠে এবং মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রিনিং কলেজে রেজাকার ও আল বদরদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

সেপ্টেম্বর মাসে জামায়াত নেতা গোলাম আযম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবাদী ও পাকিস্তানপন্থী শিক্ষকদের সহায়তায় স্বাধীনতা পক্ষের প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবীদের হত্যার একটি তালিকা পাকিস্তানী সেনাপতি রাও ফরমান আলীর কাছে পেশ করেন।[২৪৭]

রেজাকার-আলবদর বাহিনী গঠনের পটভূমি ও পূর্ব প্রস্তুতি

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী সবচেয়ে সক্রিয় দল ছিল জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান। এ দলটি সচেতনভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুধু বিরোধিতা করে নি, তার সহযোগী সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ (পরবর্তীকালে এর নাম রাখা হয় ইসলামী ছাত্র শিবির)-কে নিয়ে পাকিস্তান রক্ষার জন্য তারা সশস্ত্র দল পর্যন্ত গড়ে তোলে।

সারাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে হত্যা, ধ্বংস, লুট ও নারী ধর্ষণকে এরা শুধু সমর্থন, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সহযোগিতাই করে নি, শিক্ষিত মাধ্যবিত্ত, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকদের এরাই নির্বিচারে ধরে ধরে এনে অমানুষিকভাবে হত্যা করে।

২৪৭ *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা, কে কোথায়,* (ঢাকা, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮) পৃষ্ঠা ১২৮

কিন্তু আদর্শবাদের নামে জামায়াতে ইসলাম ও ইসলামী ছাত্রসংঘের এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক আচরণের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এটা তাদের জন্য মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কারণ যে আদর্শবাদে এ দলটি সংগঠিত, তার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে এসব ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপ।

জামায়াতে ইসলামের জনক মাওলানা মওদুদী তাঁর প্রচারিত আদর্শে একথাই বারবার প্রকাশ করেছেন যে, অস্ত্র ছাড়া আদর্শ কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তিনি তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থেও এ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন যে, তলোয়ারের জোরেই ইসলাম দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'দাওয়াতে' নয়।

মাওলানা মওদুদীর 'আল-জেহাদ ফিল ইসলাম' গ্রন্থে আছে:

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তের বৎসর পর্যন্ত আরবকে ইসলামের আহ্বান জানাইতে থাকেন, মানুষকে বুঝাইবার জন্য যত প্রকার উৎকৃষ্ট পন্থা আছে তাহা অবলম্বন করেন, যুক্তি প্রমাণ দেন... তিনি সত্য প্রকাশ ও সংস্থাপনের জন্য উপযোগী কোন উপায় বাদ দেন নাই।... কিন্তু ওয়াজ নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহ্বায়ক তলোয়ার হাতে লইলেন... তিনি (সা:) তলোয়ার হাতে লওয়ার পর মানুষের মন হইতে ক্রমে ক্রমে পাপ ও দুস্কৃতির কালিমা দূর হইতে লাগিল'।[২৪৮]

ইসলাম সত্য, ন্যায় ও সাম্যের আদর্শ। বস্তুত: দেশে দেশে, কালে কালে ইসলাম সাধারণ মানুষের কাছে যে লালিত হয়েছে, তা ঐ আদর্শেরই গুণে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামের জনক মাওলানা মওদুদী ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে গুণ ব্যাখ্যা করেন তা মূলত পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী লেখকদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। মেজর আসবার্ণ তাঁর 'Islam under the Arab rule' গ্রন্থে বলেছেন:

'আবরবাসীরা এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তলোয়ার লইয়া ভস্মীভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর সমূহের পরিবারগুলির আর্ত চিৎকারের মধ্যে নিজেদের ধর্ম প্রচার করিয়াছে'।[২৪৯]

---

২৪৮ মওলানা আবু আলা মওদুদী, *আল জেহাদ ফিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮ (হযরত মিয়া তাহের আহমদ (আই:), *পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রের উত্তর*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৮৭) গ্রন্থে উদ্ধৃত

২৪৯ মেজর আসবান, *Islam under the Arab Rule* P. 46, *পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রের উত্তর*, পূর্বোক্ত- গ্রন্থে উদ্ধৃত)

এখানে মাওলানা মওদুদী ও আসবার্ণের বক্তব্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

১৯৫৩ সালেও মাওলানা মাওদুদী ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে হাজার হাজার পাকিস্তানী আহমদীয়া সম্প্রদায়কে হত্যা করেন। আইয়ুব খানের আমলে বিচারপতি মনীর ও বিচারপতি কায়ানীর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিচারকরা তাঁকে এজন্য ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। পরে মানবিক কারণে মওলানা মওদুদীকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু এ ক্ষতি পাকিস্তানে থেকেই যায়।

লেখক আসবার্ণ-এর সাথে মাওলানা মওদুদীর ব্যাখ্যার মিল খুব নিকটবর্তী। বস্তুত মওদুদী প্রচারিত ইসলামের ব্যাখ্যার আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বেশী ছিল ধর্মীয় উন্মদনা, অস্ত্র, সংহার এবং লড়াই করে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।

বস্তুত: মওদুদীবাদের এই আদর্শ যে-ই গ্রহণ করেছে সে-ই এই ধরণের ধর্মীয় উন্মাদনার শিকার হয়েছে। আজো এই মতবাদীদের মধ্যে লক্ষণীয় ব্যাপাটি হল এই যে, যে ইসলামের জন্য তারা এতো উন্মাদ, সেই ইসলামের অনুশাসন যে তারা খুব একটা মেনে চলেন এমনও নয়। তাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রসঙ্গে এই লেখককে একজন ইসলামী নেতা জানান:

'জামাত ও শিবির কর্মীদের সংগঠন পার্টি নিয়ে যেমন ছোটাছুটি, আন্তরিক দেখা যায়, নামাজ আদায়ে তেমন নিবিষ্ট মনে হয় না, এটা তারা একটি রুটিন ওয়ার্কের মতোই করে থাকে। দেখা যায়, অনেক কর্মী নামাজ আদায়ের নিয়ম নীতিই জানেন না, শুধু উঠ-বস করার মধ্য দিয়ে নামাজ হয় না। যে নামাজে আন্তরিক নয়, সে কিভাবে ইসলাম কায়েম করবে। এ অনেকটা এক প্রকার সমাজতন্ত্রীদের মতো, মুখে সাম্যের বুলি, কাজ-কর্মে অভিসন্ধি। তিনি বলেন, জামায়াত-শিবিরের কাজ-কর্মে দুনিয়াদারী বেশী, আধ্যাত্মিকতা কম'।২৫০

সুতরাং বাঙালীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানীদের যুদ্ধে, জামায়াতে ইসলামী নিজ দেশের মুসলমান বাঙালীদের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধরলো তা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এমনকি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরই যে তারা অস্ত্র নিয়ে নেমে পড়লো, তাও নয়, অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও এর আয়োজন তারা অনেক আগে থেকেই করছিল, এমনকি প্রকাশ্যেই তা তারা বলে বেড়াচ্ছিল।

---

২৫০ সাক্ষাৎকার : মাওলানা লোকমান আহমদ আমীমী, ইমাম, মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ

১৯৬৯ সালের ১৫ অক্টোবর করাচীতে মাওলানা আবু আলা মওদুদী হজ্বব্রত পালনে মক্কা যাওয়ার পূর্বে কর্মীদের এস সমাবেশে বলেন, 'সমাজতন্ত্রীদের মোকাবেলার জন্য জীবন উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে হবে।'

মাওলানা মওদুদী এ দিন শেখ মুজিব ও মাওলানা ভাসানীকে দেশে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য অভিযুক্ত করেন। তিনি তাঁদের (মুজিব-ভাসানীকে – লেখক) চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলেন, বল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে বিপ্লব করতে চাইলে জামাতও শক্তি দিয়ে শক্তির মোকাবেলা করবে।

তিনি বলেন, ওলামাদের ফতোয়া দেওয়া উচিৎ যে, সমাজতন্ত্র সমর্থক ও প্রচারকদের পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। তিনি জামাত কর্মীদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে সমাজতন্ত্র প্রচারক মসজিদের ইমামদের বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মাওলানা, সমাজতন্ত্র প্রচারক ওলামাদের পরিচালিত মাদ্রাসায় অর্থ সাহায্য দান বন্ধেরও আহ্বান জানান। তিনি কর্মীদের ধর্ম রক্ষার্থে জীবন কোরবানী দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ধর্ম রক্ষায় কোরবানী অপরিহার্য।

মাওলানা মওদুদী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাধীন সংবাদপত্র প্রকাশ করা উচিৎ এবং এখানে যাতে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি পিয়নও প্রবেশ অধিকার না পায় তার ব্যবস্থা করা উচিৎ।[২৫১]

১৯৭০ সালের দোসরা এপ্রিল মাওলানা মওদুদী লাহোরে সমাজতন্ত্রীদের প্রতিরোধ করার জন্য দেশের সর্বত্র স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর দল জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় বক্তৃতা করছিলেন।

মওদুদী বলেন, সমাজতন্ত্রীদের আন্দোলনের আগেই এসব বাহিনী ও সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, এরা জোর করে জমি ও কলকারখানা দখল করে নিতে চায়।[২৫২]

৫ জুন (১৯৭০) জামায়াতে ইসলামের মিত্র সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তানের মজলিস-এ-আমল-এর নেতা সাহেবজাদা ফয়জুল হাসান, সামজতন্ত্রীদের প্রতিরোধ

২৫১ দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ অক্টোবর, ১৯৬৯
২৫২ ঐ ৩ এপ্রিল ১৯৭০

করে দুই লাখ লোকের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার ঘোষণা দেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, পাশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যক মস্কোপন্থী এবং পূর্ব পাকিস্তান সমপরিমাণ চীনপন্থী রয়েছে।[২৫৩]

এসব বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, রেজাকার-আলবদর বাহিনী হটাৎ করেই ১৯৭১ সালে গঠিত হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, জামায়াতে ইসলামের এ বিষয়ে পূর্বেই মানসিক ও বৈষয়িক প্রস্তুতি চলছিল। ১৯৭১ সালে তা চূড়ান্ত ও চরম প্রকাশ ঘটে মাত্র।

সারাদেশে রাজাকার, আলবদর এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তাণ্ডব

২৫ মার্চ (১৯৭১) দিবাগত রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হত্যা, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, গ্রেফতার ইত্যাদির মাধ্যমে ঢাকা থেকে যে সন্ত্রাস অপারেশন শুরু করে তার তাণ্ডব অত্যন্ত দ্রুতই ছড়িয়ে দেওয়া হয় সারাদেশে, এমনকি গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এর বিভৎসতার নগ্নরূপ কার্যকরী করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের যেসব রাজনৈতিক সংগঠন সচেতনভাবে এ ব্যাপারে পাকিস্তানীদের সহায়তা করে তার মধ্যে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রসংঘ, মুসলিম লীগ, পি.ডি.পি. প্রভৃতি দল ও তাদের প্রতিষ্ঠিত রেজাকার, আলবদর এবং শান্তি কমিটি ছিল অন্যতম।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শাখারী বাজার, তাঁতীবাজার, ইপি আর (বি ডি আর) সদরদপ্তর এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। তবে পরবর্তীতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন খান সেনাদের তাণ্ডবলীলার অব্যাহত কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

রাজারবাগ পুলিশ লাইন: সভ্যতার পরাজয়

১৫ মে (১৯৭১) থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশদের জমায়েত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী এই পুলিশরা আসার পর থেকেই ঢাকা শহরের রাস্তা-ঘাট, বাসগৃহে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। প্রতিদিন সারাবেলা চোখ

২৫৩ দৈনিক পাকিস্তান, ৫ জুন ১৯৭০

বেঁধে বাঙালী যুবকদের ধরে এনে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে জমায়েত করা হতো এবং সন্ধ্যার পর এ সব যুবকদের মিলিটারী ট্রাকে করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে হত্যা করা হতো। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের এবং ঢাকার বিভিন্ন এলাকার বালিকা যুবতী মেয়ে ও সুন্দরী রমণীদের ধরে আনা হতো নিয়মিত। এদের নিয়ে যখন মিলিটারী জীপ ও ট্রাক পৌঁছতো তখন পুলিশ লাইনে হৈ চৈ পড়ে যেত। পাঞ্জাবী, বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ জীভ চাটতে চাটতে ট্রাকের সম্মুখে এসে মেয়েদের টেনে হেচড়িয়ে নামিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ দেহের পোশাক পরিচ্ছদ কাপড়-চোপড় খুলে তাদের সম্পূর্ণভাবে উলঙ্গ করে মাটিতে ফেলে কুকুরের মতো ধর্ষণ করতো।

বহু মেয়েকে পুলিশ লাইনের হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং এর উপর-তলায় রুমে নিয়ে যাওয়া হতো, যেখানটা পূরণ হয়ে গেলে অবশিষ্ট মেয়েদের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। অনেক মেয়ের হাতে থাকতো বই, অনেক সুন্দরী মেয়ের গায়ে অলঙ্কার, অঝোরে কাঁদতে থাকতো তারা।

উন্মত্ত নরপিশাচ পাকিস্তানী সেনাদল এসব ধরে আনা মেয়েদের পাগলের মতো ধর্ষণ করতো, আর ধারাল দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিতো। ওদের উদ্ধত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কঁচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসতো, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমড়ের মাংস ওদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে যেতো।

যে সকল বাঙালী যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করতো, তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবী সেনারা ওদের চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছো মেরে টেনে ছিড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারাল ছুড়ি ঢুকিয়ে পবিত্র দেহটি ছিন্ন ভিন্ন করে দিতো। অনেক পশু সেনা ছোট ছোট বালিকাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজনে দুপা দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিড়ে ফেলে দিত।

উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসাররাও মদ খেয়ে হিংস্র, বাঘের মতো দুই হাত নাচাতে নাচাতে উলঙ্গ বালিকা, যুবতী মেয়েদের পর্যায় ক্রমে ধর্ষণ করতো। কাউকে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেওয়া হয় নি, উপুর্যপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছে, পরের দিন এসকল মেয়ের লাশ অন্যান্য জীবিত মেয়েদের সামনে ছুরি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিতো।

কখনো কখনো উলঙ্গ মেয়েদের গরুর মতো লাথি মারতে মারতে, পশুর মতো পিটাতে পিটাতে উপরে হেডকোয়ার্টারের দোতলা, তেতলা ও চার তলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। পাঞ্জাবী সেনারা যখন চলে যেতো, তখন মেয়েদের লাথি মেরে আবার কামড়ার ভেতর ঢুকিয়ে তালাবদ্ধ করে দিত। এরপর বহু যুবতী মেয়েকে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দার মোটা লোহার তারের উপর চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়, প্রতিদিন পাঞ্জাবীরা সেখানে যাতায়াত করতো এবং সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের কেউ এসে তাদের উলঙ্গ দেহের কোমরের মাংস বেটন দিয়ে উন্মত্তভাবে আঘাত করতে থাকতো, কেউ তাদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে যেত, কেউ হাসতে হাসতে তাদের যোনীপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ উপভোগ করতো, কেউ ধারালো চাকু দিয়ে কোনো যুবতীর পেছনের মাংস আস্তে আস্তে কেটে কেটে আনন্দ করতো, কেউ কেউ উচুঁ চেয়ারে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত বক্ষ মেয়েদের স্তনে মুখ লাগিয়ে ধারাল দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্টহাসি করতো। কোনো মেয়ে এসব অত্যাচারে কোনো প্রকার চিৎকার করার চেষ্টা করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হতো।

বিরামহীন এলোপাথারী প্রহারের ফলে অনেক মেয়েই তাদের সামনের দাঁত হারিয়েছিল। অনেক মেয়ের আঙুল, হাতের তালু ভেঙে, থেতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অবিরাম ধর্ষণের ফলে অনেকে ঝুলন্ত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে। ক্ষত-বিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যেত এবং আবার নতুন করে ধরে আনা মেয়েদের উপর অনুরূপ পৈশাচিক নির্যাতন চালতে থাকতো।[২৫৪]

ঢাকা শহরের এই করুণ চিত্র সারাদেশেই মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন ৯ মাস বিরামহীন গতিতে চলতে থাকে। ঘরে ঘরে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং এখানে তাদের সহযোগী মিত্ররা এ ধরণের অপকর্মকে, 'গণিমতের মাল' বলে অভিষিক্ত করে ইসলামের পবিত্রতাকে ধ্বংস করে। এর সামান্য কয়েকটি নমুনা পড়লে দেখা যাবে কতো বিচিত্র ও বিভিন্ন কায়দায় সারাদেশটিকে এই সময় লুটেরা হায়েনারা 'জাহান্নাম' বানিয়ে ছেড়েছিল।

---

২৫৪ সাক্ষাৎকার : আবদুল কুদ্দুস মিয়া (রিজার্ভ ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, রাজারবাগ), সুবেদার খলিলুর রহমান (রাজারবাগ পুলিশ লাইন), মোহাম্মদ সাবেদুজ্জামান (সাবইন্সপেক্টর অব পুলিশ রমনা), মিসেস রাবেয়া খাতুন (সুইপার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন), স্বাধীনতার দলিল, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩-৫৬

একজন নির্যাতীতা দোলজান বিবি (বাগমারা, রাজশাহী) জানায়, 'রমজান মাসে রোজা ছিলাম। এসময় একদিন বহু সংখ্যক পাকিস্তানী বর্বর সৈন্য আসে এবং কোনো রকম পালানোর সুয়োগ না দিয়েই তারা আমার ঘরে ঢোকে এবং ধরে পাশবিক অত্যাচার শুরু করে।'

একই গ্রামের সোনাভান খাতুন বলে, 'রমজানের ১২/১৪ দিনের দিনে একদিন দুপুরে দুজন মিলিটারী যখন গ্রামের মধ্যে আসে তখন গ্রামের আর সকলের সাথে আমিও পালাতে চেষ্টা করি, কিন্তু বর্বর পশুরা আমাকে পথের মাঝখান থেকে তাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে আসে। আমার উপর দুজন নরপশু অমানুষিক হৃদয়হীন ভাবে পাশবিক নির্যাতন করে'।২৫৫

নাজিরউদ্দিন মিশ্রা (নাজিরপুর, পাবনা) জানান,'শান্তি কমিটির লোকদের কুমন্ত্রণা ও সরবরাহকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানী সৈন্যরা নাজিরপুর গ্রামটি অপারেশন করে। প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ জন পাক সৈন্য রাজাকার-আলবদর বাহিনীর সমন্বয়ে ভোরের দিকে সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলে। ইতপূর্বে আরো দুবার এই একই গ্রাম মিলিটারীরা অপারেশন করে। লোকজন ঘুমিয়ে ছিল। যারা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান এবং মুক্তিবাহিনী বলে সন্দেহ হয় তাদের ধরে নিয়ে একটি নালার কাছে গলাকেটে ফেলে দেয়। এমনি করে তারা এখানে ৫৭ জন লোককে হত্যা করে। এই সময় তারা সকলে মিলে বাড়ী-ঘর লুটপাট করে। প্রায় ৫০০ ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে'।২৫৬

মোছাম্মৎ এসবাহাতুন (নতুন ভাঙ্গারাড়ী, সিরাজগঞ্জ) বলে, '১৯৭১ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানী সেনারা আমাদের গ্রামে ঢুকে আমাদের বাড়ীতেও আসে। তারা আমার বাবা ও ভাইকে রাইফেল দিয়ে ধরে রাখে এবং তাদের সামনে আমার উপর একের পর এক পাশবিক অত্যাচার করে। দুইজন মিলে প্রায় ১ ঘন্টা আমার উপর অত্যাচার করার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই'।২৫৭

রহিমা খাতুন (আউনদাউন, বাগবাটি, সিরাজগঞ্জ) বর্ণনা করে, '৭১ সালের আগস্ট মাসে মিলিটারীরা আমাদের ঘর আক্রমণ করে। তারা আমার শিশু সন্তানকে

২৫৫ স্বাধীনতার দলিল, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৬
২৫৬ ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৯
২৫৭ ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৮

আছাড় দিয়ে হত্যা করে। তারপর একে একে ৭ জন আমার উপর বলৎকার করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরে দেখি আমার ৩জন জা'কেও ওরা ধরে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের কোনো খোঁজ আমরা পাই নি'।২৫৮

মৌলভী বছিরউদ্দিন আহমদ (বড় মনোহারা, উল্লাপাড়া, পাবনা) বলেন, 'উল্লাপাড়া রেলষ্টেশনে জুলাই মাসে একদিন দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় ১ জন রাজাকার ও ৭-৮ জন পাকিস্তানী এসে আমাকে গ্রেফতার করে। বর্বররা আমাকে পেছন থেকে বেঁধে দুই পা উল্টো করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয় এবং চাবুক দ্বারা প্রহার করে। পরে সিরাজগঞ্জ নিয়ে আমার দাড়ি কেটে দেয় এবং নামাজ পড়তে দিত না। সিমেন্টের বস্তা টানাতো। আমার মুখে চুন-কালি মেখে রাজাকাররা শহরে ঘুরাতো। ১৫ দিন পরে একজন মেজর এসে বললেন, শুনেছি, আপনি 'দরবেশ' লোক। না জেনে আপনাকে মারধোর করেছি বলে দুঃখিত'।২৫৯

রেবা রাণী নাথ (ডুমুরিয়া, খুলনা) জানায়, 'জুনমাসের শেষের দিকে আমরা পাথরঘাটা হয়ে ভারতে যাচ্ছিলাম। দলে ছিল প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার লোক। হটাৎ করে আমরা ৩-৪গাড়ী মিলিটারীর সামনে পড়ে যাই। পাক সেনাদের তাৎক্ষণিক গুলিতে বহুলোক তখনি প্রাণ হারায়। যারা বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে যুবকদের ধরে পরে লাইন করে গুলি করে। শুধু মেয়েদের তারা নিয়ে যায়। ক্যাম্প নিয়ে আরো ৫০-৬০ জন মেয়ে দেখলাম। এদের মধ্যে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রীও ছিল। বিভিন্নভাবে তারা তাদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। একজনের সাথে অপরজনের কথা বলতে দিত না। আমাদের গায়ে ব্লাউজ রাখতে দিত না। সবাইকে কেবল শাড়ী পরিয়ে রাখতো।

পাকসেনারা এরপর আমাদের রাজাকারের হাতে তুলে দেয়। প্রত্যেক রাজাকার একজন করে মেয়ে নিয়ে যায়। আমাকেও এক রাজাকার তার বাড়ীতে নিয়ে যায়। ৩-৪ দিন রাজাকারটি আমার উপর অত্যাচার চালায়। রাজাকারের বউ এবং মা নিষেধ করলে তাদের গুলী করতে যেত। এই মা ও বউয়ের সহায়তায় অবশেষে আমি ভারতে পালিয়ে যাই। আমি অন্ত:সত্তা হয়ে পড়ি। স্বাধীনতার পর নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করি'।২৬০

---

২৫৮ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ১৯৯
২৫৯ ঐ, পৃষ্ঠা ২০৬
২৬০ ঐ, পৃষ্ঠা ২৩৬-৩৭

তাহমীনা বেগম দীপালী (বৈতপুর, বাগেরহাট) বলেছে, '২৪ এপ্রিল পাকিস্তানীরা কাড়াপাড়া হয়ে বাগেরহাট আসে। এ সেই কাড়াপাড়া এলাকাতেই ১০০ শতের উপর লোককে হত্যা করে। মে মাসে এখানে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়। রজব আলী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়। এই এলাকায় এরপর পাকিস্তানীদের চেয়ে রাজাকাররাই বেশী অত্যাচার চালিয়েছে।

২২ আশ্বিন রাত ৩টায় ৫০-৬০ জন রাজাকার আমাদের বাড়ীতে এসে মুক্তিবাহিনী বলে পরিচয় দেয়। আমার ভাই পালাতে চেষ্টা করলে তাকে বেয়নেট দিয়ে আমাদের সামনে গলাকেটে হত্যা করে। তারপর আমার বাবা, কাকাকে গুলী করে হত্যা করে। হত্যার পর তারা আমাদের বাড়ী লুট করে। আমার স্বামী, আমাদের ছেলে-মেয়ে, কাকীমা সবাইকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। এরপরও তাদের অত্যাচার শেষ হল না। সমস্ত এলাকা পুড়িয়ে ধ্বংস করে'।[২৬১]

ডা. এস. এম আহাদ আলী খান (কোতোয়ালী, যশোর) দুঃস্বপ্নের দিনগুলির কথা স্মরণ করে বলেন, 'এপ্রিল মাসে পাকিস্তানীরা যশোর শহর পুরোপরি দখল করে নেয়। জুলাই মাসের ১৭তারিখে আমাকে মার্কিন হাউসে একজন ব্রিগেডিয়ারের কাছে হাজির করা হয়। এরপর ক্যান্টমেন্টে নিয়ে আমার উপর অত্যাচার করা হয়। এর পর মেজর আনোয়ার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমাকে জিজ্ঞেস করে, কোন দল করতাম। আমি সত্যি কথা বললাম 'ন্যাপ'। মেজর খুরশীদ আনোয়ারের মেয়েকে এক সময় আমি চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছিলাম, ফলে আমাকে মেরে ফেলা গেল না।আমি কারাগারে মফিজ চৌধুরী, নড়াইল কলেজের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন, ডা. মাহবুবুর রহমান, আজিজুল হক, এ, বি. এম. বদরুল আলম প্রমুখকে দেখলাম।

প্রতি রাতে ৮টার দিকে কালোকাপড় দিয়ে মুখ বেধে গ্রেফতারকৃত বাঙালীদের নিয়ে যেতে দেখতাম। অবাঙালীরা ছুরি দিয়ে তাদের জবাই করতো। উপরে পা ঝুলিয়ে মারতো। গুহ্যদ্বারের ভেতর বেয়নেট ঢুকিয়ে দিত। কখনো কখনো বরফও ঢুকিয়ে দিত। বাগাছড়া হাই স্কুলের শারিরীক শিক্ষককে ধরে নিয়ে ইলেকট্রিক শর্ট দিতে দেখেছি। অনেককে ধরে নিয়ে জোর করে টেপ বেকর্ডে রেকর্ড করাতো, 'পাকিস্তানের পক্ষে আছি, ভাল আছি'। কর্নেল শামস, মেজর বেলায়েত এই এলাকায় ধর্ষণ, খুন অত্যাচারের নেতৃত্ব দেয়। প্রায় ১০ হাজার লোককে ওরা এই এলাকায় হত্যা করে'।[২৬২]

---

১৬১ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ২৪০-৪১১
২৬২ ঐ, পৃষ্ঠা ২৪৭-৪৮

নূরজাহান (সুইপার, সি এম এইচ, যশোর ক্যান্টনমেন্ট) বলে, '১১ এপ্রিল সামরিক হাসপাতালের ষ্টাফ বাদে যে সমস্ত মহিলা প্রাণ বাঁচাতে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের সবাইকে পাকিস্তানী সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায়। এসব মহিলারা সবাই ছিলেন বাঙালী ই পি আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও বেসামরিক লোকদের স্ত্রী, কন্যা। পাকিস্তানীরা এদের উপর অত্যাচার করে। এর মধ্যে একজন ভদ্র মহিলার পেটে যে বাচ্চা ছিল, তা এই অমানুষিক অত্যাচারের ফলে নষ্ট হয়ে যায়।

একদিন এক বাঙালী যুবকের দেহ থেকে রক্ত নিয়ে তাকে হত্যা করে। মরার আগে ছেলেটির কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম, 'মা, স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলাম না।'২৬৩

মোঃ শহিদুল ইসলাম (বেড়ী, শারসা, যশোর) বলে, '১৫ আগষ্ট ভোর রাত ৪টার সময় আমাকে একজন রাজাকার নাভারণ বাজার থেকে ধরে নিয়ে রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমার উপর দিনের পর দিন চলতো অত্যাচার আর নির্যাতন। পায়ের তলায় রুল দিয়ে প্রহার করার পর সিগারেটের আগুন শরীরের বিভিন্ন স্থানে চেপে ধরতো'।২৬৪

রাজাকারের মা'ও ধর্ষণের শিকার হ'ল

মোঃ খোন্দকার নূরুল ইসলাম (বাটিয়ামারা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া) বলেন, ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহে কল্যাণপুর গ্রামে আর্মী আসে। মেয়েদের উপর পাশবিক নির্যাতন চলে যথেচ্ছভাবে। কল্যাণপুরের একটি অবিবাহিতা যুবতী মেয়ে আছিয়া। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং কলঙ্কিত মুখ সমাজে দেখাবে না বলে রাতে গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়।

একদিন মিলিটারীরা এক রাজাকারকে 'আওরাত' জোগাড় করে দিতে বলে। রাজাকার, শূন্য-বাড়ীগুলি খুঁজে কোথাও মেয়ে খুঁজে পেল না। মিলিটারীরা রাজাকারকে বললো তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে। রাজাকারটি তা-ই করলো। পাক সেনারা রাজাকারের বাড়ীতে গিয়েই তার ঘরে ঢুকে পড়ে। তারা দেখে ঘরে রাজাকারের মা বসে আছে। তারপরই পাক সেনা বাইরে চলে আসে এবং রাজাকারের বুকে রাইফেল ধরে তার চোখের সামনে একের পর এক মাতাকে

২৬৩ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ২৫৩
২৬৪ ঐ, পৃষ্ঠা ২৭৪

উপর্যুপরি ধর্ষণ করতে থাকে। মানুষরূপী এই জানোয়াররা তাদের কাজ শেষ হলে ক্যাম্পে চলে যায়। এবং এ খবরটি ক্যাম্পে ছড়িয়ে যায়। ফলে রাজাকারটি আর ক্যাম্পে ফিরে না গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে, তার খবর শেষ পর্যন্তও মেলে নি'।[২৬৪ক]

মোঃ দিয়ানত আলী খান (মালিগ্রাম, খোকসা, কুষ্টিয়া) বলে, '১৩৮৮ সালের পয়লা শ্রাবণ রাত ৯টায় ৩০-৪০ জন মিলিটারী, মুজাহিদ, রাজাকার ও বিহারী মিলে আমার বাড়ী ঘেরাও করে এবং আমাকে ও আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়। মিলিটারীরা আমার ছেলেকে কারেন্টের তারের সাথে দুই পা ঠেকিয়ে দেয় এবং বেতের লাঠি দিয়ে ভীষণ প্রহার করে'।[২৬৫]

ইমদাদুল হক মজুমদার (অধ্যক্ষ, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল) বলেন, 'দিনের বেলায় পাকিস্তানী সেনারা ট্রাক ভরে লোক ধরে আনতো। প্রথম দিকে এদের গুলী করে হত্যা করতো। পরের দিকে জবাই করেছে। অসংখ্য লাশ নদীতে ভাসতে দেখেছি। আমার ধারণা, ৭৫ হাজারের মতো লোককে পাকিস্তানীরা সমস্ত বরিশালে হত্যা করেছে।

অসংখ্য মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে এই শহরে। বরিশাল মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা এবং তার সাথে আর একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে অস্ত্রসহ পাকিস্তানী সেনারা গৌরনদী অথবা উজিরপুর এলাকার কোনো একটি ব্যাংকার থেকে ধরে আনে। বহু অত্যাচার চালায় ওদের উপর তথ্য নেওয়ার জন্য। কিন্তু কোন কথা বের করতে পারে নি।[২৬৬]

খাদিজা বেগম দুলু, (পিরোজপুর, বরিশাল) জানায়, 'পিরোজপুরে ভাগিরথী নামে এক মেয়েকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার অপরাধে গাড়ীর পেছনে ১০-১২ হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে সারা শহর ভীষণ বেগে গাড়ী চালিয়ে নৃশংশভাবে হত্যা করে'।

আলী হায়দার খান (পিরোজপুর, বরিশাল) বলেন, 'কর্ণেল আতিকের নেতৃত্বে পাক সেনারা হুলারহাটে আসে, ঢুকেই ঘর-বাড়ী জ্বালাতে থাকে। মুসলিম লীগাররা

২৬৪ক স্বাধীনতার দলিল, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮
২৬৫ ঐ, পৃষ্ঠা ২৯২
২৬৬ ঐ, পৃষ্ঠা ২৯৫

তাদের স্বাগত জানায়। পিরোজপুর মহকুমা প্রশাসক মহিবুল্লাহ শাহ পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের ন্যাপ নেতা বাকের শাহর ভাইপো ছিলেন। তিনি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন।

মিটিং-এর কথা বলে ৫ মে পিরোজপুর থানার ও. সি, ভারপ্রাপ্ত এস.ডি.ও এবং ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমানকে ডেকে এনে গুলী করে হত্যা করা হয়। ৪ হাজারের বেশী লোককে এখানে হত্যা করা হয়। ভাগিরথী নামে এক মেয়েকে মুক্তিবাহিনীর স্পাই সন্দেহে গাড়ীর পেছনে বেঁধে সারা শহর ঘুরিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বিশিষ্ট ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গণপতি হালদারকে (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে সে প্রথম হয়েছিল) নির্মমভাবে হত্যা করে। ফুলু রাণী বিশ্বাস (কলেজ ছাত্রী)-এর উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতনের ফলে তার মৃত্যু ঘটে'।[২৬৭]

যতীন্দ্র নাথ মণ্ডল (শশীদ, স্বরূপকাঠী) বলেন, '২৬ বৈশাখ পাকিস্তানী সৈন্যরা ও রাজাকার বাহিনী পুনরায় আমাদের গ্রামে আসে। এই দিন আমাদের গ্রামের ১৮ জন লোককে পাকবাহিনী গুলী করে ও বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। এর মধ্যে জিতেন নামে একজনকে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী নারকেল গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার পায়ের কাছে খড়-কুটা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার সারা শরীরে আগুন ধরে গেলে সে ভীষণ চিৎকার করতে থাকে, তখন পাক বর্বর বাহিনী গুলী করে তার মাথার অর্ধেক উড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা তাঁর স্ত্রীর সামনেই ঘটে। পাকিস্তানীরা তার স্ত্রীকেও ধরে এনে তার সামনেই তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে'।[২৬৮]

আবদুল মোমেন (প্রধান শিক্ষক, দক্ষিণ বল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ছাগলনাইয়া) বলেন, '১৮ সেপ্টেম্বর আমি আমার নিজ বাড়ীতে অবস্থানকালে দেখি হটাৎ পাকিস্তানী সেনা আসছে। আমি আত্মগোপন করি। এমন সময় দেখি, পাক সেনারা আমাদের গ্রাম থেকে ৩ জন যুবতী মেয়েকে বন্দী করে শিবিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে'।[২৬৯]

নূরজাহান বেগম (পূর্বচর, চান্দিয়া, সোনাগাজী, নোয়াখালী) জানায়, '২৫ অক্টোবর কয়েকজন পাকিস্তানী সেনা দেশের রাজাকারদের নিয়ে আমাদের গ্রামে তল্লাশী

২৬৭ স্বাধীনতার দলিল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৬
২৬৮ ঐ, পৃষ্ঠা ৩১২
২৬৯ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৫

চালায়। তারা মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আমি ঘরের চৌকির নীচে পালিয়েছিলাম। ঘর খোঁজার পর তারা আমাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় এবং টেনে বের করে। আমার বাবা-মা তাদের পায়ে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তাদের জোর করে ঘর থেকে বের করে দরজা দিয়ে দেয়। আমি তাদের লাথি মেরে ফেলে দেই। পরে আমার উপর নির্মমভাবে পাশবিক নির্যাতন চালায়। এইভাবে একে একে ৩ জন পাক সেনা আমার উপর অত্যাচার চালায়। যে কয়জন রাজাকার অত্যাচারে ওদের সাথে অংশ নেয়, তার মধ্যে একজন ছিল আমার চেনা'।[২৭০]

ডা: মো: ইদ্রিস মিয়া (মেডিক্যাল অফিসার, সোনাগাজী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র) বলেন, '১৭ অক্টোবর রাতে তারাবির নামাজ পড়া অবস্থায় মসজিদের ভেতর আমাকে গ্রেফতার করা হয়। আমার উপর নির্যাতন চলতে তাকে। আমার ডায়াবেটিস রোগ ছিল। কিছুক্ষণ পরপরই প্রসাব করতে হতো। কিন্তু তারা তা করতে দিত না। প্রসাবের চাপে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। আমার স্ত্রী ও গ্রামবাসী মিলে ৩,০০০ টাকা পাকিস্তানী পুলিশদের দিলে ঈদের আগের দিন নরপশুদের হাত থেকে মুক্তি পাই।'[২৭১]

গোলাম রফিক (কসবা, কুমিল্লা) বলেন, 'পাক সেনারা প্রায় ৩০০ জন লোককে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করে। এর মধ্যে চারগাছ গ্রামে একটি ঘরের মধ্যে ৩৪ জনকে হত্যা করে। এছাড়াও এ এলাকার ৩০জন লোককে সন্দেহবশত জীবন্ত অবস্থায় মাটি চাপা দেওয়া হয়। পাকিস্তানীদের এই পৈশাচিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এই এলাকার শতকরা ৯০ জন লোক দেশত্যাগ করে।[২৭২]

মোসাম্মৎ চানুভান (ফুলবাড়ীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) বলেন, 'জুলাই মাসে ১৭ তারিখে স্থানীয় রাজাকার বানু মিক্সা, সোনা মিক্সা ও চাঁদ মিক্সা গভীর রাতে আমাকে ধরে পাকিস্তানীদের শিবিরে নিয়ে যায়। আমাকে দেখে পাকিস্তানী সৈন্যরা আনন্দে নেচে উঠে। আমাকে নিয়ে যাওয়ার পুরস্কার স্বরূপ রাজাকাররা লুন্ঠন করার অনুমতি পেয়েছিল। ৫ দিন আমার দূর্বল দেহের উপর পিশাচগুলি অত্যাচার চালায়। আমার মা এর মধ্যেই কেসবপুরে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার নজীর আহমদকে আমার ধরে নেওয়ার খবর দেয়। ২৯ জুলাই মুক্তিবাহিনী আমাকে মুক্ত করতে ফুলবাড়িয়ার

২৭০ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ৩৭৬
২৭১ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৯
২৭২ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯৭

আর্মী ক্যাম্প আক্রমণ করে। যুদ্ধে পাকিস্তানী ও রাজাকাররা আত্মসমর্পণ করলে ১৪ জন পাকিস্তানী ও ৩জন রাজাকারকে গ্রেফতার করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়ে যায়। এবং তারপরে এই রাজাকার ও পাকিস্তানী পিশাচদের আমার সামনে জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করে'।২৭৩

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার প্রধান সমর্থক ও পূর্ব পাকিস্তানে আলবদর ও রেজাকার বাহিনীর স্থপতি অধ্যাপক গোলাম আজম পরে তাঁর একগ্রন্থে পাকিস্তানী তাণ্ডবের সত্যতা স্বীকার করে লিখেছেন,

'তারা (ইসলামপন্থীরা-লেখক) একদিকে দেখতে পেল যে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে ইয়াহিয়া সরকারকে বিব্রতকরার জন্য কোন গ্রামে রাতে আশ্রয় নিয়ে কোন পুল বা থানায় বোমা ফেলেছে, আর সকালে পাক সেনাবাহিনী যেয়ে ঐ গ্রামটাই জালিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা রাতে কোন বাড়ীতে উঠলে পরদিন ঐ বাড়ীতেই সেনাবাহিনীর হামলা হয়ে যায়। এভাবে জনগণ এক চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে গেলো'।২৭৪

পাকিস্তানের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলাম, মওদুদী ও গোলাম আযম প্রসঙ্গ

পাকিস্তানের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলাম, মওলানা মওদুদী ও তার একনিষ্ঠ শিষ্য অধ্যাপক গোলাম আযম ছিলেন বিতর্কিত এবং বিভিন্ন মহলের কাছে নানা প্রশ্নের কেন্দ্র। এমনকি পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমরা পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ডকে ইসলামের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন। আলেমরা বলেছেন, মওদুদীর ইসলাম ও রসুলের ইসলাম এক নয়। মওদুদী মূলত তাঁর নিজের স্বার্থে ইসলামের নাম ব্যবহার করছেন। অনেকে মওদুদীকে 'কাফের' বলেও ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলাম, গোলাম আযম ও মাওলানা মওদুদীর ভূমিকার স্বরূপ বোঝার জন্য এ বির্তকগুলি পাঠকের অধ্যয়ন প্রয়োজন। তবে গ্রন্থের কলেবরের কথা চিন্তা করে তা শুধু মাত্র এ গ্রন্থের সময়কালের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে।

---

২৭৩ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ৩৯৮-৯৯
২৭৪ অধ্যাপক গোলাম আযম, *পলাশী থেকে বাংলাদেশ* (পুস্তিকা), (ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা ১৮

মাওলানা মওদুদী ১৯৬৯ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। সফরের পর তিনি পশ্চিম পাকিস্তান গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক উদ্ভট প্রচারণা শুরু করেন। লাহোরে তিনি ৩০ জুন ১৯৬৯ বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে তিনি কিছু লোকের মধ্যে হিন্দুদের প্ররোচনায় বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা দেখতে পেয়েছেন। এরা পশ্চিম বাংলার সাথেও যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে।

অবশ্য মাওলানা মওদুদী বলেন, তাঁর দলের লোকেরা এদের প্রতিবোধ করা শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদুদী দৈনিক পাকিস্তানে চিঠিপত্র কলামে হাফিজুর রহমান নামে একজন ছাত্রের চিঠির কথা উল্লেখ করে বলেন, এই চিঠিতে ছাত্রটি হিন্দু সংস্কৃতির পক্ষে ও পাকিস্তান সৃষ্টির বিপক্ষে লিখেছিল।[২৭৫]

পূর্ব পাকিস্তানীদের ধর্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন এর আগেও বহুবার জামায়াতে ইসলামী নেতা মওদুদী তুলেছিলেন। তখনও পূর্ব পাকিস্তান থেকে এর জবাব দেওয়া হয়েছে। তবে এবার জবাব আসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই।

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রখ্যাত নেতা ও পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুফতী মাহমুদ পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা থেকে বিরত থাকার জন্য মাওলানা মওদুদীর প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, মওদুদী পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে সবার উপর টেক্কা দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য মহৎ নয়।

মুফতী মাহমুদ বলেন, ধর্মীয় প্রেরণা ও দেশপ্রেমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কোনো অংশে খাটো নয়। যখনি কায়েমী স্বার্থবাদীদের কুমতলব চরিতার্থ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তখনই পূর্ব পাকিস্তান, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশের অনুন্নত এলাকার মানুষের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থে এ পুরনো খেলা বন্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, মাওলানা মওদুদী হালে পূর্ব পাকিস্তান সফর করে ফিরে এসে কতকগুলি আজগুবী তথ্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে শুনিয়েছেন। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রদেশের উভয় অংশে কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তানে দেশদ্রোহিতার গন্ধ খুঁজে ফেরা অত্যন্ত হীন মনোভাবের পরিচায়ক। এর

---

২৭৫ দৈনিক পাকিস্তান, ২ জুলাই ১৯৬৯

দ্বারা শুধু দু'অংশের তিক্ততাই বাড়বে। এ সমস্ত নেতাদের অভিভাবকসুলভ মনোভাব ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন করার তিনি পরামর্শ দেন।[২৭৬]

জামাতে ইসলামী নেতা মাওলানা মওদুদী লাহোরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে উস্কানী, তাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে কটাক্ষ করায় পূর্ব পাকিস্তানের ৯১ জন আইনজীবীও এক বিবৃতিতে তার নিন্দা করেন। বিবৃতিতে তাঁরা উল্লেখ করেন, অবশ্য মাওলানা মওদুদীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ তিনি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষারই বিরোধী ছিলেন এবং এখন পাকিস্তানের প্রতি তার অকৃত্রিম অনুরাগ দেখানোর জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রমনা জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে বহু জিনিস তো আবিষ্কার করবেনই। বিবৃতিদাতারা আরো বলেন, মওদুদীর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা নববর্ষ উদযাপন সম্পর্কে ঘৃণ্য মন্তব্য করেছেন। বাংলা নববর্ষকে হিন্দু নববর্ষ দিবস বলে অভিহিত করায় তারা বিস্ময় প্রকাশ করেন'।[২৭৭]

মাওলানা কাওসার নিজামী ২৫ আগষ্ট (১৯৬৯) সামরিক আইনে মাওলানা মওদুদীর বিচারের দাবী করেন। তিনি বলেন, মওদুদী সম্প্রতি জামাতের সাপ্তাহিক 'এশিয়া'-তে এক নিবন্ধে কোরআনের অপব্যাখ্যা করে লিখেছেন, অমুসলমানদের সুশ্রী ছেলেরা ও তরুণী কন্যারাই হবে বেহেশতের গোলেমান ও হুর।

মাওলানা কাওসার নিয়াজী বলেন, মওদুদীর এ ব্যাখ্যা উদ্ভট এবং অমুসলমানদের প্রতি অপমানজনক। তিনি এজন্য সামরিক আইনের ৫০ নম্বর ধারা মওদুদীর বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর আহবান জানান।[২৭৮]

মাওলানা কাওসার নিয়াজীর এই বক্তব্যের পর জামায়াতে ইসলাম তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়। এই হুমকি প্রকাশ্যেই দেওয়া হয় এবং এরপর কাওসার নিয়াজী যখন ঢাকায় আসেন তখন হোটেল শাহাবাগে পরপর ১৩টি টেলিফোনে তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

এই কথা জানিয়ে জামায়াতে ইসলামের অফিস সেক্রেটারী বলেন, মওদুদীর সমালোচনা করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নিয়াজীকে ভোগ করতেই হবে।

---

২৭৬ দৈনিক পাকিস্তান, ৯ জুলাই, ১৯৬৯
২৭৭ ঐ ২৫ জুলাই ১৯৬৯
২৭৮ ঐ ২৫ আগস্ট ১৯৬৯

মাওলানা কাওসার নিয়াজী বলেন, মওদুদীর বিরুদ্ধে বই লেখার জন্য মাওলানা ওবায়েদুল্লাহ বিন সাইদকেও হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি বলেন, জামাতকে কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা তিনি জানেন।[২৭৯]

১৯৬৯ সালে তেসরা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া ও মেনন গ্রুপ এবং ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক ছাত্রসভায় জামায়াত নেতা মিয়া তোফায়েল সম্প্রতি শেখ মুজিব ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক সাংবাদিককে কমিউনিস্ট বলে যে গালি দিয়েছেন তার নিন্দা করে।[২৮০]

৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতা মওেলানা গোলাম গাউস হাজারভী এক বিবৃতিতে বলেন, জামায়াতে ইসলাম হচ্ছে ইংরেজ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য পুষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান।[২৮১]

দোসরা নভেম্বন পীর মোহাসেনউদ্দিন দুদুমিঞা ও মাওলানা মহিউদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, মাওলানা মওদুদী ও তাঁর বেতনভোগী কর্মীরা ইসলামের নামে পাকিস্তানে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে মজবুত করার দায়িত্ব পালন করছে। মওদুদী সাহেব ইহুদীদের ন্যায় অশ্লীল ভাষায় সাহেবায়ে কেরামের সমালোচনা করে রাফেজী মতবাদের সমর্থক বলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এজন্য উপমহাদেশের সকল আলেম সমাজ মওদুদীকে 'গোমরাহ' তথা সুন্নাত আল জামাতের বহির্ভূত বলে বক্তব্য দিয়েছেন।[২৮২]

১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) ঢাকায় জামাত নেতা গোলাম আযম ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের সর্তক করে দিয়ে বলেন, পাকিস্তান ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তৈরী হয়েছে।[২৮৩]

একই দিন পশ্চিম পাকিস্তানের লারকানায় জামাতের অস্থায়ী আমির মিয়া তোফায়েল বলেন, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদের চেয়েও মারাত্মক এবং দেশের সংহতির জন্য ক্ষতিকারক।[২৮৪]

---

২৭৯ দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯
২৮০ ঐ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
২৮১ ঐ ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
২৮২ ঐ ২ নভেম্বর ১৯৬৯
২৮৩ ঐ ১৯ নভেম্বর ১৯৬৯
২৮৪ ঐ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

১৪ জানুয়ারী (১৯৭০) মাওলানা মওদুদী কমিউনিস্ট পার্টিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শ বিরোধী কোনো দলকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া উচিৎ হবে না।[২৮৫]

১২ জুন (১৯৭০) জামাতের নয়া নেতা মেজর জেনারেল (অব:) ওমরাও খান রাওয়ালপিণ্ডিতে বলেন, দেশ কয়েকটি মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান সহজেই কমিউনিজমের কবলিত হয়ে যেতে পারে।[২৮৬]

৬ মার্চ (১৯৭০) পাবনা টাউন হল ময়দানে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ ঐক্য করলে পূর্ব পাকিস্তান দ্বিতীয় ইন্দোনেশিয়ায় পরিণত হবে। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট সুকর্নের ভাগ্যে যা ঘটেছিল শেখ মুজিবের ভাগ্যেও তাই ঘটবে।[২৮৭]

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে ইসলামী শাসনতন্ত্র দিবস পালন কালে জামাত নেতা মাওলানা আব্দুস সোবহান ও আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা ইসহাকের নেতৃত্বে একটি মিছিল দাও, কুড়াল, লাঠি সহ শহর প্রদক্ষিণ করে এবং তারা শ্লোগান দেয়, কডিউনিস্ট - সমাজতন্ত্রীরা নিপাত যাক। শেখ মুজিবের গুণ্ডামী চলবেনা।[২৮৮]

২৯ জুন সোমবার পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়, ঢাকায় মাওলানা মওদুদী ইসলামী ছাত্রসংঘের এক প্রশ্নোত্তর সভায় বক্তৃতা দানকালে বলেন, তাঁর নিজের নামের 'আবুল আলা' (যার অর্থ 'আল্লাহ্র পিতা')-এর সমালোচনা শুরু হয়েছে মাত্র দু'বছর ধরে। তিনি বলেন, তাঁর বর্তমান বয়স ৬৭ এবং গত ৫০ বছর ধরে তিনি লিখছেন এবং জনগণের কাছে তিনি ভালভাবেই পরিচিত। এতো-দিন কেউ এ নামের সমালোচনা করে নি, কিন্তু আজ তা করা হচ্ছে।[২৮৮ক]

রাওয়ালপিণ্ডি জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা গোলামুল্লাহ খান এক বিবৃতিতে ২২ সেপ্টেম্বর বলেন, কোরআনের অপব্যাখ্যা করা বইগুলি মাওলানা মওদুদী প্রত্যাহার করে নেবেন বলে ওয়াদা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কথা রাখেন নি। বিবৃতিতে মাওলানা আরো বলেন, আমরা কমিউনিজম বিরোধী, কিন্তু পুঁজিবাদ খতম না

২৮৫ দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ জানুয়ারী ১৯৭০
২৮৬ ঐ ১৩ জুন ১৯৭০
২৮৭ ঐ ৭ মার্চ ১৯৭০
২৮৮ ঐ ২৬ মার্চ ১৯৭০
২৮৮ক ঐ.

হওয়া পর্যন্ত দেশে প্রকৃত শান্তি আসতে পারে না। তিনি অভিযোগ করেন, মওদুদী আলেমদের পুঁজিবাদের পক্ষে বলার জন্য চাপ দিচ্ছেন।

একইদিন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের মাওলানা সবুর, মওদুদীকে প্রকাশ্য বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি মওদুদীর বিরুদ্ধে কোরআনের অপব্যাখ্যা করার অভিযোগ আনেন।[২৮৯]

৫ অক্টোবর (১৯৬৯) এন. এস. এফ. (রশীদ হাসান গ্রুপ) রাওয়ালপিণ্ডিতে এক বিবৃতিতে বলে, জামাতে ইসলাম ও তার ছাত্রশাখা পাকিস্তানে রক্তপাতের স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু তা বাস্তবায়িত করতে দেওয়া হবে না।[২৯০]

এ ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ছাত্রনেতা রশীদ হাসান খান ১২ অক্টোবর পুনরায় জামাতকে দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।[২৯১]

১৯ অক্টোবর (১৯৬৯) পীর মোহসেনউদ্দিন দুদুমিয়া ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মাওলানা মওদুদীর কার্যকলাপে আশঙ্কিত হয়ে পড়ছেন, কারণ মওদুদী এখন সকল জায়গাতেই কমিউনিজমের গন্ধ পাচ্ছেন। এমনকি মসজিদ মাদ্রাসাতেও মওদুদী কমিউনিস্ট খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

পীর সাহেব আরো বলেন, মওদুদী সাহেব নিজে কোনো সনদপত্র প্রাপ্ত মাওলানা নন। হায়দরাবাদের নিজামের দরবারে তদানন্তীন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের তুষ্ট করার জন্য তিনি কাজ করতেন। সেই প্রভুদের থেকেই তিনি মাওলানা খেতাব পান।[২৯২]

১৯ অক্টোবর (১৯৬৯) ন্যাপ (ভাসানী) কার্যনির্বাহী কমিটির সভায়, রাজনৈতিক মতলব হাসিলের জন্য জামায়াত ইসলাম কর্তৃক মসজিদ ব্যবহারের নিন্দা করা হয়। এতে আরো বলা হয়, পিতা-মাতা তাদের কন্যাকে কোথায় বিয়ে দিবেন তার নির্দেশও জামাত দিতে চাচ্ছে। অথচ এই জামাতের আমীর মওদুদীই একদিন পাকিস্তান আন্দোলনকে 'হারাম আন্দোলন' এবং পাকিস্তানের জন্য যারা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তাদের 'হারাম মউত' হয়েছে বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন।[২৯৩]

---

২৮৯ দৈনিক পাকিস্তান, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
২৯০ ঐ ৭ অক্টোবর ১৯৬৯
২৯১ ঐ ১৪ অক্টোবর ১৯৬৯
২৯২ ঐ ২০ অক্টোবর ১৯৬৯
২৯৩ ঐ ২১ অক্টোবর ১৯৬৯

এবোটাবাদ থেকে ৩০ অক্টোবর পাকিস্তানের ১৩ জন আলেম এক যৌথ ঘোষণায় বলেন, মাওলানা মওদুদী বিপথগামী এবং তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের পেছনে নামাজ পড়া না-জায়েজ।[২৯৪]

৭ নভেম্বর ঢাকার কেরানীগঞ্জের শ্রদ্ধেয় আলেম মাওলানা অলিউর রহমান বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে, ধর্মের প্রভাব সমাজ থেকে ষোল আনাই মুছে যাবে। কারণ আলেম সমাজই আজ বিপথগামী হয়ে পড়ছে। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি কিংবা রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম পালন করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।[২৯৫]

১২ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ বিন সাইদ এক বিবৃতিতে মওদুদী ও জামায়াতে ইসলাম সমর্থক ইমামদের পেছনে নামাজ না পড়ার আবেদন জানান।[২৯৬]

রাজশাহীতে ১১ এপ্রিল গোলাম আযম বলেন, জয়বাংলা শ্লোগান, ইসলাম ও পাকিস্তান বিরোধী। তিনি বলেন, বাঙালীরা কখনো জাতি ছিল না।

জামাতে ইসলাম আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশ থেকে অর্থ সাহায্য পায় একথা তিনি অস্বীকার করেন।[২৯৭]

পশ্চিম পাকিস্তানের শুক্কুরে ১৮ জুন (১৯৭০) এক সংর্বধনায় জামায়াত নেতা গোলাম আযম বলেন, উর্দু পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা। তিনি বলেন, ৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময় তিনিও তাতে অংশ নিয়োছিলেন। কিন্তু তা ভুল হয়েছিল।[২৯৮]

২৮ আগস্ট মাওলানা মওদুদী বলেন, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের কখনো ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের অভিপ্রায় ছিলনা। তিনি অভিয়োগ করেন, পাকিস্তানের খোদ প্রতিষ্ঠাতারাই হিন্দুদের সম্পত্তি এবং এমনকি পাকিস্তানে যেসব মেয়েদের ফেলে যাওয়া হয়েছে তাদের লুট করার কাজে এসব প্রতিষ্ঠাতারা নিয়োজিত ছিল।

---

২৯৪ দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ অক্টোবর ১৯৬৯
২৯৫ ঐ ৭ নভেম্বর ১৯৬৯
২৯৬ ঐ ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
২৯৭ ঐ ১৩ এপ্রিল ১৯৭০
২৯৮ ঐ ১৯ জুন ১৯৭০

তিনি বলেন, ১৯৪১ সালেই তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার কোনো সম্ভবনা নেই। তিনি বলেন, পাকিস্তানে কাফিরানা সরকারের মোকাবেলা করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।[২৯৯]

৩০ অক্টোবর (১৯৭০) মাওলানা মওদুদী লাহোরে বলেন, আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই দুনিয়ায় ধনী দরিদ্র আছে।[৩০০]

সরকারী দৈনিক পাকিস্তান মাওলানা মওদুদীর উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে 'মাওলানা মওদুদীর ধর্ম রাজ্য বনাম কায়েদে আজমের পাকিস্তান' শীর্ষক এক উপসম্পাদকীয় লেখে। এতে মন্তব্য করা হয়:

'মাওলানা মওদুদীর প্রস্তাবিত ধর্মতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই সীমিত।.... কিন্তু তাদের কথাবার্তা এবং আচরণে মনে হয় মধ্যযুগীয় থিয়োক্র্যাসীই জামাতে ইসলামীর সকল শ্লোগানের সারকথা।....

পাক ভারত উপমাহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রতিষ্ঠাই ছিল কায়েদে অজমের স্বপ্ন।.... তাঁর কাছে এই সত্য আগোচর ছিল না যে, বিংশ শতাব্দীতে পুরোহিততন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্র একেবারেই অচল।....

মাওলানা মওদুদীর ধর্ম চিন্তা অথবা জামাতের রাজনীতির সঙ্গে একমত না হলেই তা ইসলামের খেলাপ হয়ে যাবে এই জবরদস্তিমূলক নীতি এ দেশের জনসাধারণের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না'।[৩০১]

অবরুদ্ধ ৯ মাসে ইসলামী ছাত্রসংঘ, জামায়াতে ইসলাম ও দৈনিক সংগ্রাম

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সৈন্যদের ভায়াবহ হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলার মাত্র ৬ দিন পর পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এক ভাষণ দেন। এ বেতার ভাষণ শুনে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল যুগপৎ বিস্মিত ও আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ গোলাম আযম বা জামায়াতে ইসলাম ক্ষমতাসীন কেউ ছিলো না। পূর্ব পাকিস্তানে তখন পাকিস্তান

২৯৯ দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ আগস্ট ১৯৭০
৩০০ ঐ ৩১ অক্টোবর ১৯৭০
৩০১ *'মাওলানা মওদুদীর ধর্মরাজ্য বনাব কায়েদে আজমের পাকিস্তান'* , দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ আগস্ট ১৯৭০

সমর্থক আরো রাজনৈতিক দল ছিল-মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, পিডিপি, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম প্রমুখসহ আরো বিভিন্ন দল ছিল। কিন্তু একমাত্র গোলাম আযমই ঢাকা বেতার থেকে উস্কানীমূলক বেতার-বক্তৃতা দেন. ভাবটা এমন ছিল যে, ২৫ মার্চের পর বুঝি জামায়াত ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় চলে গেছে। গোলাম আযম তাঁর এই বেতার-বক্তৃতার মূল বিষয় করেন ভারতকে। এই বেতার বক্তৃতায় মোট ১৬টি স্তবক ছিল এবং তিনি এই ১৬ স্তবকের ৪০ লাইনের ভাষণে ৩৩ বার 'ভারত' শব্দটি উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন,

'সম্প্রতি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ১ জন দায়িত্বশালী ব্যক্তি হয়েও ভারতীয় লোকসভায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এমনভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, যা আমাদের মনেও উৎসুক্য জাগায়।.... ভারতের মনে রাখা উচিত যে পূর্ব পাকিস্তানীরা তাহাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের ব্যাপারে কোন দেশের নিকট হতে সাহায্য চায় না। এটা তাদের অভ্যন্তরীন ব্যাপার।....

ভারতীয় বেতার যে জঘণ্য মিথ্যা প্রচার করছে ঢাকার প্রতিটি নাগরিক তা ভালোভাবে বুঝে, ভারতীয় বেতারের মতে সমগ্র ঢাকা নগরী মাটির সথেই মিশিয়ে দেয়া হয়েছে,.... এটা কি করে সম্ভব যে ঢাকার জনগণ নিজ চোখে যা দেখেছে, নয়াদিল্লী তার চেয়ে বেশী দেখেছে।....

ভারত সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ করে কার্যত পূর্ব পাকিস্তানীদের দেশপ্রেমকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।.... আমি বিশ্বাস করি যে, এই অনুপ্রবেশকারীরা পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের নিকট হতে কোন প্রকার সাহায্য পাবে না'।[৩০২]

৮ এপ্রিল (১৯৭১), পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রাদেশিক প্রচার সম্পাদক নূরুজ্জামান এবং ঢাকা নগর জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম সারোয়ার এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানের মাটিতে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারত বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানীদের দেশপ্রেমের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে।

তাঁরা বলেন, ভারতীয়দের জানা উচিত এদেশের জনগণ সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কখনো ত্রাণকর্তা হিসেবে মনে করেন না। পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ

৩০২ দৈনিক সংগ্রাম, ৭ এপ্রিল ১৯৭১

সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কোন স্থানে দেখামাত্র খতম করে দেবে বলে তারা দৃঢ় আস্থা পোষণ করেন।৩০৩

১১ এপ্রিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউনুস, পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি নূরুল ইসলাম, ঢাকা শহর সভাপতি শাহ জামাল চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, তথাকথিত স্বাধীন বাংলা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে চিরতরে গোলামে পরিণত করার জঘণ্য ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।৩০৪

১৪ এপ্রিল দৈনিক সংগ্রাম সংবাদ পরিবেশন করে যে, দিনাজপুরের প্রতিরোধের সকল ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারীদের নির্মূল করা হয়েছে।

এদিন দৈনিকটি আরো বলে যে, পাকিস্তানের প্রতি চীনের সমর্থন দেখে ভারতের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে।

১৯ জুন অধ্যাপক গোলাম আযম রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা পুন:প্রতিষ্ঠত না হওয়া পর্যন্ত জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় না।

তিনি এদিন দুষ্কৃতকারীদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে তাঁদের অস্ত্র সরবরাহ করার জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।৩০৫

লাহোরে ২০ জুন সাংবাদিককদের কাছে গোলাম আযম বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে অধিক সংখ্যক অমুসলমানদের সহায়তায় শেখ মুজিবর রহমানের হয়তো বিচ্ছিন্নতার ইচ্ছা থাকতে পারে, তবে তিনি প্রকাশ্যে কখনও স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করেন নি।

কিন্তু মাওলানা ভাসানীই প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতার দাবী তোলেন।... অনুরূপভাবে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং আতাউর রহমান খানের দলও এই উদ্দেশ্যে সারা পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন।

৩০৩ দৈনিক সংগ্রাম, ৮ এপ্রিল ১৯৭১
৩০৪ ঐ ১১ এপ্রিল ১৯৭১
৩০৫ ঐ ২০ জুন ১৯৭১

গোলাম আযম আরো বলেন, বিচ্ছিন্নতার জন্য শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু যারা প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাদের তো গ্রেফতার করা হচ্ছে না।

তিনি বলেন, তাঁর দল পূর্ব পাকিস্তানে দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা দমন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং এ কারণেই দুষ্কৃতকারীদের হাতে বহু জামায়াত কর্মী নিহত হয়েছেন।[৩০৬]

২৪ শ্রাবণ (১৩৭৮) দৈনিক সংগ্রাম 'রেজাকার বাহিনীর কৃতিত্ব' শিরোনামে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে দৈনিকটি লেখে:

'গত ২৫ শে মার্চ বিচ্ছিন্নতাবাদী ভারতীয় দালাল, দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের[৩০৭] বিরুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে তাদের সুসংগঠিত শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।...

সীমান্তের ওপার থেকে অনুপ্রবেশকারী ও দালালরা এসে চোরাগুপ্তাভাবে এখানকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সেতু ধ্বংসের চেষ্টা করে এবং বহু দেশপ্রেমিক নাগরিককে হত্যা করে। নিরস্ত্র জনগণ দুস্কৃতিকারীদের সন্ধান পেয়েও তেমন কিছু করতে পারতো না। আনন্দের কথা যে জনগণ এখন স্বত:স্ফূর্তভাবে শান্তি কমিটি গঠন ও তারই পরিচালনাধীন রেজাকার বাহিনীতে দলে দলে যোগ দিয়ে অস্ত্র চালনা শিখেছে এবং প্রদেশের অভ্যন্তর ভাগে আত্মগোপনকারী ভারতীয় দালালদের উৎখাত করে চলেছে।

জানা যায় অনেক স্থানে প্রথমদিকে সাধারণ মানুষ দুস্কৃতিকারীদের মিথ্যা প্রচারণায় কিছুটা বিভ্রান্ত হলেও এখন তাদের কাছে এ দেশের ক্ষতিসাধনকারী ভারতীয় দালালরা চিহ্নিত হয়ে যাওয়ায় জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবেই তাদের ধরে সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করছে।[৩০৮]

৮ আগস্ট দৈনিক সংগ্রাম দু'টি আলোকচিত্র ছাপে। তাতে নীচে লেখা ছিল 'রাজশাহীতে রেজাকার বাহিনীর প্রথম দলটি সম্প্রতি পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ

৩০৬ দৈনিক সংগ্রাম, ২১ জুন ১৯৭১
৩০৭ 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'ভারতীয় দালাল', 'দুস্কৃতকারী', 'অনুপ্রবেশকারী', ইত্যাদি শব্দ বলতে পাঠক বুঝে নেবেন এরা 'মুক্তিবাহিনী'। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী এবং তাদের দালাল সমর্থকরা মুক্তিযোদ্ধাদের এই নামেই সম্বোধন করতো
৩০৮ দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ শ্রাবণ ১৩৭৮

গ্রহণ করে।' এবং 'শপথ গ্রহণ শেষে রাজশাহী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আইনুদ্দিন দেশের সংহতি রক্ষার জন্য রেজাকারদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বক্তৃতা করছেন'।

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের শেষ স্বাধীনতা দিবসে ইসলামী ছাত্রসংঘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র সমাবেশ করে। এতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ছাত্রসংঘ নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, ইসলাম প্রিয় ছাত্র সমাজ বেঁচে থাকতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকে থাকবে। পাকিস্তানের শত্রু ভারত ও রাশিয়ার পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে ছাত্রনেতা নিজামী বলেন, শুধু রাশিয়াই নয়, সারা দুনিয়ার শক্তি দাঁড়ালেও ভারত পাকিস্তানের এক ইঞ্চি জমিও দখল করতে পারবে না। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের করে শ্লোগান দেওয়া হয়, 'আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে, ভারতের দালালদের খতম কর, ইত্যাদি।[৩০৯]

পাকিস্তান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া আয়োজিত আজাদী দিবসের আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন জামায়াত ইসলামী নেতা গোলাম আযম।

পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর প্রধান আমীর আজাদী দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে বলেন, আজ উৎসবের দিন নয়, অনুশোচনার দিন।[৩১০]

২০ আগস্ট, লাহোরে জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন মাওলানা মওদুদীর উপস্থিতিতে মাওলানা রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এক প্রস্তাবে এ অধিবেশনে বলা হয়, ভারতীয় যুদ্ধবাজ ও তাদের চরদের যোগসাজশে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের দমন করার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, মজলিসে শূরা তার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে।[৩১১]

১৮ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামে অধ্যাপক গোলাম আযম 'ইতিহাসের দৃষ্টিতে পাকিস্তান' শিরোনামে এক উপসম্পাদকীয়তে বলেন, 'বাঙালী মুসলমানগণ সচেতনভাবে বাঙালী হিন্দুদের সাথে মিলে বাঙালী জাতিতে পরিণত না হলেও বিভিন্ন ভাব প্রবণতার চক্রান্তে তথাকথিত বাঙালী স্বার্থের ডাকে মুসলমানেরা সাড়া দিয়ে চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে'।[৩১২]

---

৩০৯ দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ আগস্ট ১৯৭১
৩১০ ঐ
৩১১ ঐ ২১ আগস্ট ১৯৭১
৩১২ ঐ ১৮ আগস্ট ১৯৭১

৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রামে গোলাম আযমের পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালের একটি সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। এতে গোলাম আযম মুক্তিবাহিনীর সাথে তাঁর দলের সদস্যদের সংঘর্ষের বিভিন্ন বিবরণ ও পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির উপর মন্তব্য করেন। গোলাম আযম বলেন,

'বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জামায়াতকে মনে করতো পহেলা নম্বরের দুশমন। তারা তালিকা তৈরী করেছে এবং জামায়াতের লোকদের বেছে বেছে হত্যা করেছে। তাদের বাড়ীঘর লুট করেছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং এখনো দিচ্ছে।

এতদসত্ত্বেও জামায়াত কর্মীরা রেজাকারে ভর্তি হয়ে দেশের প্রতিরক্ষায় বাধ্য, কেননা তারা জানে 'বাংলা দেশে' ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোন স্থান হতে পারে না। জমায়াত কর্মীরা শহীদ হতে পারে কিন্তু পরিবর্তিত হতে পারে না।....

শান্তি কমিটি সমূহে যোগদানকারী অন্যান্য দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই হত্যার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু জামায়াতের সাধারণ কর্মীদেরও ক্ষমা করা হয় না।

আল্লাহ্‌র অপার মহিমায় জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও জামায়াত কর্মীদের মনোবল অটুট রয়েছে। দুস্কৃতকারীদের তৎপরতাও অব্যহত রয়েছে। ২রা আগষ্ট খুলনা শান্তি কমিটির অফিসে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, এতে সতের জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে সাবেক এম, এন এ ও প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর সহকারী আমীর এবং খুলনা শান্তি কমিটির সভাপতি মাওলানা ইউসুফ ও মওলানা শামসুর রহমানও রয়েছেন।....

আইয়ুব খানের সময়ে কমিউনিস্টদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সবচেয়ে বড় কাজ হল, যতো নেতা সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিতো এবং বর্তমানে উগ্র জাতীয়তাবাদী রূপ ধারণ করেছে, পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করা। এরা ময়দানে কাজ করতে সুদক্ষ। এদের কারণেই গেরিলা তৎপরতা চালু রয়েছে। সরকারী দফতর, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র সর্বত্রই এরা মওজুদ রয়েছে। এরা 'গাইড' হিসেবে রীতিমত কাজ করে যাচ্ছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার মিশউর রহমান.... যিনি ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ব্যর্থ করার জন্য জনগণকে উস্কানী দিয়েছেন, বর্তমানে তিনি জনগণের মধ্যে কাজ করে

যাচ্ছেন এবং পিপলস পার্টির সঙ্গে সমঝোতার পাকিল্পনা তৈরী করছেন। কিছুদিন আগে তিনি ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ভারতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাকে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয় নি। আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি কিভাবে গেলেন এবং কেন গেলেন?' অবস্থা অনুযায়ী রূপ বদল করাই তাদের টেকনিক। মশিউর রহমানকে বিশ্বস্ত মনে করার কি যৌক্তিকতা রয়েছে?[৩১৩]

৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে কলা ভবনে এক ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী এই সমাবেশে বলেন, তারা পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হিন্দুস্থানের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানতেও প্রস্তুত। সংঘকর্মীদের এই সুযোগ দানের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানান।[৩১৪]

৯ সেপ্টেম্বর যশোর বিডি হলে যশোর জেলা ছাত্রসংঘের উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক, শহর শাখার সভাপতি নূরুল ইসলাম এবং বিশিষ্ট কর্মী আজিজুল হক। এতে প্রধান অতিথির ভাষণে ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে সম্প্রতি যা কিছু ঘটেছে তা নি:সন্দেহে দু:খজনক, কিন্তু সবকিছুই অপ্রতাশিত নয়। তিনি বলেন, যারা পাকিস্তানকে 'আজিমপুরের গোরস্থান' বলেছে, পাকিস্তানের মাটি তাদের গ্রহণ করে নি। তাদের জন্য কলকাতা ও 'আগরতলার মহাশ্মশান'। তিনি আরো বলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমরা কোন জাতি। এরপর ৬৫ সালে ৬ সেপ্টেম্বর আমরা বুঝতে পারি, কোন জাতি। কিন্তু দু:খের বিষয় মাত্র ৬ বছর পর আবার ১৯৭১ সালে আমরা সর্বনাশ ডেকে আনলাম। এদেশের মুসলমানরা ভারতীয় দাদাদের ধোকায় পরে গেল'।[৩১৫]

১৭ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামী নেতা আব্বাস আলী খান পূর্ব পাকিস্তানের মালেক মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হল ও জিন্নাহ হল পরিদর্শনে আসেন। তিনি এখানে এক সমাবেশে বলেন, আল্লাহ্র অসীম রহমতে পাকিস্তান বেঁচে গেছে। পাকিস্তানকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করবার জন্য এক শ্রেণীর ছাত্রই দায়ী। তিনি বলেন, ছাত্রদের পুরো পাকিস্তানী ও পুরো মুসলমান হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

৩১৩ দৈনিক সংগ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৩১৪ ঐ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৩১৫ ঐ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

আব্বাস আলী খানের সঙ্গে এ সময় মহসিন হলের প্রাধ্যক্ষ ড. ওয়াদুদর রহমান ও জিন্নাহ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. কে আলী উপস্থিত ছিলেন।[৩১৬]

জামায়াতে ইসলাম থেকে যারা নতুন মন্ত্রী হয়েছে তাঁদের সম্মানে ২৫ সেপ্টেম্বর শনিবার ঢাকায় এক হোটেলে জামায়াত ইসলামের পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

এতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গোলাম আযম বলেন, জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি আর্দশবাদী দল হয়েও জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত নয় এমন একটি মন্ত্রিপরিষদে জামায়াতের যোগদানের কারণ হলো, দেশের সাম্প্রতিক সংকট ও দুস্কৃতকারীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে যে সব পাকিস্তানী প্রাণ হারিয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোকই জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত।

জামায়াতে ইসলাম, পাকিস্তান ও ইসলামকে এক ও অভিন্ন মনে করে। পাকিস্তান সারা বিশ্বমুসলিমের জন্য ইসলামের ঘর। কাজেই পাকিস্তানই যদি না থাকে তাহলে জামায়াত কর্মীদের বেঁচে থাকার সার্থকতা নেই।

গোলাম আযম বলেন, এই মন্ত্রিসভা কোনো ভোগের মন্ত্রিসভা নয়। বরং মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নিয়ে তাদের আরো বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

সংবর্ধনার জবাবে মন্ত্রী আব্বাস আলী খান বলেন, প্রতিটি কারবালার পরই ইসলাম জীবন্ত হয়ে উঠে। আমাদের সামনে আরো কারবালা রয়েছে।[৩১৭]

লাহোরে সাপ্তাহিক 'জিন্দেগীর' সাথে গোলাম আযমের দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারের হুবহু বিবরণ প্রকাশ করে ২৬ সেপ্টেম্বরের দৈনিক সংগ্রাম। এতে গোলাম আযম অভিযোগ করেন, ১৯৬১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমাজতন্ত্রীরা আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতার শ্লোগান দিয়েছিল। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করছি যে, দেশের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে যারা প্রকাশ্য কথা বলেছে তাদের ক্ষমা করার মধ্যে কি যৌক্তিকতা ছিল? শুরু থেকেই কি এ বিদ্রোহ দমন করা যেত না?

---

৩১৬ দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৩১৭ ঐ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

তিনি বলেন, ২৫ মার্চের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা ছিল এদেশের মাটি রক্ষা করার জন্য, এ দেশের জনগণকে রক্ষা করার জন্য এর আগেই অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ণ বিজয় লাভ করেন এবং তথাকথিত বাংলাদেশের সমর্থকদের মনোবল ভেঙে পড়ে।[৩১৮]

১৭ সেপ্টেম্বর গোলাম আযম মোহাম্মদপুরে ফিজিক্যাল এডুকেশন সেন্টারে ট্রেনিং গ্রহণরত রেজাকার শিবির পরিদর্শন করেন। এখানে রেজাকারদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতাকালে রেজাকার বাহিনীতে বিভিন্ন দলের কোন্দলের কথা উল্লেখ করে বলেন, কোনো দলের লোক কম বা কোনো দলের বেশী লোক রেজাকার বাহিনীতে থাকতে পারে, কোনো দলের লোক কম হওয়ার কারণে যদি কোনো দলের নেতা হিংসা পোষণও করে তবু রেজাকারদের তাতে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এরপরও যদি কেউ বিভিন্নতা সৃষ্টির পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ না করেন তাহলে আল্লাহ স্বয়ং তাদের 'মেরামত' করবেন।

গোলাম আযম বলেন, আমাদের ঘরেই এখন অসংখ্যা শুক্র তৈরী হয়েছে। এই শত্রু সৃষ্টির কারণ যা-ই হোক সেদিকে এখন নজর দেয়ার সুযোগ নেই। এখন ঘরে আগুন লেগেছে, কাজেই আগুন নেভানোই আমাদের প্রথম দায়িত্ব। এ ব্যাপারে সেনাবাহিনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং রেজাকারও তাদের পেছনে এগিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, সেনাবহিনী যতদিন দেশের অভ্যন্তরীণ দায়িত্বে থাকবেন, ততোদিন দেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে না। গোলাম আযম রেজাকারদের অস্ত্রের ট্রেনিং এর সাথে ঈমানের ট্রেনিং গ্রহণেরও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভাল লোকের হাতে অস্ত্র না থাকলে উপকারের পরিবর্তে তা অপকারই করে।

এসময় গোলাম আযমের সাথে তেজগাঁও থানা জামাতের নেতা মাহবুবুর রহমান গোরা, রেজাকারবাহিনী প্রধান মোহাম্মদ ইউনুসও ছিলেন।[৩১৯]

২৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রাম, রাজশাহী শান্তি কমিটির তত্ত্বাবধানে চতুর্থ রেজাকার বাহিনীর ট্রেনিং শেষে রেজাকারদের কোরআন ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করার ছবি প্রকাশ করে।[৩২০]

---

৩১৮ দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
৩১৯ ঐ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৩২০ ঐ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১০ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ও জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান বগুড়ায় বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। তিনি বলেন, বর্তমান যুব সমাজ দ্বি-জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পাকিস্তানের পবিত্র মাটি থেকে দুস্কৃতকারীদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার জন্য তিনি জনগণের কাছে আহ্বান জানান।৩২১

১৩ অক্টোবর জয়পুরহাটে আব্বাস আলী খান বলেন, ভারত ৬৫ সালের ভুলের পুনরাবৃত্তি করলে জাতি তার সমুচিত জবাব দেবে।৩২২

১৬ অক্টোবর শনিবার ঢাকার বায়তুল মোকাররমে জামায়াতে ইসলামীর এক সমাবেশে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, বাঙালী মুসলমানদের নিজেদের অস্তিত্ব এবং অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে বেঁচে থাকতে হলে পাকিস্তানের ঐক্য সংহতিকে অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে। তিনি বলেন, নির্যাতিত বাঙালী মুসলমানদের যেটুকু উন্নতি হয়েছে, তা পাকিস্তান হাসিলের পরই হয়েছে।৩২৩

১৬ নভেম্বর চাঁদপুরে আব্বাস আলী খান বলেন, দুনিয়ার এমন কোনো শক্তি নেই যে মানচিত্র থেকে পাকিস্তানের নাম মুছে ফেলতে পারে। পাকিস্তান চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।৩২৪

২৩ নভেম্বর লাহোরে গোলাম আযম বলেন, বর্তমান মুহূর্তে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করাই হবে দেশের জন্য আত্মরক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা। তিনি শান্তি কমিটির সদস্য ও রেজাকারদের উন্নতমানের ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য আহ্বান জানান।৩২৫

২৫ নভেম্বর লাহোরে গোলাম আযম পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতের উপর হামলা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।৩২৬

২৭ নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলাম আযম বলেন, কোন জাতি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। তিনি বলেন, মাওলানা ভাসানী, প্রফেসর

৩২১ দৈনিক পাকিস্তান, ১১ অক্টোবর ১৯৭১
৩২২ ঐ ১৫ অক্টোবর ১৯৭১
৩২৩ ঐ ১৭ অক্টোবর ১৯৭১
৩২৪ ঐ ১৯ নভেম্বর ১৯৭১
৩২৫ ঐ ২৪ নভেম্বর ১৯৭১
৩২৬ ঐ ২৬ নভেম্বর ১৯৭১

মোজাফফর, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার জন্য আসল দায়ী। শেখ মুজিবের গৃহীত পদ্ধতিও বিচ্ছিন্নতার সুযোগ করে দিয়েছে।

এদিন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাসেম আলী এক বিবৃতিতে ছাত্রসংঘ কর্মীদের সবাইকে সৈনিক হিসেবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নিদের্শ দেন।[৩২৭]

গোলাম আযম:
'ঘরে ঘরে দুশমনদের খুঁজে বের কর'

১৪ আগষ্ট (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানে ইতিহাসের শেষবারের মতো পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এ উপলক্ষে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. কামালউদ্দিন, পিডিপি প্রধান নূরুল আমীন, জামায়াতে ইসলামের প্রাদেশিক আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম প্রমুখ এতে বক্তৃতা করেন।

পিডিপি প্রধান নূরুল আমীন বলেন, আজ আজাদী দিবস। আজ আনন্দের দিন। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও আমাদের মন ভারাক্রান্ত।

কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আজম বলেন, এবার প্রাণ চাঞ্চল্যতার সাথে আজাদী দিবস উদযাপিত হয়েছে। কারণ যাঁরা পাকিস্তানকে ভালবাসেন তাঁরা এবার আন্তরিকতা ও জাকজমকের সাথে আজাদী দিবস পালন করছে। শত্রু ও মিত্রের মানদণ্ডে এবার পাকিস্তান যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, এবার পাকিস্তানের ভেতরে হাজারো দুশমন সৃষ্টি হয়েছে। বাইরের দুশমনের চেয়ে ঘরে ঘরে যেসব দুশমন রয়েছে, তারা অনেক বেশী বিপদজনক। ঘরে ঘরে যেসব দুশমন রয়েছে, তাদের খুঁজে বের করতে হবে।[৩২৮]

বদর দিবস পালিত

৭ নভেম্বর ইসলামী ছাত্রসংঘ সারাদেশে বদর দিবস পালনের ডাক দেয়। উল্লেখ্য, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিরোধ করতে আলবদর বাহিনীও গঠন করা হয়।

৩২৭ দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ নভেম্বর ১৯৭১
৩২৮ ঐ ১৬ আগষ্ট ১৯৭১

মোহাম্মদ শামসুল হকের সভাপতিত্বে বায়তুল মোকাররমে গণজমায়েতে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি আলী আহসান মোহাম্মদ মোজাহিদ ৪ দফা ঘোষণা দেন। ঘোষণায় বলা হয়:

দুনিয়ার বুকে হিন্দুস্তানের কোনো মানচিত্রে আমরা বিশ্বাস করিনা। যতোদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্তানের নাম মুছে না দেয়া যাবে ততোদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।

বই বিক্রি কেন্দ্র (বিভিন্ন লাইব্রেরীর) উদ্দেশ্যে বলা হয়, আগামীকাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দুদের দালালী করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরীতে স্থান দিতে পারবে না বা বিক্রি বা প্রচার করতে পারবে না। যদি কেউ করে তবে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকরা তা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।

পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বদর দিবসে শপথ হল, ভারতের আক্রমণ রুখে দাঁড়াব, দুষ্কৃতকারীদের খতম করব, ইসলামী সমাজ কায়েম করব।

পরে একটি মিছিল বের হয় এবং এতে শ্লোগান দেওয়া হয়, 'আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে, বীর মজাহিদ অস্ত্র ধর, ভারতের চরদের খতম কর, মুজাহিদ এগিয়ে চল, কলিকাতা দখল কর'।৩২৯

ইসলামী ছাত্রসংঘের (বর্তমান ছাত্র শিবিরের পূর্ব নাম) এই বদর দিবস পালনের পর থেকেই সারাদেশে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার তালিকা তৈরী শুরু হয়।

রাজাকারের প্রসন্ন বদন

ডিসেম্বর যতোই এগিয়ে আসছিল পাকিস্তান সমর্থক গোষ্ঠীবাহিনী ইত্যাদিতে হতাশার ধ্বংস নেমে আসছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে হানাদার বাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজী সকলের মুখে প্রত্যয় খুঁজে পাচ্ছিলেন।

২৭ নভেম্বর সাভারে রেজাকার কম্পানী কমাণ্ডারদের প্রথম দলের বিদায়ী কুজকাওয়াজে তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, রাজাকারদের মধ্যে তিনি আত্মপ্রত্যয়, উচ্চ মনোবল ও প্রসন্ন বদন দেখতে পাচ্ছেন।৩৩০

৩২৯ দৈনিক পাকিস্তান, ৮ নভেম্বর ১৯৭১
৩৩০ ঐ ২৮ নভেম্বর ১৯৭১

মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট চলছিল। এরমধ্যে ২৫ মার্চ রাতে ভয়াবহ সামরিক অভিযানের মূল লক্ষ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হওয়ায় ছাত্ররা এমনিতেই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছিল। বেশীর ভাগ ছাত্রই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল। সামরিক সরকার একে একে সকল বিষয়ে হাত দিলেও সহজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে হাত দিতে চায় নি।

অনেক পরে, ২০ মে (১৯৭১) পাকিস্তানের সামরিক সরকারের টিক্কা খানের প্রশাসন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্পর্কিত একটি সামরিক আদেশ জারী করে। এতে বলা হয়, সরকারী কলেজ এবং প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ শুরু হবে দোসরা আগস্ট থেকে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পয়লা জুন কাজে যোগ দিতে হবে। আর বেসরকারী কলেজসমূহের ক্লাশও শুরু হবে দোসরা আগস্ট থেকে, তবে শিক্ষকরা কাজে যোগ দেবে পয়লা জুলাই থেকে।[৩৩১]

সামরিক সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম, ও রাজশাহী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ দানে বিরত থাকে। ৩ জুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্পর্কিত ১৪৯ নম্বর সামরিক বিধি জারী করে বলা হয়, নির্ধারিত তারিখে শিক্ষকরা কাজে যোগদান করবেন। অতিরিক্ত ১৫ দিনের 'গ্রেজ পিরিয়ড' ঘোষণা করে বলা হয়, যেসব শিক্ষক কাজে যোগ দিবে না, তারা বরখাস্ত বলে গণ্য হবে এবং সামরিক আদালতে তাদের বিচার হবে।[৩৩২]

২২ মে (১৯৭১) জনশিক্ষা পরিদপ্তরের একটি পরিপত্রে শিক্ষকদের দেশের 'দুস্কৃত-কারী ও ধংসাত্মক' কাজের সাথে জড়িতদের সম্পর্কে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন উক্তি বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়।[৩৩৩]

৩০ মে গভর্নর টিক্কা খান দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এর সদস্য নিযুক্ত হন,

৩৩১ দৈনিক পূর্বদেশ, ২১ মে ১৯৭১
৩৩২ দৈনিক পাকিস্তান ৩ জুন ১৯৭১
৩৩৩ স্বাধীনতার দলিল, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৩

১. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেইন, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২. ড. হাসান জামান, পরিচালক, জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো
৩. ড. মোহর আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. এ. এক. এম আবদুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. ড. আবদুল বারী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৬. ড. মকবুল হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৭. ড. সাইফুদ্দিন জোয়ারদার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘোষণায় আরো বলা হয়, সিলেবাসকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য এর সংশোধনের সুপারিশও কমিটি করবে।[৩৩৪]

৩১ জুলাই (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারী এ.এম. এফ. রহমান, শিক্ষা সচিবকে লিখিত এক পত্রে, পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এক অনুসন্ধান চালিয়ে কাদের সন্তান মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আছে তা খুঁজে বের করতে বলেন।

১০ আগষ্ট অনুরূপ আরেক পরিপত্রে ঢাকা শহরে অবস্থানরত চাকুরীজীবীদের শিক্ষার্থী সন্তানদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান শুরু করার আহবান জানানো হয়।[৩৩৫]

১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস, এস, সি পরীক্ষা সফল করার জন্য এ অভিযান ও তৎপরতা সামরিক সরকার শুরু করে। কিন্তু এমন করে চাকুরীজীবীদের ভয়-ভীতি দেখিয়েও আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা সফল করা গেল না। কারণ ছাত্ররা কেউ পরীক্ষা দিতে সম্মত হয় নি।

৬ আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার সকল বিভাগ থেকে দৈনিক ছাত্র হাজিরার প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য তাগিদ দিয়ে পত্র লেখেন।[৩৩৬]

কিন্তু কেউ এ রকম প্রতিবেদন না পাঠানোর কারণে রেজিষ্টার, তেসরা সেপ্টেম্বর, জরুরী তাগিদ দিয়ে আবার সকল বিভাগীয় প্রধানের কাছে চিঠি দেন।[৩৩৭]

---

৩৩৪ দৈনিক পূর্বদেশ ৩০ মে ১৯৭১
৩৩৫ স্বাধীনতার দলিল, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৭, ৫৫২
৩৩৬ ঐ, সপ্তম খন্ড, ৫১৮
৩৩৭ ঐ, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬১

এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও ৭ সেপ্টেম্বর প্রদেশের সকল স্কুল-কলেজে একটি পরিপত্র (সার্কুলার) পাঠান। এতে বলা হয়, এক শ্রেণীর শিক্ষক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ছাত্রদের ক্লাশে আসতে অনুৎসাহ জোগাচ্ছেন। ফলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাজিরার হার কম হচ্ছে। মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের অনুরোধ করেন, তাঁর অধিনস্থ শিক্ষকরা যাতে ছাত্রদের ক্লাশে ফিরে আসতে ইতিবাচক ভূমিকা নেয় সেদিকে যেন তাঁরা খেয়াল রাখেন।

পরিপত্রে আরো বলা হয়, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রবিরোধী কিছু পোস্টার দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে এ বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে। একই সাথে ছাত্রদের কাছে পরিচয়পত্র রাখারও পরামর্শ দেওয়া হয়।[৩৩৮]

পয়লা সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান নিজ স্বাক্ষরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে ৬ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এর মধ্যে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এনামুল হক এবং ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. এ.বি.এম হাবিবুল্লাহকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে একাধারে চাকুরী থেকে বহিস্কার ও ৬ মাসের ডিটেনশন দেওয়া হয়। ড. মুনীর চৌধুরী, ড. নীলিমা ইব্রাহীম (বাংলা বিভাগ), ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী বিভাগ)-কে সতর্ক করে দেওয়া হয়।[৩৩৯]

দোসরা সেপ্টেম্বর টিক্কা খান এক আদেশ বলে নিম্নলিখিত অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীদের ৬ নং সামরিক আইন প্রশাসকের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন:

১. মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২. আবদুর রাজ্জাক, ঐ
৩. ড. খান সোরওয়ার মুর্শেদ, ইংরেজী বিভাগ, ঐ
৪. মাজহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আবুজাফর শামসুদ্দীন, বাংলা একাডেমী।[৩৪০]

---

৩৩৮ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ৫৬৫
৩৩৯ ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩৬-৩৭
৩৪০ ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩৯

উপরিউক্ত ৫ জনের প্রথম ৪জনের অনুপস্থিতিতে বিচার করে ১০ নভেম্বর জানানো হয়, এদের প্রত্যেককে ১৪ বছররের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।[৩৪১]

এ সময় ঢাকা টেলিভিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ হচ্ছে এবং বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ছাত্ররা ক্লাশে যোগ দিচ্ছে-এমন একটি সচিত্র রিপোর্ট পরিবেশন করে। একজন এন. এস. এফ নেতা এ সম্পর্কে লেখককে বলেন, ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীগণ ও আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে এসে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে ক্লাশ করার ভান করে ছবি তোলে। প্রকৃতপক্ষে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময় কার্যত: কোনো ছাত্র উপস্থিতি ছিল না এবং ক্লাশও হতো না।[৩৪২]

বস্তুত সারাদেশেই ক্লাশে উপস্থিতির হার এমনি নৈরাশ্যজনক অবস্থায় পৌঁছে যে সামরিক সরকার কোনোভাবেই তা কার্যকর করে তুলতে পারছিলেন না। শিক্ষকরাও তাঁদের কাজে ফিরে আসেন নি।

দিনাজপুর জেলা জনসংযোগ অফিসের একটি ঘোষণা থেকে প্রতীয়মান হয়, দিনাজপুর শহরে ছাত্রীদের ক্লাশে উপস্থিতি এতোই কমে গিয়েছিল যে, শহরের ৫টি বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাশ একটি মাত্র স্কুলে সরিয়ে নেওয়া হয়। জেলা জনসংযোগ অফিস, সারদেশ্বরী গার্লস স্কুল, দিনাজপুর হাই স্কুলের মহিলা বিভাগ, ঈদগাহ বস্তি গার্লস স্কুল ও কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের একত্রে গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে গিয়ে ক্লাশ করতে অনুরোধ করে এক ঘোষণা প্রচার করে।[৩৪৩]

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক সরকারের নতুন গভর্নর ডা. আবদুল মোতালিব মালেক ২৬ সেপ্টেম্বর, রোববার, ঢাকা বেতারে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে, ছাত্রদের ক্লাশে ফিরে আসার আহবান জনান। তিনি বলেন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্লাশে যোগদানে বিরত থাকলে শুধু তার নিজেদেরই ক্ষতি করবে না, দেশের কল্যাণ ও অগ্রগতিও বিঘ্নিত হবে।[৩৪৪]

নতুন শিক্ষামন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা আববাস আলী খান ২১ সেপ্টেম্বর এক সভায় বলেন, ইসলামী অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা ছাড়া আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের পাকিস্তানের পটভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারবো না।

৩৪১ দৈনিক পাকিস্তান, ১০ নভেম্বর ১৯৭১
৩৪২ সাক্ষাৎকার : মাহবুবুল হক দুলন, পূর্বোক্ত
৩৪৩ স্বাধীনতার দলিল, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮২
৩৪৪ দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের সকল ক্ষতির কারণ। বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ ও অর্থহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন না করা হলে আমরা কিছুতেই আমাদের ধ্বংসকে রোধ করতে পারবো না।[৩৪৫]

২১ অক্টোবর প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আববাস আলী খান এক বেতার ভাষণ দেন। তিনি সীমান্তের ওপাড়ে ও এ পাড়ের ছাত্র সমাজের প্রতি নির্ভয়ে দেশে ফিরে এসে তাদের শিক্ষা জীবন শুরু করার আকুল আবেদন জানান।

তিনি বলেন, তাঁর কাছে সকল ছাত্রই নির্দোষ। ছাত্রদের অপকর্মের জন্য দায়ী হচ্ছে বিপথগামী নেতৃত্ব ও ভুল শিক্ষানীতি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ শিক্ষানীতি পরিবর্তনে সরকার বদ্ধপরিকর। ছাত্রদের যাতে একটা বছর নষ্ট না হয়, সে জন্য কিছু করা যায় কিনা তাও তিনি বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।[৩৪৬]

১০ ডিসেম্বর (১৯৭১) এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, ইত:পূর্বে গঠিত পাঠ্য পুস্তক পর্যালোচনা কমিটি তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন। এ. এফ. এম আবদুল হকের নেতৃত্বে ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি যে প্রতিবেদন পেশ করেন তা কিছু সংশোধনীর পর ৮ নভেম্বর মন্ত্রিপরিষদের সভায় গৃহীত হয়।

প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী, আগামী শিক্ষাবছর থেকে কিছু সংখ্যক পাঠ্য পুস্তক পরিবর্তন করা হবে এবং বাদ বাকী বইগুলো ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ও পাকিস্তানের আর্দশমত ভিত্তি তুলে ধরার জন্য ঢেলে সাজানো হবে।

মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত হয়, এখন থেকে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা পাঠ্য করার পূর্বে এ সব বই ন্যাশনাল একাডেমী অব পাকিস্তান এ্যাফেয়ার্স কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।[৩৪৭]

উল্লেখ্য,দালাল মন্ত্রিসভার এ ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত স্বপ্নেই থেকে যায়। আগামী শিক্ষাবর্ষ আসার পূর্বেই তাদের পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে করুণ বিদায় নিতে হয়।

---

৩৪৫ সাপ্তাহিক পাক সমাচার, পয়লা অক্টোবর এবং স্বাধীনতার দলিল, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৯৫-৯৬
৩৪৬ দৈনিক পাকিস্তান, ২২ অক্টোবর, ১৯৭১
৩৪৭ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

১৩ মে (১৯৭১) খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক এক সমন জারী করে, ২০ মে'র মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ওসমানীকে সামরিক আইন আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। অন্যথায় তাঁর অনুপস্থিতিতেই ৪০ নম্বর সামরিক বিধি অনুযায়ী বিচার করা হবে বলা হয়।[৩৪৮]

অগাস্টের ১৮ তারিখ থেকে দৈনিক পত্রিকা সমূহে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তালিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ২ সেপ্টেম্বর ১৩ জন সি. এস. পি অফিসারকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর মধ্যে জেলা প্রশাসক এইচ. টি ইমাম (পার্বত্য চট্টগ্রাম), আবদুস ছামাদ (সিলেট), মোহাম্মদ এন. কিউ খান (পাবনা), এবং মহকুমা প্রশাসক মোহাম্মদ খুরশেদুজ্জামান চৌধুরী (কিশোরগঞ্জ), কাজী রুকুনউদ্দীন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), ওয়ালিউল ইসলাম (মাগুরা), আকবর আলী খান (হবিগঞ্জ), কামালউদ্দিন সিদ্দিকী (নড়াইল), তৌফিক এলাহী চৌধুরী (মেহেরপুর) ছিলেন অন্যতম।

এছাড়া নাম ছিল খোন্দকার আসাদুজ্জামান (যুগ্ম সচিব), সৈয়দ আবদুস সামাদ (পুনর্বাসন অফিস, পার্বত্য চট্টগ্রাম), কুদরত এলাহী চৌধুরীর (এ. ডি. সি. রাজশাহী)।[৩৪৯]

এতে সাদাত হোসেন (এ, সি যশোর)- এর নামও ছিল। ৩ সেপ্টেম্বর ৪৫ জন ই. পি. সি. এস অফিসারকেও সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৩৫০]

কিন্তু কেউই আদালতে হাজির হননি। এঁদের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন। অনুপস্থিতিতে তাঁদের প্রত্যেককে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও সম্পত্তির ৫০ ভাগ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৩৫১]

পয়লা ডিসেম্বর ২২জন পুলিশ অফিসারকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

---

৩৪৮ দৈনিক পূর্বদেশ ১৪ মে ১৯৭১
৩৪৯ দৈনিক পাকিস্তান, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৩৫০ ঐ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৩৫১ ঐ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০ এপ্রিল (১৯৭১) শেষ পর্যন্ত লে. জেনারেল টিক্কা খান গভর্ণর হাউসে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. এ সিদ্দিকী।

বিচারপতি সিদ্দিকী এর আগে মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে শেখ মুজিবুরের নির্দেশে টিক্কা খানকে শপথ করাতে সাহস করেন নি। ফলে টিক্কা খান গভর্ণর হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নর ভাই এডমিরাল আহসানের স্থলাভিষিক্ত হলেও শপথ না হওয়ায় আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নিতে পারেন নি।

কিন্তু ১১ সেপ্টম্বর পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানে ধ্বংসাত্মক ও পোড়ামাটি অভিযানের নায়ক এই লে. জেনারেল টিক্কা খানকেও বিদায় নিতে হয়।

এদিন জনগণকে ধোকা দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার টিক্কা খানকে সরিয়ে গভর্ণর হিসেবে দাঁতের ডাক্তার এম এ মালেককে নিয়োগ করেন। বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীই তাকে শপথ গ্রহণ করান।

শপথ অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্ণর সুলতানউদ্দনি আহমদ ও আবদুল মোনায়েম খান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম, ফজলুল কাদের চৌধুরী, খান এ. সবুর, শামসুল হুদা, ইউসুফ আলী চৌধুরী, এ এস এম সোলায়মান, আবদুল জব্বার খান, পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিঞা, দোহা, হাসান আসকারী, এস এম ইসপাহানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।[৩৫২]

এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর লে. জেনারেল আবদুল্লাহ খান নিয়াজীকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসকের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়। টিক্কা খান একই সাথে দুটো দায়িত্ব পালন করছিলেন।[৩৫৩]

২৪ সেপ্টেম্বর গভর্ণর মালেক নতুন করে ১০জন মন্ত্রী নিয়োগ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী কয়েকটি রাজনৈতিক দল থেকে এ মন্ত্রীদের

৩৫২ পাক সমাচার, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৩৫৩ দৈনিক পাকিস্তান, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

বাছাই করা হয়। তবে এর মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগেরও দু' জন সদস্য ছিলেন। এরা হলেন:[৩৫৪]

আবুল কাসেম (কাউন্সিল মুসলিম লীগ) : অর্থমন্ত্রী
এডভোকেট নওয়াজেশ আহমদ (কাউন্সিল মুসলিম লীগ) : খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী
আব্বাস আলী খান (জামায়াতে ইসলাম) : শিক্ষামন্ত্রী
মাওলানা এ কে এম ইউসুফ (জামায়াতে ইসলাম) : রাজস্ব, পূর্ত, বিদ্যুৎ, সেচমন্ত্রী
ওবায়দুল্লায় মজুমদার (আওয়ামী লীগ) : স্বাস্থ্য ও তথ্যমন্ত্রী
শামসুল হক (আওয়ামী লীগ) : ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী
এ, এস এস সোলায়মান (কৃষক শ্রমিক পার্টি) : সমাজ কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী
মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক (নেজামে ইসলাম) : স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা মন্ত্রী
আখতারউদ্দিন আহমদ (কনভেনশন মুসলিম লীগ) : শিল্প, বাণিজ্য ও আইনমন্ত্রী
অউং শু প্রু (সংখ্যালঘু) : বন, সমবায়, মৎস্য মন্ত্রী

শেখ মুজিবের বিচার

৩ আগস্ট (১৯৭১) করাচীতে পাকিস্তান টেলিভিশন নেট ওয়ার্কের সাথে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, অবিলম্বেই শেখ মুজিবের বিচার করা হবে।[৩৫৫]

৯আগস্ট পাকিস্তান সরকার এক সরকারী প্রেসনোটে বলে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য শেখ মুজিবের বিচারের কাজ ১১আগস্ট থেকে শুরু হবে।[৩৫৬]

২০ আগস্ট হেলসিংকি থেকে থেকে বিশ্ব শান্তি পরিষদ শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করে।[৩৫৭]

২ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান বলেন, মুজিব যদি এখন পূর্ব পাকিস্তান ফিরে যান তার লোকেরাই তাকে মেরে ফেলবে। কেননা, তারা তাদের সকল দুর্ভোগের জন্য তাকেই দায়ী করছে। খেয়ালের বশে আমি তাকে মুক্তি দিতে পারি না। তবে জাতি যদি তার মুক্তি চায়, আমি তাকে মুক্তি দেব।

৩৫৪ পাক সমাচার, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৩৫৫ The dawn (Karachi), 5 August, 1971 এবং স্বাধীনতার দলিল, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০২
৩৫৬ ঐ, ১০ আগস্ট ১৯৭১
৩৫৭ *আমি বিজয় দেখেছি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৯

প্রেসিডেন্ট বলেন, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হলে চীন পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করবে।[৩৫৮]

এ সময় পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিচারের নামে প্রহসন শুরু হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দুনিয়ার ২৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তার জীবন রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়ে তারবার্তা প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে এই তথাকথিত প্রহসনের আড়ালে শেখ মুজিবকে হত্যার চক্রান্ত করা হয়েছে। এই হত্যা সংগঠিত হলে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির আরও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে...

আমরা আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, আপনি পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানান, যেন তারা তাদের এবং আমাদের দেশকে বিপদজনক পরিস্থিতিতে ফেলার মতো কোন কাজ না করেন। পাক সরকার শেখ মুজিবের কোন ক্ষতি করলে তার ফল মারাত্মক হবে।'[৩৫৯]

৪ নভেম্বর লাহোরে, পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী, লেখক ও ছাত্রনেতা সহ মোট ৪২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি চেয়ে এক বিবৃতি দেন।

এ দিনই ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিণ্ডি থেকে লাহোর যান। এ উপলক্ষেই এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।লাহোরকে পাকিস্তানের মুজিব বিরোধী সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বলে মনে করা হতো। এখানে প্রেসিডেন্টের কাছে এ রকম আবেদন এই প্রথম।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, সাবেক বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান, লেনিন শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কবি ফয়েজ আহমদ, পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, পাকিস্তান সোসালিষ্ট পার্টির নেতা চৌধুরী আসলাম এবং পাকিস্তান টাইমস্-এর প্রাক্তন সম্পাদক মাজহার আলী খান।[৩৬০]

ন্যাপ নিষিদ্ধ ঘোষিত

২৬ নভেম্বর (১৯৭১) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক বিবৃতিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সকল উপদলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

---

৩৫৮ দৈনিক পাকিস্তান, ৩ নভেম্বর ১৯৭১
৩৫৯ সাপ্তাহিক ১৬ আগস্ট ১৯৭১
৩৬০ সাপ্তাহিক বাংলারবাণী, ৯ নভেম্বর ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট বলেন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দীর্ঘদিন যাবৎ পাকিস্তানের স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কাজ করছিল। এর কতিপয় নেতা এই দেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে জোর তৎপরতা চালিয়েছিল এবং এর অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেননি।

তিনি বলেন, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এখন দেশের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যারা প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা দাবী করেছিলেন, মাওলানা ভাসানী তাদের অন্যতম এবং এখন তিনি আমাদের শত্রুদের মধ্যে বসবাস করছেন।

তিনি আরো বলেন, সবচেয়ে ঘোরতর পাকিস্তান বিরোধী আবদুল গাফফার খান এই দেশের প্রতি শত্রুতায় কখনো ক্ষান্ত হয়নি এবং এখন তিনি এর শত্রুদের সঙ্গে প্রকাশ্য যোগাসাজসে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, কাজেই আমি ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টির সকল গ্রুপ ও উপদল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।[৩৬১]

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ন্যাপ যে নিষিদ্ধ হল, স্পষ্টতই তা মূলত ওয়ালী ন্যাপের উপরই আরাপিত হল, কারণ ভাসানী ন্যাপ ও মোজাফ্ফর ন্যাপ -ওয়ালী ন্যাপের অংশ বিশেষ মুক্তিযুদ্ধে থাকায় ইয়াহিয়ার ঘোষণায় কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ওয়ালী ন্যাপ সংকটে পতিত হয়।

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল ২৬ মার্চ।

গোলাম আযম প্রেসিডেন্ট।

লাহোরে ২৬ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল খালেক, দেশে সব কয়টি সমাজতন্ত্রী দলকেই বেআইনী ঘোষণার দাবী জানান। তিনি বলেন, সরকারের উচিত এসব দলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। যদি এদের বিরুদ্ধে পূর্বেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো তাহলে অনেক আগেই পূর্বাঞ্চল থেকে দুস্কৃতকারী নির্মূল হয়ে যেত।[৩৬২]

---

৩৬১ দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ নভেম্বর ১৯৭১
৩৬২ দৈনিক সংগ্রাম, ২৭ নভেম্বর ১৯৭১

এদিন গোলোম আযম লাহোরেই বলেন, যদি ভুট্টোকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হয় তাহলে অবশ্যই একজন পূর্ব পাকিস্তানীকে প্রেসিডেন্ট করতে হবে। তিনি এখানে ইসলামী ছাত্রসংঘের এক সভায় বক্তৃতা করছিলেন।[৩৬৩]

অনেকে মনে করেন, এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে গোলাম আযম নিজেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে ভুট্টো এর বিরোধিতা করেন। একজন জামায়াতে ইসলামীর প্রেসিডেন্ট তিনি মেনে নিতে চাননি। গোলাম আযম দাবী করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা বেশীর ভাগ রেজাকার-আলবদর- আল শামস বাহিনী গঠন করে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছে এবং প্রাণ দিচ্ছে, এখানে জামায়াতের অবদান বেশী, সুতরাং একজন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রেসিডেন্ট হলে জামায়াতে থেকেই হতে হবে। কিন্তু জামায়াত ইসলামী ও গোলাম আযমের এ ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত পূরণ হয়নি। পরে ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হন এবং পূর্ব পাকিস্তানী থেকে একজন প্রেসিডেন্ট হন বটে, তবে সেটা গোলাম আযম নন, নূরুল আমিন এ পদটি পুরস্কার হিসেবে লাভ করেন।

অবশেষে ভুট্টোর খায়েশ মিটলো

৭ ডিসেম্বর পি আই ডি-র এক হ্যান্ড আউটে বলা, হয় প্রেসিডেন্ট পি ডি পি-র প্রধান নূরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং জুলফিকার ভূট্টোকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[৩৬৪]

এর ফলে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটবে। তিনি পূর্বে আইয়ুব খানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এবং ৭০ সালের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের দুটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠাতা লাভ করে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুরের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং পাকিস্তানের ইতিহাসে নিয়ে আসেন প্রধানতম এবং সর্বশেষ দুর্যোগ।

পূর্ব পাকিস্তানী নূরুল আমিনের দল ৭০ সালের নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে দু' তিনটি আসন লাভ করা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর জন্য মনোনীত করা হয় একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানীদের খুশী করার জন্য।

---

৩৬৩ দৈনিক সংগ্রাম, ২৭ নভেম্বর ১৯৭১
৩৬৪ পাকিস্তান অবজারভার, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১

কলকাতায় ছাত্রদের মিছিল

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যখন এসব ঘটনা ঘটছিল, তখন শুরু থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গড়ে উঠছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পশ্চিম বাংলা ও ভারতের একাত্মতা প্রকাশের জন্য ১০ (১৯৭৯) এপ্রিল কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন এবং গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভকারীরা পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লনে দীনেশ মজুমদারের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখ।

বক্তারা অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে • স্বীকৃতি দানের জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানান।[৩৬৫]

এর আগে ৮ এপ্রিল কলকাতায় পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বাংলাদেশের প্রতি সংহতি মিছিল করে।[৩৬৬]

৩১ মার্চ সারা পশ্চিম বাংলায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে সর্বদলীয় হরতাল পালিত হয়।[৩৬৭]

এ ছাড়া, সমগ্র ভারত ও পশ্চিম বাংলায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সহায়তার জন্য ছাত্ররা বিভিন্ন সংস্থা ও জনমত কেন্দ্র গড়ে তোলে।

সিন্ধুর কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন

২৯ জুন ১৯৭১ পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাদের সমর্থনের কথা ঘোষণা করে। পাকিস্তানের বর্তমান. 'রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক এক প্রস্তাবে পাকিস্তানের সর্বশেষ সংকটের জন্য সামরিক জান্তাকে দায়ী করা হয়।

৩৬৫ দৈনিক যুগান্তর ১১এপ্রিল ১৯৭১
৩৬৬ ঐ ৯ এপ্রিল ১৯৭১
৩৬৭ ঐ পয়লা এপ্রিল ১৯৭১

প্রস্তাবে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় এবং পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার সাথে এক হয়ে লড়াই করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৩৬৮]

পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের প্রগতিশীল ছাত্রনেতা জাম সাকীও এক বিবৃতিতে ইয়াহিয়া চক্রের পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার নিন্দা করে বাংলাদেশের ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।[৩৬৯]

'পাকিস্তান টুকরা টুকরা হইয়া যাইবেই'

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে (আগস্ট, ১৯৭১) বলেন, ইসলামাবাদের পশুশক্তি বাংলাদেশের মানুষকে আর পদানত করে রাখতে পারবে না। 'পাকিস্তান টুকরা টুকরা হইয়া যাইবেই' এবং কেনো শক্তি নেই তাকে প্রতিরোধ করে।[৩৭০]

আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থন

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্র সংগঠনের সমিতি--আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কাছে প্রেরিত ছাত্রদের এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি ইয়াহিয়ার নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বীর ছাত্র সমাজের সাথে সংহতি জ্ঞাপন করে বার্তা পাঠায়।[৩৭১]

সোভিয়েতের বিভিন্ন গণসংগঠন

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার ৫টি ভিন্ন ভিন্ন গণসংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পূর্ব বাংলায় নারকীয় নির্যাতন ও গণহত্যার নিন্দা করে। তারা পূর্ব বাংলার জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের সাথেও একাত্মতা ঘোষণা করে।

---

৩৬৮ সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ, ৮ আগস্ট ১৯৭১
৩৬৯ ঐ
৩৭০ ঐ ২২ আগস্ট ১৯৭১
৩৭১ ঐ ৮ আগস্ট ১৯৭১

৫টি .ছাত্র সংগঠন হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তি কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা, সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি পরিষদ, সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মহিলা সমিতি।

বৃটিশ লেবার পার্টি

বৃটেনের লেবার পার্টি পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার নির্বিচার হত্যা, লুট ও নির্যাতনের নিন্দা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

৪ অক্টোবর লেবার পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটির এক বৈঠকে অবিলম্বে নির্যাতন বন্ধ ও শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়।[৩৭২]

সশস্ত্র বিশ্ববাহিনী গঠন

নয়াদিল্লীতে ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯৭১) থেকে শুরু হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে ৩ দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। উদ্বোধনী দিনে ভারতের সর্বোদয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ ও নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী পিণ্ডি কৈরালা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর হাতে হাত মিলিয়ে জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন।

শ্রী কৈরালা বলেন, প্রস্তাব দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসবে না। ফরাসী সাহিত্যিক আদ্রে মালরো বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সম্প্রতি সামরিক কমাণ্ডের যে ভার নিতে চেয়েছেন তিনি তার উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হলে বিশ্বের এই অংশের সমস্ত মানুয়ের মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হবে।

সর্বোদয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ বলেন, স্পেনের গৃহযুদ্ধের মতো বাংলাদেশের জন্যও একটা সশস্ত্র আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গড়ে তোলার বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।[৩৭৩]

মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তানে বাঙালী সমাজ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পৃথিবীর যেখানেই একটি বাঙালী ছিল সেখানেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎপরতা শুরু হয়। একটি বাঙালী সন্তান যেখানেই থাকুক, দেশে কিংবা প্রবাসে, তার ন্যূনতম অবদান রাখতে চেষ্টা করেছে।

---

৩৭২ দৈনিক ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৩৭৩ দৈনিক যুগান্তর, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

তবে পাকিস্তানেই বেশী সংখ্যক বাঙালীর অবস্থান ছিল। কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানকার বাঙালীদের অবস্থা ছিল ভিন্নতর। পাকিস্তানে বাঙালীরা বন্দীজীবন অতিবাহিত করছিল। বাঙালীদের মধ্যে বেশীরভাগ ছিল সামরিক বাহিনী ও সরকারী অফিসে কর্মরত। পাকিস্তানের দাবী অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে ৯ মাস এসব বাঙালী ছিল পাকিস্তানের নাগরিক কিন্তু তবু তাদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং নামমাত্র ভাতা দেওয়া হয়।

কিন্তু বন্দী অবস্থায় থাকলেও সকল বাঙালীরই আকাঙ্ক্ষা ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার। এই চেতনার বশবর্তী হয়েই অনেক বাঙালীই আফগানিস্তান হয়ে ভারতে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। কর্ণেল তাহের, জিয়াউদ্দিন, পাশা, মঞ্জুর সহ অনেক সামরিক অফিসারই পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

তবে এরমধ্যে ফ্লাইট লেফটেনান্ট মতিউর রহমান ('বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব পেয়েছিলেন তিনি) পাকিস্তান বিমান ঘাঁটি থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটি বিমান নিয়ে পালিয়ে আসতে গিয়ে শহীদ হন। পাকিস্তান সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তানের মশরুর বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত একটি কবরস্থানে জানাজা ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই কবর দেয়।[৩৭৪]

বন্দী জীবনযাপনকারী বাঙালী অসিফসারদের এমন আরো রোমাঞ্চকর কাহিনী রয়েছে। পাকিস্তানীরা যখন ট্রেনে করে বাঙালী সামরিক অফিসারদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন এমনি একটি স্থানান্তরের সময় ক্যাপ্টেন এ. এম. এস. এ. আমিন (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে ভারতে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

বাঙালী অফিসারদের তখন থেকে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে দুর্গ ঘেরাও করে রাখা হতো। যখন পালাতে গিয়ে দু'একজন বাঙালী সৈন্য বৈদ্যুতিক তারে রাতের অন্ধকারে জড়িয়ে মারা গেল, তখন এই ভয়াবহ অবস্থা টের পাওয়া যায়। সে সময় পাকিস্তানে অনেকেরই 'কোর্টমার্শাল' হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়।[৩৭৫]

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে দুনিয়ার বেশীর ভাগ দেশ এ সম্পর্কে ছিল বিভ্রান্ত। বিভ্রান্তির একটি বড় কারণ ছিল পাকিস্তান ছিল একটি মুসলিম প্রধান দেশ। সংকটের

---

৩৭৪ জাহানারা ইমাম, *বীর শ্রেষ্ঠ* (ঢাকা, গণপ্রকাশনী, ১৩৯১), পৃষ্ঠা ৭১
৩৭৫ সাক্ষাৎকার : ক্যাপ্টেন (অব:) কাজী খুরশীদুজ্জামান (উৎপল)

শুরুতে পাকিস্তান ইসলামী ভাতৃত্ববোধের জিগির তোলে মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে দ্বিধার সৃষ্টি করে। তবে অনেক প্রগতিশীল মুসলিম দেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম কাতারে থাকার কারণে পাকিস্তানের ধুম্রজাল সৃষ্টির অপপ্রয়াস ব্যর্থ হয়। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্কই ছিল প্রধান ঘটনা।

ভারত প্রথম এবং প্রধান স্তম্ভ

বস্তুত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। আজীবন বৈরী পাকিস্তানে গণতন্ত্রহীনতা ও একের পর এক ভারত বিরোধী জিগির তুলে সামরিক নেতাদের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রয়াসের বিরুদ্ধে ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল না একথা কেউ বলবে না। কিন্তু এরপরেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ত্যাগ ও ক্ষতি তার রাজনৈতিক স্বার্থকে ছাড়িয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ভারতের একটি বক্তব্য স্মর্তব্য : 'বাঙালী নিধনযজ্ঞের মুখে বিশ্ববিবেক নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে পারে না'।[৩৭৬]

তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে বিশ্ব মানবতাকে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন জাগিয়ে তোলেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ জন্য সফর করে বেড়ান। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে চিঠি লেখেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে বক্তৃতা দেন।

২৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে বলেন,

"When millions of people are pushed into another's territory, jeopardising its normal life, its plans for the future, and its very security, it is obvious that peace is in peril'.[৩৭৭]

যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ৬ নভেম্বর বক্তৃতা দেন। এখানে তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে ইয়াহিয়া খানদের সম্পর্কে বলেন,

"I do not personally think that they can save Pakistan, or keep it united, or keep it strong by supporting a person who is not an elected Person, who is a military dictator,'[৩৭৮]

---

৩৭৬ Robert Jackson, *south Asian crisis* (Newdelhi, 1978) P. 150
৩৭৭ স্বাধীনতার দলিল,দ্বাদশখণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০
৩৭৮ ঐ পৃষ্ঠা ১৪৮

১০ ডিসেম্বর তিনি বক্তৃতা দেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বলেন,

"Students have played an important part in the freedom movement of their country, whether in India or abroad. ...'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে, সে প্রসঙ্গ টেনে মিসেস গান্ধী বলেন,

"We do not want to go to war. In fact we tried hard to avoid it. ... But, what is peace? Peace does not mean that we keep quiet while the people of a neighbouring country are being annihilated. This is not peace'.[৩৭৯]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সেনাবাহিনী যৌথ কমাণ্ড গঠন করে মুক্তিবাহিনীর সাথে লড়াই করে, রক্ত দেয়। এমনকি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মুক্ত হওয়ার পর ভারতীয় সেনাবাহিনী এদেশ সহসা ছাড়ছে না—এমন চিন্তাকেও কল্পনা বলে প্রমাণিত করে এবং অতিদ্রুত বাংলাদেশ ছেড়ে চলে দিয়ে দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। 'মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পশ্চিমবঙ্গবাসী তাদের দুর্বল অর্থনীতির ওপর প্রায় এক কোটি শরনার্থীর চাপ' সহ্য করে।[৩৮০]

আজ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যতো কথাই উঠুক, ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে ভারতের অবদান ছিল অনবদ্য। প্রথম থেকেই ভারতের প্রচার মাধ্যমগুলি সোচ্চার হয়েছিল যে, অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের অজুহাতে বাংলাদেশে যে গণহত্যা চলছিল তা প্রতিহত করা বাইরের পৃথিবীর নৈতিক দায়িত্ব।[৩৮১]

এছাড়া, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর রক্তের সাথে ভারতীয় সেনাদের লাল রক্ত মিশে একাকার হয়ে আছে। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধে ১,৯৭৮ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছিল, নিখোঁজ হয়েছিল, ১,৬৬২ জন এবং আহত হয়েছিল, ৫,০২৫ জন।[৩৮২]

---

৩৭৯ স্বাধীনতার দলিল, পৃষ্ঠা ১৭৯
৩৮০ *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪৪ এবং মুলধারা', ৭১, পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা ১৪৭
৩৮১ *South Asian crisis*, পূর্বোক্ত, এবং *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, পূর্বোক্ত, ২৪৩
৩৮২ ভারতীয় পার্লামেন্টে দেশরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের যুদ্ধের খতিয়ান, *আমি বিজয় দেখেছি*-গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২১৯

'বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর চীন সরকাররের পাকিস্তান ঘেষা নীতি বাঙালীদের জন্য ছিল একটি বিপন্ন বিস্ময়, বাঙালী বামপন্থী কর্মীদের জন্যে সৃষ্টি করেছিল এক গভীর হতাশা।... বিস্মিত ও হতবাক মাওলানা ভাসানীর এক আকুল আবেদন জানানোর পরেও চীনের এই নীতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি'।[৩৮৩]

ঐতিহাসিক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন-এর এ সম্পর্কিত মন্তব্য আরো উদ্ধৃতিযোগ্য: 'আদর্শগত দিক থেকে বিচার করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে চীন একটি সুপরি-কল্পিত বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। বাঙ্গালী মুক্তি সংগ্রামে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র জনতার ব্যাপক ভূমিকা তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল।এটা অনস্বীকার্য যে, আওয়ামী লীগ একটি বুর্জোয়া দল ছিল, কিন্তু এই দলটির ভূমিকাই চুড়ান্ত বিচারে কেন্দ্রীয় ছিল না। আপামর বাঙালী জনতার অংশ গ্রহণের ফলেই স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছিল। কাজেই যে কোন বিচারেই বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি গণযুদ্ধ।

...মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস মূলত চীনা রাইফেল ও অন্যান্য উন্নতমানের মারণাস্ত্র বাঙ্গালীর প্রাণসংহার করেছে।... ১৯৭১ এর মধ্যভাগ থেকে প্রায় প্রতিদিন পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে চীন একশটি লরীভর্তি সমর উপকরণ পাঠাতো।এছাড়াও গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ দানের জন্যে চীন অক্টোবর মাসে ঢাকায় দু'শ জন চীনা সামরিক বিশেষজ্ঞকে পাঠিয়েছিল'।[৩৮৪]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীন এভাবে বিরোধিতা করে, অস্ত্র পাঠিয়ে নির্বিচারে বাঙালী হত্যায় শুধু অংশীদারই হল না, সর্বশেষেও বাঙালীর স্বাধীনতাকে অপমানিত করে। ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য যখন উদিত হচ্ছে, ঠিক সে সময় চীন এক বিবৃতিতে তার ভাষায় তথাকথিত বাংলাদেশ সৃষ্টিতে রাশিয়া ও ভারতের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে। চীন এখানেই থেমে থাকলো না, তিরিশের দশকে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত তাবেদার রাষ্ট্র মাঞ্চুকোর সঙ্গে বাংলাদেশকে তুলনা করে বিবৃতি দেয়।[৩৮৫]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চীনের ভূমিকা এতোই দুঃখজনক হয়ে থাকলো যে, ৪০ দিন আগে মাত্র জাতিসংঘের সদস্য পদ ও নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী

৩৮৩ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, '*বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পরাশক্তির ভূমিকা*', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা', জুন, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ২৩৬
৩৮৪ ঐ পৃষ্ঠা ২৩৮,২৪০
৩৮৫ Peking Review, 17 December 1971

সদস্যের আসন লাভের পর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তার প্রথম যে ভেটো প্রয়োগ করে তা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে।[৩৮৬]

পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর জাতিসংঘ সদস্যপদের জন্য বাংলাদেশ আবেদন করলে চীন সে প্রস্তাবের বিপক্ষেও ভেটো দিয়েছিল। ফলে জাতিসংঘে বালাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তি অনেক দিন আটকে থাকে।

সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা

দুনিয়ার বড় শক্তিমান দেশগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে প্রথম, যে বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের নির্বিচার গণহত্যাকে নিন্দা করে।

১৯৭১ সালের ২ এপ্রিলই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে একটি পত্র লেখেন। এর ভাষা ছিল কূটনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত কড়া মেজাজের। প্রেসিডেন্ট পদগর্নি, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে লেখেন:

'মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহাশয়, ঢাকার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার খবর এবং সামরিক প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করে পূর্ব, পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে সামরিক বলপ্রয়োগ করেছেন-এই মর্মে খবর সোভিয়েত ইউনিয়নে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে।

এই ঘটনার ফলে পাকিস্তানের অগণিত মানুষের প্রাণহানি, নিপীড়ন ও দুঃখ-কষ্টের খবরে সোভিয়েতের জনগণ বিচলিত না হয়ে পারে না। মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বন্দী করায় এবং নির্যাতন করায়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ বোধ করছে। এইসব নেতারা হালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সন্দেহাতীত সমর্থন লাভ করেছিলেন...

পাকিস্তানের জনগণের কঠিন পরীক্ষার দিনে খাঁটি বন্ধু হিসেবে আমরা দু' একটি কথা না বলে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি যে পাকিস্তানে বর্তমান যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, বলপ্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবে তার সমাধান করা যায় এবং করতে হবে'।[৩৮৭]

---

৩৮৬ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০০
৩৮৭ স্বাধীনতার দলিল, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬১

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একেবারে প্রথম থেকেই, এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও যে সময় গঠিত হয়ে সারে নি, এমনি প্রাথমিক অবস্থায় ২এপ্রিলই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে নিজেকে এভাবে জড়িয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়,'এবং করতে হবে' বলে কার্যত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি, ইয়াহিয়াকে চরম ভাবেই এ ব্যাপারে হুমকি প্রদান করে ফেলেন।

তবে সোভিয়েত চিঠিতে সে সময় শুধু বাংলাদেশের গণহত্যা ও এর রাজনৈতিক সমাধানের দিকেই প্রধান ভাবে আলোকপাত করা হয়েছিল। এরপরও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন প্রসঙ্গে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির উপর মন্তব্য করলেও বাংলাদেশের 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ'-এর তাত্ত্বিক দিককে উপলব্ধি করে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যায়ে। ২৮-২৯ সেপ্টেম্বরে ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে ৩ জন সোভিয়েত শীর্ষ নেতা লিউনিদ ব্রেঝনেভ, নিকোলাই পদগার্নি ও আলেস্কি কোসিগিন এক সাথে দীর্ঘক্ষণ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলাপ করেন। এসময়:

'Brezhnev observered that "there is an element of national liberation present in the situation."[৩৮৮]

আর এর ফলেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল প্রকার সোভিয়েত বৈষয়িক সাহায্যে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র, খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহের চেয়ে সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সাহায্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হয়।

কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান সমর্থক বৃহৎশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের তৎপরতা ও বিরোধিতার মোকাবেলা বাংলাদেশের হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একাই করতে হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় রোধের জন্য সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে তিন তিনবার যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব আনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।সোভিয়েত ভেটোতে তা তিনবারই বাতিল হয়ে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সোভিয়েতের ৩টি ভেটো অনন্য ইতিহাস হয়ে আছে। কারণ যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন সে ভেটো প্রয়োগ সেদিন না করতো, তাহলে হয়তোবা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক করুণ পরিণতির দিকে আগাত।

৩৮৮ সাক্ষাৎকার : ডি পি ধর (ইন্দিরা গান্ধির রাজনৈতিক উপদেষ্টা), মঈদুল হাসানের পুর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্বৃত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ফলে সৃষ্ট জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বিপন্ন বিস্ময়।... মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের জন্যে নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন জুগিয়েছিল।'[৩৮৯]

মার্কিন জনগণ ও সে দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির একটি অংশও মার্কিন প্রশাসনের এ গণবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী মার্কিন সরকারকে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে চাপ দিয়েছিলেন এবং নিজে এসে ভারতে শরনার্থী শিবিরে লাখ লাখ বাঙালীর দুর্দশা দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। কারণ কেনেডী বুঝেছিলেন, মার্কিন অস্ত্র ও অন্যান্য সমর উপকরণ দিয়েই পুর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা হচ্ছে।

৮ এপ্রিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপতর পূর্ব পাকিস্তানের বিবদমান সমস্যাকে পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে অভিহিত করে বিবৃতি দেয়। 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' তত্ত্বের এই নীতি মার্কিন সরকার এই মুক্তিযুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখে।[৩৯০]

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঠেকাতে বিজয় দিবসের মাত্র ১২দিন পূর্বে ৪ ডিসেম্বর (১৯৭১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সহায়তায় নিরাপত্তা পরিষদে একটি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু সোভিয়েত বিরোধিতায় তা নাকচ হয়ে যায়। এমন করে ১২ডিসসেম্বর এবং ১৩ ডিসেম্বরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুন: পুন: একই রকম অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

সর্বশেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমপর্ণের অল্প দিন আগে ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠায়। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জবানবন্দীতে তার স্বীকারোক্তি রয়েছে :

"Later that after'noon (on December,9) O authorised Admiral Moorer to despatch a task force of eight ships including the nuclear aircraft carrier Enterprise, from vietnam to the Bay of Bengal.[৩৯১]

---

৩৮৯ *'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পরাশক্তির ভূমিকা'*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৮-৫৯
৩৯০ New York Times, 8 April 1971
৩৯১ The Memoires of Richard Nixon, P 870, মঈদুল হাসানের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত

কিন্তু মার্কিনীদের সে আশাও ভণ্ডুল হয়ে যায় সোভিয়েতের পাল্টা অষ্টম নৌবহর পাঠানোর কারণে। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ষড়যন্ত্র সবচেয়ে বড় আঘাত হানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শক্তির মধ্যে চর সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগের নেতা খোন্দকার মোশতাক ও সচিব পর্যায়ের আমলা মাহবুব আলম চাষী মার্কিন সরকারের গোপন 'অনুগত দাস' হিসেবে ভেতরে ভেতরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে পাকিস্তানের সাথে আপোষ রফার বিভিন্ন দিক প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলে। তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের প্রধান উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জারের স্বীকারোক্তিতে তার প্রমাণ মেলে:

'We establilished contact with the Banglesh people in calcutta'.[৩৯২]

অন্যত্র,

'on september Farland (পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদুত-লেখক) suggested to Yahya that we contact the Bangladesh Foreign Minister (তখন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ-লেখক)... we would tell him of Yahya's do willingness to engage in secret talks.[৩৯৩]

কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের পরম সৌভাগ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুচর মোশতাক চক্রের এই ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি।

ঢাকায় গোপন তথ্যগ্রুপ

মুক্তিযুদ্ধের কাজে সহায়তার জন্যে, পাকিস্তানী সরকার পক্ষের ভেতরের খবর সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকারের কাছে পৌছানোর জন্যে, ঢাকায় একটি গোপন তথ্য গ্রুপ গঠিত হয়। এদের পাঠানো তথ্যাদি তিন সপ্তাহ পর পর প্রবাসী সরকারের কাছে বিশেষ ব্যবস্থায় পাঠানো হতো। প্রবাসী সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার কাজে তাঁদের তথ্যের উপর নির্ভর করা হতো।

এই গোপন তথ্য গ্রুপের সদস্য ছিলেন, মোখলেসুর রহমান ও তার স্ত্রী, জিয়াউল হক, আনোয়ারুল আলম, আতাউস সামাদ, জহিরুল ইসলাম, রহমত-

---

৩৯২ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭
৩৯৩ Henrey Kissinger, The white House years, p870, পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত

উল্লাহ। প্রথমে মইদুল হাসান ও জামিল চৌধুরীও এর সাথে জড়িত ছিলেন। পরে তারা কলকাতায় চলে গিয়ে সমন্বয় সাধনের কাজে সহায়তা করেন।[৩৯৪]

এপ্রিল মাসেই ঢাকায় গোপন প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঢাকার 'ক্র্যাক প্লাটুন'

মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহর ঢাকার গেরিলা অপারেশন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ যেমন রাজধানী হিসেবে তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের অস্তিত্ব পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছিল সর্বোত্তম স্থান।

অন্যদিকে, ঢাকা শহর ছিল ২নম্বর সেক্টরের অধীন। এ সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ এবং সাব কমাণ্ডার ছিলেন মেজর হায়দার। তাঁদের নেতৃত্বে ছাত্র-যুবকের চার-পাঁচটি গ্রুপ গঠন করা হয়-এটা ছিল অনেকটা আত্মঘাতি স্কোয়াডের মতো। ফলে তাঁদের অপারেশন ছিল অব্যর্থ অপারেশন। একদল তরুণ তাঁদের টগবগে যৌবন বাজি রেখে নাম লিখিয়েছিল এ বাহিনীতে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা যারা দেশপ্রেম ও মেধার সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন এ ক্ষেত্রে।

ক্র্যাক প্লাটুনের অন্যতম সদস্য শহীদুল্লাহ খান বাদল (১৯৬৫ সালের ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম স্থান অধিকারী), এ এফ. এম এ হ্যারিস, বদি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি), রুমী (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), স্বপন, মাসুদ সাদেক, চুল্লু, ফতেহ আলী চৌধুরী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজী), হিউবার্ট, কাসেম, জিয়া, রানা (অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মোর্শেদ (ঢাকা মেডিকেল কলেজ), শাহাদাত চৌধুরী (বর্তমান বিচিত্রার সম্পাদক), মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান), মোক্তার, নীলু, বকুল, রুপু ম্যাক, মুজিবর, রশীদ (কুলির সর্দার), সিরাজ (প্রকৌশলী) সেকেন্দার (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) নজীব, কামাল, খালেদ, জুয়েল (পাকিস্তান টিমের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার), হাবিবুল আলম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভূগোল), প্রমুখ সাহসী তরুণ ছাত্র-মেহনতী মানুষ ছিলেন এই গ্রুপের সদস্য।

---

৩৯৪ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত

ক্র্যাক প্লাটুনের প্রথম অপারেশন ছিল ঢাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমান শেরাটন) অপারেশন। এ সময় জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান বিদেশী প্রতিনিধি নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে। পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিরীক্ষণই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল। পাকিস্তান সরকার জানিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি একেবারে স্বাভাবিক। ফলে ক্র্যাক প্লাটুন তাঁদের অপারেশনের পরিকল্পনা বেছে নেন এখানেই প্রথম। খালেদ মোশাররফ তাদের 'ব্রীফ' করে পাঠান। গেরিলা যুদ্ধ ঢাকায়ও চলছে এটা দেখানোই মূল উদ্দেশ্য। গুলশান থেকে গাড়ী ছিনতাই করে বীর মুক্তিযোদ্ধারা পৌঁছে যায় হোটেল পাশে এবং পরপর ৬টি গ্রেনেড ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। বি বি সি থেকেও সেদিন এ খবর প্রচারিত হয়।

ক্র্যাক প্লাটুনের অস্ত্রাগার করা হয়েছিল সঙ্গীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদদের বাড়ীতে (পরে আলতাফ মাহমুদকে আল বদর বাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করে)। রুমীর মা জাহানারা ইমাম ছিলেন ক্র্যাক প্লাটুনের চোখে 'গোর্কির মা' (রুমী পরে পাক হানাদারদের হাতে ধরা পড়ে, আর কখনো ফিরে আসে নি)। ২৯ আগস্ট পাকিস্তানীদের হাতে অপারেশন চালাতে গিয়ে ধরা পড়ে রুমী, জুয়েল, বদি, বাকের, আজাদ, হাফিজ ও সেকান্দার হায়াৎ। চুল্লু সাদেক, সামাদ খোনুবিল্লাহ, বেলায়েত হোসেন ধরা পড়েও পরে বেঁচে যায়।

ক্র্যাক প্লাটুন দখল করেছিল আড়াই হাজার থানা, অনেক সৈন্যের অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করেছিল এখান থেকে। ইছাপুর যুদ্ধে মুখোমুখি আক্রমণে ৫/৬ জন খান সেনাকে হত্যা করে। ঢাকার কাছে ত্রিমোহনীতে সরাসরি যুদ্ধে হত্যা করে ১৯ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে। এখানে শহীদ হয় খলিল ও বাবলু। আমেরিকান তথ্য কেন্দ্র বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয় একদিন। এছাড়া নিউমার্কেট চৌরাস্তায় পেট্রোল পাম্প, ওয়াপদা ভবন, আজিমপুর গার্লস স্কুল সহ প্রভৃতি স্থানে বোমা মেরে ক্র্যাক প্লাটুন পাকিস্তানী সেনাদের নাভিশ্বাস উঠিয়ে ছাড়ে।[৩৯৫]

মুক্তিবাহিনীর হাতে মোনায়েম খান নিহত

১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সকল দুষ্কর্মের সাথী আবদুল মোনায়েম খান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ১৩ অক্টোবর তাঁর স্থায়ী বাসভবনে নিহত হন। ১৯৬৯ সালে

৩৯৫ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, সচিত্র সন্ধানী, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৮৬, পাক্ষিক ঘর সংসার, ৫ ডিসেম্বর ১৯৮৯ এবং *পূর্ব-পশ্চিম* একাত্তরের দিনগুলি, ইত্যাদি গ্রন্থ অনুসৃত

গণঅভ্যুত্থানের স্রোতে তাঁকে পদত্যাগ করে করুণ বিদায় নিতে হয়। এ সময় তিনি বাঙালীদের চরম ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন।[৩৯৬]

মোনায়েম খান যখন নিহত হন তখন তাঁর বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তানের আইয়ুব আমলের মন্ত্রী আমজাদ হোসেন প্রমুখসহ তিনি খোশগল্প করছিলেন। মুক্তিবাহিনীর একটি দল যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল নবম শ্রেণীর একজন কিশোর, সে-ই মোনায়েম খানের উপর গুলী চালায়। এরপর মোনায়েম খানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

'অত্যন্ত নির্মম হলেও সত্য, শেষ পযর্ন্ত তাঁকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়েছে। ৭১-এর ১৩ অক্টোবর রাতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পর তিন ঘন্টা পর্যন্ত নাকি ডাক্তাররা তাঁর কোনো চিকিৎসাই করেন নি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি নাকি এই আক্ষেপ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, 'আমি এদেশে ডাক্তার তৈরীর জন্যে সাতটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেছি অথচ মৃত্যুর সময় আমিই কোনো চিকিৎসক পেলাম না।'[৩৯৭]

আজিমপুর নতুন কবরস্থানে মোনায়েম খানকে কবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাতে মুক্তিযোদ্ধারা তার লাশ কবর থেকে তুলে নদীতে ফেলে দেয়।

'মোনেম খানের অপবিত্র লাশ তুলে দেওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে একখানা কাগজে কতিপয় কথা লিখে রেখে যায়। তাতে বলা হয়:

'অন্যান্য দালালদেরও মোনেমেরই দশা হবে। তাদের কুকুরের মত হত্যা করা হবে। তারপর তাদের লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হবে বা শিয়াল কুকুরের উদরপূর্তির কাজে লাগান হবে যাতে মৃত্যুর পরে তারা বাংলার মাটিকে অপবিত্র করতে না পারে'।[৩৯৮]

যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েকটি ঘটনা

সারাদেশেই মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস চলেছে একাধারে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ। খণ্ড খণ্ড হয়ে মুক্তিবাহিনীর তাজা প্রাণ ছাত্র-যুবকরা এতে অংশ নিয়েছে। সম্মুখ সমরে তারা

৩৯৬ সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ, ১৭ অক্টোবর ১৯৭১
৩৯৭ মো: নুরুল ইসলাম, *গর্ভণর মোনায়েম খানকে আজ যে চোখে দেখছি* (পুস্তিকা) (ঢাকা : ভয়েস পাবলিকেশন্স, ১৩৯৬) পৃষ্ঠা ১৮
৩৯৮ সাপ্তাহিক জয়বাংলা, ১২নভেম্বর ১৯৭১

পাকিস্তান থেকে আগত সৈন্য এবং তাদের এদেশীয় সমর্থক রেজাকার-আলবদর বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সে সব লক্ষ-কোটি ঘটনা। তার পুরোটা এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। দু'একটি ঘটনা, যা ছাত্র-যুবকদের মধ্যে এনেছিল প্রাণের স্পর্শ তা এখানে উদ্ধৃত করা হল।

কুমিল্লার বেতিয়ারা নামক একটি গ্রাম। এখানে আশ্রয় নিয়েছিল ছাত্রদের একটি মুক্তিযোদ্ধার দল। দলটি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নিয়মিত গেরিলা বাহিনী দ্বারা সংগঠিত ছিল। এদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয় পাকিস্তানী বাহিনীর। যুদ্ধে কয়েকজন ছাত্র শহীদ হন। তারই একটি স্মৃতিচারণ:

'১১ই নভেম্বর। রাত দশটা তিরিশ মিনিট। কুমিল্লা জেলার জগন্নাথ দীঘির কাছে সরকারী সড়কে ঘটনাটা ঘটেছিল। রাতটা ছিল অত্যন্ত অন্ধকার। আমাদের দু'টো দল সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। যাব সাতবাড়ীয়া। পিছনে পড়ে রইল ভারতের ভৈরব টিলা। ধান ক্ষেতের আল বেয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি--পিঠে গুলীর বোঝা। হাতে শক্ত করে ধরা হাতিয়ার। মাঝে মাঝে হাঁটুপানি। কোথাও জমির আল এত সরু যে পড়ে যাবার ভয়। প্রায় আধ মাইল আসার পর আমরা একটা পোড়া গ্রামের মাঝে ঢুকে পড়লাম। অন্ধকার যেন আরও বেড়ে গেল। দশ হাত দূরের লোক দেখা যায় না, গাছপালা ঘেরা থাকায়। গ্রামটা পার হয়ে আবার মাঠে পড়লাম। ধানে ভরে গেছে ক্ষেতগুলো। একটা ছমছমে আবহাওয়া। তবু যখনি বাংলার মাটিতে পা দিয়েছি সাহস বেড়েছে হাজার গুণে।

আমরা প্রায় সরকারী সড়কের কাছাকাছি এসে গেছি। হঠাৎ ''হ্যাণ্ডস আপ'' কমাণ্ড এলো রাস্তার অপর পাড় থেকে। গাইড থমকে দাঁড়ালো সাথে সাথে, গ্রুপ কমাণ্ডার আজাদ বুঝে নিয়েছে পরিস্থিতি। সামনে সমূহ বিপদ। ওর হাতের ষ্টেনগান গর্জে উঠলো। গর্জে উঠলো কয়েকজনের রাইফেল। কিন্তু তখন আমাদের তিনদিক থেকে খান সেনারা আক্রমণ শুরু করেছে। আমরা শুয়ে পড়ে পজিশন নিলাম; কিন্তু ধান ক্ষেতের পানিতে অনেকে ডুবেই গেল। বুঝলাম আমাদের ওরা তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। কয়েক রাউণ্ড গুলী চালালাম। কিন্তু ওদের গুলীর ঝাঁক বেড়ে চলেছে। গাড়ীর শব্দ হল। বুঝলাম ওদের রিইনফোর্সমেন্ট এসে গেছে। পিঠের বাঁধা বোঝা নিয়ে লড়ে চলা খুব কঠিন। তাই চিৎকার করে বাঁদিক দিয়ে ঘেরাও থেকে বেরিয়ে যেতে অর্ডার দিলাম।

কিন্তু কয়েকজনকে এগিয়ে যেতে দেখলাম বোধ হয় আমার কমাণ্ড শুনতে পায়নি। ও টা কে, দুদুমিয়া গুলী খেল। চিৎকার শুনলাম ''জয় বাংলা'', আবার উঠে

দাঁড়িয়ে গুলী খেল, ''জয় বাংলা'', তারপর পতনের শব্দ। এতক্ষণে শেলিং পড়ছে আমাদের চারধারে। গেরিলারা মাথা নিচু করে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল বাম দিক লক্ষ্য করে। প্রায় সবাই বেরিয়ে এল শেল মাথায় করে। প্রায় তিনশ' গজ দূরে সরে এসে নিচু হয়ে দৌড়ে নিরাপদ স্থানে এসে পৌঁছেছে সবাই। তখন আমাদের ফেলে আসা জায়গায় মুহুর্মুহু শেল পড়ছে।

আমি ষ্টেন ছেড়ে রাইফেল নিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। ঘটনাস্থলের দিকে ওদের ফিরিয়ে আনতে, যারা এখনও আমার কমাণ্ড শুনতে পায়নি। কারা যেন আমাকে জড়িয়ে ধরল, কানে এলো-না আপনি যেতে পারবেন না, আপনি গেলে আমাদের চালাবে কে? পৃথিবীটা আমার চোখের সামনে ঘুরছে, তারা যেন আমার নাম ধরে ডাকছে, প্রচণ্ড কামানের গর্জনকে ছাপিয়ে তাদের কথা শুনছি, তারা বলছে, আমাদের বিদায় দাও।

পরে চোখ খুলে দেখি সবাই আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ভারাক্রান্ত মুখে। মাথা টলছে তবু উঠে দাঁড়ালাম, সবাইকে আরও নিরাপদে পাঠিয়ে আমরা কয়েকজন রয়ে গেলাম, যদিও খুব নিরাপদ স্থান নয়, যে কোন সময় শেল পড়তে পারে, তবুও ওদের ফিরে আসার আশায়।

পরের দিন ভোর বেলায় খবর পেলাম আমাদের পাঁচজন গেরিলা শহীদ ও চারজন গেরিলা ধরা পড়ে গেছে। শত্রু সৈন্যদের কয়েকজন খতম হয়েছে। আমরা আহতদের হাসপাতালে পাঠালাম। এই ঘটনার পর আমরা হাতিয়ার হাতে প্রতিজ্ঞা করলাম, এরপর আর গেরিলা কায়দা নয়। রেগুলার আর্মির মত মুখোমুখি হব'।৩৯৯

মুক্তিযুদ্ধের সময় একদল তরুণ ছাত্র যুদ্ধক্ষেত্রের খবরা-খবর প্রেরণ করতেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে। স্বাধীন বাংলা সরকার এসব খবর প্রেরণের জন্য মোট ৬জন রণাঙ্গন প্রতিনিধি (war correspondent) নিয়োগ করেন। এদের একজনের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের বিভিন্ন কাগজ-পত্র দেখার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল। তা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কতকগুলি খণ্ডচিত্র ভেসে আসে।

---

৩৯৯ ইয়াফেস ওসমান, *'মুক্তি সংগ্রামের কয়েকটি দিন'* 'বেতিয়ারার সহাযোদ্ধার লাশ' (স্মরণিকা), মুহাম্মদ হিলালউদ্দিন প্রকাশিত, ১৯৭৮

এই রণাঙ্গন প্রতিনিধির প্রেরিত একটি সংবাদের মূল কপি (খানিকটা ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া যায়)। তা বর্তমান লেখকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। এতে লেখা রয়েছে:

'২৪ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর আরেকটি দল ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জ থানার কুখ্যাত দালাল আবদুল খালেক মেম্বারকে মুক্তিবাহিনী বন্দী করে নিয়ে আসে। এই দালালটি ৪ জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছিল। আত্মরক্ষার জন্য দালাল খালেক জনৈকা মহিলার অন্তর্বাসের মধ্যে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তবুও সে বাঁচতে পারে নি। দালালদের ভাগ্য লিপিতে যা লেখা রয়েছে, তাকেও সেই ভাগ্যবরণ করতে হয়। লোকটি গ্রামের নিষ্পাপ সরল মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে পাক সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য উপহার দিত।'

আরেকটি রিপোর্টের অংশ বিশেষ :

'সাপ্তাহিক রিপোর্ট : ১৮ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর'

'....২১ নভেম্বর ল্যাফটেনেন্ট আলমের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানী বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণ করে। এ সংঘর্ষে শত্রুপক্ষের মোট ১০ জন নিহত এবং অজ্ঞাত সংখ্যক আহত হয়েছে। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ৩ ইঞ্চি মর্টার ব্যবহার করে। একই দিন মুক্তিবাহিনীর নৌ কমাণ্ডোরা ঐ অঞ্চলে একটি লঞ্চ ডুবিয়ে দেয় এবং একটি ডিজেল রেল ইঞ্জিন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। এছাড়া ঘাটের ষ্টীমার ফ্লাটের অংশ বিশেষেরও বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। কমাণ্ডোরা দু'টি রেলওয়ে ওয়াগনও উড়িয়ে দেয়'।[৪০০]

রণাঙ্গন প্রতিনিধির ডায়রীর একটি ছেঁড়া অংশ :

'বাংলাদেশ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে চলেছে। দিনের পর দিন বাংলার দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তাঞ্চলের সীমানা বাড়িয়ে চলেছেন। আর হানাদার খান সেনারা দিনের পর দিন পিছু হটে চলেছে। যে পিছু হটা একদিন শেষ হবে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের বুলেটের মুখে, নয় পাঞ্জাবের ধূসর মরুতে।

কিন্তু বুকের তাজা রক্ত ঢেলে মুক্তিযোদ্ধারা যে বাংলাকে মুক্ত করছেন, সেই মুক্ত বাংলায় জীবনযাত্রা কেমন চলেছে? কি ভাবছে সেই মুক্ত বাংলার মুক্ত মানুষগুলো'?....[৪০১]

---

৪০০ মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন প্রতিনিধি জনাব হারুন-উর-রসিদ এর পাঠানো প্রতিবেদনের খসড়া থেকে সংগৃহীত
৪০১ রণাঙ্গন প্রতিনধি হারুন-উর-রসিদের ডায়রী

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই পূর্ব ও পাশ্চিমাঞ্চল উভয় সীমান্তেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের প্রত্যক্ষ সামরিক ভূমিকার সমস্যা ছিল অনেক। কারণ আন্তর্জাতিকভাবে ভারতের জোটনিরপেক্ষতার একটা ভাবমূর্তি ছিল। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত যেভাবে ঝুঁকে পড়েছিল তার সম্ভাব্য পরিণতি এড়ানো অসম্ভব ছিল। ফলে ৯ আগস্ট ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে। কোনো কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেছেন এই মৈত্রী চুক্তি 'অপ্রত্যাশিত ছিল'।[৪০২]

যেদিন মস্কোতে এ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, ঠিক সেদিনই পাকিস্তান থেকে পুনরায় শেখ মুজিবের বিচারের কথা বলা হয়। কিন্তু এবারের সুরে একটু কড়া মেজাজ ছিল। বলা হয়েছিল, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য' শেখ মুজিবের বিচার করা হবে। দোসরা অক্টোবর পাকিস্তানের সামরিক আদালত শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে এমন একটা খবর আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হয়।[৪০৩]

অক্টোবরের শেষ দিকে ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের যুগ্মকমাণ্ড গঠন করা হয়। কর্নেল ওসমানী এর বিরোধিতা করেন, কার্যত তিনি পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুল করিম খোন্দকার (প্রাক্তন পারিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে. খোন্দকার —লেখক) মূলত এই সময় প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আর এই জন্যই মূলত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে ওসমানী নয়, এ. কে. খোন্দকারই বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। যদিও ওসমানীর থাকার কথা ছিল, কিন্তু সিলেটে সেদিন তার বিমান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গুলীতে অকেজো হয়ে যায় এবং তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।

১১ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী বাহিনীর দ্বিতীয় সেনাপতি মেজর জেনালের রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট-এর কাছে প্রেরিত এক তার বার্তায় আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি পাকিস্তানী সৈন্য ও অবাঙালী নাগরিকদের নিরাপত্তার অনুরোধ জানান।

৪০২ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭১
৪০৩ DAWN, 10 Augst 1971

এ খবর পেয়ে ইসলামাবাদ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পাল্টা আরেকটি বার্তায় রাও ফরমান আলীর বার্তাকে গ্রহণ না করার জন্য উথান্টকে অনুরোধ করেন।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামাবাদের সিংহাসনে বসে ইয়াহিয়া-ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের মিত্রদের করুণ অবস্থা বুঝতে অসমর্থ হয়েছিলেন। সারা পূর্ব পাকিস্তানে একের পর এক পাকিস্তানীদের দখলদারীর অবসান ঘটছিল। বিভিন্ন সেকটরের থানাগুলিতে মুক্তিবাহিনীর বিজয় অব্যাহত ছিল। 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে তখন বাংলাদেশের পথ-প্রান্তর প্রকম্পিত।

দ্রুতই ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর যৌথ বাহিনী ঢাকার পতনের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। ১২ ডিসেম্বর ঢাকার আশপাশ অঞ্চল নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর, কেরাণীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কালিয়াকৈর, নরসিংদী প্রভৃতি এলাকায় ভারতীয় বাহিনীর ছত্রী সেনারা অবতরণ করে। হাজার হাজার মানুষ করতালির মাধ্যমে এ দৃশ্য উপভোগ করে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলো ঢাকার আশপাশ দিয়ে খেলনা ঘুড়ির মতো উড়ে বেড়াতে লাগলো। তারা পাকিস্তানী সেনাদের উপর বোমা মেরে তাদের ব্যাংকারগুলি ধ্বংস করতে পারছিল না। কারণ এসব ব্যাংকারগুলির উপর পাকিস্তানী সৈন্যরা বাঙালী নারী-পুরুষদের বেঁধে ফেলে রেখেছিল। এসব যায়গায় পাকিস্তানী লক্ষ্য বস্তুর উপর বোমা মারলে মারা যেত মুক্তিকামী বাঙালীরাই। ফলে ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য বোমা মারতে লাগলো তেলের ট্যাংকীর উপর। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকলো। কালো ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ঢাকার আকাশ।

'প্রিয় আব্দুল্লাহ, এসে পড়েছি'

১৬ ডিসেম্বর সকাল দশটায় মেজর জেনারেল নাগরার নেতৃত্বে প্রথম ভারতীয় বাহিনী সাভার-মিরপুর সড়ক দিয়ে বিপুল করতালি ও জয়বাংলার মুহূর্মুহূ ধ্বনির মধ্য দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করে। তাঁর সাথে ছিল বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কাদের সিদ্দিকীর দল। এর আগে সকাল ৮.৩০ মি: জেনারেল নাগরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের নায়ক জেনারেল আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীর কাছে একটি চিঠি পাঠান (দুই শত্রুর পক্ষের এই দুই জেনারেল আবার কলেজ জীবনের বন্ধু ছিলেন)। চিঠিতে নাগরা লেখেন,

'প্রিয় আব্দুল্লাহ,

আমরা এসে পড়েছি। তোমার সব বাহাদুরি আর খেলা শেষ। আমরা তোমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছি। বুদ্ধিমানের মতন আত্মসমর্পন কর।.....

তোমার নাগরা
সকাল ৮.৩০ মি:
১৬.১২.৭১'

এর কিছুক্ষণ পরেই ভারতের পূর্বাঞ্চল যুদ্ধের একজন অধিনায়ক জেনারেল জ্যাকব পূর্বাঞ্চলে বিমান দিয়ে ঢাকায় অবতরণ করলেন। বিকেলে আসলেন পূর্বাঞ্চলে ভারতের সেনাপতি জেনারেল অরোরা।

শত্রুমুক্ত বাংলাদেশ

আত্মসমর্পণের ভাষা ঠিক করা হল। একটি দলিল তৈরী করা হল। তাতে লেখা হল:

'The pakistan eastern command agree to surrender all pakistan armed Forces in Bangladesh to Lieutenant General Jagtit Singh Aurora, General officers commanding in chief of the indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre.'[৪০৫]

কিন্তু দলিলে অন্তর্ভুক্ত 'ভারত-বাংলাদেশের যৌথ কমাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ' এ কথাটিতে পাকিস্তান পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হলো। তাঁরা 'বাংলাদেশ' শব্দটি বাতিল করার দাবী জানায়, কারণ বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে তাদের 'আত্মসম্মানে' বাধে। কিন্তু ভারতীয় সেনাপতি 'বাংলাদেশ' শব্দ মুছে দিতে অস্বীকার করেন, তিনি দলিলের ভাষায় অনঢ় থাকেন।

বিকেল তখন ৪.৩১ মিনিট এবং ৪.৩১ মিনিট। তারিখ ১৬ ডিসেম্বর। সাল ১৯৭১। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হল। বাংলাদেশ স্বাধীন হল। হাজার বছরের বাঙালীর স্বপ্নসাধ পূরণ হল আজ এবং এই সময়টিতে।

---

৪০৪ *পূর্ব-পশ্চিম*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮৫
৪০৫ *Bngladesh Documents*, II, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫০

পাকিস্তানী সেনাপতি নিয়াজী নাকে খত দিয়ে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। নিয়াজীকে সবাই 'টাইগার' বলতো। টাইগারের চোখে পানি এসে গেল।

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমাণ্ড আত্মসমর্পণ করার জন্য যে স্থানটি বেছে নিয়েছিলেন সেই রেসকোর্স ময়দানে এ বছরই মাত্র নয় মাস আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলে শ্লোগান তুলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'। বাংলাদেশ পক্ষে এ সময় উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খোন্দকার ও মেজর হায়দার।

ফুলের মালা আর থুতুর ছটা

মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আকাশের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে গুলী বর্ষণ করতে লাগলো—''জয় বাংলা''। প্রকম্পিত হয়ে উঠলো ঢাকার রাজপথ, অলি-গলি, বাসা-বাড়ী। স্রোতের মতো মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসলো। নয় মাস পর তারা মুক্ত বায়ুর ঘ্রাণ নিতে থাকলো জোরে-জোরে নিশ্বাস টেনে। ভারতীয় সৈন্যদের ট্রাক দেখলেই লোকে ছুঁড়ে দিতে লাগলো ফুলের পাপড়ি আর পাকিস্তানীদের দিকে থুথু।

এই থুথু ছিটানো শুরু হয়েছিল সকাল থেকেই। যখন বিমানে করে জেনারেল জ্যাকব ঢাকায় আসেন তখন তার সাথে ছিলেন একজন আমেরিকান। কিন্তু বাংলাদেশের একজন কর্মকর্তা ভারতীয় সেনাপতিকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে আমেরিকানের সাথে হাত মেলাতে অস্বীকার করলেন। গায়ে ছুঁড়ে দিলেন থুথু।[৪০৬]

মানুষে মানুষে ঠাসা হয়ে যায় রাজপথ। হাঁটা যায় না। এর বর্ণনা দিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় :

'রাস্তায় মানুষের ভিড়ে গায়ে গা ঠেকে যায়। অচেনা লোকজনও এসে হঠাৎ হঠাৎ আলিঙ্গন করছে। চতুর্দিকে উদ্দাম কোলাহল। এ যেন এক অচেনা নগরী। গোলাগুলির শব্দের সঙ্গে একটা ভয়ের অনুষঙ্গ থাকে, আজ চতুর্দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের উল্লাস ধ্বনি। আর শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত গর্জন--জয়বাংলা'।[৪০৭]

---

৪০৬ *আমি বিজয় দেখেছি*, পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা ২৩০
৪০৭ *পূর্ব-পশ্চিম*,পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা, ৪৮৮

উৎফুল্ল মানুষের স্রোত ভেসে চললো রেসকোর্সের দিকে। তারা পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে পেতে চায়। ভারতীয় সৈন্যরা বাঙালী মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে আটকে রাখলো। রক্তের প্লাবন বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলো সবাই।

এর মধ্যে নতুন বিপদের আবির্ভাব হল। রাস্তায় রাস্তায় ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সৃষ্টি হল। '১৬ ডিসেম্বর রাত্রি থেকে বিজয়োল্লাসে মত্ত যে সব 'মুক্তিযোদ্ধা' পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ১৭ই ডিসেম্বরে দেখা যায় তাদের অনেকের হাতেই চীনা 'AK47' রাইফেল ও ষ্টেন গান। এই সব অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করার কোন প্রশ্ন ছিল না। বস্তুত: এইসব অস্ত্রধারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কখনো মুক্তিযোদ্ধাই ছিলনা- অন্তত: মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ইউনিট নেতাই এদের সনাক্ত করতে পারে নি।.... মুখ্যত: এদের হাতেই ছিল পাকিস্তানী সৈন্য এবং সমর্থকদের ফেলে দেওয়া অস্ত্র.... ষোলই ডিসেম্বর নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পর এই বাহিনীর উৎপত্তি ঘটে বলেই অচিরেই ঢাকাবাসীর কাছে এরা "sixteenth Division' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কাল-ক্ষেপণ না করে এদেরই একটি অংশ অন্যের গাড়ী, বাড়ী, দোকান-পাট, স্থাবর ও অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে দখল করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে'।[৪০৮]

বস্তুত: ঢাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে বিজয় উল্লাসের মধ্যে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদীর আচরণে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিদেশী সাংবাদিক ও টেলিভিশনের সামনে 'অজ্ঞাত অভিযোগে' চারজন বন্দীকে এনে কাদের সিদ্দিকী প্রকাশ্যে তাদের পিটিয়ে হত্যা করে বেয়নেট বিদ্ধ করে রাখে। এই নারকীয় সচিত্র টেলিভিশন প্রতিবেদন বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত হয়। অবশেষে ভারতীয় বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়।[৪০৯]

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিছু অংশের মধ্যেও শৃঙ্খলা ভঙ্গের উৎসাহ পরিলক্ষিত হল। একদল যশোর, কুমিল্লা, ঢাকা, চট্রগ্রামের ক্যান্টনমেন্ট ও খুলনার শিল্পাঞ্চলে লুটপাট শুরু করে।[৪১০]

---

৪০৮ মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত
৪০৯ ঐ পৃষ্ঠা ২৪৪
৪১০ ঐ পৃষ্ঠা ২৪৫

এরও বর্ণনা পাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায়:

'মুক্তিযোদ্ধারা যাতে প্রতিশোধ নিতে শুরু করে না দেয় তাই বিভিন্ন জায়গায় নিযুক্ত করা হয়েছে ভারতীয় সেনাদের। বিজয়ের গর্বে তারাও বাড়াবাড়ি করে ফেলছে অনেক জায়গায়। আইন-শৃঙ্খলার কোনো রক্ষক নেই বলেই গুণ্ডা বদমাস শ্রেণী শুরু করে দিয়েছে লুটপাট। অবাঙালীদের বাড়িঘর লুন্ঠনের তো একটা নৈতিক সমর্থন আছেই। ভারতীয় সেনারা অবাঙালী হলেও তারাও অনেক জায়গায় হাত মেলাচ্ছে সেইসব লুন্ঠন যজ্ঞে। ঢাকায় এতসব বিদেশী জিনিস পাওয়া যায়, এসব তো আগে দেখেনি ভারতীয়রা। রেফ্রিজারেটার, টি.ভি, টু ইন ওয়ান, কার্পেট, টিনের খাবার এই সব ভর্তি হতে লাগলো ভারতীয় সৈন্যদের ট্রাকে। শুধু সেই বিজয় উন্মত্ত সৈনিকেরা বাংলাদেশের সুন্দরী মেয়েদের দিকে হাত বাড়াতে সাহস করলো না, সে ব্যাপারে তাদের ওপর গোড়া থেকেই কঠোর নির্দেশ ছিল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী।'[৪১১]

ইন্দিরার সংযম

বাংলাদেশের জন্ম দুনিয়ার দেশে দেশে ঘোষিত হতে লাগলো। সকল টেলি-প্রীন্টারের পাতায় ভরে উঠলো *"BIRTH OF A NATION."* বিশ্বের সকল গণমাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বরের প্রধান খবর -'বাংলাদেশ।'

দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন:
'Dacca is now the free capital of a free country'.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন মনোরম ভঙ্গীতে:

'সন্ধ্যের সময় দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী যুদ্ধ জয়ের ঘোষণায় আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন, 'এই জয় নিয়ে আমাদের গর্ব করার এমন কিছুই নেই। দু'পক্ষেরই বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে। আমাদের আসল যুদ্ধ তো দারিদ্র্যের সঙ্গে।'[৪১২]

---

৪১১ *পূর্ব পশ্চিম*, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৮৭
৪১২ ঐ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭৮

বিজয়ের আনন্দে যখন বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত, তখন এই আনন্দে একটা বিষাদের ছায়া সকলের মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই বিজয়ের পশ্চাতে যিনি মূলনায়ক, যিনি গত তেইশ বছর পাকিস্তানী জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে এসেছেন আর লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, সেই বঙ্গবন্ধু আজ জনগণের আনন্দে অংশ নিতে পারছেন না। তিনি পাকিস্তানী কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করছেন।

কিন্তু এই দু:খ ভারাক্রান্ত বিষাদিত মনকে অন্য যে খবর একেবারে ম্লান ও স্তব্ধ করে দিল তা আরো করুণ, ভয়াবহ। বাংলার মানুষ সে খবর শুনে শিউরে উঠলো, আর্তনাদ করে উঠলো বিজয় উল্লাসে মত্ত বাংলার মানুষ। শোকে মুহ্যমান হল সংগ্রামী জনতা, যখন শুনলো তাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিজয়ের মাত্র ১দিন আগে (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১) আল বদররা ধরে নিয়ে গিয়ে কুচি-কুচি করে হত্যা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংবাদিক, ডাক্তার, শিল্পী, লেখকদের রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে আলবদর বাহিনী।

অবশ্য ২৫ মার্চ রাত থেকেই শুরু হয়েছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড। এদিন রাতে বাংলার বিশিষ্ট দার্শনিক জি সি দেবকে হত্যা করে পাকিস্তানী সেনারা। জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে হত্যা করে। হত্যা করে আরো অনেক শিক্ষক-সাংবাদিককে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত একটানা সারাদেশের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের হত্যা করা হয়। এই পর্যায়ে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে শুধু পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘ এবং মুসলিম লীগের নেতাকর্মীরা পথ চিনিয়ে দেয় মাত্র।
নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝ পর্যন্ত ঢাকা ও সারাদেশে বেছে বেছে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়, তা করে একমাত্র জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র সংঘের বাহিনী--আল বদর গোষ্ঠী। পাকিস্তানী সেনারা এ সময় ছিল এদের সহযোগী মাত্র।

১৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার -এর মতো লোকজনদের যে হত্যা করা হয় তা ছিল আল বদর বাহিনীর দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার অংশ বিশেষের বাস্তবায়ন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি রাও ফরমান আলী ও আলবদর বাহিনীর প্রধান

জল্লাদ আশরাফউজ্জামান খানের পৃথক পৃথক যে দুটি ডায়রী আবিস্কৃত হয়েছে, তাতে রয়েছে হত্যা-তালিকার অদ্ভুত মিল। ডায়রী দুটিতে বুদ্ধিজীবীদের যে তালিকা রয়েছে তাতে অনেককেই হত্যা করা হয়েছিল ডিসেম্বরের পূর্বেই। তালিকার অনেককে হত্যা করার সময় পায় নি আল বদররা। এর মধ্যে ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও প্রফেসর কবীর চৌধুরী অন্যতম।

৭ নভেম্বর ইসলামী ছাত্রসংঘ ঘটাকরে সারাদেশে যে আল বদর দিবস পালন করে, প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই শুরু হয় বুদ্ধিজীবী হত্যার আয়োজন। আল বদররা 'শয়তান নির্মূল অভিযান' -এর নামে এ সময় বুদ্ধিজীবীদের কাছে 'শনি' নামে চিঠি পাঠায়। চিঠিতে এরা বুদ্ধিজীবীদের হুমকি দিয়ে লেখে :

'তোমার মনোভাব, চালচলন ও কাজকর্ম কোনটাই আমাদের অজানা নেই।... এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নির্মূল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।-শনি'[৪১৩]

৪ ডিসেম্বর থেকে বুদ্ধিজীবীদের অপহরণের জন্য কারফিউ এবং ব্ল্যাক আউট শুরু হয়। ১০ ডিসেম্বর কাদামাটি মাখানো একটি বাসে অপহরণ করা অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিকদের তোলা হয় এবং প্রথমে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে স্থাপিত আলবদর সদর দপ্তরে। কাউকে গভীর রাতে ঘুম থেকে তুলে, কাউকে দুপুরে খাবার টেবিল থেকে, যে, যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায়ই, সেই পোশাকেই তুলে নিয়ে যায় আলবদররা।[৪১৪]

মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে নৃশংস নির্যাতন চালানো হয় বুদ্ধিজীবীদের উপর। এরপর রায়ের বাজারের ইটখোলা, কাটাসুরের বধ্যভূমি, শিয়ালবাড়ী প্রভৃতি এলাকায় তাদের নৃশংসভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কুচি কুচি করে কেটে হত্যা করা হয়। ফলে চেহারা দেখে বুদ্ধিজীবীদের সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি, তাদের পরণের লুঙ্গি, শার্ট ও অন্যান্য পোশাক দেখে আত্মীয়-স্বজনরা তাদের চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়। বধ্যভূমি আবিস্কৃত হওয়ার পরপর প্রকাশিত দৈনিক পূর্বদেশের রিপোর্ট পড়ে পাঠক শিহরিত হবেন ইতিহাসের সেই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিকতার বিবরণ পড়ে,জামায়াতে ইসলাম ও তার সহযোগী ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ (বর্তমান ইসলামী ছাত্র শিবিরের পূর্বতন নাম) ধর্মের নামে এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল :

---

৪১৩ *একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা,কে কোথায়,* পৃষ্ঠা ১৪১
৪১৪ ঐ পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩

'যদি না যেতাম সেই শিয়ালবাড়িতে। তাহলে দেখা হতো না ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায়কে। অনুসন্ধিৎসু হিসেবে যা দেখাও কোন মানুষের উচিত নয়।...

কাটাসুরের হত্যাকাণ্ডকে মোটামুটি একটা থিওরিতে ফেলা যায়। একে যে কোন হিসেবে কোন থিওরিতে ফেলা যায় না।... ক'হাজার লোককে সেখানে হত্যা করা হয়েছে? যদি বলি দশ হাজার, যদি বলি বিশ হাজার, কি পঁচিশ হাজার তাহলে কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন?... আমরা শিয়ালবাড়ির যে বিস্তীর্ণ বন-বাদাড়পূর্ণ এলাকা ঘুরেছি তার সর্বত্রই দেখেছি শুধু নরকঙ্কাল আর নরকঙ্কাল।... দেখেছি কুয়ায় কুয়ায় মানুষের হাড়।...

ইতিহাসে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করার অনেক কাহিনী পড়েছি। কিন্তু শিয়ালবাড়িতে ঐ পিশাচরা যা করেছে এমন নির্মমতার কথা কি কেউ পড়েছেন। শুনেছেন বা দেখেছেন? কসাইখানায় কসাইকে দেখেছি জীবজন্তুর গোশতকে কিমা করে দিতে। আর শিয়ালবাড়িতে গিয়ে দেখলাম কিমা করা হয়েছে হাড়। একটা মানুষকে দু'টুকরো করলেই যথেষ্ট পাশবিকতা হয়। কিন্তু তাকে কিমা করার মধ্যে কোন পাশবিক উল্লাস?'[৪১৫]

এই সময়ে দৈনিক পূর্বদেশ মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের উদ্বৃতি দিয়ে জানায়, হানাদার পাকবাহিনীর সহযোগী আল বদররা যখন পালিয়ে যায়, তখন তাদের হেড কোয়ার্টারে পাওয়া যায় এক বস্তা বোঝাই চোখ।[৪১৬]

আল বদরদের হাতে নিহত সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের লাশের অজস্রতার কারণে তা দাফন করাও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সনাক্তহীন অবস্থায় পড়ে থাকা লাশের স্তুপ অবিলম্বে দাফন করার আবেদন জানায় দৈনিক বাংলা তাদের ২০ ডিসেম্বর সংখ্যায়।[৪১৭]

দৈনিক আজাদ জানায়, আর এক সপ্তাহ সময় পেলেই আলবদর বাহিনী সকল বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ফেলতো। গ্রেফতারকৃত আলবদর বাহিনীর কতিপর সদস্যের স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করে দৈনিকটি এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করে।[৪১৮]

---

৪১৫ দৈনিক পূর্বদেশ, আনিসুর রহমানের প্রতিবেদন, ৮ জানুয়ারী ১৯৭২
৪১৬ দৈনিক পূর্বদেশ, ১৯ জানুয়ারী ১৯৭২
৪১৭ দৈনিক বাংলা, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
৪১৮ আজাদ, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

জামায়াতে ইসলামীর নেতা (ঢাকা শহর জামাতের দপ্তর সম্পাদক, ১৯৭১) আবদুল খালেক মজুমদার (তিনি ১৪ ডিসেম্বর রাতে সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করে হত্যা করেছিলেন) জানায়, একমাত্র ঢাকা শহরেই বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য ৫০০ আলবদর নিয়োজিত ছিল।[৪১৯]

ঢাকা শহরে আল বদরদের প্রধান ঘাতক ছিল ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং জামায়াতে ইসলাম ও আলবদর হাই কমাণ্ডের সদস্য আশরাফউজ্জমান খান। সে মিরপুরের বধ্যভূমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষককে জবাই করে হত্যা করে। যে গাড়িতে করে শিক্ষকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে গাড়ীর ড্রাইভারের স্বীকারোক্তিতে একথা জানা যায়। এ ঘাতকের বাড়ী থেকে যে ডায়রিটি উদ্ধার করা হয় তাতে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ২০জন শিক্ষকের নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল। ১৪ ডিসেম্বর এ তালিকার ৮জন শিক্ষককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[৪২০]

খালেক মজুমদার, শহীদুল্লাহ কায়সারকে হত্যা করার জন্য ঢাকার কায়েতটুলী মসজিদের ইমাম হাফেজ মো: আশরাফউদ্দীনের কাছ থেকে তার ঠিকানা সংগ্রহ করেছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই ইমাম সাহেবই শহীদুল্লাহ কায়সারের ঘাতক খালেক মজুমদারকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেন।

'অভিশাপ দিচ্ছি'

বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম একদিন শুরু করেছিল এদেশের ছাত্র সমাজ, তার চূড়ান্ত পরিণতি ও বিজয় লাভের শুভ মুহূর্তে করুণভাবে এমন করে প্রাণ দিল তাদের শিক্ষা গুরুরা।ছাত্রদের তপ্ত বুকে তাঁরা অগ্নিমন্ত্র ঢেলে দিয়ে যে দীপ্ত শিখা জাগিয়ে তুলেছিলেন, তার পূর্ণ ফসল যেদিন ঘরে তোলা হল, সেদিন ঘাতকরা তার চরম প্রতিশোধ নিল।

বাংলার মানুষ এর প্রতিশোধ নিতে পারে নি। এর হয়নি কোনো বিচারও। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধের আইনে এ নর পশুদের বিচার হতে পারতো। 'মক্কা বিজয়'-এর পর শত্রুদের ক্ষমা করা হয়েছিল, এই বাহানা তুলে খুনীদের ক্ষমা করে দেওয়া হয় ১৯৭২ সালে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক।

---

৪১৯ *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়,* পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৫১
৪২০ ঐ পৃষ্ঠা ১৫৩-৫৪

কিন্তু বাংলার একজন কবি খুনীদের ক্ষমা করতে পারেন নি। তিনি 'অভিশাপ' দিয়েছেন নর ঘাতকদের। তিনি ওদের বলেছেন, 'নেকড়ে','দজ্জাল','পশু':

'না, আমি আসিনি
ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রাচীন পাতা ফুঁড়ে,
দুর্বাসাও নই,
তবু আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধুলিতে
অভিশাপ দিচ্ছি।
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ দিয়েছিলো সেঁটে,
মগজের কোষে কোষে যারা
পুঁতেছিলো আমাদেরই আপনজনের লাশ
দগ্ধ, রক্তাপ্লুত,

যারা গণহত্যা
করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে,
আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়েও অধিক
পশু সেই সব পশুদের।

ফায়ারিং স্কোয়াডে ওদের
সারিবদ্ধ দাঁড়
করিয়ে নিমেষে ঝাঁ ঝাঁ বুলেটের বৃষ্টি
ঝরালেই সব চুকে বুকে যাবে তা আমি মানি না।
হত্যাকে উৎসব ভেবে যারা পার্কে মাঠে
ক্যাম্পাসে বাজারে
বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ দিয়েছে ছড়িয়ে,
আমি তো তাদের জন্যে অমন সহজ মৃত্যু করি না কামনা।
আমাকে করেছে বাধ্য যারা
আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত
সিঁড়ি ভেঙে যেতে
ভাসতে নদীতে আর বনবাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে,
অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেইখানে দজ্জালদের।

আমি অভিশাপ দিচ্ছি ওরা চিরদিন বিশীর্ণ গলায়
নিয়ত বেড়াক বয়ে গলিত নাছোড় মৃতদেহ,
অভিশাপ দিচ্ছি
প্রত্যহ দিনের শেষে ওরা
হাঁটু মুড়ে এক টুকরো শুকনো রুটি চাইবে ব্যাকুল,
কিন্তু রুটি প্রসারিত থাবা থেকে রইবে
দশ হাত দূরে সর্বদাই।
অভিশাশ দিচ্ছি
ওদের তৃষ্ণার পানপাত্র প্রতিবার
কানায় কানায় রক্তে উঠবে ভরে, যে রক্ত বাংলায়
বইয়ে দিয়েছে ওরা হিংস্র
জোয়ারের মতো
অভিশাপ দিচ্ছি
আকন্ঠ বিষ্ঠায় ডুবে ওরা অধীর চাইবে ত্রাণ
অথচ ওদের দিকে কেউ
দেবে না কখনো ছুঁড়ে একখণ্ড দড়ি।
অভিশাপ দিচ্ছি
স্নেহের কাঙাল হয়ে ওরা
ঘুরবে ক্ষ্যাপার মতো এপাড়া ওপাড়া,
নিজেরই সন্তান
প্রখর ফিরিয়ে নেবে মুখ, পারবে না
চিনতে কখনো;
অভিশাপ দিচ্ছি এতটুকু আশ্রয়ের জন্যে, বিশ্রামের
কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে
দ্বারে দ্বারে ঘুরবে ওরা প্রেতায়িত
সেই সব মুখের ওপর
দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে পৃথিবীর প্রতিটি কপাট।
অভিশাপ দিচ্ছি।
অভিশাপ দিচ্ছি,
অভিশাপ দিচ্ছি'...৪২১

---

৪২১ শামসুর রাহমান, *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* (চট্টগ্রাম, বইঘর, দ্বিতীয় সংস্করণ,১৩৯০) পৃষ্ঠা ৭১-৭২

পরিশিষ্ট

ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলী

১. এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির লেলিয়ে দেওয়া সশস্ত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালীদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে নিহত বাঙালী ভাইদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির সেনাবাহিনীর এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

২. এই সভা ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর বাঙালী ভাইদেরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্যে স্বাস্থ্যবান বাঙালী ভাইদেরকে ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত প্রদানের আহ্বান জানাইতেছে।

৩. এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষনহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।

৪. এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহার সফল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

৫. এই সভা দলমত নির্বেশেষে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইতেছে।

তারিখ : ৩ মার্চ ১৯৭১

জয় বাংলা

ইশতেহার নং/এক

(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী)

(ছাত্রলীগ)

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে:

গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন এ'কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করার জন্যে বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালীর মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগেলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ'রাষ্ট্রের নাম 'বাঙলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে:

(ক) বাঙলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুঠতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে:

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(আ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙালী মিলিটারীকে বিদেশী ও হামলাকারী শত্রু সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রুসৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে-কোন শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(ঊ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি............' সঙ্গীতটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিমা পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাঙলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক।

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে :-

※ স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'-দীর্ঘজীবী হউক
※ স্বাধীন কর স্বাধীন কর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর
※ স্বাধীন বাংলার মহান নেতা-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
※ গ্রামে গ্রামে দূর্গ গড়- মুক্তিবাহিনী গঠন কর
※ বীর বাঙালী অস্ত্রধর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর
※ মুক্তি যদি পেতে চাও-বাংগালীরা এক হও

বাংলা ও বাঙালীর জয় হোক
জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
কেন্দ্রীয় সংসদ
প্রস্তাবাবলী

৪২, বলাকা ভবন
ঢাকা -২
তারিখ : ৮ই মার্চ, ১৯৭১

অদ্যকার এই সভা আগামী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'ছাত্রলীগ' নাম ব্যবহৃত হইবে।

প্রত্যেক জেলা শহর হতে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত শাখার সভাপতিকে আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সম্পাদক করিয়া এবং ৯জন সদস্য সর্বমোট ১১ জনকে নিয়া ''স্বাধীন বাঙলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'' গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে। সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যাপারে কলেজ ছাত্র সংসদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

প্রত্যেকটি শাখাকে তাহার আওতাভুক্ত এলাকায় আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

বটতলা ও পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলী এক নম্বর ইস্তাহার এই সভার প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করা হইল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ''স্বাধীন বাঙলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের'' সদস্যদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিতেছে।

প্রত্যেক জেলা শাখাকে জরুরী কাউন্সিল সভা আহবান করিয়া ছাত্রলীগের এই কেন্দ্রীয় সংসদকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দায়িত্ব পালনের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

যে সকল জেলায় জেলা শাখা নাই, সেখানে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সরাসরিভাবে সেই সকল জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার দায়িত্বভার অর্পণ করিতেছে।

দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহে পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন, পাকিস্তানী সঙ্গীত বাজানো এবং উর্দু বই প্রদর্শন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে এবং বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত সিনেমা করও প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দাবী

গণস্বার্থ ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েম করুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

রক্তক্ষয়ী গণ-সংগ্রামের ফলে পাকিস্তানে প্রথমবারের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়া বর্তমানে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে শাসনতন্ত্রের ইস্যু সামনে আসিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন জনগণের স্বার্থে একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্যে সংগ্রাম করা বর্তমান মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেশপ্রেমিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দাবী ছাত্র জনতার মধ্যে জনপ্রিয় করা ও উহা ব্যাখ্যা করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট উহা উপস্থিত করা সকল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীর কর্তব্য বলিয়া এই কাউন্সিল ঘোষণা করিতেছে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে যে, পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার স্থায়ী এবং গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

তাই একটি বিজ্ঞানসম্মত, গণতান্ত্রিক ও জনগণের আশা-আকাঙক্ষার অনুরূপ শাসনতন্ত্র কায়েমের দাবীতে ছাত্রসমাজ সহ সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য এই কাউন্সিল আহবান জানাইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দাবী উত্থাপন করিতেছে।

এই কাউন্সিল গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য তীব্র গণসংগ্রাম গড়ে তোলার আহবান জানাইতেছে।

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার পথ বাধাহীন করার জন্য এই কাউন্সিল LFO-র বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানাইতেছে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে দাবী :

১. পাকিস্তানে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে ১৮ বৎসর বয়স্ক সকল নর-নারীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার গঠন করিতে হইবে। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

পার্লামেন্ট হইবে সম্পূর্ণ সার্বভৌম। দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ হইবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র।

২. পার্লামেন্টের উপর জনগণের প্রত্যক্ষ অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য প্রয়োজন মত নির্বাচিত সদস্যদের ফিরাইয়া আনার অধিকার জনগণের হাতে দিতে হইবে।

৩. জাতি ধর্ম-বর্ণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার দিতে হইবে। সকল ধর্মের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চলিবেনা, তবে যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা প্রচার বেআইনী করিতে হইবে। রাষ্ট্র হইবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

৪. ব্যক্তি স্বাধীনতা, নিজ বিবেক অনুযায়ী দল, সংঘ-সংগঠন গঠনের অধিকার, বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক নাগরিক অধিকারের পূর্ণ গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। ছাত্র শিক্ষক প্রভৃতি সকলের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অধিকার দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌমত্বের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ না করার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। মেহনতি কৃষক, মজুর, কর্মচারী প্রভৃতি জনগণের রুটি-রুজির প্রভৃতি সংগ্রামে রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে এবং সরকার যাহাতে মেহনতি শোষিত মানুষের ন্যায্য দাবী আদায়ে ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হয় উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। শ্রমিক-কর্মচারীর বাঁচার মত মজুরী, চাকুরীর নিরাপত্তা, খোদ কৃষকের হাতে জমি, সকলের জন্য শিক্ষা, কর্মচ্যুত ও অন্যান্য বেকারদের ভাতা, ন্যূনতম চিকিৎসা পাইবার অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকার সমূহের গ্যারান্টি দেওয়া।

৫. পাকিস্তানে যে মূল পাঁচটি ভাষাভাষী জাতির অবস্থান উহাদের সকলকে পাকিস্তান ফেডারেশন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের অধিকার

দিতে হইবে। জাতিসমূহের এইরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে জাতিসমূহের স্বেচ্ছাকৃতভাবে অর্পিত বা হস্তান্তরিত ক্ষমতা কার্যকরী করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেশন সরকার গঠন করা চলিবে।

৬. উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের হাতে উর্ধ্বপক্ষে এগার দফা কর্মসূচী মোতাবেক দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীত) ও মুদ্রণ (ছাপান) -এই তিনটি বিষয় ন্যস্ত থাকিতে পারে। অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে এগার দফা মোতাবেক সকল জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব সরকারের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা বা স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে।

৭. বৃহৎ অথবা শক্তিশালী জাতি যেন ক্ষুদ্র অথবা দুর্বল জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত তাহার উপর চাপাইতে না পারে উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার যেন জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে- উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি চালু করিতে হইবে এবং বাংলা ও উর্দু দুইটি রাষ্ট্রভাষাকে অবিলম্বে চালু করা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি জাতির চারটি মাতৃভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হইবে। ছোট ছোট উপজাতিসমূহের উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঘোষণা করিতে হইবে।

৮. দেশের উন্নয়নের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা বা বিদেশী শোষক সমাজবাদী পুঁজি জাতীয়করণের পথে বাধা হইতে পারে এমন কোন আইন শাসনতন্ত্রে রাখা চলিবে না। কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কারের অন্তরায় সৃষ্টিকারী কোন আইন শাসনতন্ত্রে রাখা চলিবে না।

৯. কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্র কাঠামো নির্মাণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরাসরি কর্মচারী বাছাই ও নিয়োগের ব্যবস্থা রহিত করিয়া প্রদেশ হইতে কর্মচারী গ্রহণের ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইন হিসাবে প্রণয়ন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় বিচারালয় বা সুপ্রীম কোর্টও অনুরূপভাবে গঠন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কোর্টে একজন মাত্র নির্ধারিত বিচারপতি না করিয়া পাঁচটি জাতির পাঁচজন বিচারপতি হইতে রোটেশন ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে প্রাদেশিক পরিষদ হইবে নিয়োগকর্তা। রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন স্থায়ী পদসমূহের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিচারপতি প্রভৃতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১০. বিচার বিভাগ হইবে শাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন।

১১. সরকার বিনাবিচারে আটকের কোন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না এবং যে কোন সরকারী অর্ডিন্যান্স তিন মাসের বেশী সময় কার্যকরী থাকিতে পারিবে না।

১২. নারী সমাজের সম-অধিকার স্বীকার করা ও তাঁহাদের সরাসরি ভোটে আইন পরিষদে মহিলা প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা। মহিলাদের উপর সামাজিক নিপীড়নের অবসান ঘোষণা করিতে হইবে।

১৩. দেশরক্ষা বাহিনীর উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং দেশরক্ষা বাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বরখাস্ত প্রভৃতি পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিতে ইহবে।

১৪। যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা প্রভৃতি প্রশ্নে একমাসের মধ্যে পার্লামেন্টের আনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নেয় কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এই দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে।

মুদ্রণে: ইষ্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩, বংশাল রোড, ঢাকা। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষে প্রচার সম্পাদক এ,কে এম, জাহাঙ্গীর কর্তৃক ৩১/১, হোসেনী দালান হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত। তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১।

শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করিয়া তুলুন

প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও উহাদের ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর যে-কোন রূপ হামলা, আক্রমণ প্রতিরোধে আজ ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনতাকে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। চরম গণ-বিরোধী শাসকগোষ্ঠী উহাদের সেনাবাহিনীকে লেলাইয়া দিয়া পূর্ব বাংলার জনগণের মহান সংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া মারিবার যে ঘৃণ্য চক্রান্ত আঁটিয়াছে উহাকে উপযুক্তভাবে মোকাবেলা করিতেই হইবে। এইজন্য আমরা জনগণের প্রতি জানাইতেছি সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান।

পূর্ববাংলার জনগণ আশা করিয়াছিল যে নির্বাচনের পরে যথানিয়মে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে, শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল' বারবার গণদুশমন দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে শেষ পর্যন্ত ভুট্টোর সহিত ষড়যন্ত্রের পথ গ্রহণ করিয়া পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে লেলাইয়া দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন দূরে চলিয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘকাল জাতিগত নিপীড়ণে নির্যাতিত পূর্ব বাংলার জনগণ নিরঙ্কুশ ঐক্যবদ্ধ কন্ঠে আওয়াজ তুলিয়াছেন-''পূর্ববাংলা স্বাধীন কর। পৃথক রাষ্ট্র গঠন কর।'' শাসকগোষ্ঠী জনগণের এই দাবীকে অস্ত্রের দ্বারা মোকাবেলা করিতে চাহিতেছে। ইয়াহিয়া খান পূর্ববাংলার জনগণকে শাসাইতেছে।

অনেক ঘটনার ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়া বাংলাদেশের সাত কোটি জনতা আজ পূর্ববাংলায় তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কায়েম করিতে চাহিতেছেন, চাহিতেছেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করিতে। এই জন্যে জনগণ আজ অকুতোভয়ে জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন। শত শত শহীদের রক্তে পূর্ববাংলার শ্যামল মাটি রক্তলাল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জনগণের এই মহান বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সঠিক নীতিতে অগ্রসর করিয়া লইয়া এমন একটি 'স্বাধীন পূর্ববাংলা' রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানাইতেছি, যে রাষ্ট্রে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ উন্মুক্ত হইবে।

আমাদের দেশমাতৃকার উপর হইতে বৃটিশ, আমেরিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের যে কোন শোষণ ও প্রভাব লুপ্ত হইবে, কৃষকদের উপর হইতে জোতদার মহাজনদের সামন্তবাদী শোষণ উচ্ছেদ হইবে, দেশের জনগণকে পুনরায় পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইতে হইবে না। সকল প্রকার শোষণমুক্ত বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলা কায়েমের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া বর্তমান সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লইবার আহবান আমরা জানাইতেছি।

কিন্তু এই সংগ্রাম খুব সহজ সংগ্রাম নয়। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী এই সংগ্রাম দমনের জন্য নানা প্রচেষ্টা করিবে। অন্যদিকে, তথাকথিত দেশ-প্রেমিকরা এই সংগ্রামকে ভুলপথে ঠেলিয়া দেওয়ারও প্রচেষ্টা করিতেছে। ইহারা ''স্বাধীন পূর্ব বাংলায়'' তাহাদের শ্রেণীস্বার্থ হাসিলের লক্ষ্য হইতে বাঙ্গালী জনতাকে বুঝাইতে চায় যে, এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে এবং এমন কি তাহারা আরও বুঝাইতে চায় যে এই সংগ্রামে পূর্ব বাংলার অবাঙ্গালী মেহনতী জনগণও আমাদের জনতার দুশমন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে শাসকগোষ্ঠী আমাদের সংগ্রামকে দমন করিতে চাহিতেছে উহারাই পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকেও শোষণ করিতেছে। তাই এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, পূর্ববাংলার অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধেও নয়। এই সংগ্রাম পরিচালিত করিতে হইবে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও উহাদের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। মনে রাখিতে হইবে যে অন্যজাতির সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে পূববাংলার জনগণের স্বার্থে 'স্বাধীন পূর্ববাংলা' কায়েম করা যাইবে না। তাই আমরা ছাত্র-জনতার প্রতি আবেদন জানাইতেছি যে গণস্বার্থে সঠিক নীতিতে 'স্বাধীন পূর্ববাংলা' কায়েমের সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন।

বর্তমান গণসংগ্রামের পটভূমিতে ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আহূত জাতীয় পরিষদে অংশ গ্রহণের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসাবে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমানে ৪টি দাবী উত্থাপন করিতেছেন। এই দাবী হইল সামরিক শাসন প্রত্যাহার কর, শাসন ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অর্পন কর, সেনাবাহিনী ব্যারাকে লও, গণহত্যার তদন্ত চাই। বর্তমান গণঅভ্যুত্থানকে অগ্রসর করিয়া লওয়ার স্বার্থেই ২৫শে মার্চের মধ্যে এই সকল দাবী পূরণের জন্য গণসংগ্রাম অব্যাহত রাখুন, সরকারের প্রতি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখুন, ইয়াহিয়া সরকারকে দাবী মানিতে বাধ্য করুন।

কিন্তু শাসকগোষ্ঠী যদি পুনরায় সেনাবাহিনী লেলাইয়া দিয়া জনগণের সংগ্রামকে দমন

করিতে চায়, তবে 'যার যাহা আছে' উহা লইয়া সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করুন। পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে আজ দুর্গ গঠন করুন, আরও বৃহত্তর আত্মত্যাগী সংগ্রামের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকুন। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

বর্তমানে করণীয়সমূহ:

রাজনৈতিক প্রচার অব্যাহত রাখুন। গ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে উহা ছড়াইয়া দিন।

সর্বত্র 'সংগ্রাম কমিটি' ও 'গণবাহিনী' গড়িয়া তুলুন।

শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকুন।

যে-কোন রূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা-উস্কানি প্রতিরোধ করুন।

শান্তি শৃংখলা নিজ উদ্যোগে বজায় রাখুন।

এই সংগ্রামের সফলতার জন্য সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামী শক্তির একতা গঠনের জোর

ছাত্র ইউনিয়ন

১১-৩-৭১

বিশ্বের আন্তর্জাতিক যুব ও ছাত্র সংগঠনের প্রতি
স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন চেয়ে

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের আবেদন

Telegram : YOUNGINDIA Telephone 567352

BANGLADESH STUDENTS' UNION
(EPSU)
923, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi-5.
I N D I A

AN APPEAL BY THE CENTRAL COMMITTEE OF BANGLADESH STUDENTS' UNION, (FORMERLY EAST PAKISTAN STUDENTS' UNION)

TO ALL THE NATIONAL AND INTERNATIONAL YOUTH AND STUDENTS ORGANISATIONS.

Dear comrades and friends,

We are sure that you know, we the people and students of Bangladesh (formerly East Pakistan) are today fighting a difficult but determined battle for our national liberation. The soil is running red in the blood of our martyres. The Pakistani army of Yahya Khan is destroying our country and murdering unarmed and innocent people. ....

On the very first day when the occupation army began its "Operation Genocide" over 20 thousand people, including many students and teachers, were killed in the city of Dacca, our capital city, alone. The capital city was raced to ground by bombing and shelling. Most of our cities in Bangladesh including the main port city of Chittagong, most of the University centres, including the university of Dacca, thousands of villages and many of the

market places have been destroyed. This is how military dectatorship of Yahya Khan is taking revange on our people whose only "crime" was that they wanted to uphold the noble cause of democracy, national autonomy and social progress. ....

In this fight, on many occasions, we got the massive verdict of the people in favour of our demands. After the historic students movement in 1952, the East Pakistan went to polls in 1954 and the people gave their verdict in favour of the democratic forces. ....

A decade long struggle continued again against the military dictatorship and finally it was brought down by our united and powerful struggle in 1969. This was followed by the military rule of Yahya Khan. The democratic movement of the people forced the military dictatorship to conduct an election. Thus the elections took place in Pakistan in 1970. Though it was held under strange conditions imposed by the military regime, the people in this election had expressed their will in unequivocal terms.

They voted in favour of democracy and had given clear majority in the National Assembly for those who stood for the peoples cause. Out of the 300 seats in the National Assembly, the Awami League had won 167 seats. More than 90% of the people of East Pakistan had voted for the national autonomy. The verdict of the people was so clear and so massive that even Yahya Khan had to accept it, while he described Sheikh Mujibur Rahman as the future Prime Minister of Pakistan.

But, as it was characteristic of the ruling class in Pakistan, this time also, they had scuttled the will of our people in a most shameless manner, violating all norms of democracy. ...

But the ruling class took the most dastardly attitude towards it had sent the army to East Pakistan on the night of 25th March, 1971 and began its occupation.

This is the background in which we in Bangladesh were forced to adopt a different course of action. We were put in a position where we had the alternative only to fight for our national independence and dignity or to perish.

Naturally we have had to chose the former path and thus began a new chapter in our history. ...

In this struggle the Bangladesh Students' Union, formerly known as the East Pakistan Students' Union, with a membership of half a million and with the support of several hundreds of thousands of students, are in the forefront of the struggle. In the alter of this great battle, already hundreds of our student comrades have laid their lives.

We are fighting an enemy backed by the monopolists, feudal lords and are supported by World Imperialism, particularly by the US imperialists. The government of Pakistan is a member of imperialist military pacts like CENTO and SEATO.

But we are fighting with full confidence that we will win. In this context we need the unqualified support and solidarity of the students and youth from all over the world. It would inspire our comrades who are valiantly fighting in the front.

We appeal all national and international youth and studnets organisations to come forward.

—to demand the recognition of the Bangladesh Government headed by Sheikh Mujibur Rahman and to render all political, moral and material support to the noble cause for which we are fighting today.

— to send us arms, money, medicine, food, clothing and all other materials to our fighting people.

— to mobilise popular public opinion in your country in favour of our freedom struggle.

We once more appeal you to send immediately your greetings and messages to our students who are now in the battlefield. We are sure that these messages would inspire them in a big way.

We are looking forward for receiving a reply from you at your earliest convenience.

With Revolutionary Greetings,

Sd/-

NURUL ISLAM

President,

Bangladesh Students' Union.

New Delhi,

10th May, 1971.

P.S.: Due to obvious reasons, we are now setting up an office in Delhi in whose address all the communications and assistance etc. are requested to be sent:

The President,
Bangladesh Students' Union.
(East Pakistan Students' Union)
C/o. All India Students' Federation,
923, Faiz Road, Karol Bagh,
NEW DELHI - 5, INDIA.

মুক্তিসংগ্রামে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে অংশ গ্রহণের জন্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

To
The News Editor,
....

Mujibnagar : 7th November, 1971.

Bangladesh Students' Union and Bangladesh Students' League the two traditional fighting organisations of the students of Bangladesh—the vanguard of all democratic movements have issued the radiant call of United Struggle against the reactionary ruling clique of Pakistan.

The representatives of these two main students' organisations met today and issued the following statement on behalf of the students and youths of Bangladesh.

The signatories to the statement are :

Noor-e-Alam Siddiquee,
President, Bangladesh
Students' league.

Nurul Islam,
President, Bangladesh
Students' Union

Shahjahan Shiraj,
General Secretary, Do.

Mujahidul Islam Selim,
General Secretary, Do.

A.S.M. Abdur Rab,
Vice-President,
Dacca University Central Students' Union.

Abdul Quddus Makhan,
General Secretary, Do.

Released By :

(Shahjahan Shiraj)
General Secretary,
Bangladesh Students' League.

(Mujahidul Islam Selim)
General Secretary,
Bangladesh Students' Union.

PRESS RELEASE

The Statement :

The glorious freedom struggle of Bangladesh inspired by the ideal and conducted according to the instructions of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the great leader of the Bengali Nation, is now seven months old. Our heroic freedom fighter are fighting a life and death battle and unhesitatingly shedding their blood for the liberation of their motherland. The fighting students of Bangladesh have long been unitedly fighting against the Ultra-reactionary ruling clique of Pakistan. In keeping with the past tradition of the students and youths of Bangladesh must forge iron-strong unity and carry on freedom struggle to liberate the motherland.

The students and youths must come forward and participate in the armed struggle. We must keep in mind that the enemy of the 75 million people of Bangladesh — the savage Yahya clique is being nourished by the Chinese Government as well as the American Imperialists. We have therefore to fight against heavy odds.

Our struggle is a national liberation struggle for attaining the cherished goals of Bengali Nation and it is directed against imperialism and colonialism. This is a people's War. Therefore, all the fighting forces of Bangladesh should unite under the leadership of Bangladesh government.

We appeal to the youths and students of Bangladesh, particularly the workers of this two organisations to participate in the liberation struggle en masse against the freedom fighters unitedly, jointly boycott the administration in the Pak-occupied areas and destroy the invading army. We appeal to all fighting forces to advance under the leadership of the Bangladesh government that has been established according to people's verdict in order to accelarate our victory as well as to raise the demands for and secure the release of President of the People's Republic o Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

As the liberation forces are achieving new successes, the World concious is more and more siding with us. We express our gratitude to the countries like India, Soviet Union which are in many ways helping and supporting us and we appeal to all freedom loving and democratic people and states, particularly the studnets and youths of the World, to extend support and assistance to our just struggle. We appeal to all States of the World to accord recognition to the Bangladesh Government headed by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

We appeal to all strenghthening united armed struggle with a view to establishing secular, democratic, progressive state by completely liberating Bangladesh, a state that will free from all kinds of exploitation and ensure peace and prosperity to the workers, peasants, middle class, students and youths.

There is nothing in the World more glorious than sacrificing our lives in the struggle for liberating our motherland. Let us pledge to unitedly liberate the country from the clutches of the enemy. Our victory is certain. Joy Bangla.

একাত্তরের একুশের ডাক

সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধে তুলিয়া ধরুন

স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন

<u>বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ</u>

* পূর্ব বাংলার বাঙালী জাতিসত্বা বিকাশকে রুদ্ধ করিবার জন্য পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণ মূলত শাসন ব্যবস্থার জাতীয় নিপীড়ন নীতির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

<u>ভাষা আন্দোলন</u>

* শোষকশ্রেণীর এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রথম সচেতন ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

* বায়ান্ন-এর একুশ সেই প্রতিবাদের সক্রিয় ও সংগ্রামী রূপান্তর

* এই দিনে জনতার সচেতন অংশ হিসাবে পূর্ব বাংলায় ছাত্র সমাজ শোষক শ্রেণীর দালালদের আত্মসমর্পণ ও আপোষকামী নীতির বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া তুলিয়া ধরে সংগ্রামের পতাকা

* নিজেদের নিয়োজিত করে শাসকগোষ্ঠী পরিচালিত সকল নির্য্যাতনের প্রত্যক্ষ মোকাবিলায়

* হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়া সৃষ্টি করে জনগণের স্বার্থে আত্মবলিদানের ঐতিহ্য।

বায়ান্ন-এর একুশ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে
একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী দিন

কিন্তু একাত্তরে আজও

※ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বে সামন্তবাদ-আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির স্বৈরাচারী এক-কেন্দ্রীক শাসনব্যবস্থার উপর নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন অব্যাহত

※ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাম্কৃতিক ক্ষেত্রে ''কাগুজে'' ''লোক ভোলানো'' অধিকারে শ্রুতিমধুর প্রতিশ্রুতির সোচ্চার ঘোষণা করা হইলেও বাস্তবে উহা ''এক জাতি তত্ত্ব'' রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অখণ্ডতার'' বস্তাপচা বুলির বেড়াজালে আবদ্ধ

※ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণ মর্যাদা পায় নাই। প্রতিমুহূর্তে তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণের সম্মুখীন

※ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ১৫ লাখ বাঙালী নির্মম মত্যুবরণ করিয়াও পাইয়াছে নিষ্ঠুর উপেক্ষা ও অবমাননা

※ আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙালী জাতি পরিপূর্ণ ধ্বংসের মুখে

※ কারাগার রাজবন্দীতে ভরপুর। হূলিয়া মামলার বেড়াজালে অনেকে আবদ্ধ জেল-খানা নিত্যদিনের সঙ্গী।

※ আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্ত পূর্ব বাংলায় গভীরতর হইয়াছে।

আর অন্যদিকে

※ বিগত নির্বাচনে পূর্ববাংলার বাঙালী জাতির বিভিন্ন শ্রেণী তাহার শ্রেণীগত মুক্তি ও স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে ''জয়বাংলা'' ধ্বনির পিছনে সমবেত হইয়াছিল নির্বাচনোত্তরকালে বাঙালী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা শ্রেণীগত দুর্বলতা ও আপোষমুখী মনোভাব লইয়া সেই ''জয় বাংলা শ্লোগানকে 'জয় পাকিস্তান'' শ্লোগানে পরিণত করিতে চাহিতেছে।

* পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির পতাকাবাহীদেরও সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনতার বিপ্লবী সংগ্রামকে দমননীতির জাঁতাকলে নিস্পিষ্ট করিতে চাহিতেছে।

একাত্তরের একুশেতে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নবতর সমস্যার সম্মুখীন

কেন এই ব্যর্থতা?

* কারণ জনগণের সংগ্রামের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া শোষকশ্রেণীর রং-বেরং-এর দালালরা পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির মূল প্রশ্ন শ্রমিক কৃষক মেহনতী জনতার উপর শ্রেণী শোষণ অবসানের প্রশ্নকে বারবার বাদ দিয়া গিয়াছে

ভাষা আন্দোলন হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন গণ-আন্দোলনকে ব্যবহার করিয়াছে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর লাভের ভান্ডার পুরণের জন্য ভোটের রাজনীতি, মন্ত্রীত্ব ও পার্লামেন্টের মাধ্যমে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারার বাহন হিসাবে

* আর তাই সত্যিকার দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ নয়, শ্রমিক-কৃষক মেহনতী জনতার শ্রেণী সংগ্রাম হইতে বিচ্যুত বিকৃত ধাপ্পাপূর্ণ ''জাতীয়তাবাদী'' শ্লোগানে করিয়াছে জনগণকে বিভ্রান্ত

* শোষণব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করিয়া তথাকথিত শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ও নিয়মতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিয়াছে জনগণের বিপ্লবী চেতনা।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বারংবার মিথ্যা রাজনীতির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে

একাত্তরের মহান একুশেতে

* পূর্ব বাংলার মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে যে বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা লাভ তথা পূর্ব বাংলার উপর পরিচালিত নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণের অবসান হইতে পারে একমাত্র জনগণের বৃহত্তর অংশ কৃষকের মুক্তির পতাকাকে দৃঢ়ভাবে উর্ধে তুলিয়া ধরিয়া

※ এই মুক্তি আসিতে পারে ভোটের রাজনীতি, মন্ত্রীত্বের লড়াই বা তথাকথিত আইন সভায় 'শাসনতন্ত্র'' রচনা করিয়া নয়, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে

– গ্রামাঞ্চলে কৃষকের শ্রেণী সংগ্রাম ও সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে সামন্তবাদী জোতদারী মহাজনী ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের বিপ্লবী কর্তৃত্ব কায়েম করিয়া

-উহার পাশাপাশি শহরাঞ্চলে বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করিয়া

-মুক্ত গ্রামাঞ্চল দ্বারা শহর ঘেরাও ও অধিকার এবং সর্বোপরি সারা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া।

আর এই লড়াই হইবে সশস্ত্র জনযুদ্ধের মহান
বিপ্লবী পথে

।।এবার একুশে তাই শহীদদের স্মরণের সাথে সাথে
সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধে তুলিয়া ধরি
স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের শপথ গ্রহণ করি।।

পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন

'স্বাধীন সার্বভৌম গণ-বাঙলা' কায়েম করো

মহান ৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী) উপলক্ষে

বাঙলা ছাত্রলীগের ডাক

অতীতের সংগ্রামী প্রতিশ্রুতি নিয়ে মহান ৮ই ফাল্গুন আবার আমাদের দ্বারে সমাগত। ৮ই ফাল্গুন আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ক্রান্তিলগ্ন। বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক, সালাউদ্দিন এমনি একদল অমিততেজা দু:সাহসী যুবক বুকের তাজা খুনের বদলে রাষ্ট্রভাষা বাঙলা স্বীকৃতি ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করেছেন, আজ থেকে ১৯ বছর আগে এমনি এক রক্তক্ষরা ফাল্গুনে। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে এমনি আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর নেই।

সেই সুমহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বাঙলার ছাত্র সমাজ প্রতি বছরই এই স্মরণীয় দিনটিতে সবাক হয়ে ওঠে। শপথ নেয় দু:সাহসের। বজ্রকন্ঠে ঘোষণা করে, আমরা বরকতের ভাই, আমরা সালামের ভাই।

কিন্তু মায়ের ভাষা বাঙলাকে সেই ইপ্সিত মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে পেরেছি কি আমরা? ৮ই ফাল্গুনের আনুষ্ঠানিকতার আতিশয্যের আড়ালে আমাদের অক্ষমতার, আমাদের ব্যর্থতার, আমাদের হীনমন্যতার যে কুৎসিৎ চিত্র মুখব্যাদন করছে, তাকে উপেক্ষা করে এই আত্মপ্রবঞ্চনা আর কতকাল আমরা চালিয়ে যাবো?

'ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের দুই দুইটি দশকেও আমরা আজো জীবনের সর্বস্তরে বাঙলা ভাষা চালু করতে পারিনি'-এর চাইতে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে?

কিন্তু তার চাইতেও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, ভাষা আন্দোলনকে আমরা যেন কেবল বাঙলা হরফে ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। আমরা ভুলে গেছি যে, বাঙলা ভাষার উপর কায়েমী স্বার্থের হামলা ছিল মূলত: বাঙলার সংস্কৃতির ও বাঙালী জাতির স্বাধিকার বিলুপ্তির বৃহত্তর ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ।

৬৯ -এর গণআন্দোলন ও ৭০ -এর নির্বাচনের আলোকে আজ সমগ্র জগতের কাছে বাঙালীর জাতীয় স্বতন্ত্র এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চিরন্তন আকুতি পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। এই পটভূমিতে ৮ই ফাল্গুন আজ বাঙালীর সামগ্রিক স্বাধিকার তথা, 'জাতীয়তাবাদী, স্বাধীন, সার্বভৌম গণ-বাঙলা' গঠনের নবতর সংগ্রামের ডাক দিচ্ছে।

বাঙলা ছাত্রলীগ সেই সংগ্রামেরই দৃপ্ত সারথী। বাঙলার প্রতিটি ছাত্রছাত্রী সেই সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক। তাই এবারকার ৮ই ফাল্গুনে আমাদের কন্ঠের তুর্যে ধ্বনিত হোক সেই অভয়মন্ত্র: জয় স্বাধীন বাঙলা।

বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, সালাউদ্দিনের আত্মাকে সাক্ষী রেখে আমাদের দ্ব্যার্থহীন ঘোষণা:

(১) অবিলম্বে সরকারী অফিস আদালতে বাঙলার মাধ্যমে কার্যনির্বাহের ব্যবস্থা কর, অন্যথায় বিদেশী ভাষা সংরক্ষণের যাদুঘর, সরকারী অফিস আদালতগুলো আমরা নিশ্চিহ্ন করে দেবো।

(২) ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির নিকট আমাদের দাবী, কেবল সাইনবোর্ড পাল্টে দিলেই চলবেনা, পরিপূর্ণভাবেই বাঙলার ব্যবহারে মন দিতে হবে; অন্যথা তাদের এই মনোভাবকে আমরা বাঙলার জনমতকে প্রতারণার প্রচেষ্টা হিসাবে ধরে নেবো।

(৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে বাঙলার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে এ বছর থেকেই বাঙলা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাও বাঙলায় নিতে হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এ ব্যাপারে যে কোন প্রকার শৈথিল্যের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

(৪) আমাদের সাংস্কৃতিক এতিহ্য অটুট রেখে বাঙলার সহজাত সংস্কৃতির বিকাশে মন দিতে হবে, বিদেশী ও পশ্চিম পাকিস্তানী পর্ণোগ্রোফিক পুস্তক ও সিনেমার আমদানী বন্ধ করতে হবে। বাঙলার মানুষ এব্যাপারে আর কোন দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ দিতে রাজী নয়।

(৫) আমাদের সর্বশেষ, কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দাবী ঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মানের বিদ্যায়তনগুলোকে একই মানে আনতে

হবে। অর্থাৎ, কিণ্ডার গার্টেন, মিশনারী, মন্টেশ্বরী, পাবলিক স্কুল, মডেল স্কুল, ইত্যাদি সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিলোপ ঘটিয়ে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমপর্যায়ে এনে শ্রেণীহীন, সার্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশেষ সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে জাগ্রত ছাত্রসমাজকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে।

আলমুজাহিদী
সভাপতি

মোশাররফ হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

বাঙলা ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ

এবারের ৮ই ফাল্গুন উপলক্ষে বাঙলা ছাত্রলীগের কর্মসূচী:-

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) : বস্তী এলাকায় নিরক্ষর ছেলে মেয়েদের মধ্যে লেখা -পড়ার জন্য বই, খাতা পেন্সিল, শ্লেট বিতরণ।

২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী) : দেয়াললিপি, পোস্টার ও প্রচারপত্র বিলি।

২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী) : নিরক্ষর, নাগরিকদের মধ্যে ভ্রাম্যমান অবস্থায় অক্ষরজ্ঞান প্রদান।

২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী) : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ফলক বাঙলায় করার প্রচার অভিযান।

২৭শে মাঘ (১০ ফেব্রুয়ারী) : এ বছর থেকেই শিক্ষার মাধ্যম বাঙলায় করার জন্য শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তাদের কাছে স্মারকলিপি পেশ।

৩০শে মাঘ (১৩ই ফেব্রুয়ারী) : অফিস আদালতের নথিপত্র বাঙলায় প্রবর্তন করার অভিযান।

১লা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী) : বিকেল ৮টায় রমনা পার্কে আলোচনা সভা ও গণমুখী সাহিত্যানুষ্ঠান।

৩রা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) : রাস্তার মোড়ে মোড়ে শিক্ষামূলক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ।

৪ঠা ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) : খণ্ড মিছিলও পথসভা।

৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী) : মধুর কেন্টিনে কর্মী জমায়েত।

৬ই ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী) : সন্ধ্যায় সঙ্গীত মিছিল।

৭ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী) : বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বিকাল ৩-৩০ মিনিটে ছাত্রগণজমায়েত।

৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী) : ভোর পাঁচটায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী ভবন এবং সংগঠনের কার্যালয়ে কালোপতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরী,ভোর ৬টায় শহীদানদের মাজার জিয়ারত এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পন ও শপথ গ্রহণ। বিকাল তিনটায় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বিরাট ছাত্রজনসভা ও সন্ধ্যায় গণ সংগীতের আসর।

মুদ্রণে: ভেনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫/ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩

জয় স্বাধীন বাঙলা

ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের ডাক

আপোসের চোরাবালিতে বাঙলার এ স্বাধীনতার উদীত সূর্য যেন মেঘাচ্ছন্ন না হয়।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে-ঘরে ঘরে আজ উড়ছে স্বাধীন বাঙলার পতাকা। দুই যুগ ধরে যারা বাঙলার রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের চিহ্নটুকু নিশ্চিহ্ন করার জন্য স্বৈরাচারের নির্মম, হিংস্র নখরের থাবা এ বাঙলার মাটিতে চালিয়েছিল-জাগ্রত বীর বাঙলীর রুদ্র রোষের মুখে আর কালের অবধারিত বিচারে বাঙলার মাটি থেকে উৎখাত হয়ে আজ তারা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবার পথে।

সংগ্রামী সাথী ভাইবোনেরা,

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এ দুর্জয় সংগ্রামকে খতম করার নিমিত্তে শোষক চক্রের কারসাজির জাল বিস্তার সবিশেষ লক্ষণীয়। মুক্তিপাগল বাঙালীরা শোষকদের দু-একটি কারসাজির মুখোশ ইতিমধ্যেই আঁচ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাঙলার জনপদ আজ বাঙলার বীরমুক্তিফৌজদের রক্তে রঞ্জিত। বিদেশী সেনাদের পদচারণায় বাঙলার মাটি আজও অপবিত্র ও কলঙ্কিত।

এরই পটভূমিতে সে রক্তশোষকদের রুদ্ররোষের দাবানলের বহ্নিশিখা সাময়িক ক্ষীণতর হয়ে এ বাঙলার মানুষের জন্য কুম্ভীরাশ্রু প্রদর্শন করা আরম্ভ করেছে।

মুক্তিকামী জাগ্রত ভাইবোনেরা,

ইয়াহিয়া-ভুট্টো-কাইয়ুম চক্র আজ আপোসের চোরাবালি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। প্রাসাদ চক্রের এ বিস্তারিত জালের পতন অবশ্যাম্ভাবী কিন্তু আজ আমাদের সর্বাগ্রে আপোসের সেই জালে পদচারণা থেকে বিরত থাকার শপথ নিতে হবে।

সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী নিপীড়িত বাঙালী যদি পশ্চিমাদের সে আপোষের চোরাবালিতে পদচারণা করে তা'হলে যুগের নির্ধারিত স্থানে আর ইতিহাসের অবধারিত কলঙ্কিত

অধ্যায়েই বাঙালীদের স্থান হবে। আজকের এ স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত হবে, নচেৎ তাদেরকেও পলাশীর বিশ্বাসঘাতকদের দলেই ইতিহাসের রূঢ় বাস্তব চিহ্নিত করে রাখবে।

পরিশেষে বাংলার সাড়ে সাতকোটি জাগ্রত স্বাধীনতাকামী ভাইবোনদের নিকট আমাদের আকূল আবেদন টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত বাঙলার প্রতিটি ঘরে ঘরে মাতৃভূমি বাঙলাকে স্বাধীন করার যে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা গর্জে উঠেছে তাকে যে কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রেখে ''স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাঙলা দেশ'' গঠন করতে হবেই। এরই প্রেক্ষিতে সর্বস্তরে ''বাঙলা মুক্তিফ্রন্ট'' (Bangal Liberation Front) গঠন করুন, গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে, মুক্তি ফৌজ গড়ে তুলুন আর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলুন। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

জয় স্বাধীন বাঙলা

বিনীত-

মো: লুৎফর রহমান
সভাপতি

সৈয়দ ওয়াজেদুল করিম
সাধারণ সম্পাদক।

পাকিস্তানের শেষ 'আজাদী' দিবসে সরকারী প্রচারপত্র :

[ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মসূচীও সরকারী প্রচারপত্রের ঠাঁই পেয়েছে]

মাওলানা ভাসানীর প্রতি হাজী দানেশের খোলা চিঠি

'আমি এই আশা নিয়ে ন্যাপে যোগদান করেছিলাম যে, আপনার নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্র ও শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম হবে। গত ১৪ বছরে আমি তার বিপরীত অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আগের চাইতে অন্ধকারাচ্ছন্ন। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ এখন আগের চাইতে নিরাপদ। আমাদের দেশে দুবার সামরিক আইন জারী হয়েছে এবং আমরা তা রোধ করতে পারিনি। আমরা আইয়ুবের একনায়কত্ববাদী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভকে কাজে লাগাতে পারিনি। প্রেসিডেন্টের আইনকাঠামোতে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী অস্বীকার করা হলেও আমরা তার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে পারিনি।

আমার মতে আমাদের ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে দলের অভ্যন্তরে আপনার একনায়কত্ববাদী নীতি। ইসলামী সামজতন্ত্রকে ন্যাপের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করার পূর্বে আপনি কখনো দলীয় কাউন্সিল অথবা ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণার পূর্বেও আপনি দল, দলীয় কাউন্সিল অথবা ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ এটা অর্জন করাই হচ্ছে ন্যাপের মূল লক্ষ্য।

দলের জাতীয় কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত ছাড়াই আপনি নির্বাচন বর্জনের শ্লোগান দেন। নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে আপনি হঠাৎ বিবৃতি দিয়ে দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। এ সমস্ত কার্যক্রমে দলীয় মেনিফেস্টো দলীয় নীতি ও কর্মসূচী সরাসরি লংঘন করা হয়েছে।

১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আপনি ভবিষ্যতবাণী করেন যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না; অথচ তখন ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত ছিল। ১৯৬৮ সালে করাচী থেকে ফিরে এসে আপনি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে, দেশে সামরিক আইন জারী হবে। আপনি বিশ্বাস করতেন যে, ইস্কান্দার মির্জা ও আইয়ুব খান দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করবেন।

আইয়ুবের বিরুদ্ধে বামপন্থী শক্তিগুলোকে সংগঠিত করার ব্যাপারে আপনার অনীহা এটাই প্রমাণ করে যে, শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আপনার যোগ ছিল। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি না যে, আপনার ও ন্যাপের এ ধরণের নীতির মাধ্যমে লাখ লাখ শোষিত মানুষের মুক্তি আসবে।

দলীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী দল গড়ে তুলতে হবে। এ ধরণের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন দলীয় কর্মীদের মধ্যে চিন্তার সামঞ্জস্য ও কাঠোর শৃংখলা। ন্যাপ এখন বিভিন্ন মতাবলম্বী নিয়ে গঠিত এবং তাদের পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রকাশ আপনি বন্ধ করতে পারেননি। এ ধরনের বিভিন্ন মতাবলম্বী শক্তিদের নিয়ে গঠিত দলে উপদলীয় কোন্দলের সৃষ্টি হয় এবং এরূপ কোন দল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ এখনো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মেহনতি জনগণকে শোষণ করে যাচ্ছে। দেশের দু-অংশের মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমেই জনগণের এই শত্রুদের পরাজিত করা সহজতর হবে। কিন্তু সম্প্রতি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা সংগ্রাম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে এবং তাতে শত্রুদেরই শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কারো পক্ষে আপনার নেতৃত্বাধীন ন্যাপের সদস্য থাকা সম্ভব নয়। কাজেই আমি পদত্যাগ করেছি।'

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের

খোলা চিঠি

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত
তারিখ: ২রা মার্চ, ১৯৭১

আপনার ও আপনার পার্টির ছয়-দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে ছয় দফার অর্থনৈতিক দাবী সমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, পূর্ব-বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে। আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ব-বাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোটপ্রদান করছে পূর্ব-বাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাঙালী শাসকগোষ্ঠীর উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য। পূর্ব-বাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবলী পেশ করেছে:

(১) পূর্ব-বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুন

(২) পূর্ব-বাংলার কৃষক-শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কয়েম করুন

প্রয়োজনবোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তরিত করুন

(৩) পূর্ব-বাংলা ব্যাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসক-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সূচনার আহবান জানান
এ উদ্দেশ্যে পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতমের ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহবান জানান

(৪) পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'জাতীয় মুক্তি পরিষদ' বা 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' গঠন করুন

(৫) প্রকাশ্য ও গোপন, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করার জন্য পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রতি আহবান জানান

(৬) পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে: (ক) পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত করা এবং পূর্ব-বাংলাস্থ তাদের সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। উপনিবেশিক সরকারের সকল প্রকার শোষন ও অসম চুক্তির অবসান করা। এদের দালালদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। এদের মধ্যে ঘৃণ্যতমদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা

(খ) পূর্ব-বাংলার জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সকল নাগরিক অধিকার বাতিল করা। সার্বজনিন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-দেশপ্রেমিকদের জাতীয় সরকার গঠন করা

(গ) গ্রাম্য এলাকায় উপনিবেশিক সরকারের ভূমি শোষণের অবসান করা। সরকারী খাসভূমি এবং বিশ্বাসঘাতক জমিদার-জোতদার ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা। দেশপ্রেমিক জমিদার জোতদারদের পরিচালিত শোষণ হ্রাস করা

(ঘ) শ্রমিকদের আট ঘন্টা শ্রম সময়, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার' ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমর্থন করা

(ঙ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা।

(চ) ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠা করা

(ছ) ধর্মীয়, ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের সকলক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা

(জ) পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অসম উন্নতির সমতা বিধানের ব্যবস্থা করা

(ঝ) বন্যা, ঘূর্ণীঝড়, জলোচ্ছাস, খরা ও পোকা এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করা

(ঞ) জাতীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষা, গবেষণা, খেলাধুলা ও শরীর গঠনের ব্যবস্থা করা

(ট) পঞ্চশিলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করা

(ঠ) বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রাম সমর্থন করা

(ড) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব-বাংলাস্থ তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা ইয়াহিয়া-ইয়াকুবের বেয়নেট বুলেটের নিকট আত্মসমর্পণ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ মেনে নেওয়া বা সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার দুটো পথ পূর্ব-বাংলার জনগণের সামনে খোলা রয়েছে

পূর্ব-বাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে প্রমান করেছেন স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় তাদের নিকট আর কিছুই নেই।

আপনি ও আপনার পার্টি অবশ্যই উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনতার এ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবেন। অন্যথায় পূর্ব-বাংলার জনগণ কখনই আপনাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না।

※ পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা- জিন্দাবাদ !

※ পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-জিন্দাবাদ !

※ পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠি ও তার দালালদের-খতম করুন !

※ গ্রামে-শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ-শুরু করুন !

※ সমস্ত দেশপ্রেমিকদের-ঐক্যবদ্ধ করুন !

পূর্ব-বাংলা শ্রমিক আন্দোলন কর্তৃক প্রচারিত।

১৯৭১-এ প্রবাসী স্বাধীন বাংলা সরকার

রাষ্ট্রপতি	ঃ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তান কারাগারে বন্দী)
উপরাষ্ট্রপতি	ঃ	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
প্রধানমন্ত্রী	ঃ	তাজউদ্দিন আহমদ
অর্থমন্ত্রী	ঃ	এম মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	ঃ	এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান
পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী	ঃ	খন্দকার মোশতাক আহমদ
প্রধান সেনাপতি	ঃ	মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী
চীফ অফ স্টাফ	ঃ	আব্দুর রব
বিমান বাহিনী প্রধান	ঃ	এ কে খন্দকার

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নিযুক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা ঃ

মুখ্য সচিব	ঃ	রুহুল কুদ্দুস
অর্থ সচিব	ঃ	খন্দকার আসাদুজ্জামান
ক্যাবিনেট সচিব	ঃ	তওফিক ইমাম
প্রতিরক্ষা সচিব	ঃ	আব্দুস সামাদ
পররাষ্ট্র সচিব	ঃ	মাহবুবুল আলম চাষী (নভেম্বর পর্যন্ত, পরে বহিস্কৃত)
	ঃ	এ ফতেহ (নভেম্বর থেকে)
তথ্য সচিব	ঃ	আনোয়ারুল হক খান
সংস্থাপন সচিব	ঃ	নূরুল কাদের খান
স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধান	ঃ	আব্দুল খালেক
কৃষি সচিব	ঃ	নূরুদ্দীন আহমদ
বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত	ঃ	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
নয়াদিল্লীতে মিশন প্রধান	ঃ	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
কলতাকায় মিশন প্রধান	ঃ	হোসেন আলী
পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান	ঃ	ড. মোজাফ্ফর আহমদ

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ ঃ ড. মোশারফ হোসেন
ঃ ড. আনিসুজ্জামান
ঃ সৈয়দ আলী আহসান
ঃ ড. সারোয়ার মুর্শেদ
ঃ ড. স্বদেশ রঞ্জন

উপসচিব, (দেশরক্ষা) ঃ আকবর আলী খান
উপসচিব, (সংস্থাপন) ঃ ওয়ালীউল ইসলাম
উপসচিব, (স্বরাষ্ট্র) ঃ খোরশেদুজ্জামান চৌধুরী
ট্রান্সপোর্ট (অফিসার) ঃ এম এইচ সিদ্দিকী

রণাঙ্গনে ১১টি সেক্টর

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাপক ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকার রণাঙ্গণকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেছিলো। প্রতিটি সেক্টরে একজন করে অধিনায়ক নিযুক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। নীচে সেক্টরগুলোর নাম ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কমাণ্ডারদের নাম দেয়া হলো:

এক নম্বর সেক্টর ঃ ১ মেজর খালেদ মোশাররফ [যুদ্ধে আহত] (এপ্রিল-জুন)

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ফেনী নদী পর্যন্ত ঃ ২ মেজর মোহাম্মদ রফিক (জুন এবং ডিসেম্বর)

দুই নম্বর সেক্টর ঃ ১ মেজর খালেদ মোশাররফ [যুদ্ধে আহত] (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)

নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ ঃ ২ মেজর এ টি এম হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)

তিন নম্বর সেক্টর ঃ ১ মেজর কে এম শফিউল্লাহ্ (এপ্রিল সেপ্টেম্বর)
আখাউড়া ভৈরব রেললাইন

থেকে পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা এবং ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ		২ মেজর নূরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
চার নম্বর সেক্টর সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাইউকি সড়ক	ঃ	১ মেজর সি আর দত্ত
পাঁচ নম্বর সেক্টর সিলেট জেলার পশ্চিম এবং সিলেট-ডাউকি এলাকা এবং সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ, ময়নসিংহ জেলার সীমানা	ঃ	মেজর মীর শওকত আলী
ছয় নম্বর সেক্টর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র রংপুর জেলা ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ	ঃ	উইং কমাণ্ডার এম বাশার
সাত নম্বর সেক্টর সমগ্র রাজশাহী জেলা, ঠাকুরগাঁ মহকুমা ছাড়া দিনাজপুর জেলার বাকী অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র বগুড়া ও পাবনা জেলা	ঃ	মেজর কাজী নূরুজ্জামান
আট নম্বর সেক্টর	ঃ	১ মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত)

সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা ফরিদপুরের অংশ বিশেষ ছাড়াও দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা	ঃ	২ মেজর এম এ মঞ্জুর (আগস্ট থেকে ডিসেম্বর)
নয় নম্বর সেক্টর	ঃ	১ মেজর এম. এ জলিল (ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত)
সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়কসহ খুলনার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা	ঃ	২ মেজর এম এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
দশ নম্বর সেক্টর আভ্যন্তরীণ নৌ-পথ এবং সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়াও চট্টগ্রাম ও চালনা	ঃ	মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্ত নৌ-কমাণ্ডার যখন সেক্টরে এ্যাকশন করেছে, তখন সেসব সেক্টর কমাণ্ডারদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছে।
এগারো নম্বর সেক্টর	ঃ	১ মেজর আবু তাহের (যুদ্ধে আহত, ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত)
কিশোরগঞ্জ ছাড়া সমগ্র ময়মনসিংহ এবং টাংগাইল জেলা	ঃ	২ ফ্লাইট লে: এম হামিদুল্লাহ্ (৩রা নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত)
অতিরিক্ত টাংগাইল সেক্টর সমগ্র টাংগাইল জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ, ও ঢাকা জেলার অংশ	ঃ	১ কমাণ্ডার কাদের সিদ্দিকী
বিমানবাহিনী প্রধান	ঃ	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

ব্রিগেড আকারে তিনটি ফোর্স গঠন

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে আরও জোরদার করার জন্য মুজিবনগর সরকার ১১টি সেক্টর ও টাংগাইলের অতিরিক্ত সেক্টর ছাড়াও জুন মাস নাগাদ ব্রিগেড আকারে তিনটি ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। মুক্তিবাহিনীর তিনজন শ্রেষ্ঠ সেক্টর কমাণ্ডারের নাম অনুসারে এই তিনটি ফোর্সের নামকরণ করা হয় 'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স এবং 'কে ফোর্স। তিনজন কমাণ্ডার হচ্ছেন যথাক্রমে জিয়াউর রহমান, কে এম শফিউল্লাহ এবং খালেদ মোশাররফ। নিম্নে এই তিনটি ফোর্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

নাম		অধিনায়কের নাম দায়িত্বকাল
১ 'জেড' ফোর্স	ঃ	লে: কর্ণেল জিয়াউর রহমান জুলাই-ডিসেম্বর
২ 'এস' ফোর্স	ঃ	লে: কর্ণেল কে এম শফিউল্লাহ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
৩ 'কে' ফোর্স	ঃ	১ লে: কর্ণেল খালেদ মোশাররফ সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২ নভেম্বর মাসে খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হলে মেজর আবু সালেক অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের ৬ জন সরকারী রণাঙ্গন প্রতিনিধি (War Correspondent)-এর নাম:

১. মাহাবুব তালুকদার (বর্তমানে শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক)
২. আবুল মঞ্জুর (চিন্তাবিদ আবুল ফজলের ছেলে)
৩. হারুন-উর-রসিদ (বর্তমানে তথ্য অধিদপ্তরের উর্দ্ধতন তথ্য অফিসার)
৪. মঈনউদ্দিন আহমদ চৌধুরী (ঐ)
৫. জালাল আহমদ
৬. নাম পাওয়া যায় নি।

মুক্তিযুদ্ধের উপাধিপ্রাপ্ত বীরদের সংখ্যা

উপাধি	মোট সংখ্যা	শহীদ
বীরশ্রেষ্ঠ	৭	৭
বীরউত্তম	৬৮	২১
বীরবিক্রম	১৭৫	৭৭
বীরপ্রতীক	৪২৬	৫২

বীরশ্রেষ্ঠদের নাম ও তালিকা

১. ফ্লা. লে. মোহাম্মদ মতিয়ুর রহমান

২. ল্যান্স নায়ক মুন্সী আবদুর রউফ

৩. সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

৪. ল্যান্স নায়ক নূর মোহাম্মদ শেখ

৫. সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

৬. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

৭. আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে ১৯৭১-এ পাক সরকারের 'প্রেস এডভাইস-এর নমুনা :

No 1/12/71-PIO

CONFIDENTIAL

IMPORTANT NOTICE
(NOT FOR PUBLICATION)

PRESS ADVICE SYSTEM INTRODUCED

The Defence of Pakistan Rules, 1971, which have come into force, prohibit certain Prejudicial acts, publication and communltions in order to aeny the enemy informotion likely to assist him. .These rules are obligetory and have to be followed by all.

For the Convenience of the Press , which has a vital role to play in the prosecution fo War, the Goverment of Pakistan have docided to introduce a system of Press advice.

Arranzments for Press advice have been made at the headquerters of the Central Goverment, Provincial Goverments and diastrict, of which the Press should take full advantage.

(Siddique Salek) CIS
Chief Press Adviser to the Goverment of Pakistan,
Press Infomation Department
Raw 25.01.71

To

(a) All Newspeper Editor in Pakistan.
(b) All Accredited Pakistani Correspondenst/ through/ ly. Chief Press Adviss.

১৯৭১-র এ পাকিস্তান সরকারের একটি প্রচারণা

ধ্বংস করছে কারা
কষ্ট পাচ্ছে কারা

পুল ধ্বংস করে মানুষ ও পণ্য চলাচলে বিঘ্ন ঘটালে কষ্ট পাবে কারা?
-জনসাধারণ

রেল রাস্তা উড়িয়ে দিয়ে মানুষ ও খাদ্য চলাচল বন্ধ করলে মারা পড়বে কারা?
-জনসাধারণ

বিদ্যুৎ সরবরাহ নষ্ট করে কলকারখানা বন্ধ করলে এবং শ্রমিকরা কাজ না পেলে কষ্টে পড়বে কারা?- -জনসাধারণ

আর এই সব কষ্টের জন্য দায়ী কারা? -ভারত ও তার দালালরা।

এ সব দুস্কার্যের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণই কষ্ট পাবে।

অতএব, জনসাধারণের নিজেদের স্বার্থেই এই সব দুস্কার্য প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

পূর্ব পাকিস্তানবাসীর পুনর্বাসন কার্যসহ দেশের অর্থনৈতিক তৎপরতা পূর্ণদ্যমে চালু করার জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা মঞ্জর করেছেন। আসুন এ সকল কার্যে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করি।

হিন্দুস্থান ও হিন্দুস্থানী দালালরা আমাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজে পূর্ণ সহযোগিতার দ্বারাই আমরা তাদের এই দুরভিসন্ধি বানচাল করব।

ই পি জি পি- ৭১/ ৭২-২০৮১-এইচ-এ অক

সাম্রাজ্যবাদী ভারতের বর্বর হামলার মোকাবেলায় ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিন

রাজধানীর জাগ্রত জনতা :

মানবতার দুশমন সাম্রাজ্যবাদী ভারতের বর্বর সৈনিকেরা পাকিস্তানের পশ্চিম ভূখন্ডে আবার নয়া হামলা চালানোর জন্যে সংঘর্ষে নেমেছে। পাকিস্তানের চির নির্ভিক দু:সাহসী সেনানীদের হাতে তারা সাতটি রণাঙ্গনে চরমভাবে মার খাচ্ছে। ভারতীয় বাহিনী এখন মরিয়া হয়ে বেসামরিক লক্ষ্য বস্তুর উপরও মূখ্য হামলা চালাচ্ছে। মাসের পর মাস ভারতীয় চক্র ও আমলাদেরকে এদেশের বুকে ..... ভারত যে ক্ষতি সাধন করতে চেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের নামে সাতকোটি মানুষ তার সমুচিত জবাব দিয়েছে। শহর, বন্দর গ্রামে ভারতীয় বর্বরকে সমূলে উৎখাত করার সাফল্যজনক অভিযান চলছে। ভারতীয় চক্র ও আমলাদের এহেন দুর্দশা দেখে এখন ভারত হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পাকিস্তানের প্রতিটি সীমান্তে ও আকাশ পথে তার বর্বর সৈনিকদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে। ভারতের হামলায় পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ জনসাধারণ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও হচ্ছে। এ দেশের প্রতিটি পাকিস্তানী নাগরিক ৬৫'র সেপ্টেম্বরের মত ভারতকে উচিত সাজা দেবার জন্যে বদ্ধ পরিকর। ভারতীয় হামলা সাফল্যজনকভাবে শুধু প্রতিহত করাই হবে না বরং ভারতীয় ভূখণ্ড তছনছ করা হবে।

সংগ্রামী আহবান ঃ

- শান্তিপূর্ণভাবে ও সতর্কতার সাথে দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যান।
- ভারতীয় চক্র ও দালাল ছাড়া প্রতিটি নাগরিক এর পূর্ণ নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে।
- নিজ নিজ এলাকার ভারতীয় চক্র ও দালালদের সমূলে উৎখাত করুন এবং এদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করুন।
- হানাদার ভারতের রেডিও ষ্টেশন কেহ ধরিবেন না।
- কলকাতায় অবস্থিত তথাকথিত জয়বাংলা রেডিও ষ্টেশন কেহ ধরবেন না। যারা শুক্রর প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয় তারা জাতির দুষমন।

- নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুদামজাত করবেন না এবং বেশী পরিমাণে ক্রয় করবেন না।
- বেসামরিক প্রতিরক্ষা আইন পুরোপুরি মেনে চলুন।
- বিমান হামলার সময় কেহ বাহিরে থাকবেন না এবং ছাদের উপর উঠবেন না।
- গুজবে কান দিবেন না।
- পাকিস্তান ও এর আদর্শ বিরোধী সমস্ত বই পুস্তক ধ্বংস করে ফেলুন।

আসুন–আমাদের এদেশকে রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব আমরা পালন করতে সচেষ্ট হই। এদেশের নিরীহ সরল প্রাণ জনগণের আশার আলো 'আল বদরকে' সার্বিক সহযোগিতা করি। আপনাদের যে কোন সমস্যা, অভাব–অভিযোগ দূর করার জন্য আল বদর সদা প্রস্তুত। ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আল্লাহই আমাদের একমাত্র সহায়।

ঢাকা শহর 'আল বদর' হাইকমাণ্ড কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

পাকিস্তানের শেষ 'আজাদী' দিবসে সরকারী প্রচারপত্র :

[ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মসূচীও সরকারী প্রচারপত্রে ঠাঁই পেয়েছে]

স্বাধীনতা দিবস

১৪ই আগস্ট ১৯৭১ইং

কর্মসূচী

১৩.৮. ৭১	সম্মিলিত মিছিল। (কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি কর্তৃক আয়োজিত)	
১৪.৮.৭১	সকাল ৫-৩০ মি: জাতীয় পতাকা উত্তোলন	(সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী ভবনে)
	,, ৬-০০মি :	জাতীয় পতাকা উত্তোলন (ইসলামী ছাত্র সংঘ কর্তৃক)
	,, ৮-৩০মি :	সম্মিলিত কুচকাওয়াজ জুনিয়ার কেডেট, বয়েজ স্কাউট, কাবস, মুকুল ফৌজ, সবুজ সেনা, কচিকাচার মেলা, শাহীন ফৌজ এবং অনুরূপ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সমাবেশ ও শরীর চর্চা প্রদর্শনী স্থান-ইনার স্টেডিয়াম।
	,, ১০-০০ মি :	(ক) কুচকাওয়াজ (গালর্স গাইড কর্তৃক) স্থান-সলিমউল্লাহ এতিম খানা
	,, ১০-০০ মি :	(খ) কুচকাওয়াজ (ইসলামী ছাত্র সংঘ কর্তৃক আয়োজিত) স্থান-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন
	,, ১১-০০ মি :	কুচকাওয়াজ (গার্লস গাইড কর্তৃক) স্থান : বায়তুল আতফাল এ সাবিয়া, তেজগাও।
	,, ১১-৩০ মি :	মিছিল-বায়তুলমোকাররাম পর্যন্ত (ইসলামী ছাত্র সংঘ কর্তৃক আয়োজিত)
	দুপুর ১-৩০ মি :	বিশেষ মোনাজত সমস্ত মসজিদ, মন্দির ও গির্জায় (ঢাকা মিউনিসিপাল কর্তৃক আয়োজিত)
	বিকাল ২-০০ মি :	জনসভা, স্থান পল্টন ময়দান। (পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত)

	বিকাল	৪-০০ মি :
	কেরাত প্রতিযোগিতা,	
		স্থান-সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা।
	,,	(খ) বিচিত্রানুষ্ঠান
		(আপওয়া কর্তৃক আয়োজিত)
		স্থান-আপওয়া নব নির্মিত মিলনায়তন।
	,, ৫-৩০ মি :	টেনিস টুরনামেন্ট
		স্থান-অফিসারস্ ক্লাব।
	সন্ধ্যা ৭-০০ মি :	আলোক সজ্জা
		(সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী ভবনে)
১৫-৫-৭১	সকাল	৯-০০ মি :
	প্রার্থনা এবং কোরানখানি	
		স্থান-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ।
	বিকাল	৩-০০ মি :
	আলোচনা সভা	
		স্থান-ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র

ঢাকা জেলা জনসংযোগ অফিস কর্তৃক প্রচারিত।

-মোনালিসা প্রেস

গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার

মোনাফেকদের ক্ষমা নাই

ক্ষমতার দম্ভে, শক্তির উন্মত্ততায় মানুষ বিবেকবুদ্ধি এমন সব কথাবার্তা বলে থাকে যখন মনে হয় মানুষ তার আসল হারিয়ে জানোয়ারের স্তরে নেমে এসেছে।

পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাস এরূপ বহু নজীর সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে এতটুকু হতে পড়তে দেখলেই অস্থির হয়ে উঠে। ন্যায়-নীতির সমর্থকদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাঞ্জাবী গোষ্ঠী ও তাদের তাবেদারগণ তখন তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায়, ষড়যন্ত্রে লেগে যায়। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাস ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, অবিচার ও নির্যাতনের ইতিহাস, শোষণ ও পীড়ণের ইতিহাস।

সিরাজুদ্দৌলা নাটকে নাট্যকার নবাব সিরাজুদ্দৌলার মুখ দিয়ে জানিয়েছেন : ''মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদের দল কি আর জন্মগ্রহণ করবেনা গোলাম হোসেন?'' নাট্যকারের সে আশঙ্কা অমূলক নয়। বাংলায় বহু বিশ্বাসঘাতক জন্ম নিয়েছে এবং তারা বহাল তবিয়তে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর সাথে বেঈমানী করে চলেছে। বাংলার এই বেঈমান, বিশ্বাসঘাতকগণই কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর পদলেহী হয়ে দেশ ও দশের সর্বনাশ করে চলেছে। এদের দাস-সুলভ মনোভাবের উপর নির্ভর করে তাদের পাঞ্জাবী প্রভুরা বাঙ্গালীর কুৎসা রটনা করে বাঙ্গালীদের উৎখাত করে।

বাংলার মানুষ যখনই তাদের হক আদায়ের দাবী জানিয়েছে, ইনসাফের আওয়াজ তুলেছে সুখে-শান্তিতে, মর্যাদার সাথে বাঁচতে চেয়েছে তখনই পশ্চিম পাকিস্তানী গোষ্ঠী তাদের দেশদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, ভারতের দালাল বলে কুৎসা রটনা করে বাংলার সরল, সহজ মানুষের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যে দেশের সিংহ পুরুষ মরহুম এ, কে, ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করল, যে দেশের মানুষ তাদের প্রিয় নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নের্তৃত্বে পাকিস্তানের পক্ষে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করেছিল, যে দেশের

মানুষ তাদের আসন কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মরহুম লিয়াকত আলী খান, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, খান আবদুল কাইয়ুম খানকে ছেড়ে দিয়েছিল, সে দেশের মানুষ ও তাদের নেতৃবৃন্দের দেশপ্রেমে কটাক্ষ করা হয়েছে।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নিজেদের অটুট ধর্মবিশ্বাসে পঞ্জেগানা নামাজ ভুল করে না, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে থাকেনা, কামুক-নারীর উলঙ্গ নৃত্য ও উৎকট সঙ্গীত শুনে ক্লাবে, ক্যাবারেটে আল্লাহর শান খুঁজে ফেরে না, ধর্মীয় বিধান মেনে যারা জিঘাংসাকে সংযত করে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বাণী প্রচার করে, যে দেশের মানুষ পশ্চিম পাঞ্জাবী শোষণ ও শাসনকে ছোট ভাইয়ের উৎপাত বলে মনে করে নির্যাতনের অবসান কামনায় তাদের উপর আল্লাহতালার হেদায়েত বহনের প্রার্থনা জানায়, সেই বাংলাদেশের মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি করার অপপ্রচার চালান হয়েছে ও হচ্ছে।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যারা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বিনা চিকিৎসায়, অবহেলায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করছিল, যারা লিয়াকত আলী খানকে হত্যা করেছিল, যারা নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারে রাজনীতির ষড়যন্ত্রের আমদানী করে পাকিস্তানের পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলেছে, যারা বৃটিশের গোলামী করেছে আর পরে গোষ্ঠী স্বার্থে জনপ্রতিনিধিদের সরিয়ে দিয়ে নিজেদের পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতা হয়েছে, যারা পাকিস্তানে গণতন্ত্রেরে অবসান ঘটিযে স্বৈরতন্ত্র ও সামরিক শাসন চালু করেছে, চোলাচালানকারীদের সাথে আতাঁত করে কোটি কোটি টাকার সোনার চোরাকাবরার করেছিল, যারা ইরান, আফগান চোরাকারবার ও চোরাচালানের খোলাবাজার চালু রেখেছে, যারা ইরান-তুরস্কের মাধ্যমে ইহুদীদের সাথে গোপন সংযোগ করে বাংলাদেশের বরেণ্য নেতৃবৃন্দ ও বাংলা গণপ্রতিনিধিবৃন্দকে দেশদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করছে।

* * * *

[এখানে প্রচারপত্রে একটি স্তবক অস্পষ্ট থাকায় ছাপানো সম্ভব হল না-লেখক]

অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস! মুসলমান মুসলমানের উপর নির্যাতন করতে পারবেনা, হত্যা করতে পারবেনা, অমুসলমানদের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা মুসলমানকে দিতে হবে, অহেতুক অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবেনা, ইসলামের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করে যারা স্রেফ নিজের প্রভুত্ব, শোষণ ও শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করছে তাদের ধন সম্পত্তি লুট করছে,

তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টানদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে তাদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করছে, যাদের ভাড়াটিয়া সৈন্য নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করছে আর বাংলার মুসলমান নারীদের উলঙ্গ করে মা-বাপের সামনে পরস্পর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে শেষে গুলি করে মারছে, নিষ্পাপ শিশু কন্যাদের যাদের সঙ্গে রাজনীতি বা দুনিয়ার কোনও সম্পর্ক এখনো গড়ে উঠেনি, তাদের খুন করছে, মুসলমান বাঙালীকে গ্রেপ্তার করে তাদের দিয়ে গর্ত খুড়ে গুলী করে মারার পর তাদেরই সেই গর্তে ফেলে দিচ্ছে, নিরপরাধ সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিল্পীদের নির্বিচারে খুন করেছে ও করছে, যারা মদে চুর হয়ে থাকে; কোরআন-হাদিসের বিধি-বিধানের ধার ধারেনা, যারা সুন্নী সম্প্রাদায়কে দাবিয়ে রেখে শিয়া-কাদিয়ানী প্রভুত্ব কায়েমের চক্রান্তে মেতে উঠেছে, তারাই ইসলামের জিগীর তুলে বাঙালীর সরল মনকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারগণ যদি ইসলামে বিশ্বাসী হত তা'হলে তারা নিরপরাধ বাঙ্গলীকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারত না। বাঙ্গালীর বুকে গুলী লেগে যখন মৃত্যু নেমে আসে তখন তার মুখ দিয়ে কি কলেমা উচ্চারিত হয় না? কি অপরাধ করেছিল, বাংলার নারী ও শিশু সন্তানেরা? কেন আজ তারা সর্বহারা হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে? ইয়াহিয়া খান কেন নির্বাচন দিয়েছিল, কেন বলেছিল নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয়েছিল, আজ আবার কেনই বা আওয়ামী লীগকে বে-আইনী করল, বাঙ্গালী উপর নরপিশাচ পাঞ্জাবী ভাড়াটিয়াদের অতর্কিতভাবে লেলিয়ে দিল? এর জবাব কে দেবে?

ধর্ম যদি রাষ্ট্রীয় বন্ধনী হয়, তবে সাউদী আরব কেন ইয়েমেনের মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, লিবিয়া, আলবেনিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সুদান, পাকিস্তান এক হতে পারল না কেন? পাকিস্তান কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিষেদগার করছে? পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের মাধ্যমে কেন ইহুদীদেরও সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে আর বাইরে দেখাচ্ছে তারা ইসরাইলের বিরোধী--এ মোনাফেকীর জবাব দিবে কে? প্যালে-স্টাইনের মুসলমান মুক্তিফৌজ আজ জর্দানের মুসলমানদের হাতে কেন খুন হচ্ছে? বাঙ্গালী কি এসব বুঝে না? বাঙ্গালী কি এতই বুজদিল? বাঙ্গালী সব জানে, সব বুঝে কেবল সময়ের অপেক্ষায় আছে। বাঙ্গালী আজ সম্পূর্ণ সচেতন।

আর এই ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর মহলের পদলেহন পরে তাদের মনতুষ্টির জন্যে চাটুকারিতা করে চলেছে বাংলার কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতক, পিশাচ। হানাদারদের

সাময়িক সাফল্যকে তারা স্থায়ী সাফল্য বলে মনে করে, হানাদার পশুদের সাথে হাত মিলিয়ে বাংলার গণজীবনে হাহাকার সৃষ্টি করেছে। বিশ্বাসঘাতককে কেউ কখনো বিশ্বাস করে না-- ইতিহাস তার সাক্ষী, মীরজাফরকে রেহাই দেওয়া হয়নি। বিশ্বাসঘাতক যাদের জন্যে দেশ ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, স্বার্থসিদ্ধির পর তারাই তাদের খতম করে দেয়। তাই বিশ্বাসঘাতকের জান-মাল দু'দিক থেকেই বিপন্ন। বাংলার মুক্তিকামী মানুষ, বাংলার মানুষ, বাংলার মাটি থেকে এসব বিশ্বাসঘাতক মোনাফেক, পরগাছাদের নির্মূল করে দিতে বদ্ধপরিকর। এ অভিযান চলছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতককে বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাসঘাতককে তাদের কাজের জন্য চরম মূল্য দিতে হবে কোন ক্ষমা নেই! তাদের উৎখাত করা হবেই-তাদের পাঞ্জাবী প্রভুদের বেষ্টনী ভেদ করে মুক্তি সংগ্রামীর বুলেট বিশ্বাসঘাতকের লাগবেই। নির্যাতীত, নিপীড়িত মানুষের তীব্র জ্বালায় বিশ্বাসঘাতকদের ধন-সম্পত্তি দাউ দাউ করে জ্বলবে। জাতীয় স্বার্থে বাঙ্গালী শত্রুকে ক্ষমা করবে না, করতে পারে না- তাদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে।

আজকের এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। বাঙ্গালীর এ সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম, সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম, মানুষের নিজের গরজে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের জন্য মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষকে মেরে রাষ্ট্র হতে পারে না। বাঙ্গালী তাদের দু'যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতায় নিজেরাই নিজেদের শাসন করার দাবী জানিয়েছে, বাঁচার মত বাঁচতে দাবী জানিয়েছে। বাঙ্গালী তাদের সন্তানদের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের চিকিৎসার দাবী জানিয়েছে, অনাহার-অনটনের হাত থেকে মুক্তিলাভের দাবী জানিয়েছে, বন্যা ও প্লাবনের কবল থেকে রক্ষা করার দাবী জানিয়েছে, বেকারত্বের অবসানে কর্মসংস্থানের দাবী জানিয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকারে শান্তিতে ও সুখে বাস করার দাবী জানিয়েছে। অন্য কোন অপরাধ করেনি। বাঙ্গালী অটুট সঙ্কল্প ঐক্য ও দৃঢ়তা তার মুক্তি আনবে; বাঙ্গালী পশ্চিম পাকিস্তানী অক্টোপাসের কবল থেকে মুক্ত হবেই।

আল্লাহতা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন : সত্যের জয় ও মিথ্যার বিনাস অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালী এতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

জয় বাংলা।

গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রচার দপ্তর হইতে প্রকাশিত

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের তালিকা

শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যাপক জি, সি, দেব
অধ্যাপক মুনির চৌধুরী
জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
ড. আবুল খায়ের
ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
জনাব এ, এন, এম, মনিরুজ্জামান
ড. এম, এ, মুক্তাদির
ড. ফজলুর রহমান খান
জনাব এস, সি, ভট্টাচার্য
জনাব আনোয়ার পাশা
জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ
ড. সাদত আলী
জনাব আনোয়ার পাশা
ড. ফয়জুল মহী
জনাব সিরাজুল হক খান
জনাব আতাউর রহমান খান খাদিম
জনাব সরাফত আলী
জনাব অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য
জনাব রশীদুল হাসান

চিকিৎসা কর্মকর্তা

ডা: এম মর্তুজা
জনাব মো: সাদেক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ছাত্রদের তালিকা

ফজলুল হক হল

সিকান্দার আলী
আব্দুস সালাম
নজরুল ইসলাম
গোলাম মাহবুব
মোস্তফা হোসেইন
আবুল ফজল
আবুল কাশিম

জহরুল হক হল

জাফর আলম
চিশতি মোহাম্মদ হেলালুর রহমান
জাহাঙ্গীর মুনীর
আবুল কালাম
আবু তাহের পাঠান
সালেহ আহাম্মদ
আশরাফ আলী খান

সূর্য সেন হল

জিল্লুর মোর্শেদ মিঠু
বদিউল আলম
শামসুজ্জামান
আব্দুর রহিম
আতাউর রহমান
আমীরুল সালাম
আতিকুর রহমান

হাজী মোহাম্মদ মহসীন হল

এ,কে, এম, মিরাজুদ্দীন
সামাদ
নিজামউদ্দীন ভুঁইয়া
আনোয়ার হোসাইন
সৈয়দ নূরুল আমিন
খোন্দকার আবু তাহের
জাহাঙ্গীর হায়দার খান
জহিরুল ইসলাম
মোশাররফ হোসাইন
মঞ্জুর রহমান চৌধুরী

সলিমুল্লাহ হল

ওয়াহিদুর রহমান
নিজামুদ্দিন আজাদ
লুৎফর আজিম
নজরুল ইসলাম
সিকান্দার হায়াৎ খান
শাহজাহান চৌধুরী
মো: সলিমুল্লাহ
শাহজাহান কবীর
আব্দুস সালাম
নাসিম মুহসীন

জগন্নাথ হল

স্বপন চৌধুরী
গণপতি হালদার
মৃণাল কান্তি বোস
মনোরঞ্জন বিশ্বাস
রমনী মোহন ভট্টাচার্য
কিশোরী মোহন সরকার
রনদা প্রসাদ রায়
সুবল চন্দ্র চক্রবর্তী
ভবতোস ভৌমিক
ননী গোপাল ভৌমিক
বরদাকান্ত তরফদার
সত্যরঞ্জন দাস
কেশবচন্দ্র হালদার
নির্মল কুমার রায়
বিধান চন্দ্র ঘোষ
শিবু কুমার দাস
শিশুতোষ দত্ত চৌধুরী
রাখাল চন্দ্র রায়
উপেন্দ্র নাথ রায়
সন্তোষ কুমার রায়

জীবনকৃষ্ণ সরকার
সত্যরঞ্জন নাগ
রুবেন্দ্রনাথ সেন
মুরারী মোহন বিশ্বাস
বিমল চন্দ্র রায়
প্রবীর পাল
নিরঞ্জন হালদার
কার্ত্তিক শীল
পল্টন দাস
সুজিত দত্ত
নিরঞ্জন সাহা
হরিনারায়ন দাস
দীনেশ চন্দ সিকদার
নিরঞ্জন চন্দ্র
সুব্রত সাহা
প্রদীপ নারায়ন রায় চৌধুরী
আনন্দ কুমার দত্ত
রবীন রায়
সুশীল চন্দ্র দাস
সুভাষ চক্রবর্তী

অজিতরায় চৌধুরী

শহীদুল্লাহ হল

জালাল উদ্দিন হায়দার

চারুকলা ইন্সটিটিউট

অমিত বসাক

মো: শাহনেয়াজ

সংযুক্ত তালিকা
লতিফুর রহমান
বদরুদ্দোজা
মাহতাব উদ্দিন
আবুল কাশেম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত মুক্তিযুদ্ধে শহীদ কর্মচারীদের তালিকা

আব্দুল্লাহ ভুঁইয়া	ঃ	উচ্চমান সহকারী, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট
খগেন্দ্র চন্দ্র দে	ঃ	চাপরাশী, দর্শন বিভাগ
আব্দুস সামাদ	ঃ	চৌকিদার, ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র
দজ্জুলাল	ঃ	সুইপার, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র
আবদুস সহিদ	ঃ	টি এস সি কাফেটেরিয়া
পীর মোহাম্মদ	ঃ	পিওন, রেজিস্ট্রারের দপ্তর
সোলায়মান	ঃ	দারোয়ান, রোকেয়া হল
চুন্নু মিয়া	ঃ	মালী, রোকেয়া হল
আব্দুলখালেক	ঃ	মালী, রোকেয়া হল
আহাম্মদ আলী	ঃ	লিফ্‌টম্যান, রোকেয়া হল
নূরুল ইসলাম	ঃ	বেয়ারার, রোকেয়া হল
হাফিজুউদ্দিন	ঃ	বেয়ারার, রোকেয়া হল
নমি	ঃ	দারোয়ান, জগন্নাথ হল
প্রিয়নাথ রায়	ঃ	দারোয়ান, রোকেয়া হল
সুনীল চন্দ্র দাস	ঃ	দারোয়ান জগন্নাথ হল
দু:খীরাম মন্ডল	ঃ	দারোয়ান, জগন্নাথ হল
শামসুদ্দীন	ঃ	নৈশ প্রহরী, জহরুল হক হল
জহর লাল	ঃ	মালী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
দাসু রাম	ঃ	মালী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
সিরাজুল হক	ঃ	বেয়ারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব
আলী হোসাইন	ঃ	বেয়ারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব
সোহরাব আলী গাজী	ঃ	বেয়ারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব
শিভযাদ কাপুরী	ঃ	দারোয়ান, জগন্নাথ হল
শ্রী মিস্ত্রী	ঃ	ইলেকট্রিশিয়ান
আব্দুল মজিদ গাজী	ঃ	দারোয়ান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব
সুনীল চন্দ্র দে	ঃ	দারোয়ান, জগন্নাথ হল
মোহাম্মদ নোনা মিয়া	ঃ	ঝাড়ুদার, চারুকলা ইন্সটিটিউট

সংগ্রহ : গোপাল, ডাকসু কার্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ স্মরণে (স্মরণিকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, হুমায়ুন আহমদ সম্পাদিত, ১৯৮৮

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের শহীদের তালিকা:

১. অধ্যাপক হবিবর রহমান
রিডার, গণিত বিভাগ

২. অধ্যাপক মীর আব্দুল কাইউম
মনোবিজ্ঞান বিভাগ

৩. অধ্যাপক সুখরঞ্জন জমাদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

৪. আব্দুর রাজ্জাক
নৈশ প্রহরী, প্রশাসনিক ভবন

৫. শেখ এমাজউদ্দিন
স্টেনো টাইপিস্ট, প্রশাসনিক শাখা

৬. এস. এম. সাইফুল ইসলাম
উচ্চমান সহকারী, হিসাব বিভাগ

৭. মো: কলিমউদ্দিন
কর্ম সহকারী,প্রকৌশল দপ্তর।

৮. মোহনলাল
সুইপার স্টুয়ার্ড শাখা

৯. আবুল আলী
পরিবহন শাখার ড্রাইভার

১০. শফিকুর রহমান
কাঠমিস্ত্রি
প্রকৌশল দপ্তর

১১. নূরু মিঞা
প্রহরী স্টুয়ার্ড অফিস

১২. মোহাম্মদ ইউসুফ
উপচার্য অফিসের জরুরী পিয়ন

১৩. মো: ওয়াজেদ আলী
পিয়ন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর

১৪. মো: আফজল মৃধা
প্রহরী উপচার্যের দপ্তর

১৫. ওয়াহাব আলী
অর্ডালী পিয়ন
প্রক্টর দপ্তর

১৬. আব্দুল মালেক
বেয়ারা আইন বিভাগ

১৭. কোরবান আলী
প্রহরী
ভূগোল বিভাগ

১৮. ইদ্রিস আলী
পানি বাহক
সৈয়দ আমীর আলী হল

ছাত্র :

১৯. আব্দুল মান্নান আখন্দ
বাণিজ্য বিভাগ
দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান

২০. আমীরুল হুদা জিন্নাহ
বাংলা বিভাগ
এম. এ. শেষ বর্ষ

২১. গোলাম সারওয়ার খান সাধন
এম.এস. সি.
পূর্ব ভাগ

২২. প্রদীপ কুমার রাহা
রসায়ন বিভাগ
স্নাতক সম্মান শ্রেণী

২৩. মোহাম্মদ আলী খান
অর্থনীতি বিভাগ
প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান

২৪. শাহজাহান আলী
বাণিজ্য বিভাগ
স্নাতক সম্মান শ্রেণী

২৫. মিজানুল হক
এম.এস. সি (পূর্বভাগ)
পদার্থবিদ্যা বিভাগ

মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, (স্মরণিকা), শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭

স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ছাত্র-কর্মচারীদের তালিকা

১. মোঃ বদিউল আলম ৪র্থ বর্ষ পুরকৌশল
২. সালাহউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ৪র্থ বর্ষ তড়িৎকৌশল
৩. জামালউদ্দিন আহমেদ ৪র্থ বর্ষ বস্ত্রকৌশল
৪. মোঃ আহসানুল হাবীব ৪র্থ বর্ষ যন্ত্রকৌশল
৫. আবু সেলিম শহিদুজ্জামান ৩য় বর্ষ পুরকৌশল
৬. মোঃ হাবিবউল্লাহ ৩য় বর্ষ তড়িৎকৌশল
৭. মোঃ আনোয়ারুল আজীম ৩য় বর্ষ তড়িৎকৌশল
৮. মুফতী মোহাম্মদ কাসেম ৩য় বর্ষ যন্ত্রকৌশল
৯. মোঃ মাহফুজুল হক ৩য় বর্ষ যন্ত্রকৌশল
১০. মোঃ রফিকউদ্দিন আহমেদ ২য় বর্ষ পুরকৌশল
১১. আবুল কাসেম শরফুদ্দিন আহমেদ ২য় বর্ষ তড়িৎকৌশল
১২. আবুল কাশেম মোল্লা ২য় বর্ষ তড়িৎকৌশল
১৩. শামসুদ্দিন আহমেদ ২য় বর্ষ তড়িৎকৌশল
১৪. ইকবাল আহমেদ ২য় বর্ষ যন্ত্রকৌশল
১৫. এ, কে, এম আমিনুল ইসলাম ১ম প্রকৌশল
১৬. আবু আহমেদ আবদুল্লাহ ১ম প্রকৌশল
১৭. মোঃ গোলাম নবী ১ম প্রকৌশল
১৮. শ্রী সিদ্ধিপদ ঘোষ স্টেনো টাইপিষ্ট
১৯. আব্দুল সোবহান আখন্দ, ল্যাবরেটরী এসিস্ট্যান্ট
২০. আবদুস সোবহান, মালী, সোহরাওয়ার্দী হল

স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ছাত্র-কর্মচারীদের স্মরনে স্মৃতিফলক থেকে সংগৃহীত, ২৭ আগষ্ট, ১৯৮৯।

মুক্তিবাহিনীর শপথনামা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
জয় বাংলা

আমি ---

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার*/ পরমেশ্বরের*/ সৃষ্টিকর্তার* নামে সজ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে শপথ করিতেছি যে, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে হইলেও আইনগতভাবে গঠিত প্রতিনিধিত্বশীল স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকিব। আমি আরো শপথ করিতেছি যে, মুক্তিবাহিনীর একজন সৈনিক হিসাবে আমি আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সর্বশক্তি নিয়োগ করিব এবং এ ব্যাপারে আমার উপর অর্পিত যে কোন দায়িত্ব ও নির্দেশ প্রাণের বিনিময়ে হইলেও যথাযথভাবে পালন করিব, দেশরক্ষার স্বার্থে জল, স্থল বা আকাশপথে যে কোন স্থানে যাইব এবং মুক্তিবাহিনীতে আমার উর্ধতন নায়ক বা অন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে কোন নির্দেশ প্রাণ বিপন্ন করিয়াও পালন করিব।

আমি আরো শপথ করিতেছি যে, বাংলাদেশের সামরিক প্রস্তুতি ও বাংলাদেশ রক্ষণ ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা অন্য কোন বন্ধু রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের বন্ধুত্ব-পূর্ণ সম্পর্কের সহিত জড়িত যে কোন তথ্য এমন কোন ব্যক্তিকেই জানাইব না বা তাহার কর্ণগোচর করিব না, যাহার সরকারী দায়িত্ব পালনে এই তথ্য জানিবার প্রয়োজন নাই অথবা যাহাকে কোন তথ্য জানান আমার দেশের স্বার্থানাকূল নয়।

স্থান-হেডকোয়ার্টার, ৯ নং সেক্টর   স্বাক্ষর-
তারিখ ১৪-১-৭১

** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শীল মোহর

* যেটাই প্রযোজ্য হয় পড়ুন

সাক্ষী ....
তারিখ ....

রাজাকারের শপথনামা

AnxtA'
to HQ MLA Zone B
ITr No 1200/3/ML-2
Of o2 Oct 71

SCHEDULE B
form of Oath
(Rule 16)

I ....S/O ....
address............Vill. .... P.O. .... dist............ do solemnly declare that from this moment I shall faithfully fellow the injunctions of my religion, and dedicate my life to the service of my society and country. I shall obey and carry out all lawful orders of my superiors. I shall bear true allegience to the Constitution of Pakistan as framed by law and shall defend Pakistan, if necessary, with my life.

Signature

Oath taken in my presence this 31st days of Oct.1971.

Sd/-Illegible
Deputy Commandant
Nareil Sub-division
Jessore district

পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLADESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLADESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usaqes of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and will-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic mibnorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and Bangladesh Forces in the
Eastern Theatre
16 December 1971

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZi)
Lieutenant-General
Martial Law Administratior Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর (ভারত-বাংলাদেশ বাহিনী) কাছে ৯১,৫৪৯ জন সৈন্যসহ আত্মসমর্পণের পর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক দলিলের হুবহু ভাষা)

ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস
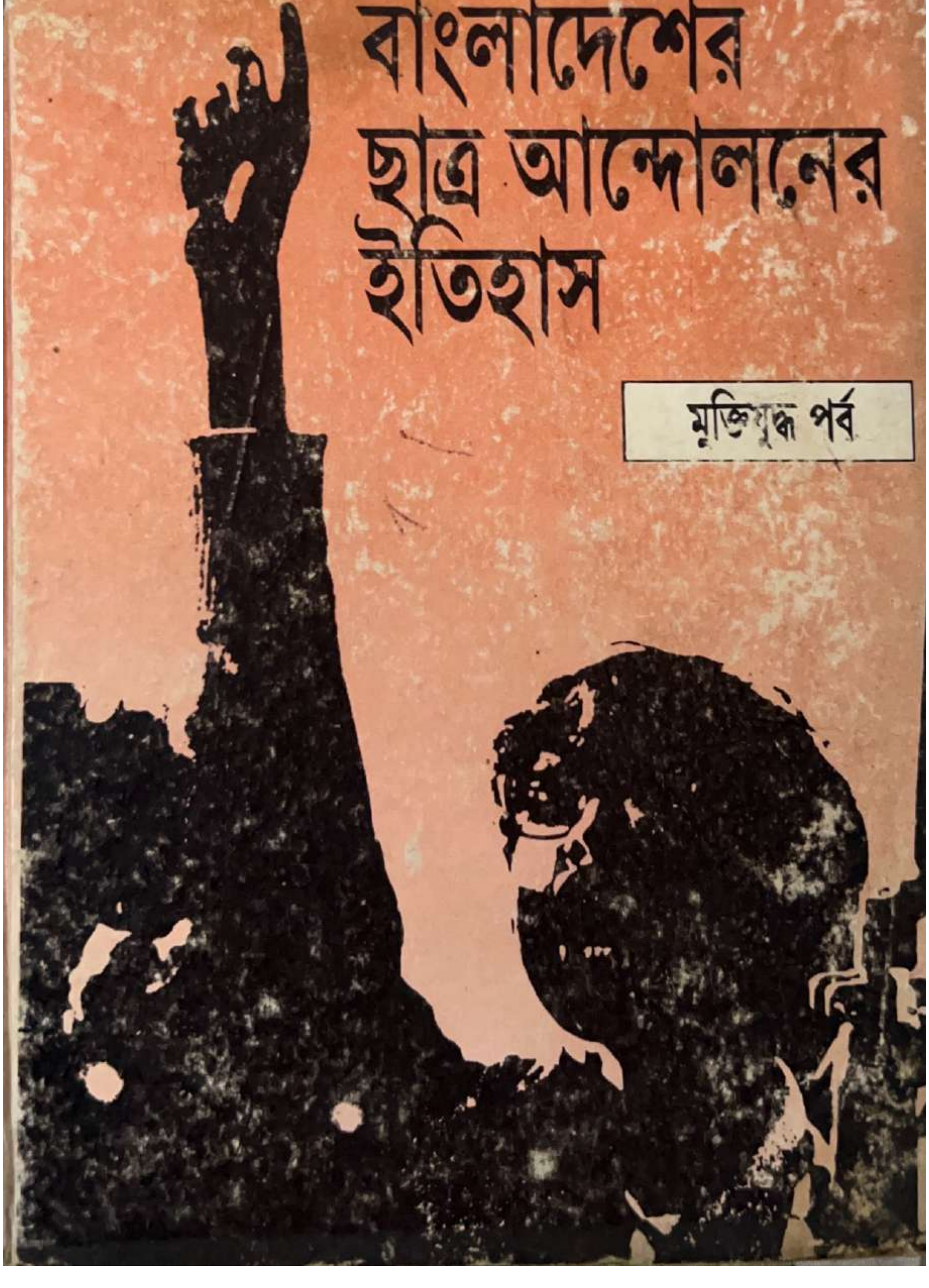
মুক্তিযুদ্ধ পর্ব